পঞ্চাশ বছরের সাংবাদিকতা

জাতীয় প্রেস ক্লাব

সুবর্ণ জয়ন্তি ২০০৪

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ঐতিহাসিক লাল বাড়ি

জাতীয় প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের পেশা ও অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক সত্তা। এদেশে সাংবাদিকতা পেশায় উৎকর্ষ অর্জন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার সুদীর্ঘ লড়াইয়ের উৎসভূমি এই ক্লাব। জাতীয় ইতিহাসেও রয়েছে এর গৌরবোজ্জ্বল, জোরালো ভূমিকা ও অবদান। প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচার বিরোধী সকল আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রেস ক্লাব ছিল অনন্য বলিষ্ঠ এক প্রতিষ্ঠান। সাহসের উৎসভূমি, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কেন্দ্র।

ঐতিহাসিক সেই লাল বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু, ক্লাব এখন বিশাল কমপে-ক্সেপরিণত। সেই বাড়ি সংরক্ষণ করাই ছিল বাঞ্ছনীয় এবং ঐতিহ্যের দাবি। কিন্তু শত দীর্ঘশ্বাসেও আমরা তা ফিরে পাবো না আর!

জাতীয় প্রেস ক্লাব অনাগত দিনগুলোতে আপন ঐতিহ্যের ধারায়, আনন্দের উদ্ভাসে, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক দায়িত্ব পালনে বর্ণচ্ছটায় ক্রমেই আরও বিকশিত হোক। সৃষ্টিশীলতার প্রয়াসে, সহিষ্ণুতায়, পারস্পরিক সহাবস্থানে, শ্রদ্ধাবোধে আরও আদর্শ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক এই সম্মিলনের কেন্দ্র। ক্ষুদ্র দলাদলি, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধে উঠে সকলের প্রিয় মিলনস্থলে পরিণত হোক জাতীয় প্রেস ক্লাব।

গ্রামীণফোন

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেস ক্লাবের নতুন কমপে-ক্স

প্রাচীন ও ছোট্ট শহর ঢাকায় সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল অনেক বছর আগে। কালের প্রবাহে এ পেশা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, আধুনিকতায় উজ্জ্বল হয়েছে। ব্যতিক্রমী এ পেশার পরিধি, দায়িত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও ঝুঁকি সব কিছুই বেড়েছে বহুগুণে। পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী বেরুচ্ছে অজস্র। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে সাংবাদিকতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হয়নি। অনেক তথ্য, ঘটনার মধ্যে পড়েছে বিস্মৃতির প্রলেপ।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণীয় করে রাখবার প্রয়াসে এই গ্রন্থের প্রকাশ। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের কৃতী পূর্বপুরুষদের যাঁদের অসামান্য মেধা, শ্রম, ও নিষ্ঠা এ পেশাকে বিকশিত করেছে। পরিণত করেছে সম্মানিত একটি পেশায়।

সমাজের বঞ্চিত, শোষিত মানুষের প্রতিবাদের কেন্দ্র, প্রত্যাশার প্রতীক এই প্রেস ক্লাব। গৌরবোজ্জ্বল সে ভূমিকা সবসময়ই সাংবাদিকদেরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, মৃত্তিকার সঙ্গে একাত্ম রেখেছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা, পরমত সহিষ্ণুতার লালন, গোঁড়ামিমুক্ত ঋদ্ধ, আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ ও প্রগতির অভিযাত্রায় এই প্রতিষ্ঠান সব সময়েই থেকেছে অগ্রণী। সে ঐতিহ্য আমাদের অনন্য অহঙ্কার।

www.pathagar.com

পঞ্চাশ বছরের সাংবাদিকতা
জাতীয় প্রেস ক্লাব

হাসান হাফিজ সম্পাদিত

জাতীয় প্রেস ক্লাব
১৮ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পঞ্চাশ বছরের সাংবাদিকতা

জাতীয় প্রেস ক্লাব

সুবর্ণ জয়ন্তি প্রকাশনা

হাসান হাফিজ সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ

পৌষ ১৪১১, ডিসেম্বর ২০০৪

প্রকাশক:

শওকত মাহমুদ

সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

১৮ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০

ফোন: ৯৫৬৩৩৮৩, ৯৫৬৩৩৯৪

প্রচ্ছদ ও বই নকশা:

সৈয়দ লুৎফুল হক

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র:

আফতাব আহমেদ (পুরনো ভবনের ছবি)

মীর ফরিদ (নতুন ভবনের ছবি)

গ্রন্থস্বত্ব: জাতীয় প্রেস ক্লাব

মুদ্রণ:

টিউলিপ প্রিন্টার্স

৩৪ সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা

ফোন: ৮৬৩১৫৬৯

এই গ্রন্থে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকদের নিজস্ব

মূল্য: ৫০০ টাকা

ISBN 984-32-1870-1

50 Years of Journalism Jatiya Press Club

Golden Jubilee Publication

Edited by Hasan Hafiz

Price: Taka 500 US$ 20

www.pathagar.com

উৎসর্গ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর সাংবাদিকদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেস ক্লাব

ব্যবস্থাপনা কমিটি
২০০৩-২০০৪

সভাপতি
রিয়াজউদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সহ সভাপতি
মোঃ নূরুল হুদা

সহ সভাপতি
বখ্‌তিয়ার রাণা

সাধারণ সম্পাদক
শওকত মাহমুদ

যুগ্ম সম্পাদক
কামালউদ্দিন সবুজ
সৈয়দ আবদাল আহমদ

কোষাধ্যক্ষ
আবদুর রহমান খান

সদস্য
আবদুল বাতেন
ইউসুফ পাশা
কাজী রওনাক হোসেন
রিটা রহমান
জিয়াউল হক
মাহমুদ হাসান
মোস্তফা কামাল মজুমদার
রেজোয়ানুল হক রাজা
মোঃ মাশির হোসেন
আফতাব আহমেদ
গোলাম মহিউদ্দিন খান
খায়রুল আনোয়ার মুকুল

স্মরণিকা উপ-কমিটি
২০০৩-২০০৪

আহ্বায়ক
হাসান হাফিজ

সদস্য
সৈয়দ আবুল মকসুদ
হারুন হাবীব
আকরাম হোসেন খান
মাহমুদ শফিক
আতাহার খান
শিহাব সরকার
সোহরাব হাসান
মঈনুল আহসান সাবের
স্বপন দাশগুপ্ত
মির্জা তারেকুল কাদের
সাইফুল আমিন
নাদিম কাদির
ড. আবদুল হাই সিদ্দিক
মনির হোসেন লিটন

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপন করা হচ্ছে নানামাত্রিক আয়োজনে। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অভিযাত্রায় জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রেস ক্লাবের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনকে এদেশের সাংবাদিক সমাজ গভীর যত্ন ও পরিচর্যায় পুষ্ট ও বিকশিত করেছেন। সেই লালনভূমি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান– জাতীয় প্রেস ক্লাব।

এক সময়ের প্রায় নিস্তরঙ্গ ছোট্ট শহর ঢাকায় ঐতিহাসিক লাল বাড়িতে প্রেস ক্লাবের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সাংবাদিকই শুধু নয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া অঙ্গনের বিশিষ্ট সব মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবে উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে এই ক্লাবের। এই চত্বরের ধূলি-কণা ও পরতে পরতে সঞ্চিত আছে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান, যা আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ ও বিকাশে সহায়তা করেছে।

এই গ্রন্থের লেখাগুলোতে বিধৃত হয়েছে এদেশে সাংবাদিকতা পেশার বিকাশ-বিবর্তনের ধারাক্রম, বিপত্তি, বৈশিষ্ট্য, অর্জন ইত্যাদি। উজান পাড়ি দিয়ে এই পেশা এখন বৃহত্তর পরিসরে উপনীত। দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ, অঙ্গীকার, প্রত্যয়, এমনকি জীবনের ঝুঁকিও। দীর্ঘ লড়াই ও ত্যাগের বিনিময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সে স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার কাজ আরও কঠিন। দুঃখজনক সত্য, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের চোরাবালিতে ঘুরপাক খেতে খেতে সাংবাদিক ইউনিয়ন খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় প্রেস ক্লাব এখনও অখণ্ড, মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও এর নবীন-প্রবীণ সদস্যরা একই ছাদের নিচে সমবেত– এটা শ্লাঘার ব্যাপার নিঃসন্দেহে।

সাংবাদিকদের 'সেকেণ্ড হোম' অভিধায় ধন্য-গর্বিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের বহুমাত্রিক উন্নয়নে, সাংবাদিকতা পেশার মর্যাদা অর্জন ও বিকাশে এর প্রতিটি সদস্যই অংশীদার। নিছক বিনোদনের লক্ষ্যে কিংবা আড্ডা-গল্প-গুজবের জন্যেই এ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। জ্ঞান, বিজ্ঞান, মননের চর্চাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। কালের প্রবাহে এই দিগন্ত আরও নতুন নতুন উজ্জ্বলতায় হবে দীপ্ত। আমরা সেই স্বপ্নাভিসার ও প্রত্যয়ে উদ্দীপিত।

এই গ্রন্থের লেখকদের বেশিরভাগই প্রবীণ সদস্য। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ক্লাব সদস্যদের মধ্যেই সীমিত থাকিনি। সাংবাদিকতা পেশার বিকাশ-বিবর্তন, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং হালফিল প্রবণতা, মৌল বৈশিষ্ট্য, চারিত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরাও। বর্তমান ও অনাগত প্রজন্মের যারা সাংবাদিক, তাদের কাছে বিশাল ও গৌরবস্নিগ্ধ ইতিহাসের মাত্রা ও পরিধি প্রতীকী হলেও উপস্থিত করা ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। সেজন্যে পথিকৃৎ সাংবাদিকদের কয়েকটি লেখাও সংযোজিত হলো।

এই গ্রন্থের সব লেখককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শ্রদ্ধেয় রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক আমার পরম প্রীতিভাজন শওকত মাহমুদের

www.pathagar.com

সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে ক্রমেই নতুনতর মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে জাতীয় প্রেস ক্লাব। তাঁদের সর্বাত্মক সমর্থন, উদার সহায়তা ও নিরন্তর তাগিদ এ গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভবপর ও সহজ করেছে। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক কল্যাণীয় সৈয়দ আবদাল আহমদ পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সহায়তা দিয়েছেন। ধন্যবাদ গ্রামীণ ফোনকে, যারা বিপুলায়তন এ বই প্রকাশনার একক পৃষ্ঠপোষক।

সম্পাদনার দুরূহ, শ্রমসাধ্য কাজে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন ইউএনবি ও ঢাকা কুরিয়ারের নির্বাহী সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম মো: রওশনউজ্জামান, দৈনিক জনকণ্ঠে আমার সহকর্মী বন্ধু আলী হাবিব, বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের (এফইজেবি) চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম চৌধুরী। এফইজেবি কর্মী প্রীতিভাজন আরিফ-উল-ইসলাম মাসের পর মাস এ গ্রন্থ নিখুঁত করে তোলার ব্যাপারে প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন। পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ উপযোগী করে তোলার সময়সাপেক্ষ ও কঠিন শ্রমস্বীকারের বাইরেও প্রবীণ শ্রদ্ধেয় দুই ব্যক্তিত্ব ফয়েজ আহমদ ও সিরাজুল হোসেন খানের মূল্যবান বক্তব্যের শ্রুতিলিখন নিয়েছেন।

অজস্র ধন্যবাদ শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হককে, যাঁর শৈল্পিক ছোঁয়া উপস্থিত এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও বিন্যাসে। দুই প্রজন্মের দুই খ্যাতিমান আলোকচিত্রী আফতাব আহমদ ও মীর ফরিদকেও ধন্যবাদ– তাঁদের তোলা ছবি প্রচ্ছদ ও ফ্ল্যাপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ গ্রন্থ প্রকাশনায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে আমার স্ত্রী অধ্যাপক শাহীন আখতার ও পুত্র শিহান তাওসিফ গৌরবকে। মাসের পর মাস তারা আমার সঙ্গবঞ্চিত হয়েছেন, ওঁদের কৃতজ্ঞতা না জানালে ঘোরতর অন্যায় হবে।

পৌষ ১৪১১
ডিসেম্বর ২০০৪

হাসান হাফিজ
আহ্বায়ক
স্মরণিকা উপকমিটি
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	আমরা প্রায় সমবয়সী	ওবায়েদ উল হক	১৩
২.	হে প্রেস ক্লাব আমার!	ফয়েজ আহমদ	১৬
৩.	একটি লাল দালানের স্মৃতি	আবদুল গাফফার চৌধুরী	২৬
৪.	আজ এবং ফিরে দেখা কাল	তোয়াব খান	৩০
৫.	অতীত স্মৃতির কিছু ছোঁয়া প্রেস ক্লাব	এ বি এম মূসা	৩৭
৬.	পিছু ফিরে দেখা	আবদুল মতিন	৪১
৭.	সাংবাদিকতার গুরুত্ব ভালো সরকার নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব পালনে	মইনুল হোসেন	৪৫
৮.	আমার ক্লাব আমাদের ক্লাব	আতাউস সামাদ	৪৮
৯.	প্রেস ক্লাবের স্মৃতি কখনওই ভুলবো না	আবদুল আওয়াল খান	৫৩
১০.	ফেলে আসা দিনগুলো	হাসানউজ্জামান খান	৫৭
১১.	কালের সাক্ষী এই প্রেস ক্লাব	কামাল লোহানী	৬০
১২.	স্মরণ করি	সিরাজুল হোসেন খান	৬৮
১৩.	সাংবাদিক, সাংবাদিকতা, সাংবাদিকের স্বাধীনতা	আমান উল্লাহ	৭৬
১৪.	ক্লাবের প্রথম দিকের কিছু স্মৃতি	মো: নূরুল ইসলাম	৮২
১৫.	বাংলাদেশের সাংবাদিকতা: সেকাল ও একাল	ফজলুল করিম	৮৮
১৬.	প্রেস ক্লাব॥ কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি	বোরহান আহ্মেদ	১০১
১৭.	আদি ও নবরূপে জাতীয় প্রেস ক্লাব	বেলাল চৌধুরী	১০৫
১৮.	দেশপ্রেমবোধ বিবর্জিত সাংবাদিকতা নাকি দেশপ্রেমবোধ সম্পন্ন সাংবাদিকতা?	চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক	১১১
১৯.	আমরা পরিবর্তনের পালায়	আলমগীর মহিউদ্দিন	১১৫
২০.	গণমাধ্যমের হালচাল: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা	ড. সাখাওয়াত আলী খান	১২১
২১.	প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সালাম	গাজীউল হাসান খান	১২৮
২২.	স্মৃতিময় প্রেস ক্লাব	হাবিবুর রহমান মিলন	১৩৩
২৩.	আরাফাতের সাক্ষাৎকার: রোমাঞ্চকর অনুভূতি	জহিরুল হক	১৩৭
২৪.	আমি কি সাংবাদিক ছিলাম?	কে জি মোস্তফা	১৪৭
২৫.	সাংবাদিকদের এখন মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়	মতিউর রহমান	১৫৫
২৬.	উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও জাতীয় উন্নয়ন	মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্	১৫৯
২৭.	ক্রীড়া সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রা চলবেই	মুহম্মদ কামরুজ্জামান	১৬৪
২৮.	আঠারো নম্বর তোপখানা রোড	এরশাদ মজুমদার	১৬৯

www.pathagar.com

২৯. বাংলাদেশের সংবাদপত্রের শতবর্ষ	সৈয়দ আবুল মকসুদ	১৭২
৩০. স্মৃতিময় পাঁচ দশক, নানা কথা	মাশির হোসেন	১৭৬
৩১. জাতীয় প্রেস ক্লাব	এ. এস. এম. হাবিবুল্লাহ	১৮০
৩২. বিজয় আমি দেখেছি	আফতাব আহমেদ	১৮৪
৩৩. অর্থনীতির খোলা ময়দানে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা	ড. গোলাম রহমান	১৯০
৩৪. অসমাপ্ত পেশা	মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	১৯৮
৩৫. 'আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন!'	এম. তাজুল ইসলাম	২০৪
৩৬. আঠারো তোপখানা– একটি ঠিকানা	সালেহ চৌধুরী	২১১
৩৭. পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে কিছু কথা	আবদুল মতিন	২১৬
৩৮. আমার লাল দালানের প্রেস ক্লাব	শেহাবউদ্দিন আহমেদ (নাফা)	২১৯
৩৯. কিছু সময় কিছু অভিজ্ঞতা	শফিকুর রহমান	২২৩
৪০. সংবাদপত্রের ইতিহাস, আমার দেখা সংবাদপত্রের ডিজাইন	সৈয়দ লুৎফুল হক	২২৯
৪১. পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা, আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাব	কামরুল ইসলাম চৌধুরী	২৩৬
৪২. সুবর্ণ জয়ন্তির এই লগ্নে	নাসিমা হক	২৪১
৪৩. আমাদের সাংবাদিকতা	রোজী ফেরদৌস	২৪৬
৪৪. প্রেস ক্লাব– '... রাফ ড্রাফ্ট অব হিস্ট্রি'	শিহাব সরকার	২৫৩
৪৫. স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামল: যেসব খবর ছাপা যায়নি	সৈয়দ আবদাল আহমদ	২৫৭
৪৬. শুদ্ধতম সাংবাদিকতার স্বার্থে.....	বেবী মওদুদ	২৬৫
৪৭. সাংবাদিকতায় বিড়ম্বনা	সুনীল ব্যানার্জি	২৬৯
৪৮. সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হোক সমাজ-দর্পণের ব্রত	মমতাজ বিলকিস	২৭৫
৪৯. সোনার খাঁচার দিনগুলি	পারভীন সুলতানা মৃসা ঝুমা	২৭৯
৫০. আমাদের সেকেণ্ড হোম	রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	২৮২
৫১. আরও আলোকিত প্রেস ক্লাব গড়ার স্বপ্নে	শওকত মাহমুদ	২৮৬
৫২. সাংবাদিকতার একাল সেকাল: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের চোখে	হাসান হাফিজ	২৮৮
৫৩. My Career in News Agency Journalism: Entry & Exit	Golam Tahaboor	২৯৩
৫৪. Law and Journalism	Humayun Kabir Chowdhury	২৯৬
৫৫. Of politics, parties and politicians	Sayed Kamaluddin	৩০০

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

শেষ দু'টি সম্পাদকীয়	মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	৩০৫
পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন	তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)	৩০৭
The Supreme Test	Abdus Salam	৩১৩
অর্থ সংকটের দুর্দিনে	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	৩১৫
দরবার-ই-জহুর	জহুর হোসেন চৌধুরী	৩১৯
সেই লাল বাড়িটা	এম আর আখতার মুকুল	৩২৩
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সম্পাদকের ভূমিকা	মুজীবুর রহমান খাঁ	৩২৯
সংবাদপত্র ও সাংবাদিক	সিরাজুদ্দীন হোসেন	৩৩৩
প্রেস ক্লাবের গোড়ার কথা	খায়রুল কবীর	৩৩৬
স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের কেন্দ্র প্রেস ক্লাব	আহমেদ হুমায়ূন	৩৩৯
মনে মনে	সৈয়দ নূরুদ্দিন	৩৪৩
আন্দোলন সংগ্রামে সংবাদপত্রের ভূমিকা	সন্তোষ গুপ্ত	৩৪৭

ফটো অ্যালবাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমরা প্রায় সমবয়সী

ওবায়েদ উল হক

বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের বয়স ৫০ বছর পুরো হলো। উল্লেখ করার ও উল্লসিত হবার মতো তথ্য বটে। চার্লস ডিকেন্স সৃষ্ট একটি চরিত্র মিস্টার টোয়েমলো 'হাউস অব কমন্স' সম্পর্কে বলেছেন– 'I think that is the best club in London'. এদেশের কোনও টোয়েমলো জাতীয় সংসদ ও জাতীয় প্রেস ক্লাব সম্পর্কে এমন কোনও উক্তি করেছেন কিনা জানি না।

জাতীয় প্রেস ক্লাব বাংলাদেশের অবিভক্ত সাংবাদিক সম্প্রদায়ের অখণ্ডিত ঠিকানা হতে পারাই যথেষ্ট শ্লাঘার ব্যাপার। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সাল এই ৫০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর গৌরবগাথা রচনার প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যেতে পারে। এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি আনন্দোৎসবের লগ্ন সন্দেহ নেই।

বয়সের বিচারে আমি অবশ্য অনেক এগিয়ে। ১৯১১ সালের ৩১ অক্টোবর আমার ভবলীলার প্রথম দিন। এ লীলা সাঙ্গ হবার দিনও সন্নিকট। শরীর নামক মহাশয় এখন একেবারেই অবাধ্য। কিছুই সয় না। দেহ যন্ত্রটির সকল অংশ বহুল ব্যবহারে জীর্ণ, অচল। মন প্রায়ই আনমনা। শেকসপিয়ারের কথায়– 'Age is in, the wit is out' এই দশা।

তবে সাংবাদিকতা কালের গণনায় তফাতটা বেশি নয়। প্রায় নেক টু নেক। আমার সাংবাদিক-জীবন শুরু হয় ১৯৫১ সালে, বলা যায় আমাকে বিস্মিত করেই। অনেকটা দৈবায়ত্ত। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অবিভক্ত বাংলার বিবেকহীন মুনাফালোভী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-সৃষ্ট কৃত্রিম খাদ্য সংকটের ফলে ৫০ লক্ষ দরিদ্র মানুষ অনাহারে মারা যায়। সম্পূর্ণরূপে অকারণ ও অভাবনীয় সেই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মুনাফাখোর, মজুতদার ও কতিপয় উচ্চপদস্থ অর্থগৃধ্নু কর্মকর্তা ছাড়া আর সকলের মনেই অশেষ বেদনা ও প্রশ্নের সঞ্চার করে। সেই তেতাল্লিশের মন্বন্তর নিয়ে 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' নামে একটা বড় গল্প লিখলাম। অসহায় কাঙালদের গণমৃত্যু বা গণহত্যার একটা চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলাম তাতে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা মাসিক সওগাত, মোহাম্মদী, বুলবুল ও ছায়াবীথিতে গল্প, নাটক, রম্যরচনা ইত্যাদি লিখতাম। এই গল্পটিও তাতে ছাপার জন্যে পাঠাতে গিয়ে ভাবলাম, যাদের জন্যে লেখা সেই নিরক্ষর কাঙালেরা তো পড়তে পারে না। তারা কেন এমন দলবদ্ধ হয়ে মারা যায়, কেন অসাধু ব্যবসায়ের বলি হয়, তা তো জানতে

www.pathagar.com

পারবে না। কথাগুলো তাদের জানাবার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সিনেমা, চলচ্চিত্র। ছবির মাধ্যমে বলা কাহিনী অজ্ঞ মূর্খরাও বুঝতে পারে।

অতএব বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের কেন্দ্র কলকাতায় গেলাম। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও থেকে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছায়ানট পিকচার্স এর প্রযোজনায় 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' নামের পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি নির্মাণ করলাম। ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও ঢাকাসহ বাংলা-আসাম সার্কিটের অনেকগুলো সিনেমা হলে ছবিটি মুক্তি পেলো সেই সময়ের অতিশয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফাঁড়া কাটিয়ে। কিন্তু আরেকটি ফাঁড়া সামনে এসে দাঁড়ালো, যা কিছুতেই কাটানো সম্ভব হয়নি। ভারত ভাগ হলো এবং পাকিস্তানের জন্ম হলো। কলকাতা রইলো ভারতে। আমাদের পূর্ব বাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান।

সুতরাং সব ফেলে রেখে আমাকে চলে আসতে হলো পূর্ববাংলার মহকুমা শহর (এখন জেলা) ফেনীর বাড়িতে। তখন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ফলে বেকার জীবন। দেহ ও মনের পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর উনপঞ্চাশ সালে ঢাকা থেকে ইংরেজি ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পর থেকে সেই পত্রিকায় লিখতে লাগলাম।

একান্ন সালে ঘটলো এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক জনাব আবদুস সালামের ২৫ জুলাইয়ে লেখা একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন– ".....I believe it will be very good for you if instead of lying quiescent on bed at Feni you could join us here as a member of the Editorial Board. ....We shall pay you to start with between Rs. 300 and 400 per month. This is nothing for you, but this will give you a change of scene and occupation which must have beneficial effects on your health." সম্পূর্ণভাবে বিস্ময়কর, অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রস্তাবিত টাকার অঙ্ক মোটেই বিবেচ্য নয়। অকেজো দিনগুলোর অবসানের সম্ভাবনাই আসল কথা। তবে এ পেশা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সালাম সাহেব সিরিয়াস। আমার নীরবতায় তিনি নিরুৎসাহিত হননি। ৭ আগস্টে তাঁর একটা টেলিগ্রাম এলো– 'Please join immediately'

অনেকটা কৌতূহলবশেই ঢাকায় এলাম। জনসন রোডে অবজারভার অফিসে এসে প্রবেশ করলাম নতুন এক জগতে, যেখানে প্রবেশ ও থাকার অলঙ্ঘনীয় শর্ত হচ্ছে কৌতূহল বা অজ্ঞাতকে জানার আগ্রহ। সেদিন থেকে প্রখ্যাত সম্পাদক আবদুস সালামের উদ্যোগ ও সৌজন্যে একজন অখ্যাত সাংবাদিক হিসেবে আমার যাত্রা শুরু হয় অজানা এক জগতের বন্ধুর পথে। তিনিই আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে এলেন চলচ্চিত্র জগতের সার্থক-অসার্থক সৃজনশীল কর্মকাণ্ড থেকে সংবাদপত্র জগতের প্রতিদিনের রোমাঞ্চকর বিশ্ব আবিষ্কারে।

আমার সাংবাদিক জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও চির অমলিন স্মৃতি পাকিস্তান অবজারভারের পতন ও বাংলাদেশ অবজারভারের উত্থান। একাত্তরের ষোল ডিসেম্বরে

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের গৌরবজনক বিজয়ের দিনে যখন মিত্রপক্ষের কাছে পরাজিত পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল লেখা হচ্ছিল, তখন অবজারভার ভবনে অবজারভার পত্রিকার নাম থেকে পাকিস্তান শব্দটিকে নিশ্চিহ্ন করে সে জায়গায় বাংলাদেশ শব্দটি বসানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার বিরল আনন্দ কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

Dean of ST. Pauls W. R. Inge (প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্যে যাঁকে রেড ডীন বলা হয়) বলেছেন– "The distinction between literature and journalism is bearing blurred; but journalism gains as much as literature loses." কথাটা আমাদেরও মনে রাখা ভালো।

দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। প্রায়শই নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে নবতর রূপসজ্জা ও বলিষ্ঠতর অঙ্গীকার নিয়ে। মানের বিচারেও পিছিয়ে নেই। এখন আর টেলিপ্রিন্টারের depression in Bay of Bengal পত্রিকায় বঙ্গোপসাগরে হতাশা হয়ে দেখা দেয় না। কিংবা পুলিশ রাস্তায় patrol দিতে গিয়ে petrol ঢালে না। তবে সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে বেড়ে চলেছে সাংবাদিকের জীবনের নিরাপত্তাহীনতাও। এ যাবৎ বেশ ক'জন বিশিষ্ট সাংবাদিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আরও অনেককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস নেই। হত্যার বিচার হয়নি। হত্যার হুমকিতে সাংবাদিক ছাড়া যাদের বিচলিত হবার কথা, তারা অবিচলিত।

অথচ সাংবাদিক তো Watch dog of public interest জনস্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী। সে হিসেবে জনগণের পরম মিত্র। জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন সব গোপন কাজকারবার ও অজানা তথ্যাদি উদঘাটন করে সাংবাদিক জনস্বার্থ রক্ষা করেন। তাঁর অনুসন্ধানী রিপোর্টিং বা investigative reporting, muckraking, public conscious journalism বা literature of exposure -এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনস্বার্থ বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড জনসমক্ষে তুলে ধরা। আমেরিকায় এসব রিপোর্টের ভিত্তিতে বেশ কিছু জনহিতকর আইন পাশ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন এমন একটি আইনে স্বাক্ষর করার সময়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, "One voice which spoke so often and eloquently for measures like this is still today- the voice of Rachel Carson.....We owe much to her and to those who still work for the cause of a safer and healthier America." একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশের জন্যে যেসব নিবেদিতপ্রাণ, নির্ভীক সাংবাদিক কাজ করছেন, তাঁরা নিহত ও আহত হচ্ছেন তাদের দ্বারা, যারা প্রকাশ্যে দেশের বন্ধু সেজে গোপনে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত করে চলেছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে কায়েমী স্বার্থের কপটতা ও শঠতার গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোয় আনা ও সত্যকে মিথ্যার বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার একটা সুপরিকল্পিত প্রকল্প জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে কিনা জানার অসীম আগ্রহ মনে লালন করি।

বাংলাদেশের প্রেস ও জাতীয় প্রেস ক্লাব চিরস্থায়ী হোক।

লেখক অধুনালুপ্ত টাইমস-বাংলা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ অবজারভারের সাবেক সম্পাদক

www.pathagar.com

হে প্রেস ক্লাব আমার!

ফয়েজ আহ্‌মদ

এক কালে প্রেস ক্লাব আমার মাতৃভূমিসম ছিল। ছুটি থাক বা না থাক, প্রেস ক্লাবে গিয়ে আড্ডা বা তাস না খেললে আমার সেদিনটা বৃথা যেত। বেশিরভাগ সময় সকালে নাশতা না খেয়ে এক কাপ চায়ের পর সোজা প্রেস ক্লাব। এখানে এসে লুচি-তরকারি-ডিম আর চা না খাওয়া পর্যন্ত যেন স্বস্তি নেই। পৃথিবীতে এমন নাশতা যেন আর কোথায়ও নেই।

রিপোর্টিং এর জীবনে অনেকদিন গেছে, যখন সকাল সাড়ে ৮টায় তেজগাঁও বিমানবন্দরে আমাকে উপস্থিত হতে হয়েছে। সেই সময় বিমান আসতো করাচী থেকে । তখন পর্যন্ত প্রেস ক্লাবে যাইনি বলে এবং যাইনি বলে মনের কোথাও একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। প্রেস ক্লাবকে নিয়ে আমার জীবনের বহুতর বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী আছে। যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ। প্রেস ক্লাবের সৃষ্টিটাই হয়েছে অদ্ভুতভাবে। তখন ইত্তেফাক পত্রিকা হয়েছে। বলতে গেলে ইত্তেফাক, মর্নিং নিউজ, অবজারভার, আজাদ, মিল্লাত, সংবাদ নিয়ে ছয়টি দৈনিক। এসব পত্রিকার সাংবাদিক ছিল অধিকাংশই ঘরমুখো। ঢাকায় সাংবাদিক কোথায় পাওয়া যাবে? কলকাতা থেকে এসেছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি জুনিয়র, কেউ কেউ সিনিয়র। এ দিয়ে তো ছয়টি কাগজ বের করা সম্ভব না। বাধ্য হয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে উৎসাহী ও লেখালেখিতে অভ্যস্ত ছেলেদের এনে সাংবাদিকতার টেবিলে বসালেন। প্রথম দিকে অধিকাংশ ছাত্র-সাংবাদিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ঢাকা হল, মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা এইসব আগ্রহী ছাত্র হয় পার্ট টাইম, নয় ফুলটাইম কাজ করতো। তাই দিয়ে পত্রিকা চলতো। পরিপূর্ণ সাংবাদিকের অভাবে একসময় অবজারভার মোটা বেতনে কলকাতার নামকরা দু'জন সাংবাদিককে অমৃতবাজার থেকে চাকরি দিয়েছিল। এই সাংবাদিক-দুর্ভিক্ষের দিনে স্বাভাবিকভাবেই পত্রিকাগুলোতে বিশেষ করে ছাত্রদের মোটামুটি আধিপত্য দেখা যায়।

যুক্তফ্রন্টের আমলের ইতিহাস বড় বিচিত্র। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে '৫৪ সালের ৩০ মে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করেন কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এবং একই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন জারি করেন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা লাঠি হাতে গভর্নর হয়ে ঢাকায় এলেন। শেরেবাংলাকে কেন্দ্র রাষ্ট্রদ্রোহী বলেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা তাঁকে কে এম দাস লেনে গৃহবন্দী

www.pathagar.com

করে রাখে। সেইসময় বিখ্যাত আইসিএস এন এম খানকে চীফ সেক্রেটারি করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলাদেশের শাসক হয়ে দাঁড়ান। '৫৪ সালের এই সময়ে সংবাদের প্রাক্তন এডিটর খায়রুল কবীর ইনফরমেশনের স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগদান করেছিলেন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি এন এম খানের বন্ধু হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে খায়রুল কবীর এন এম খানের কাছে প্রস্তাব করেন যে, ঢাকায় সাংবাদিকদের একটা ক্লাব থাকা বাঞ্ছনীয়। এন এম খান সর্বময় কর্তা হিসেবে ঢাকায় বহু সংখ্যক বাড়ির অধিকর্তা। এখন আমাদের প্রথম যে প্রেস ক্লাব ছিল, সেই বাড়িতে এক সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বসু বাস করতেন। পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দীনের সময় নূরুল আমিন এই বাড়িতে খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে থাকতেন। পরে মন্ত্রী আফজাল এই বাড়িতে থাকার পর যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারায়। সেই থেকে বাড়িটি খালি। তারপর থেকে ঢাকায় মন্ত্রীদের বাড়িগুলো খালি হয়ে যায়। চামেরি হাউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি, বর্তমান চীফ জাস্টিসের বাড়ি এবং মিন্টো রোডের বহুসংখ্যক বাড়ি নির্মিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর। আমাদের প্রেস ক্লাবের আদি বাড়িটিও এগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ ছিল ভবিষ্যতের সরকারের জন্যে সেক্রেটারিয়েট। বর্তমান ফরেন অফিসের দোতলা পর্যন্ত বাড়িটি তৈরি হয় নিউ সেক্রেটারিয়েট নামে।

বঙ্গভঙ্গের পর যে সরকার হওয়ার কথা ছিল, তাদের জন্যেই ঢাকাতে বিভিন্ন সময় এই সমস্ত বাড়িঘর সরকার তৈরি করেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি বাড়িতে রান্নাঘর মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাড়ি ও অফিসগুলো ইংরেজ আর্কিটেক্টের পরামর্শে করা। আমরা এই সমস্ত বাড়ি পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সূত্র ধরে পেয়েছি। কার্জন হলও ব্রিটিশদের তৈরি, ভাইসরয় লর্ড কার্জনের নামে। পুরনো হাইকোর্ট তৈরি করেছিল ইংরেজরাই। বর্ধমানের মহারাজা 'বর্ধমান হাউজ' তৈরি করে দিয়েছিল, যা এখন বাংলা একাডেমী। এক সময় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন এ বাড়িতে বাস করতেন। যুক্তফ্রন্টের দাবিতেই এ বাড়িতে বাংলা একাডেমী হয়েছে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার পরও বহু চেষ্টা করেও ইংরেজরা ঢাকাকে রাজধানী করতে পারেনি– অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এমনই ব্যাপক হয়েছিল যে, বাংলাকে আসামের কিয়দংশের সঙ্গে জুড়ে ভিন্ন কোনও প্রদেশ করা যায়নি। ১৯১১ সালে সরকার প্রধানত কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ রহিতের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

তখন কোনও সরকার আর প্রতিষ্ঠা করা গেল না। বর্তমান বঙ্গভবনের দেয়ালের অভ্যন্তরস্থ জায়গায় তখন করা হয়েছিল লে: গভর্নরের ভবন– যিনি এসে এখান থেকে প্রদেশ শাসন করবেন। কাঠের বিরাট দরবার হলে আমরাও শেষের দিকে গেছি। বঙ্গভবনের ভিতরের চরিত্র এখন বদলে গেছে নতুন ইমারত তৈরির পর। আর সাংবাদিকদের জন্যে যে বাড়িটি ক্লাবের জন্যে নির্দিষ্ট হলো, সেটা ইডেন বিল্ডিং এর সবচাইতে নিকটবর্তী বাড়ি। খায়রুল কবীর এন এম খানকে বললেন, প্রেস ক্লাব এখানে করাটাই সবচাইতে উপযুক্ত হবে। তখন ঢাকায় সরকারের বহু বাড়ি খালি পড়ে ছিল। কারণ কোনও মন্ত্রী নেই, অতিরিক্ত সেক্রেটারি নেই। ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন করার পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। তখন বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের অর্ধেক নিয়ে ক্লাসের আয়োজন করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ১৯০৫ সালের পর মিন্টো রোড ও অন্যান্য স্থানে সরকারী বাড়িগুলো প্রফেসর ও সরকারী অফিসারদের বাড়িতে পরিণত হয়। ঢাকার এই পরিবর্তনের সময় ১৯৫৪ সালে সরকার প্রদত্ত বাড়িতে প্রেস ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। সেখানেই আমরা, অর্থাৎ বর্তমানে প্রাচীন সাংবাদিকেরা নতুন এক জীবন খুঁজে পেয়েছিলাম।

নিউ সেক্রেটারিয়েট বা বর্তমানে ফরেন অফিসের যে মূল বিল্ডিং– তা ছিল এককালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস। ওখানে এক কালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনেরও অফিস ছিল। ঢাকার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও আমরা বর্ধিত হয়েছি। ঢাকায় তখন ঘোড়াগাড়ি বা টং, এক্কাতে পরিপূর্ণ ছিল। ঘোড়ার গাড়িগুলো ছিল যেন একটা চলন্ত পালকি। কোচওয়ানরা সবাই ছিলেন ঢাকার আদিবাসী। একসময় আমি সদরঘাট থেকে প্রেস ক্লাবে এসেছি ২ টাকা দিয়ে ঘোড়া গাড়িতে করে। '৫৬ সালে আমার বন্ধু বিবিসি'র নিউজ রিডার নূরুল ইসলাম একদিন সদরঘাটে আমাকে বললো, ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আমি যাবো না। তখন রিকশা চলাচল শুরু হয়ে গেছে, সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দুই বন্ধু কোচওয়ানকে বললাম, নবাবপুরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার পায়ের নিচের ঘন্টাটা প্রায়ই বাজাবেন। আমরা দুই বন্ধুই ঘন্টাটা পছন্দ করতাম। সেই ঘোড়ার গাড়ি ক্রমান্বয়ে বিয়ের ঘোড়ার গাড়িতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা আশাতীতভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন নাকি ঢাকায় রিকশার সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। গাড়ির সংখ্যা দশ গুণ বেড়েছে। বাসের সংখ্যা যে কত বেড়েছে, আমরা জানি না। তবে লোক সংখ্যা বেড়ে ঢাকায় এক কোটিতে দাঁড়িয়েছে, ভাসমান মানুষসহ। তারই মধ্যে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে প্রেস ক্লাবের নতুন ইমারত। মেম্বারদের খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা, বহুরকম ফ্যাসিলিটিজ রয়েছে– যা আমাদের পূর্বের প্রেস ক্লাবে ছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি, সে আমলে যারা প্রেস ক্লাবে আসতেন, তাদের মধ্যে সব রিপোর্টারই ছিলেন সংবাদের সন্ধানে অস্থিরতায় নিমগ্ন। কেউ দুটো খেয়েই সংবাদের পেছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ না খেয়ে। কেউ প্রেস কনফারেন্স সেরে অবেলায় এসে খাচ্ছে। সন্ধ্যার পরেই প্রকৃত অফিস শুরু।

এই প্রেস ক্লাবে আমরা এরই মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করেছি। এই ক্লাবে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা সেন গান গেয়েছেন। এই ক্লাবে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক আবদুস সালাম সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘসময় বাইরের লনে আলোচনা করেছেন। তখন সাংবাদিকদের উপর বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের আধিপত্য ছিল না। আমরা একবার আমাদের দেশের প্রখ্যাত বাদক ও সুরকার সমর দাসকে পিয়ানো বাজানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি ডান দিকের ছোট বারান্দায় বিরাট এক পিয়ানো নিয়ে উপস্থিত। আমাদের রিক্রিয়েশনের জন্যে ব্যাডমিন্টনের জায়গাটায় সবাই আমরা চেয়ারে বসেছিলাম। সমর পিয়ানো শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো 'মোজার্ত' থেকে। তাঁর বাজনা একসময় শেষ হলো। অবাক সাংবাদিকরা স্তব্ধ! তারপরই শুরু করলেন গিটার, যেটা তাঁর অত্যন্ত শখের। এবারে গিটারে চটুলতা আমাদের রক্তকে উদ্দীপ্ত করলো। অনুষ্ঠান শেষে আমরা কি করে সমরকে ধন্যবাদ জানাবো, সে ভাষা খুঁজে পাইনি। এরই মধ্যে ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছে সাঁতার কেটে। সে আমাদের গৌরবের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো। আমরা যারা

www.pathagar.com

বন্ধু ছিলাম, তাদের সঙ্গে তাস খেলতেন ব্রজেন। ঢাকায় তখন নিরেট ক্লাব কম ছিল। প্রেস ক্লাবে সদস্য ছাড়া আর কারও প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারটার উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হতো। কিন্তু সমর দাস, ব্রজেন দাসকে আমরা ঠেকাবো কিভাবে? তাঁরা দু'জন যখনই অবসর পেতেন, দোতলায় এসে তাস খেলতেন কাজের ফাঁকে। আমি মুকুল, মূসা, আলী আশরাফ এবং আরও কয়েকজন মাঝে মাঝে তাঁদের অপেক্ষায় তাঁদের টেবিলে বসে থাকতাম। সেইসময় হয় ব্রজেন, না হয় সমর দাস এসে উপস্থিত হতো– আমরা সোনায় সোহাগা পেতাম। কেউ তাঁদের বাধা দেওয়ার নেই। সবাই তাঁদের দাদা বলে ডাকে, মনে হয় তাঁরাও সাংবাদিক। কিন্তু তাঁরা আমাদের দেশের গৌরবের নাগরিক। বুড়ো সম্পাদকদের মাঝে কেবলমাত্র সালাম ভাই তাস খেলতে আসতেন। তাঁর তাস খেলাও বন্ধ হয়ে গেল। ব্রজেন ও সমরের এই নিয়মিত নির্বাধ আগমন লক্ষ্য করে আমরা প্রস্তাব দিলাম যে, এদের দু'জনকে প্রেস ক্লাবের বিশেষ অতিথি হিসেবে মেম্বার করা হোক। বোধহয় এ দু'জনই প্রথম ও শেষ আমাদের প্রেস ক্লাবের স্পেশাল গেস্ট। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা ক্লাবের বিশেষ সদস্যরূপে আসা-যাওয়া করেছেন। তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের অভাব আমরা অবশ্যই অনুভব করি। এমন কৃতিত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারী ব্রজেন আর সমর এখন আর আমাদের উদ্দীপ্ত করে রাখে না।

পুরনো প্রেস ক্লাব বিল্ডিংয়ে বেলা ১টা থেকে রোজই দোতলায় একটা রুমে তাসের টেবিল সরগরম হয়ে উঠতো। এই তাসের টেবিলের বহু কাহিনী, এমনকি ব্রিজে ভুল খেলার জন্যে বৃদ্ধদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখতে গেলে যে কোনও প্রাচীন সদস্য একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি সেই বই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখতে গেলেও বড় হয়ে যাচ্ছে, কারণ অনেক কথাই তো মনে পড়ে। সে থাক।

যেমন ধরুন, আমাদের তাসের টেবিলের পাশে একটি টেবিলে একদিন দুই বন্ধু সদস্যের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। বন্ধু আলী আশরাফ দেখলাম লম্বা হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'এক থাপ্পড় দিবো'। আরেকজন দাঁড়িয়ে গিয়ে তার প্রতিবাদ করলো। অন্য টেবিল থেকে আমরা সবাই বললাম একি, একি, একি! ওই ঝগড়াটেদের টেবিলেই খেলছিল সমর দাস। আমরা সমর দাসকে বললাম, 'তুই এত বড় বিরাট দেহ নিয়ে এই টেবিলে চুপ করে বসে আছিস, একজনকেও থামাচ্ছিস না!' সমর খুব নীরবে নিশ্চিন্তে উত্তর দিল, 'আমি তো এই ক্লাবের মেম্বার নই', সবাই আমরা হতভম্ব! সমর তো ঠিকই বলেছে। বাইরের লোক হিসেবে সে এই আসরে মারামারি থামাতেও পারে না। তারপর থেকে সমরকে ব্রজেন দাসের সঙ্গে এই ক্লাবের বিশেষ সদস্য করা হলো।

একদিন রাত প্রায় দেড়টার দিকে অবজারভারের রিপোর্টার আবদুর রহিম তার স্ত্রীর কাছে নাকাল হতে চললো। কি হয়েছে? স্ত্রী বলছে, 'তুমি প্রায়ই এত রাতে আসো, ব্যাপার কি?' রহিম হাসতে হাসতে বললো– 'আর বলো না, ফয়েজ ভাই! প্রায়ই তিনি গল্প করতে বসেন, আর আমরা তার মজার গল্প শুনতে গিয়ে রাত হয়ে যায়।'
রহিমের বউ: প্রায়ই তুমি ফয়েজ ভাই, ফয়েজ ভাই বলো, কে সে ফয়েজ ভাই, এত গল্প বলে?

www.pathagar.com

রহিম: পূর্বদেশ আর অবজারভার তো একই বিল্ডিংয়ের দোতলায়। কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা গল্প করি। তাতেই সময় ক্ষেপণের বিপত্তি।

রহিমের বউ: ওরকম ফয়েজ ভাই আমিও একজনকে চিনি, তিনি ছড়া লিখে বিখ্যাত। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে ছোটবেলায়। তুমি আবার কোন্ ফয়েজ ভাইয়ের কথা বলছো?

রহিম: আরে ওই তো একই ফয়েজ ভাই, তিনি ছড়াও লেখেন, সাংবাদিকতাও করেন। পূর্বদেশের চীফ রিপোর্টার, আমাদের সিনিয়র।

রহিমের বউ: তা হতে পারে না। ছড়া লেখক ফয়েজ ভাই আমাদের খুব প্রিয়। তিনি আবার সাংবাদিক কবে?

রহিম: জন্ম থেকেই তিনি সাংবাদিক। ছড়াকার ফয়েজ ভাই, আর সাংবাদিক ফয়েজ ভাই একই ব্যক্তি।

রহিমের বউ: তা কি করে হয়!

সে রাতটা তারা দ্বিমত নিয়েই কাটালো।

সকালে রহিমের টেলিফোন। তিনি বললেন, আমি যেন পাঁচটার সময় প্রেস ক্লাবে থাকি, খুব জরুরি। আমি সোয়া ৫টার দিকে প্রেস ক্লাবে গিয়ে দেখি এক টেবিলে রহিম আর রহিমের বউ। তারা চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই রহিম লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'এই যে ফয়েজ ভাই, আমরা এখানে,' রহিমের বউও আমাকে সাদরে তাদের টেবিলে ডাকলো।

রহিম বললো, 'এই সেই ফয়েজ ভাই।'

রহিমের বউ: আমি তো আপনাকে চিনি ছোটবেলা থেকে ছড়াকার হিসেবে। আপনি যে সিনিয়র সাংবাদিক, তা তো জানতাম না।

আমি: একটা কিছু প্রফেশনে থাকতে হবে তো, তাই আমি সাংবাদিক হয়েছি। এখন মধ্যবয়স।

রহিম: দেখলে তো, সাংবাদিক ও ছড়াকার একই ব্যক্তি ফয়েজ আহমদ।

রহিমের বউ আমার দিকে চেয়ে হাসলো। সেই বিকেলটা আমাদের ভালোই কেটেছে।

আমি একদিন বিকেলে এক রিপোর্টের পেছনে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত ক্লাবে উপস্থিত। দোতলায় তাসের টেবিলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বললো– 'আরে ফয়েজ ভাই, আসেন আসেন।' মনটা কিছুটা খারাপ হলো, কিন্তু হেসে বেরিয়ে এলাম। নিচে ডাইনিং টেবিলের কাছে আসতেই সবাই চিৎকার করে বললো, 'ফয়েজ ভাই এই টেবিলে আসেন।' মনটা আবারও খারাপ হলো, আমি হেসে বসার ঘরে গেলাম। ওখানেও কয়েকজন আমাকে একটা চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে বসুন ফয়েজ ভাই।'

মনটা চূড়ান্তভাবে খারাপ হয়ে গেল– প্রেস ক্লাবে সর্বত্রই আমাকে ফয়েজ ভাই বলা হয়। কান ঝালাপালা। কেউ আমাকে একান্ত আপন করে ডাকছে না বলে আমার মনে হলো। আমি উঠে গিয়ে নিচের তলার বারান্দায় পায়চারি করতে আরম্ভ করলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা ফক্সওয়াগন ক্লাবের আম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো। এক যুবক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গায়ে দামী বিদেশী জ্যাকেট, তাকে আকর্ষণীয় ও অপূর্ব দেখাচ্ছিল। দূর থেকে চিনিনি। কিন্তু কাছে এসেই লাফিয়ে পড়লো আমার উপর। আমাকে জড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

বললো, 'ওই শালা, ক্যামন আছস্?' আমার প্রাচীন বন্ধু, শিল্পী আমিনুল ইসলাম। তিনি ইতালিতে কয়েক বছর শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরেছেন। তারই এই সম্বোধন।

আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। এখন আর কেউ আমাকে 'তুই' বলে না, 'শালা' বলে না, এইভাবে জড়িয়ে ধরে না– সমীহ করে। এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে বর্তমানে ব্রিবত করছে। তারপর আমিনুলের সঙ্গে চায়ের টেবিলে অনেক হাতি-ঘোড়া মারলাম। আমরা দু'জন বেরিয়ে গেলাম।

একদিন বেতন পেয়ে তাস খেলার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। বিকেলে আমি আর মুকুল (এম আর আখতার) যেখানে বসেছিলাম, সেখানে দু'জন বয়স্ক উপস্থিত– ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার ও মর্নিং নিউজ পত্রিকার ক্রস ওয়ার্ডের অধিকর্তা মি. মিটার। মি. মিটারের টেবিলে সর্বদা মি. মিটারই ব্যাংকার হতেন। তার কাছে একটা টিনের বাক্সে সমস্ত কাউন্টার ছিল। কাউন্টারেই আমরা খেলতাম।

খেলা চলতে চলতে যখন রাত ১১টা তখন আমি আর মুকুল দুই বন্ধু সব বেতনের টাকা হেরে গেছি। ক্লাবে একটা লোকও নাই, সবাই যার যার অফিসে। বৃদ্ধ দুই বেকার আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন আরও কয়েক ঘন্টা খেলতে। রাত বারোটায় নিচ তলার ফ্রিজ থেকে বাটি ভর্তি পুডিং আর পাউরুটি এনে খেয়ে ফেললাম। সকালে পয়সা দেব। রাত বারোটার পর খেলা আরও জমলো।

সেই খেলা চললো ভোর ৬টা পর্যন্ত। বাইরে তখন রিকশার ঘন্টা বাজছে, কাক ডাকছে। ইতোমধ্যে আমি আর মুকুল 'রিকভার' করেছি। আমাদের বেতনের টাকাটা আবার ফেরত পেয়েছি। তখন খেলা বন্ধ করলাম।

সচিবালয়ের দ্বিতীয় গেটে আমরা দোকানদারদের উঠিয়ে বললাম, গরম করে কিছু খাবার দাও। তারা আমাকে ও মুকুলকে চেনে। খাওয়ার পর মুকুল আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললো, থ্যাংক ইয়ু মি. মিটার এবং আমি মুকুলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললাম থ্যাঙ্ক ইয়ু মি. সাত্তার। প্রেস ক্লাবের এমন জীবন আর পাবো না, সেই যৌবন! সেই প্রেস ক্লাবকে আজ আমরা অন্য চোখে দেখি। ভোর পর্যন্ত তাস খেলি না।

এভাবে প্রেস ক্লাবের দীর্ঘজীবনে বহু কাহিনী আমার আছে। অনেক দুর্যোগ গেছে এই প্রেস ক্লাবে আমার। ১৯৫৮ সালে আগস্ট মাসে আইয়ুব খাঁ'র মার্শাল ল'র সময় আমরা অনেকেই পলাতক হয়ে গেলাম। সে সময় আইয়ুব খাঁ'র বশংবদরা আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেছিল। অনেকে গোপনে সিদ্ধান্ত নিল, এর প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা যারা ভূতলবাসী ছিলাম, তাদের কাছে খবর গেল তারাবাগে রাত ৮টায় সিকান্দার আবু জাফরের বাসার পুকুর পাড়ে সভা হবে। আমি সেই নির্দিষ্ট দিনে শহরের প্রান্তদেশ তারাবাগে জাফর ভাইয়ের বাসায় উক্ত সভায় যোগদান করলাম। হাসান হাফিজুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, এঁরা সবাই ছিলেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হলো প্রকাশ্য মিটিংয়ে এই হরফ পরিবর্তনের সরকারী অপচেষ্টার প্রতিবাদ করা হবে। ১১টার পর সভা শেষে যে যার বাড়িতে গেল, আশ্রয়ে গেল। আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে

www.pathagar.com

থেকে রাতটা কোথায় কাটাই? এক ভাগ্নির বাসায় গেলাম আর্মানিটোলায়, তারা দরজা খুললোই না। তারপর ওই রিকশা নিয়ে রাত বারোটায় প্রেস ক্লাবে উপস্থিত। প্রেস ক্লাবের বৈঠকখানাতে সোফার উপর আমি আশ্রয় নিলাম, গায়ে স্যুট। দারোয়ানকে বললাম, বাইরে থেকে তালা দাও। কিন্তু রাত ৪টার দিকে হঠাৎ আমার ঘরের কপাটে টোকা। দেখলাম এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে গোটা কয়েক পুলিশ। বুঝলাম, আমি গ্রেফতার হয়েছি। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তারা আগেই তালা খুলেছিল। ভেতর থেকে আমি দরজা খুলে বললাম, 'আসুন।' লোকটা দ্রুততার সঙ্গে ভেতরে এসে আমার পাশে বসলেন। বললেন, 'আপনাকে একটু আমাদের অফিসে যেতে হবে।' আমি বললাম, 'আমাকে গ্রেফতার করার কথা বলছেন না কেন?' উনি বললেন, 'আমার দায়িত্ব কেবল আপনাকে নিয়ে যাওয়া। চলুন।'

আমি বললাম: ভোর না হলে আমি যাবো না। জোর করে নিলে আমি চিৎকার দেবো। তাছাড়া আপনি যে আমাকে গ্রেফতার করছেন, তার নির্দেশনামা আমাকে দেখান।

লোকটা স্কুলের রুল করা খাতার একটা ছেঁড়া পাতা আমার হাতে দিলেন– তাতে লেখা আছে– 'অবিলম্বে প্রেস ক্লাবের দোতলায় গিয়ে পলাতক সাংবাদিক ফয়েজ আহমদকে পাবেন, গ্রেফতার করুন।' দস্তখতটা ঢাকার ডিআইজি'র। আমি যে ঢাকায়, একথা জেনে লঞ্চ ঘাট ও ফুলবাড়িয়া স্টেশনে আগেই লোক পাঠানো হয়েছিল। এই ভদ্রলোক এসেছেন বিশেষ এ্যাসাইনমেন্টে। ভোরের সময় যেতে আমি রাজি হয়েছি, রাতের বেলা পুলিশ আমাকে হত্যা করে গায়েব করে দিতে পারে। সে কারণে অন্যদের সাক্ষী রাখার জন্যে ভোর হতে বলেছিলাম। রাস্তায় রিকশার আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারলাম এখন ভোর হয়েছে। দু' একটা গাড়ি যাচ্ছে। সূর্য ওঠে ওঠে। আমি বললাম, 'এবার চলুন।'

নিচে এসে আমি দ্রুত একটা টেলিফোন করে বসলাম। আইবি'র সেই লোকটি আমার হাত ধরে বললেন, আপনি টেলিফোন করতে পারেন না। আমি বললাম, 'আপনারই কথা মতো এখনও আমাকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাছাড়া ঢাকায় কাউকে না জানিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাবো না। আপনারা আমাকে গায়েব করে দিতে পারেন। তখন?' আমি ড. নন্দীকে প্রথম টেলিফোন করে ঘুম থেকে ওঠালাম। বললাম, 'আমি এইমাত্র গ্রেফতার হয়ে গেলাম। যাকে যাকে বলার বলে দেবেন।' তারপরে অনেক রিকশা ও গাড়ির ফাঁক দিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে তোপখানা রোডের আইবি অফিসে (প্রাক্তন বিটপী অফিস) নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং সেখানেই আমার কারাভোগ হলো চার বছর। আমি হাইকোর্টে জজের বোর্ডের মাধ্যমে বেরিয়ে আসি। আমার বিরুদ্ধে কোনও চার্জ ছিল না। আমি ছিলাম নিরাপত্তা বন্দী, আরও বহুজনের সঙ্গে। বিচারপতি সাত্তারের এজলাসে আমাকে হাজির করা হয়। সরকার আমাকে ছাড়েনি।

এর চাইতেও বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আমি রাত কাটিয়েছি প্রেস ক্লাবে। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫শে মার্চ রাতে, বিশেষ করে তখন বাংলাদেশ ছিল অগ্নিগর্ভ। সে ইতিহাসে না গিয়ে আমার কথাটাই বলি। আমি তখন 'স্বরাজ' পত্রিকার এডিটর। সে পত্রিকায় স্বাধীনতার পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে সরাসরি লেখা হতো– ব্যানার হেডে। রাত ন'টায় শেখ

www.pathagar.com

সাহেবের বাড়ি থেকে এসে প্রেসে যাই। তারপর অফিস হয়ে ফেরার পথে দেখলাম রাজপথ সম্পূর্ণ ফাঁকা। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা করতে পারছে না। তখন রাত ১১টা। সেই সময় দ্রুতগামী একটা রিকশা থামিয়ে বললাম, পুরাতন শহরের যে কোনও জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিন। সে তীব্র আপত্তি জানালো। কিন্তু আমি নামলাম না রিকশা থেকে। তোপখানা রোডের সচিবালয়ের দ্বিতীয় গেট থেকে আমি এই রিকশাটা নিয়েছিলাম। ক্ষুব্ধ রিকশাওয়ালা হাইকোর্টের গেটের মোড়ে এসে বললো, আর তো যাওয়া যাবে না। দেখা গেল, আমাদের সামনে বিরাট একটা গাছ রাস্তার ওপর পড়ে আছে। বিদ্রোহীরা মোড়ে মোড়ে এভাবেই ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে, যাতে পাকিস্তানী বাহিনী প্রবেশ করতে না পারে। কোনও উপায় না দেখে রিকশাওয়ালাকে অনুরোধ করলাম. 'আমাকে প্রেস ক্লাবের গেটে নামিয়ে দিন।' অসন্তুষ্ট রিকশাওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিল। পকেটে যা ছিল, তাই দিলাম। প্রেস ক্লাবের বাইরের গেট টপকে ভেতরে প্রবেশ করে দেখি, সব বন্ধ। দারোয়ানদের একজনকে বাসা থেকে ডেকে আনলাম এবং উপরের সেই বৈঠকখানায় আবার আশ্রয়। বাইরে থেকে আমাকে তালা দেওয়া হলো। সেই বিভীষিকাময় ২৫ মার্চের দিবাগত রাত্রি আমি প্রেস ক্লাবের এই কক্ষেই ছিলাম। পর্দা দিয়ে ঢাকা জানালার ফাঁক দিয়ে আমি বাইরে আর রাজপথে আর্মির সব কার্যকলাপই দেখছিলাম। তারা ছিলেন দ্বিতীয় হেড কোয়ার্টার– বর্তমান ফরেন অফিসে। হাজার পাওয়ারের বাতি রাজপথে জ্বালিয়েছিল। আমি দেখছিলাম বি-৪৭ ট্যাঙ্ক, বাজুকা, স্টেনগান, ছোট মেশিনগান, টমিগান, ও তোপ ছোঁড়ার মত ছোট ছোট অনেক ট্যাংক। এর বিশদ বর্ণনা আর দিচ্ছি না। এমন সময় রাত বারোটায় পূর্ব দিকে ভীষণ কোলাহল, গুলিগোলার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপরই আকাশের দিকে অগ্নিশিখা। বুঝতে পারলাম, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকে যুদ্ধ হচ্ছে।

একটু পরেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল আজিমপুরের নিকটবর্তী পিলখানায়। সেই গোলাগুলি সারারাত এবং সকালেও চলে। এই সময় রাত একটার পরে ট্যাংক নিয়ে পুরাতন শহরে আর্মি প্রবেশ করার সময় ঢাকার বহু অঞ্চলে আজানের ধ্বনি শোনা যায়। এই অসময়ে আজানের মাধ্যমে মুসলমানরা বলতে চেয়েছিল তারা মুসলমান, তাদের অঞ্চল আক্রমণ করো না। একটু পরে রাত ৪টার দিকে হঠাৎ দেখলাম, বড় রাস্তা থেকে একটা ছোট ট্যাংক (এম-২৪) চামেরি হাউসের ভেতরে প্রবেশ করলো। প্রেস ক্লাবের দিকে তাদের কামান দাগার জন্যে প্রস্তুতি নিল। তখন আমার ধারণা হলো, বাঁচার কোনও উপায় নেই। কারণ আমার আশ্রয়ের এই কক্ষটি হচ্ছে কামানের মুখোমুখি। আকস্মিকভাবে ক্লাবের দোতলায় কামানের গোলা দেয়াল বিদীর্ণ করে প্রবেশ করলো। আমি প্রথম গোলাতেই দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে মাটিতে শুয়ে রইলাম। ৩টি গোলা প্রেস ক্লাবে ছোঁড়া হয়েছিল। তার দু'টি প্রেস ক্লাবে এখন রক্ষিত। দেয়ালে বিরাট গর্ত হয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিল।

আমি শুয়ে শুয়ে অচেতন অবস্থায় তখন ভাবছি যে, আমি মরে গেছি। আমি এখন অন্য জায়গায়। আহত অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি মারা যাইনি। ভোর ৫টার দিকে মাথা উঁচু করে দেখি, সমস্ত আকাশ দেখা যাচ্ছে এবং সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। ট্যাংক ও কামান নেই। ওখান থেকে ভোরে বেরিয়ে আসার ইতিহাস অনেক বড়। বাথরুমের পেছনে

www.pathagar.com

পেয়ারা গাছের ডাল ধরে আমি নিচে নেমে আসি এবং প্রেস ক্লাবের ডাইনিং রুমে শুয়ে পড়ি। তখন আমার পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল এবং স্যুটের অধিকাংশ জায়গা ছিঁড়ে গেছে বা উড়ে গেছে। এরপরে আমার বাঁচার অনেক কাহিনী বাদ দিয়ে বলতে চাই যে, প্রেস ক্লাব থেকে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেক্রেটারিয়েটের মসজিদে। ওই মসজিদ থেকে আমাকে শাদা পোশাকের সেপাইরা এসে দ্বিতীয় ১৩ তলা বিল্ডিং এর ৬ তলায় আমাকে একটি বাথরুমে আশ্রয় দেন। কারণ অসহযোগ আন্দোলনে সব বন্ধ ছিল। ওখানে আমি ২৬ তারিখ কাটাই। দীর্ঘ না করে পরবর্তী অনেক দুঃখ ও পলায়নের কথা নাই বা বললাম। কি করে এপ্রিল মাসে একটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের সঙ্গে আমি আগরতলা পৌঁছেছিলাম, সেই সমস্ত কথা এখানে থাক। যুদ্ধকালীন জীবনের কথা এখন আর নাইবা বললাম।

আমি তখন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি, পুলিশ আমাকে খুঁজছে। এক পর্যায়ে প্রেস ক্লাবে আমাদের এক বিরাট সভা হয়েছিল এবং সভায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াককে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল। পুলিশ আমাকে ধরতে চাইলেও আমি ওই সভায় কর্তৃত্ব করি। সভা শেষে সবাই চলে যাওয়ার পর আমি প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে অসমর্থ হই। কারণ তখন আইবি শাদা পোশাকে পুলিশ নিয়ে প্রেস ক্লাব ঘেরাও করেছিল আমাকে ধরার জন্যে। একা যখন ক্লাবে বসে রাত ৯টায় খাচ্ছি, সেইসময় একটা গাড়ি এল। গাড়ি এসে বললো, 'নেত্রী খালেদা জিয়া আপনাকে যেতে বলেছে।' আমার সন্দেহ হলো। সেই গাড়িটা বসিয়ে রেখেছে। একজন আমার প্রিয় ব্যক্তি হঠাৎ ক্লাবে উপস্থিত। আমি তার গাড়ি নিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে সমর্থ হলেও পুলিশ আমাকে ধরার জন্যে নানা দিক থেকে বেষ্টনী সৃষ্টি করে। প্রথম গাড়িটি আইবি'র লোকরাই পাঠিয়েছিল বলে আমার ধারণা। সেজন্যে সে গাড়িতে আমি যাইনি। কিন্তু আমার গাড়িটা যখন ধানমণ্ডি ময়দানের কাছাকাছি এল, সে সময় তিনটা গাড়ি ব্যাপক হর্ন দিয়ে আমার গাড়িকে মাঠের পাশে স্তব্ধ করে দিল। আমার গাড়ির সামনে একটা জীপ বাঁকা হয়ে দাঁড়ালো। পেছনে একটা জীপ মাঝখানে একটা মাইক্রোবাস। একজন লম্বা ডিএসপি, খুবই ভদ্রলোক তিনি, আমার গাড়ির কপাট খুলে নিচু হয়ে বললেন, 'ফয়েজ সাহেব, বেরিয়ে আসুন।'

আমি বললাম, 'আমি তো গ্রেফতার হয়ে গেলাম। কিন্তু একটা কণ্ডিশন মানতে হবে, আমাকে এখান থেকেই সরাসরি জেল গেটে পাঠিয়ে দিতে হবে। উনি বললেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে আমরা জেলে পৌঁছাবো, অন্য কারও হাতে পড়বেন না। আমি তার এই প্রতিশ্রুতিতে মাইক্রোবাসে উঠলাম। কিন্তু গাড়িটা গেল রমনা থানায়। রমনা থানা আমার সঙ্গে অসাধারণ ভালো ব্যবহার করেছে। বন্ধুদের টেলিফোন করতে দিয়েছে। তারা আমাকে ডিম-পাউরুটি, কাবাব ইত্যাদি খাবার এনে দিয়েছে। তারা বুঝতে দেয়নি আমি গ্রেফতার হয়েছি।

সেই ডিএসপি একটু পরে এসে বললেন, 'চলুন আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো।' এরই মধ্যে তিনি আইজি, মন্ত্রী ও সেক্রেটারিসহ বিভিন্নজনের কাছে আমার গ্রেফতারের খবর টেলিফোনে অন্য ঘর থেকে বলেছেন। তিনি আমাকে জেলের পথে গাড়িতে বললেন, 'আপনি যেন অন্য কোনও এজেন্সির হাতে না পড়েন, সেটা আমরাও চাই।' কারণ আপনাকে আর্মি

www.pathagar.com

ইন্টেলিজেন্স ধরার জন্যে লোক লাগিয়েছে, সেসব ভয়াবহ।' আবার আমি রাত এগারোটায় জেলে প্রবেশ করলাম।

রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে প্রেস ক্লাবে এখন আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত ইত্যাদি রাজনৈতিক গ্রুপ রয়েছে। আগে কিন্তু এমনও লোক ছিলেন, যারা এইসমস্ত কোনও পার্টিতেই সম্পর্কিত নন– তারা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত। এই চরিত্রের লোকগুলো সমস্ত সদস্যদের নিয়ে এক সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখে দিয়েছিল। তারা শান্তি মিছিলেও যোগদান করে। সুতরাং এক কথায় বলে দেয়া যাবে না যে, ক্লাবের লোকমাত্রেই আওয়ামী বা বিএনপি। এরা একাত্তর সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তাদের ব্যবহৃত শতাধিক প্ল্যাকার্ড ও অনেক ব্যানার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে। এই প্রেস ক্লাবে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। আর যারা অসমর্থ হয়েছিল, তাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল ঢাকাতেই, গোপনে। যে সমস্ত জামাতী বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিয়াজী ও টিক্কা খানকে সাহায্য করে বহু সাংবাদিককে হত্যা করে, তারা সবাই এই প্রেস ক্লাবের সদস্য।

প্রেস ক্লাবের সঙ্গে আমার এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নানাভাবে জীবনে ঘটেছে। আমার আত্মার সঙ্গে প্রেস ক্লাবের সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবেই এখন অনেক নতুন মুখ দেখি। তাদের আমি ভালোবাসি। কিন্তু অনেককেই চিনি না। আজকের এই নবনির্মিত প্রাসাদতুল্য প্রেস ক্লাবের আরও উন্নতি কামনা করি। কাচের দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে প্রেস ক্লাবে প্রবেশের কথা আমরা আগে কখনও চিন্তাও করিনি। আধুনিক জীবনকে ক্লাবে তারা আরও আপন করে নিচ্ছে। আজকাল আমি যখন আকস্মিকভাবে যাই, তখন হয়তো পুরনো কেউ থাকে না। আমি আমার অতি প্রিয় দোতলায় তাসের ঘরটিতেও যাই না। নতুনের দুরন্ত উল্লাসকে আমরা দেখতে পাই এই ক্লাবে। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে দুটো ভাগ হয়ে আছে। টেবিল ও সোফাগুলোও সেভাবে ভাগ করা। তবুও রাজনৈতিক এই চরম বিবাদের মধ্যে প্রেস ক্লাবের দুটো কমিটি এখনও হয়নি। নির্বাচন একটাই হয়। ইউনিয়নের মত বিভক্ত তারা এখনও হয়নি। সে জন্যে তাদের ধন্যবাদ জানাতে আমার কোনও কুণ্ঠা নেই। 'হে স্বাধীনতা'র মত করে আমার বলতে ইচ্ছে করে– 'হে প্রেস ক্লাব'..........।

শ্রুতিলিখন: মো: আরিফ-উল-ইসলাম

লেখক প্রবীণ সাংবাদিক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

www.pathagar.com

একটি লাল দালানের স্মৃতি

আবদুল গাফফার চৌধুরী

ঢাকার প্রেস ক্লাব এখন জাতীয় প্রেস ক্লাব। কিন্তু আমার কাছে এখনও এই ক্লাবের কথা মনে হলেই ঢাকার একটি লাল দালানের স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই দোতলা লাল দালানটি এখন নেই। তার পেছনের সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রশস্ত ব্যাক ইয়ার্ড, যেখানে উন্মুক্ত আকাশতলে বসে আমরা আড্ডা দিতাম আর চা খেতাম, সেটিও এখন নেই। সব বদলে গেছে। কিন্তু স্মৃতি তো বদলায় না। তাই আমার জানা প্রেস ক্লাবের কথা মনে হলেই একটি লাল দালানের স্মৃতি আমাকে ঘিরে ফেলে। আর মনে পড়ে কয়েকটি মুখ। উমিদ খান, আবদুল হক, আবদুল কুদ্দুস আরও কত কে, প্রেস ক্লাবের জন্ম থেকে এরা তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বেয়ারা বলে পরিচয় দিলে এদের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হবে না। আমার দেখা লাল দালানটি তো শুধু ইট কাঠ সুরকিতে তৈরি ছিল না। উমিদ খানেরা ছিলেন এই ভবনের আসল প্রাণ। আমাদের সকলের পরম আত্মীয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু জাতীয় প্রেস ক্লাব পরিদর্শনে এসে আবদুল হককে বুকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলেছিলেন। লাল দালানটির মত এরাও এখন নেই।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের (এবং বঙ্গভঙ্গও) আগে ঢাকায় তোপখানা রোডের এই লাল দালানটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাসগৃহ। ঢাকা তখন জেলা টাউন। তোপখানা থেকে রমনা, নীলক্ষেত পর্যন্ত বিছানো লাল দালানগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে সংরক্ষিত বাসভবন। তার আগে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রথমবারের মত ভাগ হয়ে ঢাকা শহর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী হলে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের থাকার জন্যে নাকি সারা রমনা জুড়ে এই লাল দালানগুলো তৈরি হয়েছিল। অনতিকাল পরেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই ভবনগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষকদের দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে আবার বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হলে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় এই লাল দালানের অনেকগুলোই মন্ত্রী ও সচিবদের বাসভবনে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালে মফস্বল শহর বরিশাল থেকে (তখন আমি স্কুলের ছাত্র) ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলাম। সেক্রেটারিয়েটের পাশে এই লাল দালানটির গেটে আমি সেন্ট্রি খাড়া থাকতে দেখেছি। অর্থাৎ ভবনটি মন্ত্রীর বাড়ি। ১৯৫০ সালে বরিশাল থেকে পাকাপাকিভাবে ঢাকায়

www.pathagar.com

এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। তখন একবার তোপখানা রোডের লাল দালানে ঢোকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কি একটা ব্যক্তিগত কাজে নূরুল আমিন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী আফজাল মোক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। তার বাড়িও আমার জেলায়– সাবেক অবিভক্ত বরিশালে। তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভাগ্নে। তখন মন্ত্রী হিসেবে তিনি এই বাড়িতে থাকেন। তোপখানার লাল দালানটিতে সেই আমার প্রথম প্রবেশ।

তারপর দীর্ঘকাল এই বাড়িটাতে ঢোকার সুযোগ আমার আর হয়নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের অধিকারী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করার পর যখন স্বাধীন সাংবাদিকতা ক্রমশই সরকারী হুমকির সম্মুখীন, তখন দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত খায়রুল কবীর ঢাকার সাংবাদিকদের সংগঠিত করা এবং সাংবাদিকতার উন্নয়নের জন্যে একটি প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি ঢাকায় তখনকার প্রতিষ্ঠিত নবীন ও প্রবীণ সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং তাদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগটি নেন। এই প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী, পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) অবজারভারের আবদুস সালাম, দৈনিক আজাদের আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল ওহাব প্রমুখ।

তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের প্রেস কনসালটেটিভ বডির সভায় ঢাকার সাংবাদিকদের জন্যে একটি প্রেস ক্লাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী ভবন কম ভাড়ায় অথবা অন্য কোনওভাবে বরাদ্দ করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি এন এম খান (নিয়াজ মোহাম্মদ খান) তাতে সম্মত হন এবং প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্যে তোপখানার লাল দালানটি বরাদ্দ করা হয়। তখন গোটা উপমহাদেশে দিল্লি এবং কলকাতা ছাড়া আর কোথাও প্রেস ক্লাব ছিল না। দিল্লির প্রেস ক্লাবটি ছিল জিমখানার একটি ছোট্ট ঘরে অবস্থিত। কলকাতার প্রেস ক্লাবটিও ছিল ভাড়া করা একটি ছোট কুঠুরিতে। ঢাকায় প্রথম উপমহাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেস ক্লাব একটি দোতলা ভবনের সবটা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে এই প্রেস ক্লাবের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট হন দৈনিক আজাদের উপ সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ এবং সেক্রেটারি হন দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় এবং মুজীবুর রহমান খাঁ আবার প্রেসিডেন্ট হন। জহুর হোসেন চৌধুরী সেক্রেটারি পদে কাজ চালাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে দৈনিক সংবাদের আরেক সাংবাদিক আবদুল মতিন (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী) সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগের কথা লিখছি। যদি আমার বিবরণে কোনও ভুল ত্রুটি থাকে, সহৃদয় পাঠকেরা শুধরে নেবেন।

ঢাকা প্রেস ক্লাবে প্রথম পাবলিক ফাংশনটি হয় ১৯৫৫ সালের ১৯ জুন তারিখে। এ সময় পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সি, সি, দেশাই করাচী থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁকে প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন রাষ্ট্রদূত প্রেস

www.pathagar.com

ক্লাবে সংবর্ধিত হন। ঢাকা প্রেস ক্লাবের (পরে জাতীয় প্রেস ক্লাব) এক জন সাধারণ সদস্য ছিলাম আমি। এই ক্লাব নিয়ে আমার গর্ব করার কয়েকটি কারণ আছে। যে কয়টি মনে আছে, এখানে উল্লেখ করছি।

পাকিস্তান আমলে স্বৈরশাসক আইয়ুবের বশংবদ গভর্নর মোনায়েম খাঁ সম্পর্কে ঢাকার সাংবাদিকরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাকে প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, কখনও ঢুকতে দেওয়া হবে না। মোনায়েম খাঁ তার দীর্ঘ ৬ বছরের গভর্নরগিরির আমলে অনেক চেষ্টা করে, ভয় এবং প্রলোভন দেখিয়েও প্রেস ক্লাব থেকে কোনও আমন্ত্রণ আদায় করতে পারেননি। কখনও আসতে পারেননি।

আইয়ুবের প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে যখন দেশব্যাপী প্রতিবাদ ওঠে, তখন ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রথম প্রতিবাদ সভাটি প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা সাংবাদিকতার পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মওলানা আকরম খাঁ এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। তখন ঢাকায় খুব কম সাংবাদিকের গাড়ি ছিল। বর্তমানে দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক এ বি এম মূসার একটি ছোট মোটর গাড়ি ছিল। তার হুড তুলে মওলানা আকরম খাঁকে তাতে বসানো হয়। তিনি সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকেরা পায়ে হেঁটে মিছিলে সামিল হন।

১৯৬৪ সালে সরকারী ইন্ধনে ঢাকায় যে দাঙ্গা হয়, তা প্রতিরোধের জন্যে গঠিত দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির প্রথম সভা প্রেস ক্লাবের দোতলার ঘরটিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ, এমনকি জামায়াত নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন হামিদুল হক চৌধুরীর মত রাজনৈতিক নেতা এবং তখনকার মিডিয়া টাইকুন। সকল জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হাজির ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও। এই সভাতেই 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ইশতাহারটি রচনা করা হয় এবং কয়েকজন নেতা এবং নেতৃস্থানীয় সম্পাদকেরা তাতে সই দেন। পরে এই ইশতাহার নিয়েই স্বাক্ষরদাতা নেতা ও সম্পাদকদের একটা মামলায় জড়িয়ে মোনায়েম সরকার তাদের দীর্ঘকাল হয়রান করার চেষ্টা করেছিলেন।

আইয়ুব আমলে ১৯৬৪ সালে ঢাকার ডি আই টি ভবনে প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করা হলে ঢাকার প্রেস ক্লাবেই প্রথম টেলিভিশন সেটটি রাখা হয়েছিল। আইয়ুব খান কর্তৃক এই টেলিভিশন কেন্দ্র উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের ছবি প্রেস ক্লাবের দোতলার একটি ঘরে বসেই আমরা প্রথম দেখি। বস্তুত এর আগে আমি আর কখনও টেলিভিশন দেখিনি।

একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামেরও একজন শহীদ প্রেস ক্লাবের আগের লাল ভবনটি। একাত্তরের মার্চ মাসের সেই ভয়াল রাতে পাকিস্তানী হানাদারেরা কামান দেগে এই ভবনটি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। সে রাতে বন্ধু সাংবাদিক এবং ছড়া লেখক ফয়েজ আহমদ এই ভবনেই ছিলেন এবং গুরুতরভাবে আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহীদ লাল দালানকে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই প্রেস ক্লাবের গেস্ট রুমেই আমার দু'জন পরম শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক উইলিয়ম ননী এবং আবদুল লতিফ খতিব বাস করতেন। দু'জনেই

www.pathagar.com

এখন প্রয়াত। পঞ্চাশের দশকে ননী ছিলেন কলকাতার স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি এবং আবদুল লতিফ খতিব ছিলেন ডেইলি মর্নিং নিউজের সিনিয়র লীডার রাইটার। দু'জনেই অবাঙালী। কিন্তু আবদুল লতিফ খতিব মর্নিং নিউজের চাকরি করলেও বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলনের একজন নির্ভীক সমর্থক ছিলেন।

ঢাকার প্রেস ক্লাব বা লাল দালানকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। সব কথা অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে আগের লাল দালানটি নেই। কালের পরিবর্তনে, উন্নয়নের ছোঁয়ায় নতুন এবং বিশাল ভবন তৈরি হয়েছে। আগের অধিকাংশ পরিচিত মুখ নেই। দৃশ্যপট বদলে গেছে। এসেছে নতুন মুখ, নতুন দৃশ্যপট। দীর্ঘ দুই দশক পর বিদেশ থেকে ঢাকায় গিয়ে (১৯৯৩ ও ১৯৯৭) জাতীয় প্রেস ক্লাবের এই নতুন ভবন আমি দেখেছি। ক্লাবটির নামও এখন ঢাকা প্রেস ক্লাব নয়, বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব। তবু যৌবনে দেখা প্রেস ক্লাবের সেই লাল দালানটি এখনও আমার মনে ভাস্বর। চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

লণ্ডন, ৭ ডিসেম্বর ২০০৪

লেখক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, অধুনালুপ্ত দৈনিক জনপদের সম্পাদক

www.pathagar.com

আজ এবং ফিরে দেখা কাল

তোয়াব খান

দেশের সংবাদপত্র জগতে মওসুমী বায়ুটা হঠাৎ কিছু গতি পেয়ে গেছে। পুঁজিঘন সংবাদপত্র শিল্পে বিত্তবৈভবের সাদাকালো রাঘববোয়ালরা নেমে পড়েছেন। এমন একটা ধারণা জন্ম নিয়েছে, রাজশক্তির আনুকূল্যে সাফল্যের জাদুদণ্ডটি স্পর্শ করা অনায়াসসাধ্য। বহুদিনের চর্চিত পৃষ্ঠপোষকতা এ ধরনের আজ্ঞাবহ চিন্তাস্রোত সৃষ্টিকে সহজতর করে তুলেছে। সুস্থ প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরির পরিবর্তে পৃষ্ঠদেশের পোষকতা প্রায় মজ্জাগত। বিগত পঞ্চাশ বছরে (১৯৫৪ সাল থেকে ২০০৪) কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আলোচ্য ধারাটি প্রায় ছেদহীন।

পঞ্চাশ বছরের প্রেক্ষাপটটি জাতীয় প্রেস ক্লাবের জন্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে সংবাদপত্র শিল্পের গতিপথও একইভাবে নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রবাহিত। একদা পঞ্চাশের দশকে আদর্শবাদের মোড়কে অগ্রসরমান সংবাদপত্রের পথচলা অনিবার্যভাবেই ছিল সমস্যাসঙ্কুল। তবুও সুস্থ নৈতিকতার একটা বাতাবরণ সাংবাদিকতার জগতকে ঘিরে রেখেছিল। ভাষার জন্যে, দেশের জন্যে, গণতন্ত্রের জন্যে সাংবাদিকরা জেল খেটেছেন। রাজরোষে নিগৃহীত হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে সামরিক শাসকের জংলী আইনকানুন সবার আগে কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে সংবাদপত্রের। গায়ের জোরে 'অবাধ পুঁজির' স্তাবকরা দখল করে নিয়েছে বেসরকারী মালিকানার সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে। জেল-জুলুম তো নিত্যসঙ্গী। এমনকি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে জেলে পুরে দেয়া হয় একঝাঁক সাংবাদিককে। কাউকে বা নিজ এলাকা ছেড়ে সুদূর কোনও নগরে গিয়ে পেশাদারি করতে হয়েছে।

মাথা তবুও নত হয়নি। পুরো ষাটের দশক তার বড় প্রমাণ। শিক্ষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগেই থেকেছেন সাংবাদিক সমাজ। সংবাদপত্র শিল্পের জন্যে নিকৃষ্টতম কালো আইন হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তানী শাসকদের 'সংবাদপত্র প্রকাশনা অধ্যাদেশ' বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক অশীতিপর মওলানা আকরম খাঁও সে সময়ে ছিলেন মিছিলের নেতৃত্বে। 'দস্তুরে জবাবন্দী নাহি চলে গা' এ আওয়াজ রমনার রাজপথ থেকে প্রতিধ্বনি তুলেছিল রাওয়ালপিণ্ডির নানা প্রকোষ্ঠে। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'– সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় দেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) সব ক'টি প্রধান ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে একযোগে একই

www.pathagar.com

স্থানে একই ব্যানার হেডলাইনে একই আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পিণ্ডির বশংবদ' সাংবাদিকদের লোক সমাজে মুখ দেখানোই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এসবই সাংবাদিকদের তথা সংবাদপত্রের অক্ষয় অমর গৌরবগাথা। কিন্তু 'পুঁজিঘন' সংবাদপত্র শিল্পের চাকা রাজনীতির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল না। ষাটের দশকে রাজনীতিতে নতুন পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সংবাদপত্র জগতে তখন বেজে উঠেছে আরেক সুর। সুপরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশের গতি ছিল পশ্চাৎমুখী। শিল্প স্থাপন তথা অগ্রগতি ছিল শ্লথ। ঢাকার চার প্রধান সংবাদপত্র ছিল সরকারের কালো তালিকাভুক্ত। দেশের জনগণের ট্যাক্সের টাকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোনও অর্থই তাদের জুটত না। কারণ সরকারী বিজ্ঞাপন ছিল বন্ধ। অবস্থাটা আজকের দিনেও একেবারে অচেনা মনে নাও হতে পারে। আজও আমরা বলতে গেলে আইয়ুবী কালিতেই দাগ কেটে চলেছি। তবে আজকের কালিটা সম্ভবত অমোচনীয়।

এ কথাগুলো বলার একটিই কারণ। আমাদের সাংবাদিকতায় এবং সংবাদপত্র জগতে সব ধরনের আদর্শিকতা ও সুস্থ নৈতিকতার অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপট একটু খতিয়ে দেখা।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে অর্থনীতির চালিকাশক্তিগুলো সংবাদপত্রের জগতকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলতে শুরু করে। বৃহৎ পুঁজি উদ্যত হয় ছোট পুঁজিকে গ্রাস করতে। এমনকি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় খবরদারিতে শীর্ষ আমলাদের নেতৃত্বে ট্রাস্ট গঠন করে নেমে পড়ে সংবাদপত্র শিল্পে একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠায়। পাকিস্তানে বৃহৎ পুঁজির সংগঠন ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট ঢাকা থেকে নতুন একটি পত্রিকা বের করে 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে এবং নবাব পরিবারের মালিকানাধীন মর্নিং নিউজ পত্রিকাটি তারা কিনে নেয়। স্বভাবতই মার খায় এতদঞ্চলের ছোট ছোট সংবাদপত্র, যারা এতদিন গণতন্ত্র ও দেশ হিতৈষণার আওয়াজ তুলে নিজেদের অস্তিত্ব কোনওমতে রক্ষা করে চলেছিল।

সংবাদপত্র এমন একটি শিল্প, যেখানে মধ্যবর্তী স্তরের কোনও সুযোগ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত নতুন নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে সর্বশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিকাশ লাভ অবধারিত ভবিতব্য। নচেৎ অনুগমন, পশ্চাদানুসরণ এবং পরিণামে একদিন পদস্খলন। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা প্রথম রোটারি মেশিনে ছাপা উপলক্ষে সগর্বে একটি ঘোষণা প্রকাশ করেছিল। 'এখন থেকে অবজারভার ইংল্যাণ্ড থেকে আনা রোটারি মেশিনে রাশিয়ান নিউজ প্রিন্টে ভারত থেকে আনা কালিতে ছাপা হয়ে পাঠকদের হাতে পৌছবে।' পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় আগে এ ধরনের একটি ঘোষণায় চমক লাগানোর মতো উপাদান যথেষ্ট আছে বৈকি! কি পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়েছিল বা কিভাবে কোন কোন দেশের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়েছিল, আজকের দিনে ভাবতে গেলেও বিস্ময়কর মনে হতে পারে। তবে আরও চমকপ্রদ ঘটনা হলো– পাকিস্তান অবজারভারের পথ ধরে পাকিস্তানের আদি ও অকৃত্রিম দৈনিক আজাদও রোটারি মেশিন এনে ফেলল। শোনা যায়, সেকালের বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ইস্পাহানীদের সহযোগিতায়। বসে থাকেনি আরেক পাকিস্তানী বশংবদ ঢাকার নবাব পরিবারের পত্রিকা মর্নিং নিউজও। এর পর সংবাদপত্র জগতে যাঁরা

www.pathagar.com

নতুন এসেছেন, তাঁদের শুরু করতে হয়েছে প্রযুক্তির বেঁধে দেয়া এই সোপান থেকেই। অর্থাৎ রোটারি মেশিনকেই মুদ্রণ যন্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হয়েছে।

একইভাবে ষাটের দশকের মধ্যভাগে সংবাদপত্র জগতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তান অবজারভার একটি ছোটখাটো বিপ্লব ঘটিয়ে বসে ছাপার জগতে, 'ওয়েব অফসেট' মেশিন চালু করে। ওয়েব অফসেট মেশিন মুদ্রণ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দরোজা খুলে দেয়। প্রতিযোগিতার মুখে দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাকসহ আরও কিছু পত্রিকাকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হয়। নতুন প্রযুক্তি সচিত্র সংবাদ প্রকাশে কী ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল '৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের সচিত্র কভারেজ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে এসেছে ফটোসেটার ও কম্পিউটার কম্পোজ পদ্ধতি। গুটেনবার্গের মহাআবিষ্কার 'কাঠের টাইপ' আজ জাদুঘরের বিষয়। আজকের বাংলাদেশে প্রত্যন্ত শহরগুলোতেও চলছে কম্পিউটার প্রযুক্তির দাপট। কথায় কথায় প্রিন্ট আউট বের করে পাঠানো হচ্ছে যত্রতত্র। প্রযুক্তির সর্বশেষ অবদান বা চ্যালেঞ্জ থেকে পিছিয়ে পড়ার কোনও উপায় নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নইলে মৃত্যু।

দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র তথা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের (Electronic Media) বেলায় মধ্যবর্তী স্তরের প্রযুক্তির (Intermediate Technology) স্থান খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি। জাতিসংঘ এক সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মধ্যবর্তী প্রযুক্তি গেলানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরিণাম তো সবার কাছে পরিষ্কার। আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের যখন রঙিন রূপান্তর ঘটে, অনেকেই এটাকে অনাহারক্লিষ্ট মহিলার রুজ লিপস্টিক লাগানোর কথা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার মতো দেশ রঙিন টিভিতে যাচ্ছে না। আর এক শ' ডলারের কম মাথাপিছু আয়ের দেশ বাংলাদেশের জন্যে এটা তো বিলাসিতা! কিন্তু গণমাধ্যমে প্রযুক্তির রথ বা ট্রেন মিস করার উপায় নেই। এক বছরের মধ্যেই শ্রীলঙ্কা টিভিকে বহুবর্ণের রঙিন পথেই হাঁটতে হয়েছে।

ওয়েব অফসেট, কম্পিউটার কম্পোজ, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট ইত্যাদি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি এসে যায় দক্ষ জনশক্তি বা লোকবলের কথা। ষাটের দশকের মধ্যভাগেই দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বাড়তে থাকে। সাংবাদিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল প্রথম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ দুর্বল পুঁজির সংবাদপত্রে রীতিমতো ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়ে যায়। যদিও তারা কোনও সময়েই এই রোয়েদাদ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। একদিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অমোঘ বিধান, দক্ষ ও পেশাদারি জনবলের চাহিদা এবং সাংবাদিক সমাজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সংগ্রাম, অন্যদিকে পুঁজির তীব্র প্রতিযোগিতা সংবাদপত্র জগতে সৃষ্টি করে এক নতুন মেরুকরণ। ফলত আদর্শিক নৈতিকতার শধু অবক্ষয়ই নয়, সৃষ্টি হয় নতুন প্রেক্ষিত। বনেদী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে উঠতি পুঁজির সংঘাতে নতুন নতুন সমীকরণ ঘটতে থাকে। সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এবং একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয় বিস্ময়কর সব ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল তো অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সচেতন সাংবাদিক মাত্রেই নিজের অবস্থানকে দেশমাতৃকার

www.pathagar.com

পক্ষেই সুসংহত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে কয়েক বছরের জন্যে সংবাদপত্রের ঐতিহ্যবাহী ধ্যান-ধারণা প্রায় বিপর্যস্ত তথা ছত্রখান হয়ে পড়ে। ট্রাস্ট বাতিলের ফলে এবং মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে চারটি বৃহৎ সংবাদপত্রের মালিকানা কার্যত সরকারের হাতে গিয়ে পৌঁছে।

সদ্য স্বাধীন, মুক্ত এবং বিধ্বস্ত দেশে সমস্যা অন্তহীন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আশ্বাস পুনঃ পুনঃ দেয়া হলেও স্বাধীন গণমাধ্যমের মুক্ত বিকাশের উপাদানগুলো সত্যিকার অর্থে অনুপস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, শিল্পকারখানা অধিকাংশ বন্ধ। অন্যদিকে সম্পাদকীয় লেখার জন্যে সম্পাদক অপসারিত; কিছু কিছু সংবাদপত্রে চলছে ভিত্তিহীন রটনা– সব মিলিয়ে সুস্থ পরিবেশের অনুপস্থিতি বড় প্রকট। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কয়েকটি বছর সংবাদপত্রের জন্যে মনে হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকাল। সরকার সংবাদপত্রের মালিকানা দাবি করেছে, কিন্তু আর্থিক সংস্থানের কোনও দায়িত্ব নেয়নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জোর গলায় দাবি করেছে। কিন্তু স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা (টেলিগ্রাম) বের করতে গিয়ে অপসারিত হয়েছেন দুই সম্পাদক। এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটি ভয়াবহ পরিণতিতে দাঁড়ায় ১৯৭৫ সালের জুন মাসে, চারটি বাদে সকল পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশন বাতিলের মাধ্যমে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের বিকাশে পুঁজির প্রতিযোগিতা কোনও ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ, সরকারী মালিকানার আগ্রাসী পদক্ষেপ এবং প্রতিযোগী পুঁজির অনুপস্থিতি। বেসরকারী মালিকানার সংবাদপত্রসমূহ সানন্দে সরকারের সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সরকারদলীয় কতিপয় রাজনৈতিক নেতা পরিত্যক্ত ছাপাখানা দখল করে রাতারাতি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মালিক বনে যান। কেউ কেউ 'পরিত্যক্ত' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকরূপে আবির্ভূত হন। এ অবস্থায় সংবাদপত্র জগতে প্রায় সবার অলক্ষ্যেই একটি সমূহ সর্বনাশ ঘটতে থাকে– সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান (Editorial Institution) যা সম্পাদকের মাধ্যমেই প্রতিভাত, তার পতন। একে একে ঘটে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসসাধন। সরকারী এবং বেসরকারী দু'তরফেই এই অধঃপতনটি পরিলক্ষিত হয়।

শুরুতেই কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ায়নি। পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে প্রেস ট্রাস্টের দু'টি পত্রিকায় এবং হামিদুল হক চৌধুরীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবজারভারে প্রশাসক ও সম্পাদক পদে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ অবস্থায় সম্পাদকের পক্ষে নিজস্ব সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা অনেক সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু একে একে সম্পাদকরা প্রশাসকও (Administrator) বনে গেলেন। তাই সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব উঠল চুলোয়। দৈনন্দিন জমা খরচের হিসেব মেলাতেই তাঁর প্রাণান্ত।

তথাকথিত সরকারী সংবাদপত্রের এই অবস্থা খুব স্বাভাবিকভাবেই বেসরকারী মালিকদেরও উৎসাহিত করল। এক সম্পাদককে কলামিস্ট বানিয়ে মালিক হয়ে গেলেন সম্পাদক। মালিকপুত্র রাতারাতি সম্পাদক হয়ে যান। রাজনৈতিক নেতা ছাপাখানা দখল করে দৈনিক

www.pathagar.com

সংবাদপত্র বের করলেন। এবং যথারীতি হলেন প্রবল পরাক্রমশালী সম্পাদক। পরবর্তীকালে সংবাদপত্র বেতন বোর্ড রোয়েদাদে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহীর পদ এক করে সজ্ঞানে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যুতে ঘৃতাহুতি দেয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। অন্যদিকে প্রধান নির্বাহী ও সম্পাদকের পদ একীভূত হওয়াতে বেসরকারী খাতের নতুন নতুন পত্রিকার মালিকরাও রাতারাতি সম্পাদক বনে যান। তবে ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকে, এখানেও আছে।

বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ নতুন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকের সংগ্রামী বলিষ্ঠতা আর ফিরে পায়নি। সংবাদপত্রবহির্ভূত একাধিক উপাদান, অদূরদর্শী স্বল্পমেয়াদী কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা নতুন চিন্তা-চেতনার জন্ম দিতে থাকে। স্বাধীন দেশের অবারিত সম্ভাবনা-সম্ভারও হাতছানি দেয়। হয়তো এভাবেই পুরনো প্রেক্ষিতটা বদলে যায়। পেশাগত সমস্যার আলোচনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও জট খোলার মতো সংগ্রামী চেতনা চোখে পড়ে না। সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিলের মতো ভয়ঙ্কর পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সংগ্রামী চেতনার বহির্প্রকাশ দেখা যায়নি। অন্যদিকে পঁচাত্তরের সর্বনাশা রক্তক্ষয়ী দেশবিরোধী পটপরিবর্তনের পর কণ্ঠরোধী নীরবতা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সর্বত্র। এক কালে যাঁদের কণ্ঠে গণতন্ত্রের জন্যে মর্সিয়া ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী, বাকস্বাধীনতার সর্বগ্রাসী বিলোপেও নীরবতা পালন তাঁরা শ্রেয় মনে করতে থাকেন। একদলীয় শাসন বিলোপ করতে গিয়ে ঘটে যায় রাজনীতির শিরশ্ছেদ। সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসন, তথাকথিত বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। রাতের অন্ধকারে অপহরণের মাধ্যমে খুন। চোখের সামনে এসব ঘটে গেলেও সাংবাদিক সমাজের নীরব দর্শকের ভূমিকা ছিল নিতান্তই দৃষ্টিকটু। সেনা শাসনের হরেকরকম বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গত্ করতেও দেখা গেছে অনেককে।

ব্যতিক্রমী কার্যক্রম চোখে পড়তে শুরু করে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। সামরিক শাসকের আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংবাদপত্র বন্ধ রাখা, পেশার সংগ্রামে সংবাদপত্রের প্রকাশনা স্থগিত করে দেয়া–দীর্ঘদিন পর আবার নব উত্থানের ইঙ্গিতবাহী। এটারই পরিণতি নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

দীর্ঘ সময়ের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর্যালোচনা একটি নিয়ামক হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। '... 'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;/যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,/যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।' শাসন আর শোষণের গর্জন যত প্রবলই হোক, নিরস্ত্র সত্যের বর্ম দধীচির অস্থির চেয়েও মজবুত। সত্যের কাছে অন্যায় আর মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অর্জিত গণতন্ত্রের যুগেও দেখা গেছে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেউ হাতে তুলে দিয়ে যায় না। সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একালে ফতোয়া, ইসলামী অনুশাসনের নামে মোল্লাদের বাড়াবাড়ি, মৌলবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও মহাগর্হিত বলে প্রচার করা হতো। মৌলবাদীদের নানা কুকর্মের দেয়ালটা ভাঙার জন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন ছিল। জনকণ্ঠের তিন সম্পাদকের কারাবাসের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী আতঙ্কের দেয়ালটা চুরমার হয়ে গেছে। তবে

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইন-আদালতের পথটা সবার জন্যেই উন্মুক্ত। তাই স্বাধীন সংবাদপত্রকে আদালতের কাঠগড়ায় ওঠার জন্যে প্রস্তুত থাকাই উত্তম।

আজকের বাংলাদেশে সংবাদপত্রে পুঁজির ঘনীভবন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং দক্ষ পেশাদার লোকবলের অন্বেষণ প্রায় সমান্তরাল গতিতে প্রবাহিত হয়ে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট। তাই কেউ নিজ দেশে সবার কথা বলতে উদ্‌গ্রীব, কেউ বা নবদিগন্ত কতদূর বিস্তৃত করবেন সে চিন্তায় ব্যস্ত। কোন কালে সমকালের গুরুত্ব পাবে সেটা কারও কারও মাথা ব্যথার কারণ। রাজধানী ঢাকাতেই তথাকথিত 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' পত্রিকাসহ নাকি শ' দেড়েক দৈনিক সংবাদপত্র বের হয়! কে বা তাদের সম্পাদক, কোথায় এদের সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব বা ইনস্টিটিউশন, কে-ই যোগায় তাদের পুঁজি– এসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার মতো কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে বলে মনে হয় না। তবে আজকের দিনে একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গেলে যে কোটি কোটি টাকা প্রয়োজন, এটা বাচ্চারাও জানে। পুঁজিঘন এ শিল্পে টাকা তো ঢালতে হবেই, এমনকি পত্রিকা বের হওয়ার আগেই তো মাসের পর মাস বিপুলসংখ্যক কর্মীকে পরিপোষণ করতে হয়। তাই সাদা হোক আর কালো হোক, পুঁজি চাই। শিল্পপতিরা একযোগে একটি সংস্থা গঠন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। কোনও ট্রাস্টের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে টাকা ঢালতে পারেন। আবার কেউ বা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে টাকা-পয়সা নিয়ে এসে বিনিয়োগ করতে পারেন। সবই পারেন আইনকানুন ও বিধিবিধানের গণ্ডির মধ্যে। তবে হ্যাঁ, আগেই বলেছি যদি পৃষ্ঠপোষকতা থাকে, নো চিন্তা! আপনি একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের মালিক হয়ে যান, সংবাদপত্র বের করুন। আধুনিক কোনও ক্লাবে পুঁজি বিনিয়োগ করুন। সব হবে। আবার পিঠে যদি গোলমাল হয়, তবে পেটে খেলেও পিঠে সইবে না।

কেন এ ধরনের অবস্থার উদ্ভব? আদর্শ চিন্তা-চেতনা, সুস্থ নৈতিকতা তথা সাংবাদিকতার সাধারণ নীতিমালা বিসর্জনের প্রবল মানসিকতা কেন? এমন একটি অবস্থার উদ্ভব যে রাতারাতি ঘটেছে, তাও নয়। বাজার অর্থনীতির যুগে নিজের হাতে গড়া সুন্দর প্রতিষ্ঠান, চমৎকার সংগঠন বা বলিষ্ঠ খবরের কাগজকে নিজের হাতে রাখা যায় না। পুঁজির বাজার তাকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে নিয়ে যায়। এককালের আদর্শবাদী সাংবাদিকরা বাজার ঘুরতে গিয়ে বাজারী হয়ে যান। ব্যবসা আর সাংবাদিকতার সীমারেখা ঘুচে একাকার হয়ে যায়। গালভরা সুবচন নিয়ে 'পাইকারি বাজারে' বসার সঙ্কোচটাও ঘুচে যায়।

আমরা এখনও 'ছোট প্রাণ ছোট আশা', তাই ছোটখাটো বিষয় নিয়েই বেশি ব্যস্ত। মাত্র দেড় শ' কোটি টাকার টিভি বিজ্ঞাপন নিয়েই কামড়াকামড়ি তিন টিভি চ্যানেলে, যদিও এর এক শ' কোটি টাকাই চলে যায় বিটিভিতে। একুশে টিভি থাকতে অবশ্য চিত্রটি অন্যরকম ছিল। বিটিভির আয় তখন ৪০ কোটিতে নেমে এসেছিল। আমাদের দেশে পুঁজির এমনই বেহাল দশা। পাশের দেশ ভারতে দশটি বড় গণমাধ্যম (মিডিয়া) কোম্পানি ২০০২-২০০৩ সালে আয় করে ৭ হাজার ৫শ' ৩৩ কোটি রুপী। বিজ্ঞাপনে সামগ্রিক পুঁজির লেনদেন ১৫ থেকে ১৬ হাজার কোটি রুপী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র তথা বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম গড়ে তুলতে হলে অবিলম্বে পরিহার করতে হবে আইনকানুন বিসর্জন দেয়া পৃষ্ঠপোষকতার নীতি। দলবাজি তথা অগণতান্ত্রিক নিয়মনীতি বাতিল করে সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক

www.pathagar.com

অতীত স্মৃতির কিছু ছোঁয়া প্রেস ক্লাব

এ বি এম মূসা

ঢাকা শহরে ভাড়াবাড়িতে থাকতাম, তারপর নিজ বাড়ি হলো। বাড়ির নাম রিমঝিম। সেই বাড়ির বয়স ৪০ বছর। আমার একটি দ্বিতীয় বাড়ি আছে। তারও একটি নাম আছে। নামটি হচ্ছে প্রেস ক্লাব। সেই বাড়িটির, দালানটির নয়, বয়স হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর। সেই পঞ্চাশের দশকের শেষ বা ষাটের দশকের প্রথম থেকে আমরা যারা সাংবাদিকতা করছি, এখনও আল্লাহ্ হায়াত-দারাজ করায় বেঁচে আছি এবং পরবর্তীতে যারা এসেছে, দ্বিতীয় বাড়ি সবার এই প্রেস ক্লাব। হিসেব করে বলতে পারব না এই সেকেণ্ড হোমে পঞ্চাশ বছরের কতখানি সময় কাটিয়েছি, আর কতখানি থেকেছি নিজের বাড়িতে ও আপন দফতরে। নিজ বাড়ির প্রতিদিনের ক্ষণগুলোর সঙ্গে মিশে আছে প্রেস ক্লাবে কাটানো সময়ের অনেক হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আমোদ-বিবাদের ঘটনাবলী। সবই কি একটি নিবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে তুলে ধরা যাবে? যাবে না, তবে স্মৃতি রোমন্থন করা যাবে কয়েকটি পাতায় অথবা প্যারায়।

প্রথমে চুয়ান্ন সালে যখন সংবাদের সম্পাদক আমাদের অনেকেরই শিক্ষাগুরু খায়রুল কবীর ঢাকায় সাংবাদিকদের জন্যে একটি ক্লাবের কথা বললেন, আমরা প্রথমে তাঁর ধারণার সবটুকু বুঝতে পারিনি। তারপর যখন তাঁর উদ্যোগে একটি লাল সুরকির বাড়িতে প্রথম মিলিত হলাম, তখনও বুঝিনি এই দালানটিই আমাদের মিলনস্থান হয়ে যাবে! খায়রুল কবীর মাসিক এক শ' টাকা ভাড়ায় এই বাড়িটি নিলেন। সেই ভাড়াও কখনও দেয়া হয়নি। অবশ্য অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই লাল ইটের দালানটি নেই। পরবর্তীতে অবিমৃষ্যকারী কোনও ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেটি ভেঙে তথাকথিত আধুনিক কংক্রিটের বাক্স বানিয়েছেন। তবুও কল্পনায় ভেসে ওঠে কাঠের গেটটি পার হয়ে গোলাকার চত্বরটি ঘুরে একটি ছোট্ট হলঘরে ঢুকতাম। আমরা অনেকেই তখন সদ্য সাংবাদিকতার পেশায় ঢুকেছি। সেই যুগে বড়দের সঙ্গে পেশাদারি প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলারই সাহস ছিল না। তাই সেই হলঘরকে এড়িয়ে চলে যেতাম পেছনের উঠানে অথবা দোতলায়। সেই হলঘরে তখন বসে থাকতেন সাংবাদিক জগতের কিংবদন্তির মহাপুরুষরা। অবজারভারের আবদুস সালাম, ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আজাদের আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং তাঁদের চেয়ে একটুখানি বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু ঘনিষ্ঠ দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী ও মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন। তুমুল তর্ক চলত সেই ঘরটিতে, যার আওয়াজ আমরা বাইরে বসে পেতাম। মাঝে-মাঝে উঁকি মেরে দেখতাম বর্ষীয়ানদের উত্তেজিত আচরণগুলো। পরে ভাবতাম লঙ্কাকাণ্ড ঘটছে, কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

পরেই দেখতাম একে একে বা জোড়ায় জোড়ায়, কখনও এক সঙ্গে প্রায় গলাগলি করে তাঁরা বেরিয়ে যেতেন।

আমরা ছোটরা তখন কী করতাম? ভাবতে অবাক লাগছে। নিজেদের তখন বয়সে ও পেশার জীবনে কত কনিষ্ঠ ভাবতাম। চুপচাপ দোতলায় উঠে যেতাম, সেখানে তাস খেলতাম অথবা পেছনের উঠানে আম গাছের নিচে কাঠের চেয়ারে বসে গুলতানি মারতাম। শতাব্দী প্রাচীন সেই আম গাছগুলো, বিশেষ করে একটি পেয়ারা গাছের জন্যে এখনও মায়া জাগে। আমাদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক হতো নানা ধরনের। চা খাওয়া হতো দেদার। প্রথম থেকেই ক্লাবের ক্যান্টিনটি চালু করেছিলেন অবাঙালি পিটিআই প্রতিনিধি বালান সাহেব। এক আনায় মানে ছয় পয়সায় চা, দুই পিস বাটার টোস্ট এক খানা। তখনই চালু হয়েছিল প্রেস ক্লাবের ঐতিহ্যধারী আণ্ডাপুরি। ঢাকায় তখন এই খাবারটির নতুনত্ব এতই প্রচার লাভ করেছিল, বাইরের বন্ধুবান্ধবরা আবদার করতেন, 'দোস্ত, তোদের ক্লাবের আণ্ডাপুরি খাওয়াবি?' দুপুরে ভাত-ডাল-মাছ সঙ্গে ভাজি, দিতে হতো আট আনা, পঞ্চাশ পয়সায় পেটপুরে খাওয়া। রোববারে ফিস্ট, বিশেষ খাওয়া। সবাই আসতাম সপরিবারে, মানে যাদের পরিবার ছিল। বিশেষ খাওয়া পোলাও, মুরগি, ডিম এবং পুডিং মূল্য এক টাকা ২৫ পয়সা মাত্র। মজার ব্যাপার, এখনও এবং তখনও প্রেস ক্লাবে যাওয়া মানেই খাওয়া আর অবসরের আড্ডা।

চমৎকার এসব খাদ্য যারা রাঁধত, তাদের মাঝে ছিলেন রোজারিও। তখনকার দিনে ভাল বাবুর্চিরা সবাই ছিল খ্রিস্টান। এই রোজারিওকে নিয়ে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রায় ২৭ বছর পর আমি কমনওয়েলথ প্রেস সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি গিয়েছিলাম। থাকতাম ইন্টারকন্টিনেন্টালে, খেতাম সব অখাদ্য পাশ্চাত্য খাবার। একদিন ডাইনিং রুমে খেতে বসেছি, এক সাদা চামড়ার বেয়ারা ঢেকে-ঢুকে একটি ট্রে আমার সামনে রেখে গেল। ঢাকনা খুলে দেখি এক প্লেট সাদা ভাত, সঙ্গে গরুর গোস্তের কারি আর একেবারে খাঁটি মসুরের ডাল এক বাটি। অবাক হয়ে বেয়ারার দিকে তাকাতেই সে হেসে দূরে দাঁড়ানো এক জনের দিকে ইশারা করলো। কালো চামড়ার সাদা এ্যাপ্রোন পরা ব্যক্তিটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। 'স্যার আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি এখানকার হেড শেফ, আপনাদের প্রেস ক্লাবে বাবুর্চি ছিলাম। আমি রোজারিও। যেদিন হোটেলে আপনি ঢুকেছেন, সেদিনই দেখেছি। হেড বাবুর্চি হলেও মাঝে মাঝে ডাইনিং রুমে এসে গেস্টদের খাওয়া-দাওয়া দেখি। আপনাকে চিনতে পেরে, আপনার কিছুই না খেয়ে উঠে যাওয়া দেখে ভাবলাম, স্যারের কষ্ট দূর করতে হবে। এখন থেকে রোজ রাতে আপনি ভাত-ডাল-মাছ বা মাংস পাবেন। আমি নিজে আলাদা রান্না করব।' আবেগাপ্লুত হয়ে এক ঘর সাদা চামড়াকে অবাক করে রোজারিওকে জড়িয়ে ধরলাম।

যে ঘটনাটি উল্লেখ করলাম, তখনকার দিনে ক্লাবের সদস্য আর কর্মীদের মাঝে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের একটি উদাহরণ মাত্র। যার উষ্ণতার ছোঁয়া বিদেশে গিয়েও পেয়েছি। উমিদ খান, আবদুল হক, ফরমান আলী– সব বেয়ারা সিডনির রোজারিওর মতই এমনি দরদ দিয়ে চা'র কাপটি টেবিলে রাখত। বেয়ারা কুদ্দুস সবার ফুটফরমায়েশ খাটতে হয়রান হয়ে যেত। সর্বক্ষণ দৌড়াত বাইরে থেকে সিগারেট আর পানের জন্যে। বলছিলাম সেকেণ্ড হোম, দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বাড়ি, এরা সবাই ছিল সেই বাড়ির অন্য বাশিন্দা মালিক সদস্যদের একান্ত আপন। আরেকটি উদাহরণ দেব। পঞ্চান্নের বন্যায় ঢাকা শহর ভেসে গিয়েছিল। আমার শ্বশুর জনাব আবদুস সালাম পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রেস ক্লাবের দোতলায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে একদিন আমার বড় মেয়ের জন্ম হল। সেই মেয়েকে উমিদ খান কাঁথা দিয়ে বুকে জড়িয়ে বারান্দায় পায়চারি করে কান্না থামাত। কাঁথার ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিত। এখন প্রেস ক্লাবের অডিটোরিয়ামে অনেক বিয়ে হয়। প্রথম বিয়ের আসরটিও হয়েছিল আমার এই মেয়ে রুমার। মানিক মিয়া, সালাম সাহেবেরা এলে আবদুল হক দৌড়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে পায়ের জুতো খুলে মুছে দিত। আর কত নাম বলব, সবার কথা মনে পড়ছে না। এখন যখন সদ্য পেশায় আগত নতুন কোনও সদস্যকে বাচ্চা বেয়ারাদের ওপর হম্বিতম্বি করতে দেখি, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, কোথায় গেল সেই মধুর সম্পর্ক!

ক্লাবের ঘরোয়া পরিবেশ, সেকেণ্ড হোমের সুইট হোমের সময়ের অনেক বিবরণ হয়তো পুরনো সদস্যদের আরও অনেকেই লিখবেন। বস্তুত এই প্রেস ক্লাবের প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন ও প্রতি বছর নিয়ে সাত কাণ্ড রামায়ণ লেখা যায়। শুধু সাংবাদিকদের বিনোদন কেন্দ্র নয়, এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ক্লাবটির একটি ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। এই দেশের ইতিহাসের অনেক অধ্যায় এ ক্লাবেই লিখিত হয়েছে। সেই ঐতিহ্যময় সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা জানি না। এ ক্লাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সভা করে মিছিল নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নেভাতে বিভিন্ন এলাকায় গেছেন। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নয় জন রাজনৈতিক নেতা প্রথম একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন বোধহয় বাষট্টিতে। সেই বিবৃতিটির খসড়া করেছিলেন তারা এই ক্লাবের দোতলায়, গোপন সভায় মিলিত হয়ে। ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান থেকে নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, সব নাম মনে পড়ছে না, সবাই এসেছিলেন সেই সভায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত প্রেস ক্লাবে। সেই সময়ে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই ক্লাবের মিলনায়তনে প্রথম মিলিত হয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, আজকে সাংবাদিক সমাজের নিজেদের চরম সংকটকালে যখন তাদের প্রাণ ও পেশা হুমকির মুখে, প্রেস ক্লাবের সদস্যদের কোনও প্রতিরোধী ভূমিকা নেই। আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন আগা খান, জেনারেল আজম খান, উপমহাদেশের নেতৃবৃন্দ। রাজনীতির উত্তাল দিনগুলোতে এই ক্লাব ছিল সবার অভয়াশ্রম, সেফ জোন।

অতীতে ও সাম্প্রতিককালে কয়েক বছর আগেও পুলিশের মার খেয়ে রাজনৈতিক নেতারা এসে এখানে আশ্রয় নিতেন। এখন অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটছে। বাইরের রাজনৈতিক ঝাপটা যাতে ক্লাবে না আসে, বিদ্যমান সংকটকালে রাজনীতিবিদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্যে, তারা যেন পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ঢুকতে না পারে, সে জন্যে প্রধান গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। আর বন্ধ না করলেই বা কী? পুলিশ ক্লাবের ভেতরে ঢুকে যায়। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। এমনকি সাংবাদিক পিটিয়েছেও। আইয়ুব-মোনেম বা এরশাদ আমলেও ক্লাব ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ। এখন আর তা নেই। সাংবাদিক সমাজের অনৈক্য আজ ক্লাবের নিরাপত্তার পরিবেশটি ধ্বংস করে দিয়েছে, ঐতিহ্য বিনষ্ট করেছে।

www.pathagar.com

রাজনীতির ইতিহাসে অবদান রাখার চেয়েও এ প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের অধিকার আদায় ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে অনেক বেশি। এখান থেকে বয়সের ভারে ন্যুজ মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে সব মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক আইয়ুব খানের প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে মিছিল করেছেন। আমার ছাদ-খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে মওলানা সাহেব সারা ঢাকা ঘুরেছেন, সেই গাড়িটি চালানোর সুখময় স্মৃতি এখনও আমাকে রোমাঞ্চিত করে। সাংবাদিকদের ঐক্যের প্রতীক ছিল এ ক্লাব। চার বার সভাপতি ও তিন বার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিক সমাজের ইউনিয়ন ছিল এ দালানে। এখনও আছে, তবে দ্বিধাবিভক্ত, কর্মকাণ্ডের একতাটি নেই। আমি মনের মাঝে ক্ষোভে দুঃখে জ্বালা অনুভব করি যখন দেখি আমার সেই ইউনিয়নটি, আমি এক কালে যার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলাম, ক্লাব কর্তৃপক্ষ তার মধ্যিখানে ভাগ করে দেয়াল তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ ক্লাবে ইউনিয়নের একটি ঘর পেতে আমাকে মালিক ও সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে। তাদের যুক্তি ছিল ক্লাবটি শুধু পেশাদার সাংবাদিকদের নয়, তাদেরও বটে। এ ক্লাবে পাকিস্তানে প্রথম সাংবাদিকদের ওয়েজ বোর্ডের দাবি উঠেছিল। সেই বোর্ডের প্রথম সভাও হয়েছিল বিচারপতি সাজ্জাদ আহমদ জানের সভাপতিত্বে এ ক্লাবের দোতলায় হলঘরে। সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইউনিয়নের তখনকার সভাপতি পরবর্তীতে ডেইলি স্টারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বন্ধু এসএম আলী, আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক।

আগে বলেছি, আমার ৫০ বছরের সেকেণ্ড হোম নিয়ে ৫০ পাতায়ও বিস্তারিত বর্ণনা করা যাবে না। তাই স্বল্প পরিসরে অতীতের পাতা থেকে ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতির পঙ্ক্তি তুলে ধরলাম। সঙ্গে কিছু তির্যক মন্তব্য, বর্তমানের সঙ্গে একটুখানি তুলনা। কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, মাঝে মাঝে টিপ্পনি কেটেছি অতীত ও বর্তমানের প্রেস ক্লাবের একটি খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরতে।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি, দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক

www.pathagar.com

পিছু ফিরে দেখা

আবদুল মতিন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তি উদযাপিত হচ্ছে। আমরা আনন্দিত, গর্বিত। এটি আমার সাংবাদিক জীবনে এক চরম আনন্দের দিন। আজ ৪৩ বছর পরে পিছন ফিরে তাকালে কত ছবি, কত রঙ, কত বিচিত্র মানুষ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেটি ছিল ১৯৬১ সালের ২৫ জুন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পাশ করে এসে দৈনিক সংবাদে সাব-এডিটর হিসেবে যোগদান করি। তখন বেতন ছিল সর্বসাকুল্যে ১৩০ টাকা। শ্রদ্ধেয় জহুর ভাই- জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন সংবাদের সম্পাদক। আমাদের প্রিয় শহীদ ভাই- শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। ছিলেন নূরুদ্দীন ভাই, রণেশদা- রণেশ দাশ গুপ্ত প্রমুখকে পেয়েছিলাম সামনের সারিতে। আজকের জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান ছিলেন তখন সংবাদের বার্তা সম্পাদক। আর প্রেস ক্লাব ছিল সেই ব্রিটিশ আমলের লাল ইট আর টালিতে তৈরি দোতলা ঘরটি। তখনও প্রেস ক্লাবে ছিল বাহারি ফুলের একটি নয়ন মনোহর বাগান।

প্রেস ক্লাবের খাবারও ছিল সবার প্রিয়। ছিল সস্তা। মান ছিল অতি উন্নত। তখন ঢাকার লোক সংখ্যা ছিল মাত্র আড়াই লাখ। একটি সুন্দর, নিস্তরঙ্গ ছিমছাম শহর। সাংবাদিকের সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। 'দৈনিক সংবাদ', 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' পরবর্তীতে 'দৈনিক পাকিস্তান' প্রভৃতি সংবাদপত্র ছিল। তখনকার কাগজে রঙের কোনও কারবার ছিল না। পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল ৮ থেকে ঊর্ধে ১২ পর্যন্ত। মজা হচ্ছে যে, 'সংবাদে' ওই ১৩০ টাকা বেতন পেতে বহু লড়াই করতে হতো। কিন্তু সংবাদে তখন যে সুন্দর পরিবেশ ছিল, তা মন ছুঁয়ে যেত। আমি তখনও সময় পেলেই ছাত্র ইউনিয়নের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। মতিয়া চৌধুরী তখন ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। প্রয়াত কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদও ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬২ সালে স্বামীবাগে ছাত্র ইউনিয়নের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র না থাকা সত্ত্বেও সবাই মিলে আমাকে ওই সভায় সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করেন। সেটি ছিল ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কাল। তাই তখনও কিছুটা সঙ্গোপনেই সভা-সমিতি করতে হতো।

আমি তখন হোসেনী দালানের একটি মেসে থাকি। সেখানে আমার মেজ সম্বন্ধী আনোয়ারুল ইসলাম থাকতেন। আর ছিলেন আবদুল লতিফ নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। মেস ভাড়া দিতাম মাসে ১৩ টাকা মাত্র। '৬২ সালে যখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগলো,

www.pathagar.com

তখন ওই মেসেই আমরা অনেক গোপন বৈঠক করেছি। এতে বহুবার আহমেদুর রহমান (ভীমরুল) ও মোহাম্মদ ফরহাদ সেখানে এসেছেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হতো। কিছু কিছু কর্মসূচীও সেখানে বসে স্থির করা হতো। আজকের জনকণ্ঠের সিনিয়র মোস্ট সহকারী সম্পাদক এটিএম শামসুদ্দীনের সঙ্গে ওই সংবাদেই আমার প্রথম পরিচয়। জনকণ্ঠে একই ডেস্কে শামসু ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি। বলতে ভুলে গেছি, আমি সংবাদে যোগ দেয়ার পরের বছর ১৯৬২ সালে বজলুর রহমান (বর্তমানে সম্পাদক) সংবাদে যোগ দেন। সংবাদে যে ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতাময় পরিবেশ ছিল, সেজন্যে আমরা রাজনৈতিক কর্মীরা খুব প্রাণোচ্ছল ছিলাম। তখন প্রেস ক্লাবের সদস্য হওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। ১৯৬১ সালের নবেম্বর মাসে আমি প্রেসক্লাবের সদস্য হই। যতদূর মনে পড়ে, তখন ক্লাবের মাসিক চাঁদা ছিল ২ টাকা মাত্র। প্রেস ক্লাবের সেই লাল দালানের নিচ তলায় সকালের দিকে একটু দেরি করলেই দেখতে পেতাম সিগারেট মুখে সাংবাদিক জগতের তিন মহারথীকে। জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী ও পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদক জনাব আবদুস সালামকে। নূরুদ্দীন ভাইকেও সেখানে মাঝে মাঝে দেখেছি। দেখেছি শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সারকেও। হাস্যোজ্জ্বল প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সংবাদে আমাদের সবারই প্রিয় ছিলেন শহীদ ভাই।

রণেশদা বয়সে অনেক বড় হলেও ছিলেন সবার প্রিয়। প্রায়ই দেখতাম, জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েই রাজবন্দীরা সোজা সংবাদ অফিসে চলে আসতেন। এমনি একদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সংবাদে যোগ দিলেন আনোয়ার জাহিদ ও কামাল লোহানী। জাহিদ আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমলের বন্ধু। তিনি তখন কলেজে পড়তেন। সেটি '৫৭ সালের কথা। আর কামাল লোহানী ছিলেন কলেজ জীবনের বন্ধু। ভালো কথা, সংবাদে ওই ১৩০ টাকা বেতন পেতেই গলদঘর্ম হতে হতো। তখন সংবাদের ইউনিট চীফ ছিলেন আফজাল প্রামাণিক। আমার প্রিয় আফজাল ভাই। ইউনিট মিটিংগুলোতে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকতাম, আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করতাম। আহমদুল কবীর (কবীর ভাই) তখন সংবাদের অর্থকরী দিকটি দেখতেন। আসলে কবীর ভাই ছিলেন সংবাদের এক উঁচুদরের ব্যক্তিত্ব। পরের বছর ১৯৬২ সালে আমাকে ইউনিট চীফ নির্বাচিত করা হলো। সংবাদে ইউনিট মিটিংয়ের এজেণ্ডা থাকতো। সাংগঠনিক আলোচনা, বেতন পরিস্থিতি ও বিবিধ।

একবার কি একটি কমন প্রোগ্রাম নেয়ার জন্যে সব ইউনিট চীফদের ডাক পড়লো প্রেস ক্লাবের দোতালায়। সেখানে পরিচয় হলো সিরাজুদ্দীন হোসেনের (শহীদ সিরাজ ভাই) সঙ্গে। পরিচয় হলো শহীদ তালেব ভাইয়ের সঙ্গে। তখন ডিইউজের সেক্রেটারি ছিলেন মোজাম্মেল ভাই। প্রেস ক্লাবের নিচতলায় ইউনিয়ন অফিসে মোজাম্মেল ভাই নিয়মিত বসতেন। পরবর্তীকালে '৬৫ সালের ২০ মে কায়রোর উপর মরুভূমিতে এক বিমান দুর্ঘটনায় অনেকের সঙ্গে মোজাম্মেল হক সাহেবও নিহত হন। আহমেদুর রহমানও সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হন। সংবাদে সেই আমলে আমাদের অনেকেরই মুখে মুখে ফিরত পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত ও সুভাষ-সুকান্তের কবিতা। কি যে আনন্দ লাগতো তখন। মনে আছে রণেশদা একদিন খবর দিলেন যে, সোভিয়েত কবি ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকোর একখানি কবিতার

www.pathagar.com

বই বাজারে এসেছে। পেঙ্গুইন সিরিজের এই বই পাওয়া যাচ্ছিল নিউ মার্কেটের কাছেই তৎকালীন জার্মান কালচারাল সেন্টারের কাছে একটি বইয়ের দোকানে। বিকেলে ফিরেই সেখান থেকে এক কপি বই নিয়ে এলাম। গোগ্রাসে গিললাম কবিতাগুলো। আমি তখন সংবাদের সাহিত্য পাতায় বেশ কিছু কবিতাও লিখেছি। তখন সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত কবি ইমামুর রশীদ। তখনকার লেখা 'পাগলী কাঁদছে' নামে একটি কবিতা বেশ নাম করেছিল। নির্মলদা জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই কবিতাটির কথা বলাতে খুব খুশি হয়েছিলাম।

তোয়াব সাহেব আমাকে একটি নিয়মিত কলাম লিখতে দিয়েছিলেন। তার জন্যে মাসে ৩০ টাকা পেতাম। কলামের নাম ছিল 'মানচিত্র'। লিখতাম 'নীলকণ্ঠ' ছদ্মনামে। যাহোক, একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, 'পাকিস্তান অবজারভার' এ কিছু সাংবাদিক নেবে। সংক্ষিপ্ত বায়োডেটাসহ দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে। দরখাস্ত করে উত্তর পেলাম। আমি আর শামসু ভাই 'সংবাদ' থেকে ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। অবজারভার অফিসে ঢুকতেই তখন একটি চাটাইঘেরা বড় রুম ছিল। পাশেই ছিল প্রয়াত লেখক মোহাইমেন সাহেবের ছাপাখানা। যথাসময়ে আমি ও শামসু ভাই সেখানে হাজির। সকাল ১০টায় ইন্টারভিউ। প্রায় ১১টা বেজে গেল। শামসু ভাই বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। বললেন, এ সওদাগরি অফিসে কাজ করতে পারবো না। বেলা ১১টায় ইংরেজিতে ছাপানো প্রশ্নপত্রসহ হাজির হলেন হাজারী ভাই অর্থাৎ কবি আবদুল গণি হাজারী ও মূসা ভাই (এ বি এম মূসা)। দশটি প্রশ্ন ছিল। প্রতিটিতে ছিল ১০ নম্বর করে। সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলাম। আসলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। 'Idiomatic phrase'- 'To spoil an Egyptian child' দিয়ে একটি বাক্য রচনা ছিল তাতে। আমি হাত আন্দাজে একটি বাক্য লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেককে জিজ্ঞেস করেও ওই phrase টির অর্থ জানতে পারিনি।

সংবাদের পালা শেষ হলো। এবার শুরু হলো অবজারভারের পালা। সেই যে ১৯৬৩ সালের ৪ এপ্রিল 'Pakistan Observer' এ ঢুকলাম। একটানা ২৬ বছর কাজ করে ১৯৮৯ সালে নিউজ এডিটর হিসেবে সেখান থেকে তিন বছরের লিভ উইদাউট পে ছুটি নিয়ে ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় 'প্রেস কাউন্সিলার' হিসেবে যোগ দিতে চলে গেলাম। সে সময় অবজার্ভারে এডিটার ছিলেন এস এম আলি। তখন দেশের রাষ্ট্রপতি এরাশাদ সাহেব। আমার বন্ধু কাজী জাফর আহমেদ তখন প্রধানমন্ত্রী। তারপর দেশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ফলে তার সরকারের পতন ঘটে। গঠিত হয় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তার Foreign Affairs Advisor ছিলেন প্রয়াত কূটনীতিক ফখরুদ্দীন আলি আহমেদ। পররাষ্ট্র দফতর থেকে আমাকে এক মাসের নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠানো হলো। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ। তারপর ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার পালা শেষ করে সপরিবারে ফিরে এলাম বাংলাদেশে। সুলতান মাহমুদ সাহেব ও কাউন্সিলর মহম্মদ ফারুক বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন বিদায় জানাতে। স্বামী-স্ত্রী ও

www.pathagar.com

দুই কন্যা মিলে আমরা এসেছিলাম হাইকমিশনের হ্যাণ্ডিম্যান ইতালিয় নাগরিক বেনিতোর গাড়িতে। বিদায় বেলায় বেনিতোর চোখ ছলছল করছিল। এই বেনিতো ওই সময়ের ৩০ বছর আগে নিজ দেশ ইতালি ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিল ভাগ্যের সন্ধানে। বেনিতো অশ্রুভরা কণ্ঠে আমাকে বলেছিল, 'Next time you will be my guest' এই বেনিতো ছিল পাহাড় কেটে কেটে যারা ক্যানবেরা শহরটি গড়ে তুলেছিলেন, তাদের একজন। বেনিতোর স্ত্রীও ছিলেন খুব সুন্দর মনের মানুষ। তিনিও আমাকে অনেকদিন ফেরার স্ট্রীটের হাইকমিশন অফিস থেকে বাসায় দিয়ে গেছেন। জানি না, বেনিতোরা এখন কেমন আছেন!

ঢাকায় ফিরে কিছুদিন পরে গেলাম প্রেস ক্লাবে। সেখানে বন্ধু সৈয়দ কামালউদ্দিন প্রস্তাব দিলেন সাপ্তাহিক 'Friday'তে কাজ করার। যাদু ভাইয়ের ছেলে শফিকুল গণি স্বপন ছিলেন পত্রিকার মালিক সম্পাদক। 'Friday' তে কিছুদিন কাজ করে যোগ দিলাম নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে মিন্টু সাহেব তথা এনায়েতুল্লাহ খানের 'Holiday' তে। এরপরে রিয়াজউদ্দিন আহমেদের সম্পাদনায় মওলানা মান্নান বের করলেন 'Daily Telegraph' নামের দৈনিকটি। সেখানে যোগ দিলাম Associate Editor হিসেবে। দুই বছর দুই মাস পরে ওই কাগজখানি বন্ধ করে দিলেন মওলানা মান্নান সাহেব। কিছুদিন বেকার থাকলাম। তারপর আজকের কাগজের মালিক-সম্পাদক কাজী শাহেদ বের করলেন 'Sunday News' নামে একখানি সাপ্তাহিক। মফিজুর রহমান অবজার্ভারে ছিলেন আমার সহকারী বন্ধু। তিনি এটির সম্পাদনা করতেন। আমি প্রতি সপ্তাহে একটি করে লেখা দিতাম। এ কাগজটিও একসময় বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার বেকার। গেলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছে। সায়ীদ তখন বিটিভির জন্যে 'সোনালী দরোজা' নামে একটি সিরিজ করছিলেন। ছুটে গেলাম তার সঙ্গে। ভিডিও ক্যামেরায় ছিলেন কাওসার চৌধুরী। সে পালাও একদিন শেষ হলো। তারপর কাজ করেছি জনকণ্ঠে। জীবনে প্রথম যে মানুষটির কাছে কাজ শিখেছি, সেই তোয়াব খান এই কাগজের উপদেষ্টা সম্পাদক। এটিও কম আনন্দের নয়। তাই যখন ৪৩ বছর পর পিছন ফিরে তাকাই, তখন হৃদয়ে দোলা দেয় কতো স্মৃতি, কতো গান!

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের সাবেক সহকারী সম্পাদক

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার গুরুত্ব ভালো সরকার নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব পালনে

মইনুল হোসেন

সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক থাকার একটি বড় দিক হইল– কাহারও সহিত দেখা হইলে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিয়া আলাপ করিবেন। সেইদিন গুলশানের একটি দোকানে আমাকে পাইয়া দোকানের মালিক প্রথমেই তুলিলেন চাঁদাবাজদের হাতে তাহাদের জিম্মি থাকিবার কথা। সরকার যে তাহাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারিতেছে না, সেই সম্পর্কে তাহাদের উদ্বেগের কথা। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানেন যে, আমি সরকারের কিছু নহি। তবুও তিনি ব্যবসায়ীদের অসুবিধার কথা আমাকে এত আগ্রহ নিয়া বলিয়াছেন এজন্য যে, আমি একজন সংবাদপত্রের লোক। পাঠকরা যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদেরকে তাহাদের পক্ষের শক্তি হিসাবে দেখিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। আমি তো মনে করি, একজন সত্যিকারের সাংবাদিকের বড় অহংকার হইল যে, তিনি একজন ত্যাগী নিঃস্বার্থ জনসেবক। আমার মত মাঝে-মধ্যে সংবাদপত্রে লিখিলেই একজন সাংবাদিক হয় না। দেশ ও দেশের মানুষকে নিয়া সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা করিতে হয় সাংবাদিকদের। তাই কোথায় কি ঘটিল, কে কি বক্তৃতা দিলেন, তাহা ছাপানোই সাংবাদিকতার সব কিছু নহে। সংবাদ সংগ্রহ করা এবং ছাপানো নিশ্চয়ই সাংবাদিকতার একটি বড় দিক। কিন্তু দেশের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা দেওয়া ও নিজেদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াই সাংবাদিকরা দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষায় নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। সাংবাদিকতার এই দিকটি যে বর্তমানে বহুলাংশে উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। যে-কোনও কারণেই হউক, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দিকটি বড় বেশি নিস্তেজ ও দুর্বল। যে কারণে সংবাদপত্রের নিজস্ব সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় নিয়া পাঠকদের মধ্যেও খুব কমই আলোচনা হয়। বাহিরের কলামিস্ট বা লেখকদের নিয়াই বিভিন্ন মহলে আলোচনা হইয়া থাকে বেশি।

সাধারণভাবে ইহা বলা যায় যে, মতামত প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র এখন বাহিরের লেখকদের উপর নির্ভরশীল। বাহিরের লেখকদের নিকট হইতে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার নীতি-আদর্শ বা কমিটমেন্ট আশা করা যায় না। তাহাদের লেখায় সত্যিকার সাংবাদিকতার নিঃস্বার্থ চিন্তা-ভাবনা না থাকাই স্বাভাবিক। দেখা যায়, বাহিরের যাহারা নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় লেখেন, তাহাদের অনেকেই দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। অর্থাৎ তাহাদের লেখা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নহে, তাহাও বলা যাইবে না।

অথচ সংবাদপত্র রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে ভূমিকা পালন করিতে পারে না,

www.pathagar.com

যদি জনস্বার্থ রক্ষার নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা সম্পাদকীয়তে না থাকে। বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় ভিন্ন সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকিতে পারে না।

আমাদের সংবাদপত্রসমূহের ছাপা ভাল হইতেছে। কোনও কোনও পত্রিকা এত রঙিন ছবি সহকারে বাহির হইতেছে যে, ইহা কোনও সিরিয়াস দৈনিক পত্রিকা না সিনেমা পত্রিকা, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয়। পত্রিকাসমূহের বাহিরের চাকচিক্য নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু যাহার অনুপস্থিতি সবাই অনুভব করিতেছে, তাহা হইল সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের ভূমিকা গুরুত্ব পাইয়া থাকে জনস্বার্থ রক্ষার ভালো সরকার নিশ্চিত করিবার জন্য। কোন দল ক্ষমতায় আসিলে কিভাবে তাহার লাভ হইবে, তাহা নিয়া হিসাব-নিকাশ করা সাংবাদিকের কাজ নহে। নির্দলীয় ও নিঃস্বার্থভাবে ভালো সরকার নিশ্চিত করিবার কাজটিতে সাহায্য করাই তাহার পেশাগত দায়িত্ব। সরকার যতই জনপ্রতিনিধিত্বশীল বা নির্বাচিত হউক না কেন, ক্ষমতাসীনরা যে সৎ হইবে, দায়িত্বশীল হইবে, তাহার নিশ্চয়তা থাকে না। নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী-মিনিস্টারদেরকে দুর্নীতিমুক্ত ও দায়িত্বশীল রাখিবার ভূমিকা পালন করিতে হয় স্বাধীন সংবাদপত্রের স্বাধীন সম্পাদকী প্রতিষ্ঠানের।

রাজনীতিতে সঠিক নেতৃত্বের অভাব সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু দেশে যেমন রাজনীতিহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিরাজ করিতেছে, সংবাদপত্রের জগতও সাংবাদিকতাহীনতার মারাত্মক দুর্বলতায় ভুগিতেছে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার কথা না গুরুত্ব পাইতেছে রাজনীতিতে, না পাইতেছে সাংবাদিকতায়। নিঃস্বার্থ হইতে পারিলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা খুব কঠিন নহে। নেতৃত্বহীনতার রোগে যে শুধু রাজনীতি ভুগিতেছে, তাহা নহে।

আমার তো বিশ্বাস, সাংবাদিকতার সম্পাদকীয় দুর্বলতাই জাতিকে সবচাইতে বেশি অসহায় করিয়াছে। কারণ, সাংবাদিকতায় শিক্ষা-জ্ঞান থাকিতে হয়। দেশের মঙ্গল নিয়া চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সাংবাদিকতা হয় না। তাই রাজনৈতিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইবার, দেশে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা ও জ্ঞান সত্যিকার সাংবাদিকদের তো না থাকিয়া পারে না।

দেশ যে এক চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতেছে, তাহা যে-কোনও সাধারণ লোকের নিকটও পরিষ্কার। কিন্তু জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়া জনগণের দ্বারা যাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজিত অরাজক পরিস্থিতির নিরসনে তাহাদের ব্যর্থতার জন্য তাহারা যে কোনওভাবে উদ্বিগ্ন, তাহা মনে হইতেছে না। দলীয় রাজনীতিতে যাহা গুরুত্ব পাইতেছে, তাহা হইল ব্যক্তিকেন্দ্রিক অতীতের ইতিহাস। সে ইতিহাসও ব্যর্থতায় ভরা। সুবিধাভোগী চাটুকারদের মুখে নিজেদের সাফল্যের কথা শুনিলেই তাহারা খুশি।

এই রাজধানী শহরেই প্রতিদিন নানা ধরনের ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হইতেছে। ছেলে

www.pathagar.com

কোন মন্ত্রী সাহেবের না এমপি সাহেবের তাহা বড় প্রশ্ন নহে। প্রশ্ন হইতেছে, এক শ্রেণীর তরুণ সহজেই অস্ত্র পাইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, তাহারা প্রকাশ্যে খুন-খারাবি করিয়া, ছিনতাই করিয়া পার পাইবে। পুলিশ তাহাদের কথায় চলিবে, তাহাদেরকে বাধা দিবে না। ব্যবসায়ীরা এই ধরনের তরুণদের নিকট জিম্মি। সরকারী ট্যাক্সের ন্যায় চাঁদাবাজরাও তাহাদের আরোপিত ট্যাক্স ইচ্ছামত আদায় করিয়া নিতেছে। ব্যবসায়ীরা রাস্তায় নামিতে বাধ্য হইয়াছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর যে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সেই সরকার জনস্বার্থ রক্ষায় কোনও ক্ষেত্রেই কর্তৃত্ব দেখাইতে পারে না। বাস্তবে তাহাই দেখা যাইতেছে।

বেকার তরুণদের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব আছে, তাহা অনুধাবনের কোনও চেষ্টা নাই। অথচ অর্থনৈতিক নৈরাজ্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও নৈরাজ্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। দেশ গোল্লায় যাউক, নিজেদের দলীয় লোকজনের স্বার্থ রক্ষা পাইলেই হইল। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার উপর দলীয় কর্তৃত্ব স্থায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব চরম দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে।

জাতি আজ অসুস্থ রাজনীতির বিকারগ্রস্ত নেতৃত্বের শিকার। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজ করিতে দেওয়া হইলে সরকারী ব্যর্থতা এত প্রকট হইত না। পার্লামেন্ট ঠিকমতো কাজ করিতে পারিলে, সংবাদপত্র সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করিতে পারিলে, কোর্ট-আদালত ও পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে দেশে সরকারী ব্যর্থতা এত উদ্বেগজনক আকার ধারণ করিত না। সরকারকে ঘিরিয়া দুর্নীতিপরায়ণ সুবিধাবাদীদের তৎপরতা এত বেপরোয়াভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। রাজনৈতিক মহলে সহযোগিতা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি হইত। রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শিতা দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে, তাহাদের ধারণা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া দলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই দেশে আর কোনও সমস্যা থাকিবে না। বাস্তবে রাজত্ব কায়েম যে রাজনীতিবিদদের দ্বারা সম্ভব নহে, অন্ততপক্ষে ইহা তো তাহাদের বোঝা উচিত।

লেখক দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

www.pathagar.com

আমার ক্লাব আমাদের ক্লাব

আতাউস সামাদ

প্রেস ক্লাবের খাবারে বিশেষ কিছু একটা আছে। নাহলে আমার ছোট মেয়ে সেই কবে ক্লাবের সিঙ্গাড়া খেয়েছিল কিন্তু এখনও অনেক বিকেলেই বলে, 'আব্বা, আজ যদি বাইরে যাও আর যদি প্রেস ক্লাবের দিকেই যাও তাহলে আমার জন্যে একটা সিঙ্গাড়া এনো।' একবার ওদের স্কুলের পিকনিকের সময় প্রেস ক্লাবের বানানো সিঙ্গাড়া দিয়ে দিয়েছিলাম। ওর কোনও কোনও শিক্ষিকা নাকি এখনও মাঝে মাঝে ওকে বলেন, 'তুমি আবার কবে প্রেস ক্লাবে যাবে?'

বাংলাদেশের সচিব পর্যায়ের আমলাদের অন্ততঃ দুইজন একাধিকবার বলেছেন যে, প্রেস ক্লাবের লুচি-নিরামিষ 'জুটি'র সঙ্গে চা গলাধঃকরণ করতে করতে জাতীয় সমস্যা আলোচনায় তাঁরা যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন দেশের কোনও এক সংকট মুহূর্তে, তা নাকি আজও মন থেকে যাচ্ছে না।

এই সেদিনও একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ বললেন, 'প্রেস ক্লাবে এক কাপ চা খেতে খেতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। বড় ভালো লাগতো।'

কোনও একটি মাত্র কারণে এঁদের সবাই প্রেস ক্লাবের খাবার ভালোবেসে ফেলেছেন, সেটা ঠিক নয়। কথাই তো আছে, 'আপ রুচিসে খানা, পর রুচিসে পেহান না', নিজের পছন্দ মতো খাবে, অন্যের পছন্দ মতো পরবে। কাজেই আমাদের মেনে নিতেই হবে যে এঁরা প্রত্যেকেই প্রেস ক্লাবের খাবারে এমন কিছু পেয়েছেন, যা এঁদের রসনা ও মন দুই-ই তৃপ্ত করেছে। তবে কার কাছে সেটা যে কোন্‌টা তা তাঁদেরকেই বলতে হবে। আমার কথা হলো যে, আমাদের প্রেস ক্লাবের সার্বজনীনতা আছে। সবাই কিছু পায় সেখানে। অথবা পেত।

আমার মেয়েকে যদি প্রশ্ন করি যে, প্রেস ক্লাবের কথা তোমার কি মনে পড়ে বলো তো, তাহলে সে উত্তর দেয়, পশ্চিম দিকে মাঠ ছিল আর ওখানে একটা স্লিপার ছিল। সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতাম, আর স্লিপারটায় চড়ে সরসর করে পিছলে নেমে আসতাম।

ওর শিক্ষিকাদের কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ হয়নি যে প্রেস ক্লাবে ওঁরা কোনওদিন গেছেন কিনা এবং সেখানকার কথা কিছু মনে পড়ে কিনা। সেরকম প্রশ্ন করলে হয়তো বা বলবেন, গণআন্দোলনের সময় একবার গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমলা দুই জনের একজন বলেছিলেন যে, জেনারেল এরশাদের আমলের শেষার্ধে সরকারের ভেতরে নিয়ম-শৃঙ্খলা যখন ভেঙে সন্দেহ ও শঙ্কায় দোদুল্যমান অবস্থায়, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার জন্যে প্রেস ক্লাবে ঢুকে পড়েছিলাম।

রাজনীতিবিদ বললেন, 'আন্দোলনের বিক্ষোভ কর্মসূচী যেদিন থাকতো, সেদিন তো দুইবার যেতো হতো প্রেস ক্লাবে। একবার যেতাম মিছিল করার ফাঁকে একটু দম নেওয়া আর এক কাপ চা দিয়ে গলা ভেজানোর জন্যে। আরেকবার যেতাম নতুন কর্মসূচী ঘোষণা দেবার উদ্দেশ্যে। আর অন্য সময় যেতাম পরিচিত অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়ে মাথাটা খোলাসা করে আসার জন্যে। তাতে মনটাও চাঙ্গা হতো।'

এঁদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব কিছুকাল আগেও সব বয়সের এবং নানান কাজের নানান ধরনের মানুষের জন্যে দেখা দিত এক ধরনের সঞ্জীবনী রূপ নিয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমাদের প্রেস ক্লাব (এভাবে বললে পুরনো লাল ইটের বাড়িটি আর এখনকার ইমারত দুটোই বোঝাবে) আমার জীবনের অংশ। সাংবাদিকতায় পুরোপুরি যোগ দেবার ছয় মাসের মাথায় চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই পেশা থেকেই বিদায় নেবার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ করেই প্রেস ক্লাবের সিঁড়িতে মূসা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরের দিন প্রায় ঘাড়ে ধরেই তদানিন্তন পাকিস্তান অবজারভারে নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আর পেশা ছাড়ার কথা ভাবতে হয়নি। মূসা ভাইয়ের সঙ্গে সেই নাটকীয় দেখা হওয়ার পেছনেও কিছু ঘটনা ছিল। সেসব কথা গুছিয়ে বলার ইচ্ছা আছে– আর কোনও কারণে না হলেও জীবনের অন্য প্রান্তে এসে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্যে। যেই পুরনো ভবনটির সিঁড়ি থেকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে ভেসে উঠেছিলাম জীবন সাগরে, সেই বাড়িটিতে পাকিস্তানী হানাদাররা কামানের গোলা মেরেছিল ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে। পশ্চিম দিকের দোতলার দেওয়ালে দুটো বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল গোলার আঘাতে। কিন্তু বাড়িটি তবু পড়েনি। একাত্তরের ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল হলে প্রেস ক্লাবে ছুটে গিয়েছিলাম। তখন আক্রমণের মুখেও গর্বিত দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে থাকা প্রেস ক্লাব ভবনটি দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল, আমরা বাঙালীরা জাতি হিসেবে মরবো না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, ইনশা আল্লাহ। সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেভাবে পারি দেশের জন্যে লড়াই করবোই। সেদিন আহত ওই বাড়িটির চেহারায় কেমন যেন একটা দীপ্তি ছিল।

প্রেস ক্লাবের নতুন ভবনটি ঘিরেও কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার একটি হলো ঢুকতেই বাঁ হাতের ঘর-ইউনিয়ন অফিসটির অর্গলবদ্ধ অবস্থা, যা প্রেস ক্লাবের উজ্জ্বল ইতিহাসকে মলিন করে দেয়।

কি আর করা, সব সময় তো সমান যায় না। আপাতত সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

বিবর্তন হবেই– ভালো না মন্দ সে হিসেব করার সুযোগ পেলেই হলো

প্রয়াত ফজলে লোহানীর মতো 'যদি কিছু মনে না করেন' উক্তিটি আপনাদের কাছে সবিনয়ে

www.pathagar.com

পুনরুল্লেখ করে এবং বাকায়দা মাফ চেয়ে নিয়ে আমার নিজের ও আশেপাশের মানুষদের মনে এখন যেসব প্রশ্ন, আশঙ্কা এবং ভয়-ভীতি কাজ করছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। এগুলো বেশিরভাগই আমাদের পেশা, কাজ ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে।

একটা সহজ-সরল ছোট কাহিনী দিয়ে শুরু করি। আমাদের এই জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভবনটি আমার জীবদ্দশায় বদলে গেল তিন বার। প্রথম ছিল একটি মাঝারি গোছের লাল ইটের দালান। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কামান দাগে এই ভবনে। বাড়িটি আপনা থেকেই একটি ঐতিহাসিক দালান হয়ে ওঠে। সেই লাল দালানটি আজ আর নেই। বাংলাদেশের অনেক কিছু যেমন বদলেছে, তেমনি ঐ পুরনো ইতিহাসমণ্ডিত বাড়িটার জায়গায় উঠেছে নতুন, আধুনিক এবং বড় ইমারত। কিছুদিন পর সেই ইমারতের পাশে উঠলো আরেক দালান। বিয়ে থেকে শুরু করে 'জনসভা' মানে বহু লোক নিয়ে বড় বৈঠক আর কি, সবই হয় ওখানে। অল-পারপাস ব্যাপার-স্যাপার। নতুন মূল ভবনে খোলা জায়গা ভরাট হয়ে ছোট ছোট কুঠুরিতে পরিণত হলো, ভালোই। ওগুলোতে অল্প খরচে আলোচনা সভা, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি করা যায়। গ্রাহকও বাড়ে। এসবই করতে হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাব চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে।

এখন আমাদের এই নতুন ভবনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়েছে। বেশ আধুনিক ব্যবস্থা। আমার মতো সেকেলেদের জন্যে এসব সাজ কখনও মনে হয় চোখ ধাঁধানো। নতুনরা বলবে, 'স্লিক অ্যাণ্ড সফিসটিকেটেড'। দিন কয়েক আগে গিয়েছিলাম ক্লাবে। সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে। ওরা বাল্যকাল থেকে এই ক্লাব দেখে এসেছে। চুপচাপ সব দেখলো। এটা কি, ওটা কি এরকম প্রশ্নও করলো মাঝে কয়েকটা। বাড়িতে ফিরে এসে আমি বললাম 'বেশ মডার্ন হয়েছে'। আজকাল বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিসে গেলে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের বাহার দেখি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। তবে আমাদের পুরনো সেই ক্লাবের গন্ধটা হারিয়ে গেছে। আমার মেয়েটির একটি জন্মগত অভ্যাস হলো, সে নিজে থেকে কোনও কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করে না। খুব ইচ্ছে হলে সুযোগ মতো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি দু'টি বাক্যে মৃদু মন্তব্য করে। এবার সে একটা স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বললো, 'আব্বা, আমিও ভাবছিলাম। বাড়ির ভেতরটা ক্লাবের মতো মনে হচ্ছিল না। হোটেলের লাউঞ্জ আর রেস্টুরেন্টের মতো লাগছিল।' তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'তবে আরেকবার দেখলে তখন হয়তো অন্য রকম লাগবে।'

আসলেই তো। নবীন বরণের সময় কোনও কিছু একটু বিসদৃশ লাগলেও পরে তা সয়ে যায়।

এই কাহিনীটির অবতারণা এই জন্যে যে সময়ের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যম জগতের রূপও যে বদলাচ্ছে, সেই কথাটি প্রতীকীভাবে বর্ণনা করা। নাহলে ওটা নিছকই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। রূপের সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে চরিত্রের। বর্তমান সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বৃহত্তর শক্তির আচরণে বিশ্ব-পরিবেশে যে পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো নমনীয়তা থাকলে তবেই নাকি তুলনামূলকভাবে দুর্বলরা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। এটাই নাকি বিবর্তনের বিধান। আমাদের বেলায়ও তাই হচ্ছে।

www.pathagar.com

সত্যি কথা বলতে কি, সাংবাদিক হিসেবে আমি নিজেকে নানান দিক থেকে আক্রান্ত মনে করি। সম্ভবত আমার পেশার ভাই-বোনেরা অনেকেও সেরকমই অনুভব করেন। এখন বিপদ আমাদের নানান দিক থেকে– দেশে ও বিদেশে। মার্কিনীরা জর্জ ডব্লিউ বুশ নামে প্রায় উন্মাদ, এবং অবশ্যই হিংস্র ও উন্মত্ত একটি লোককে তাদের রাষ্ট্রপতি হবার সুযোগ করে দেবার ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন সামরিক শক্তির বর্বর আক্রমণে আক্রান্ত হবার আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে মিথ্যা অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় স্বাধীন ইরাক পরাধীন হয়ে গেল। প্যালেস্টিনিয়ানরা রোজ নিহত হচ্ছে। ইয়াসির আরাফাত ইসলামী সম্মেলনে যেতে পারলেন না। অং সান সুচী সামরিক জান্তার হাতে আবার গৃহবন্দী। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের যে কোনও স্থানে সাংবাদিকরা যে কোনও অপশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। ইরাকে আল-জাজিরার দফতরে মার্কিনী সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় গোলা বর্ষণ করেছে। সেখানে একজন আরব সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম তারেক আইয়ুব। আরেকজন আরব সাংবাদিককে স্পেনে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি আল-কায়েদার সহযোগী, এই অভিযোগে।

আমরা এখন বিদেশ ভ্রমণেও নিরাপদ নই। শ্বেতকায়রাও যে খুব খুশিতে আছেন, তা নয়। বিবিসি রেডিও ব্রিটিশ সরকারের মিথ্যাচার ফাঁস করে দেয়। জানিয়ে দেয় জনগণকে যে, ইরাক আক্রমণ করার অজুহাত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সেই দেশে পরমাণু ও রাসায়নিক অবৈধ অস্ত্র আছে একথা বলার জন্যে টনি ব্লেয়ারের সরকার গোয়েন্দা ও বিজ্ঞানীদের ওপর চাপ দিচ্ছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকার এমন প্রত্যাঘাত করেছে যে, একজন বৈজ্ঞানিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং বিবিসি তার সংবাদ পরিবেশনার স্বাধীনতা হারাতে বসেছে। আমেরিকাতে অতীব শ্রদ্ধাভাজন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রধান অর্থনৈতিক সংবাদদাতা রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের মিথ্যাচার ও ইরাকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর তো কথাই নাই। এই অবস্থায় আমরা বিদেশে কোথাও গিয়ে যদি মনে করি যে, এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে এবং আমরা যা দেখছি তাই লিখতে পারি সেখান থেকে, সেটা একটা মারাত্মক ভ্রান্তিও হতে পারে।

দেশের ভেতরে তো আমাদের বিপদের শেষ নাই। কে যে কখন মার খাই, কে যে কার হাতে মরি, তার নিশ্চয়তা নেই। এই তো সেদিন দেখলাম এক ভদ্রবেশী ব্যবসায়ী কর্মকর্তা, যিনি এখন 'প্রেষণে' বা 'অনুরোধে' সরকারী কর্মকর্তাও বটে, তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতে এলেন গুণ্ডা-পাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে। সেইসব পাণ্ডারা আবার বলে গেল, 'ঠ্যাং ভেঙে দিলে সাংবাদিকতা বেরিয়ে যাবে।' আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বক্তৃতার মঞ্চে ওঠে পুলিশ কর্তৃক চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। হাসপাতালে খবর যোগাড় করতে গেলে সাংবাদিকদের মারধোর করে, ক্যামেরা কেড়ে রেখে দেয় ডাক্তার-নার্স ওয়ার্ডবয় ও তাদের বহিরাগত বন্ধুরা। উকিলরাও সাংবাদিকদের মারতে আসেন। ব্যর্থ পুলিশ কর্মকর্তারা দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে ইসলামী জঙ্গীদের খবর ছাপতে মানা করেন। সরকার যখন তখন যাকে ইচ্ছা তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে জেলে পাঠায়। অন্যদিকে বিরোধী

www.pathagar.com

দলীয়রা তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান না গাইলেও গালমন্দ করেন। দেশ-বিখ্যাত দলীয় 'বিভাজন' সাংবাদিকদের মধ্যে তো রয়েছেই। এখন তার জের ধরে মামলা-মোকদ্দমাও হচ্ছে। কোনও পত্রিকায় বা অন্য মাধ্যমে চাকরি দেবার বেলায়ও পিঠে কোন্ দলের ছাপ, তা দেখে নেয়া হয়। একুশে টেলিভিশন এক সময় বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অপছন্দের ছিল বলে মালিকানা বদলের পরও পুনরায় সম্প্রচারের লাইসেন্স সরল পথে দেওয়া হবে না।

একই সঙ্গে শুরু হয়েছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানার ব্যবসায়ীকরণ। সৎ পথে বা অসৎ পথে যেসব ব্যবসায়ী অঢেল টাকা হস্তগত করেছেন, তাঁরা এখন একাধিক ব্যবসায়ে 'বিনিয়োগ' করছেন। এঁদেরকে এখন আর অমুক কারখানার মালিক বা তমুক শিল্পোদ্যোক্তা বলা হয় না। ইনারা এখন 'হাউস' (Business House), এইসব ঢাউস ঢাউস হাউসরা এক সময় সরকারী আমলা আর ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কিনতো। এইসব হাউস-মালিকানাধীন পত্রিকা নিয়ে দুই বিপদ। এক হচ্ছে, কোনও এক ব্যবসায়ী হাউসের সঙ্গে অন্য হাউসের দ্বন্দ্ব লেগে গেলে তখন একজন সাংবাদিককে তিনি যে পত্রিকায় চাকরি করছেন সেই পত্রিকার মালিকের পক্ষ নিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করার জন্যে কলমযুদ্ধে নামতে হয়। এ কাজটিতে যথেষ্ট নোংরামো থাকে। একই সঙ্গে এইসব ঢাউস 'হাউসরা' সব সময়ই কোনও না কোনও রাজনৈতিক নেতাকে খুশি রাখার চেষ্টা করেন এবং তাঁর দলকে অর্থ সাহায্য দেন। তাঁর মালিকানাধীন পত্রিকাটিকেও তদ্রূপ আচরণ করতে হয়। সেখানে চাকরিরত সাংবাদিককে শুধু সে অনুযায়ী কলম চালাতেই হয় তা না, সঙ্গে মগজ ধোলাই হতেও রাজী হতে হয়।

এখন হয়েছে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। প্রথমতঃ এসব হাউস তো সব বলশালী রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেয়ই, তদুপরি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে একেক সময় একেক দলের সঙ্গে যায়। দ্বিতীয়তঃ এখন একই দলের সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যক্তি আলাদা আলাদা পত্রিকা প্রকাশ করতে নেমেছেন। আমার সন্দেহ, তারা চাঁদাবাজি করে বা ঋণের গুণে ব্যাংক লুট করে যে পয়সা কামিয়েছেন, সেটা সামলে রাখতে পত্রিকা বা টেলিভিশনের মালিক হতে চান। এইসব পত্রিকায় কাজ করা খুব কঠিন, কারণ সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হয় এর আসল মালিকটি কে। তাকে এবং তিনি এই মুহূর্তে যাকে বন্দনা করছেন তাকে খুশি রাখা যাবে কিভাবে? অন্ততঃ তাঁরা যাতে নাখোশ না হন, সেটা নিশ্চিত করা যাবে কিভাবে।

যেসব দেশে নষ্ট রাজনীতিবিদ এবং দুশ্চরিত্র ব্যবসায়ীরা সমাজপতি হন, সেসব দেশে সাংবাদিকতা করা খুবই কঠিন কাজ।

লেখক দৈনিক আমার দেশ -এর উপদেষ্টা সম্পাদক

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাবের স্মৃতি কখনওই ভুলবো না

আবদুল আওয়াল খান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। জাতিকে এই প্রেস ক্লাব কি দিয়েছে- একদিন হয়তো এ নিয়ে বিবেচনা করা যাবে। প্রেস ক্লাব এদেশের অনেক রাজনৈতিক সংগঠককে নেতা বানিয়েছে, অনেককে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, মুক্তিযুদ্ধে প্রেস ক্লাবের অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক স্মৃতি প্রেস ক্লাবকে ঘিরে জড়িয়ে আছে। এটা একটি বা দু'টি প্রবন্ধে শেষ করা যাবে না। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর আক্রমণের সময় প্রেস ক্লাবের ওপরও শেল নিক্ষেপ করেছিল। এই বোমায় প্রেস ক্লাবের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙে গিয়েছিল। সেদিন আমরা যারা সক্রিয় সাংবাদিকতা করতাম, তাদের চোখের সামনেই ঘটেছে অনেক ঘটনা। বাংলাদেশের জন্মের মুহূর্তের এসব ঘটনা যদি নোট বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখতাম, তাহলে ইতিহাসের তথ্য প্রমাণের জন্যে আর কারও কাছে যেতে হতো না।

একাত্তরের ২৫ মার্চ ঢাকায় প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল, তা অনেক রাজনৈতিক নেতাই বলতে পারবেন না। ২৫ মার্চ আমি সকাল সাড়ে ৯টায় বাসা থেকে বের হলাম। তখন আমার বাসা ছিল বকশীবাজারের জয়নাগ রোডে। গত ক'দিন যাবত শহরে ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সন্দেহভাজন লোকজনকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির পাশে থেকে আহমদউল্লাহ নামের ঢাকাইয়া এক যুবককে ধরে নিয়ে গেছে। সে সচিবালয়ে কাজ করতো। আটক করার কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। যা বলছিলাম, সকাল বেলা বাসা থেকে বের হয়েই সোজা প্রেস ক্লাবে চলে গেলাম। মিন্টু ভাই (নিউ এজের সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান), ফটোগ্রাফার আকিল খান ও ফয়েজ আহমদকে প্রেস ক্লাবে পাই। ঐ সময় এমনিতেই প্রেস ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাছাড়া প্রতিদিন যারা প্রেস ক্লাবে আসতেন, তাদের মধ্যেও অনেকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। মিন্টু ভাইসহ আমরা দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। মূল বিষয় ছিল আজ (২৫ মার্চ) কি হবে? মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আবার আলোচনা হবে কিনা, তাও বলা যাচ্ছে না। দু'একদিনের মধ্যে কি হবে, তা নিয়ে সবার মধ্যেই একটা শঙ্কা ছিল। মানসিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কি করবো? রাজনীতিবিদ, ছাত্র তথা সাধারণ মানুষ সবার মধ্যেই একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। গত কয়েকদিন

www.pathagar.com

ধরে মফস্বল থেকে খবর আসতো মানুষ মারা যাচ্ছে। ঢাকায় একটা ভীতিকর পরিস্থিতি। নিউজের খোঁজে সারা দিনের জন্যে বের হলাম। বাসা থেকে খেয়ে এসেছি, আর খাওয়া হয়নি।

সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে আবার যাই। সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিউজ পাঠানোর জন্যে টেলিগ্রাফ অফিসে গেলাম। আমার পত্রিকায় ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ওয়ার্নিং নিউজ পাঠালাম। তাতে বললাম, 'ঢাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। রাস্তাঘাট খালি, প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হচ্ছে না। যে কোনও সময় যে কোনও পরিস্থিতি ঘটে যেতে পারে। সবার মনেই শঙ্কা– 'কি হবে।' অফিস থেকে রিপ্লাই এলো, নিউজ যা পাবে, তাই পাঠাবে।

২৫ মার্চের আগে থেকেই ঢাকা শহর গরম। কারফিউ দিয়ে সাধারণ লোকজনকে হত্যা করা হচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। ওই দিনের (২৫ মার্চের) পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ। টেলিগ্রাফ অফিস থেকে বের হয়েছি। গা ছমছম করছে। রাস্তায় কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না। রিকশা খুঁজছি। কিন্তু পাচ্ছি না। চিন্তা করছি কোথায় যাবো? শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্যে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলাম। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কেউ নেই। সে বাসায় ঢোকা মাত্রই একটা ছেলে বেরিয়ে এলো। এখন ওর নাম স্পষ্ট মনে নেই। তবে ওই ছেলেটির নাম সম্ভবত মোশতাক, ও ছিল বঙ্গবন্ধুর সচিব আজকের আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ হানিফের সহকারী। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বঙ্গবন্ধু কই? ও জবাব দিল, ভিতরে আছেন।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাস? আমি বললাম, কোথাও যাবার জায়গা নেই– তাই আপনার কাছে এলাম। তখন বঙ্গবন্ধুর ঘরে দুই একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাত ১০টার কাছাকাছি। বাসায় লাইট কম, টিম টিম করে বাতি জ্বলছে। ওরা চলে যাবার পর তাজউদ্দিন সাহেব কোথা থেকে যেন এলেন। তাজউদ্দিন ভাই বললেন, বঙ্গবন্ধু আপনাকে নিতে এসেছি। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিন ভাইকে ধমক দিলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তুই এখনও যাসনি কেন? আমাকে নিতে হবে না। তুই যা। যেভাবে কথা হয়েছে সে ভাবে সব কিছু করবি। দেরি করিস না, চলে যা।' বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো আমি স্পষ্টই শুনলাম। নোট বই না বের করে আমি আমার হলুদ শার্টের হাতায় কলম দিয়ে এই কথাগুলো লিখে ফেললাম। বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দিন ভাইকে দেখে এত উত্তেজিত ছিলেন যে, কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না। মনে হলো, কিছু জিজ্ঞেস করলে হয়তো মারই দেবেন। বঙ্গবন্ধুর ওই কথার পর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বাসা থেকে বের হলাম।

রাস্তায় নামলাম। রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই। সোজা প্রেস ক্লাবে চলে এলাম। ওখান থেকে আতাউস সামাদের (আমার দেশের উপদেষ্টা সম্পাদক, আমি তখন তাঁর সঙ্গেই কাজ করতাম) বাসায় টেলিফোন করলাম। তিনি সর্বশেষ নিউজ পাঠাতে বললেন। সামাদ ভাই বললেন, বঙ্গবন্ধুর বাসার সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে একটা স্টোরি কর। পাঠাতে পারবি কিনা দেখ। স্টোরি লিখে পোস্ট অফিসে গিয়ে দেখি, পোস্ট অফিসের গেটে বন্দুকধারী

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে। আমি, আর সম্ভবত এনার মতিউর রহমান ছিলেন। বন্দুকধারী একজন সৈনিক আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলো। আমরা বললাম, আমরা সাংবাদিক। আমাদের কার্ড আছে। তখন আমাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তা গেটে রেখে দিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের ভিতরে ঢুকলাম। নিউজটা পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি করে নামলাম। মতিউরকে আর পেলাম না। ভয়ে গা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। কিন্তু আমার অবস্থা উল্টো। ভয়ে গা গরম হয়ে গেছে। গেটে এসে দেখলাম, আমার ৫৫৫ সিগারেটের প্যাকেটে কোনও সিগারেটই নেই। সম্ভবত এই প্যাকেট থেকে একটা মাত্র সিগারেট খেয়েছিলাম!

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে নেমেই ভাবলাম, বাসায় চলে যাবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ বন্ধ। যে দিকেই যাই, দেখি রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। রাত তখন ১০টা। কোথাও যেতে পারছি না। বাসায় যেতে না পেরে আতাউস সামাদের নয়া পল্টনের বাসায় এলাম। তাকে কপিটা দিয়ে দৈনিক বাংলার দিকে রওয়ানা দিলাম। সামাদ ভাইকে বললাম,আমার মা ও স্ত্রীকে খবর জানাতে যে, আমি বাসায় যাচ্ছি না। খবর না জানলে মা কান্নাকাটি করবেন। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দৈনিক বাংলা অফিসে ঢুকলাম। দেখলাম, তোয়াব ভাই রিং করছেন। দৈনিক বাংলার লীড নিউজের হেডিং আর্টিস্ট লিখছে। হেডিং ছিল- সেনাবাহিনী শহরে ঢুকে পড়েছে।

ভাবছি, কোথায় যাবো। এর মধ্যে কোনও গাড়ি কিংবা রিকশা দেখছি না। মর্নিং নিউজ অফিসে ঢুকলাম। দেখলাম ওয়াহিদুল হক শুয়ে আছে। পাশে হাসানউজ্জামান খান (সর্বশেষ বাসস-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক)। মর্নিং নিউজ অফিস থেকে দেখলাম, কোনও রাস্তায় বাতি নেই। না খেয়েই ওদের পাশে বসলাম। ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিছুই ভালো লাগছে না। পকেটে আছে মাত্র তিন টাকা। টোস্ট বিস্কুট আনালাম। দুই তিনটা খেলাম। দৈনিক বাংলার প্রেস ভর্তি তখন লোক। শুধু এই দু'টি পত্রিকার লোকই নয়- অনেক অতিথিও আছে। অনেকে আমার মত আটকা পড়ে এখানে অতিথি হয়েছে। একটু পরেই প্রেস ক্লাবের দিক থেকে গুলি ও বোমার আওয়াজ ভেসে এলো। দৈনিক বাংলা-মর্নিং নিউজের বাতি নিভিয়ে দিলেন তোয়াব ভাই। গুলি বোমার শব্দ চারদিক থেকে আসতে লাগলো। এবার আবার প্রেস ক্লাবের দিক থেকে বিকট শব্দ শুনলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর এলো, প্রেস ক্লাবের দেয়ালে রকেটের শেল লেগেছে।

আবার দৈনিক বাংলা নিউজ টেবিলে এলাম। ওই নিউজ টেবিলেই আমাদের থাকার জায়গা হলো। এভাবেই ২৫ মার্চ রাতটা কেটে গেল। ২৬ মার্চ কারফিউ দেয়া হয়েছে। ওই দিনও দৈনিক বাংলাতেই রয়ে গেলাম। বাসায় টেলিফোন করলাম। কিন্তু কেউ ধরছে না। সামাদ ভাইকে বললাম, বাসার খবর জানাতে। মা, বৌ ও দু' বছরের ছোট মেয়ে বাসায়, তারা নিশ্চয়ই আমার জন্যে কান্নাকাটি করছে। পরে জেনেছি, সামাদ ভাই আমার বাসায় খবর দিয়েছিলেন। সামাদ ভাইয়ের সঙ্গে ওটাই আমার শেষ কথা। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস সামাদ ভাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ২৭ মার্চ প্রেস ক্লাবে গেলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। কিছুক্ষণ পর ফয়েজ সাহেব (ফয়েজ আহমদ) লুঙ্গি পরে প্রেস ক্লাবে ঢুকলেন। দেখলাম, ক্লাবের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙে গেছে।

www.pathagar.com

দিনকয়েক পরে আবার প্রেস ক্লাবে গেলাম। সেদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত প্রেস ক্লাবে ছিলাম। এসব আজ স্মৃতি! এগুলো স্মৃতি হয়েই আমার কাছে আমৃত্যু থাকবে। প্রেস ক্লাব এবং প্রেস ক্লাবের স্মৃতি আমি কখনওই ভুলতে পারবো না।*

শ্রুতিলিখন : স্বপন দাশগুপ্ত

লেখক ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি

**মারাত্মক অসুস্থ থাকা অবস্থায় শ্রদ্ধেয় আবদুল আওয়াল খান প্রেস ক্লাবের জন্যে মূল্যবান স্মৃতিচারণ করেছিলেন। বইটি বেরুবার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন (১৯ ডিসেম্বর '০৪)। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি– সম্পাদক*

www.pathagar.com

ফেলে আসা দিনগুলো

হাসানউজ্জামান খান

মনে করেছিলাম দেশে সাংবাদিকতার একটা ইতিহাস লিখলে মন্দ হয় না। কিন্তু ইতিহাস লেখার জন্যে গবেষণা,বিপুল পড়াশোনা, সময় ও যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তার কোনওটাই আমার নেই। ইতিহাস মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ-বিশ্লেষণ। কিন্তু ইতিহাসের চরিত্ররা সবাই এক একটি মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান। সে মুখোশের পেছনে কি আছে, তা উন্মোচন করাও ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব। কিন্তু সে দায়িত্ব কি আমরা সব সময় পালন করতে পারি বা পারলেও কি সব সময় তা প্রকাশ করতে পারি? তাই সহজতর বিষয় হিসেবে আমার সাংবাদিকতা জীবনের কিছু ছোট-খাট উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। ছোট উপাখ্যানও সময় সময় ইতিহাসের মালমশলা হতে পারে। শুরুটা করি কাকাবাবুকে দিয়ে। আমি তখন 'আজাদ' থেকে সদ্য 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে যোগ দিয়েছি। স্বাধীনতা পত্রিকা বের হয় ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে। সেখানে অধিকাংশই ভলান্টিয়ার কর্মী। তারা বিনা বেতনে কাজ করেন। যাঁরা সার্বক্ষণিক কর্মী, তাঁরা পান মাসে ত্রিশ টাকা। যেহেতু আমি বাইরে থেকে এসেছি, তাই আমাকে দেয়া হলো মাসে ৩৫ টাকা আর ট্রামের কুপন। পত্রিকা বের হয় ডোভার লেন থেকে। কিছুদিন পর ডেকার্স লেনে তিনতলা বাড়িতে স্থানান্তর। কাকা বাবু সেখানে সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্বে।

এক দিন নিউজ এডিটর সুকুমার দা'র টেবিলে এক জোড়া চশমা পাওয়া গেল রাত দু'টোর পর। তখন আমি ছাড়া নিউজে কেউই নেই। পরদিন সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলতে পারলেন না চশমাটা কার। তাই নোটিশ বোর্ডে একটা চশমার ছবি এঁকে লিখে দিলাম- পাইয়াছি। আর কিছুই লেখা নেই। পরে কাকাবাবু তাঁর চশমাটা নিয়ে গেলেন আর ঘোঁতঘোঁত করে বললেন, "হুঁ পাইয়াছি।" তিনি যে মোটেই অসন্তুষ্ট হননি, তা আমার বুঝতে বাকি ছিল না।

১৯৪৭ সালের এক দাঙ্গার পর মুক্তাগাছার মহারাজা সিতাংশু আচার্য চৌধুরীকে তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ি থেকে অল্পকালের জন্যে নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে হয়েছিল। তাঁর বাড়িটি ছিল হিন্দু-মুসলিম দু'এলাকার সঙ্গমস্থলে। কিন্তু খালি বাড়ি পেলে স্কোয়াটাররা দখল নিতে পারে এ বিবেচনায় তার ভাই ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য চৌধুরী কাকাবাবুকে তাঁর মুসলমান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে অনুরোধ করলেন, যতদিন না তাঁর ভাই ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। তারা ছাড়া কর্মচারীদের জন্যে একটি দোতলা আউট হাউস, কয়েকটি গাড়ির গ্যারেজ ও তার ওপর ড্রাইভারদের থাকার ঘর। সেখানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমিও গিয়ে উঠলাম। ওপর-নিচ দু'তলাতেই মাঝখানে বিশাল হল ঘর, আর তার চারপাশে শোবার ঘর। নিচতলায় এক ঘরে বুলবুল চৌধুরী সস্ত্রীক থাকতেন। আর কে কে নিচতলায় ছিলেন, আজ আর তা মনে নেই। ওপর তলায় এক ঘরে সস্ত্রীক মনসুর হাবিব (পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার ও মন্ত্রী), এক ঘরে কবি গোলাম কুদ্দুস, আমানুল্লাহ সৈয়দ (মনসুর হাবিবের ছোট ভাই) ও আমি। গাড়ি বারান্দার ওপর আবদুল হালিম ও তাঁর স্ত্রী অশ্রু হালিম। ওপর তলায় আরও দু'টি পরিবার ছিলেন, তাদের নাম মনে করতে পারছি না। আউট হাউসের উভয় তলায় পাঁচ ছয়টি পরিবার থাকতেন, তার মধ্যে কেবল ইসরায়েল ভাই ও গনিমা ভাবীর কথা মনে আছে। তার ঘরেই আমাদের আড্ডা জমতো বেশি। গ্যারেজের ওপর ড্রাইভারদের এক ঘরে কাকাবাবু আর অপর ঘরে আবদুল্লাহ (?) রসুল সাহেব।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমাদের প্রতিটি ঘরের সঙ্গে একটি করে বাথরুম ও একটি করে রান্না ঘর। যে যার মতো রান্না করে খাচ্ছেন। আমানুল্লাহ সৈয়দের কল্যাণে আমার খাবারটা তার ভাবীর কাছ থেকে আসতো। মহারাজার এক খাস ধোপা ছিল। সে তখন মনিবের অভাবে বেকার। তাতে আমাদের খুব সুবিধে হয়ে গেল– বাইরে লন্ড্রিতে চার্জ দু'আনা কিন্তু কাপড় পড়ে থাকলে আমাদের চলে না। চার আনা দিলে ২৪ ঘণ্টা পর ডেলিভারী। এত পয়সাই বা কোথায় পাবো? রাজার ধোপাকে দু'আনা দিলে সকালের কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে দুপুরে বিছানার ওপর রেখে যেতো। এ সুখ অবশ্যই বেশি দিন থাকেনি।

এরপর একেবারে পাকিস্তান অবজারভারের কালে আসি। আমি তখন নাইট এডিটর (অর্থাৎ রাত্রির শিফটের স্থায়ী ইনচার্জ)। নিউজ এডিটর এ বি এম মূসা। ১৯৫৮ সালের বোধ হয় ৯ অক্টোবর রাতে দুটোর পর শেষ কপি প্রেসে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছি কম্পোজ হয়ে গেলে মেকআপে যাবো। অবশ্য মূসা অত রাত্রে থাকতো না। সোয়া দুই আড়াইটার দিকে মালিক হামিদুল হক চৌধুরী টেলিফোন করে জানতে চাইলেন, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কোনও খবর আছে কিনা! টেলিপ্রিন্টার মেশিন তখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিশ্চুপ। আমি সে কথাটা বলতে বলতে মেশিনটা খটাখট করে চালু হয়ে গেলো। দৌড়ে গিয়ে দেখি দেশে মার্শাল ল' জারি হয়ে গেছে। কাজেই আবার নতুন করে খবর লেখা, কম্পোজ করা, পুরোনো সংবাদ বিপজ্জনক কিছু থাকলে তা বেছে বাদ দেয়া, তার পর নতুন মেকআপের চিন্তা ভাবনা। এটাই আমাদের প্রথম মার্শাল ল'র অভিজ্ঞতা। মার্শাল ল'র জামানায় একটার পর একটা হুকুমনামা জারি হতে থাকলো। সেগুলো হুবহু ছাপাতেই হতো। কারণ তাতে বহু রকম বিধি নিষেধ, তা অমান্য করলে সাজার হিসেব এগুলোতে থাকতো।

একদিন সরকারী তথ্য দফতর থেকে নির্দেশ এলো মার্শাল ল'র হুকুমনামা ও সরকারী প্রেস নোট ছাড়াও সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও হ্যাণ্ড আউট সবই হুবহু ছাপাতে হবে, নইলে বিপদ আছে। এটা মানতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি। মূসার নির্দেশে তখন সেগুলো পয়েন্ট হেডিং দিয়ে ক্ল্যাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের পাশে পরপর সাজিয়ে ছাপিয়ে দিলাম। ওগুলো দেখতে

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপনের মতোই মনে হতো। সাত দিনের মধ্যেই সে সরকারী নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল।

সে জামানারই আর একদিনের ঘটনা। বন্ধুবর সঞ্জীব দত্ত তখন মধ্য প্রদেশের এক করদ রাজ্যে দেওয়ানগিরি শেষে ফিরে আবার অবজারভারের সিনিয়র সাব এডিটর। আমি রাত্রের দায়িত্বে। তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার তো খুব সাহস'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'যে সব সংবাদ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আসছি, তা আপনি নির্দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছেন, আর যেগুলোর মোটেই গুরুত্ব নেই, তা দিয়েই লীড বানাচ্ছেন। এ রকম সাহস আমার হতো না।'

আমি তাঁকে তখন বললাম, 'আপনি গোড়াতেই ভুল করেছেন। আমি সাহসী বলে এরকম করছি না। করছি ভয়ে।'

আজও সে ভয় আমাদের পুরোপুরি কাটেনি।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, বাসসের সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

www.pathagar.com

কালের সাক্ষী এই প্রেস ক্লাব

কামাল লোহানী

আমি প্রেস ক্লাবের মেম্বার নই। ১৯৫৮ সালে যখন জেনারেল আইয়ুব খান দেশের সর্বময় ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিল, সেদিন দেশব্যাপী চলছিল বেধড়ক ধরপাকড়। আমি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলাম গ্রেফতারী এড়াতে। সংবাদপত্র কিংবা প্রেস ক্লাব, কারও সঙ্গে ছিল না সরাসরি সম্পর্ক। ডিফল্টার হয়ে গেলাম। এতদিনে প্রতিমাসে ৫ টাকা করে চাঁদা দেবার সুযোগ ও সাধ্য কিছুই ছিল না সেদিন। ফলে সদস্যপদ হারালাম নির্বিকার। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ঢাকা প্রেস ক্লাবের বা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য হতে পারলাম না। চেষ্টা করেছি বহু, কিন্তু কেন যেন অঙ্কে মেলেনি। বন্ধু শহীদুল হক (প্রয়াত) সেদিন সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল, ওর একটা তাগিদ ছিল আমার হৃত সদস্যপদ পুনরুদ্ধারে। এমনকি হাজী জহিরের তাগাদায় বকেয়া থেকে ৫০ টাকা জমা দিয়ে আবার আবেদন অবশ্যই করেছিলাম, কিন্তু ফল হলো না সেদিনও। কি সে রহস্য, আমিও জানি না।

কিন্তু প্রেস ক্লাবে আমাকে যেতেই হতো। এই ক্লাবকে জন্ম দিয়েছে যে সাংবাদিক ইউনিয়ন, তার অফিস ছিল এই ক্লাব ভবনেই। পুরনো সেই দোতলা বাংলো'র একটা ছোট্ট ঘরে ছিল ইউনিয়নের অফিস। মিটিং বসতো দোতলার লাউঞ্জে। আর ক্লাবটাই ছিল আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সেই ঐতিহ্যবাহী প্রেস ক্লাব অত্যাধুনিক হয়েছে। ভুলে গেছে অতীতটা। সে পুরনো বাড়িটা ছিল কত গর্বের, অহংকারের, সেই বাড়িটির ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কী বিশাল অট্টালিকা! অংসখ্য কামরার 'কোলাজ' যেন এই ভবন। স্পেসকে ব্যবহারের কী চমৎকার বাহারিয়া সাধ পূরণ করেছেন স্থপতি! প্রতিদিন চঞ্চল এ ভবন!

তবু প্রিয় অনুজ হাসান হাফিজের টেলিফোনে সচকিত হয়ে উঠলাম। বুকে ব্যথা বাজলো। কী চমৎকারই না ছিল সেই বাংলোটি। গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ ওই বাংলোটাকে সারাক্ষণ উচ্চকিত করে রাখতো। চা-খানার পাশেই উঠে যাওয়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলুন, দেখবেন কী অদ্ভুত বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ সেখানে। উঠতেই বাঁ হাতে ছিল কার্ডরুম। ওইখানে সারাদিন চলতো তাসের আড্ডা। সে প্রাণবন্ত আড্ডায় কম কথা বলা সিনিয়র ও সিরিয়াস সালাম ভাই যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন হেঁড়ে গলায় সারাক্ষণ দাপিয়ে বেড়ানো সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস। তরুণ থেকে বয়োবৃদ্ধ অনেকেই এই ঘরে দিবসব্যাপী অমূল্য সময় ধ্বংস করে দিতেন, তোয়াক্কা করতেন না অফিসের, সংসারের, এমনকি পকেটেরও।

www.pathagar.com

ফয়েজ আহমদ, এ বি এম মূসা, এম আর আখতার মুকুল, দু-একজন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, বেতারের শিল্পী-কুশলী, এফডিসি'র কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন। হাসানউজ্জামান খান, সৈয়দ আসাদুজ্জামান, জাফর ভাই কিংবা অনেকেরই মুন্না ভাই, এমন কত যে নাম বলা যায়, তার শেষ নেই। ক্লাবে সদস্য ছাড়াও সহযোগী সদস্য হবার সুযোগ ছিল। তাতেই বেতার ও চলচ্চিত্রের কিংবা সরকারী অফিসের বড় কর্তারাও সদস্য হবার সুযোগ পেতেন। ফলে এই এলাকাটা সারাক্ষণ বেশ জমজমাট থাকতো। মাঝে মধ্যে হৈ হুল্লোড় যে হতো না, তা বলা যাবে না। পয়েন্ট কিংবা পেমেন্ট নিয়ে অথবা কারও তাস লুকিয়ে দেখে ফেলায় কি প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডাই না হতো! একবার তো প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের এক বড় কর্তা ও তার থেকে শ্রদ্ধেয় সিনিয়র এক জনপ্রিয় পত্রিকা সম্পাদকের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়াই হয়ে গেল।

যাক্ সে সব কথা। এই কার্ডরুমকে বাঁয়ে ফেলে ডাইনে ঘুরলেই একটি ছোট্ট ঘর ছিল, যেখানে থাকতেন প্রথিতযশা এ এল খতিব। সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট যখন লাহোর থেকে বেরোয়, তিনি সেখানে ছিলেন। পরে মর্নিং নিউজের অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর পদে ছিলেন দীর্ঘদিন। এই বিদগ্ধ সাংবাদিক পুরোধাকে চিনেছিলাম ১৯৫৯ সালে, পাকিস্তানের প্রথম ব্যালে কবি জসীম উদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কে যখন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী জি এ মান্নান নৃত্যরূপ দিলেন, তারই কোরিওগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর লেখা পড়ে। সাংবাদিক যে 'সবজান্তা' হয়, এ তার নমুনা। খতিব ভাই সিরিয়াস মানুষ ছিলেন, জ্ঞানে ছিলেন পণ্ডিত। তিনি নাচ সম্পর্কে লিখলেন, যা অন্য কেউ লিখবার সাহস করেননি। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীলংকার মানুষ ছিলেন। তাই কোরিওগ্রাফি সম্পর্কে তিনি ছিলেন ঋদ্ধ। এই কামরায় 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার প্রতিনিধি উইলিয়াম ননী বেশ কিছুদিন ছিলেন। পরে অবশ্য ম্যানেজারের কামরাও ছিল। দোতলায় উঠে সোজা গেলে বাঁ হাতে পড়তো 'লাউঞ্জ'। এইখানে বহু দুপুর কেটেছে ঘুমিয়ে। বিকেল হতেই উমিদ খান কিংবা আবদুল হক ছুটে এসে উঠিয়ে দিতেন। আর মনে করিয়ে দিতেন এখানে সোফায় ঘুমানো বারণ। এরপর ওরাই চায়ের ব্যবস্থা করে দিতেন।

নিচের তলায় ক্যান্টিন রুম দিয়ে শুরু হতো। তারপর ঢুকেই বসবার জায়গা ছিল। অতিথি আপ্যায়ন হতো আর এখানেই দেয়াল ঘেঁষে কাগজের র‍্যাক ছিল। দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরা থাকতো। পরের এক চিলতে কামরায় ছিল ইউনিয়ন অফিস। ঘরটা ছোট্ট বটে, ঐতিহ্য ও সংগ্রামে ছিল সমৃদ্ধ। পাকিস্তান আমলেই সাংবাদিক ইউনিয়ন কী অসাধারণ শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, তা সারা পাকিস্তানের সকল দৈনিক সংবাদপত্র ১৭ দিন বন্ধ রেখে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছিলাম সাংবাদিক ঐক্য কাকে বলে! যাহোক, পাশেই ছিল টেবিল টেনিস রুম। এর সামনেই বসতেন সঙ্গীত পরিচালক আবদুল আহাদ, অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক ফতেহ লোহানী, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজির আহমদ, ক্যামেরাম্যান আজাদ খান, এই পেশায় নিয়োজিত নূরুল ইসলাম। আজাদ ছাড়া সবাই বিবিসি'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এইখানে বসে তাঁরা কত কি ভাবতেন, করতেনও।

সেই প্রেস ক্লাব এই প্রাচীন ভবনেই জন্মেছিল, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। আর সেই সুবর্ণ জয়ন্তিতে যখন হাসান হাফিজ ও শওকত মাহমুদের চিঠি পেলাম, তখন বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কী ডিগনিফাইড বিল্ডিং-ই না ছিল! অথচ সেখানেই উঠেছে আরেকটি বিশাল

www.pathagar.com

আয়তন ও বহুকক্ষ বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ভবন। বাংলাদেশ হবার পর এই ভবনের বহুবিধ ব্যবহার বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু সেই কৌলিন্যপাট কোথায়? কুলীন বোধহয় একটি বিষয়ে রয়ে গেছে প্রেস ক্লাব জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে ঘোষণার পরও, তার কিন্তু ওই 'হাউজি' রয়েই গেছে। ওটা সেই যে জন্মকালে শুরু হয়েছিল অর্থ সমাগমের জন্যে, আজও তার অবসান ঘটেনি উপার্জনের নানান পথ খোলার পরও। প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়াম তৈরি হয়েছে একটি। এসি ভিআইপি রুম ছাড়াও একটি এসি কনফারেন্স রুম রয়েছে বেশ বড় এবং নন এসি বেশ ক'টি। সাংবাদিক সম্মেলনের কারণে এগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। তবে প্রাঙ্গণে যে টেনিস ময়দান তৈরি করা হয়েছে, আদৌ তার প্রয়োজন ছিল কি?

জাতীয় প্রেস ক্লাবের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার রয়েছে। দেশী ও বিদেশী দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক মিলে অগণিত পত্র-পত্রিকার সমাহার এই কেন্দ্রটিতে। তবে কোনও রেফারেন্স লাইব্রেরি বা তথ্য আর্কাইভ গড়ে উঠেছে কিনা একে ঘিরে, তার খবর অবশ্য আমি জানি না। গড়ে উঠে থাকলে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। যদি না হয়ে থাকে, তবে সেদিকে কর্তৃপক্ষ বা ক্লাব নেতৃত্ব নজর দিলে, যাদের দ্বারা ও যাদের প্রয়োজনে এই ক্লাব গঠিত ও পরিচালিত, সেই সাংবাদিকরাই যারপর নাই উপকৃত হবেন। ....এই গ্রন্থাগারে বোধহয় এখনও বিভিন্ন দূতাবাস সৌজন্য হিসেবে বই, পত্র-পত্রিকা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণও হয়তো দিয়ে থাকেন। প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ দেশের প্রগতিবাদী, সৃজনশীল ও সমৃদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোক অনুরোধ জানাতে পারে তাদের প্রকাশিত বইয়ের ন্যূনপক্ষে একটি করে কপি ক্লাবকে দেয়ার জন্যে। এতে প্রকাশকদের আপত্তি করার কিছু নেই এবং ক্ষতিও হবে না। বরং প্রচার হবে সাংবাদিক, লেখক, সাহিত্যিকদের মধ্যে। এছাড়া ক্লাবের নিশ্চয়ই বই কেনার নিজস্ব বাজেট আছে। প্রত্যেক একুশে বই মেলার সময় এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই সঙ্গে একটি প্রস্তাব দিয়ে রাখি। তা হলো, ওই যে অডিটোরিয়াম, ওটাকে এই অবস্থায় রেখেই স্থপতি ও প্রকৌশলীদের সহযোগিতায় এর aquastics এর নতুন সংযোজনের ব্যবস্থা করে যদি পুনঃ সংস্কার করা যেত, তাহলে এই মিলনায়তনটি খুবই ব্যবহারযোগ্য হতে পারতো। সেই সঙ্গে অর্থসমাগমও হতো। কারণ শহরে ভালো ছোট ও বড় মিলনগৃহের দারুণ অভাব। সেই সঙ্গে মঞ্চটাকে যদি পেছনে ডাইনে ও বামে খানিকটা সম্প্রসারিত করা হতো, তবে বহুল ব্যবহারের পথ আরও সুগম হতো।

আমাদের দেশের যেসব সাংবাদিক বিদেশের কাগজ বা গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত কিংবা বিদেশী সংবাদদাতা ও গণমাধ্যমের অন্যান্য প্রতিনিধি যাতে প্রয়োজনে প্রেস ক্লাবেই তাদের সংবাদ প্রেরণের সকল কারিগরি সহায়তা পেতে পারে, তার আধুনিকতম ব্যবস্থা এই ক্লাব ঘরেই হতে পারে। তা হলে বিরাট সংখ্যক দেশী-বিদেশী সাংবাদিককে বাইরে ছুটতে হতো না। উপার্জনও হতো।

যেহেতু সাংবাদিকগণ নিজেদের প্রয়োজনে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে, তারাই উপলব্ধি করেছিলেন প্রেস ক্লাবের। তাই ব্রিটিশ আমলের পুরনো

www.pathagar.com

একটি বাড়িতে প্রেস ক্লাব গড়ে উঠেছিল সামাজিক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর কোনও তুলনা সম্ভব ছিল না এবং আজও নেই। পেশাভিত্তিক সংগঠন। সাংবাদিকদের আড্ডাস্থল। তাস খেলার জায়গা। দাবাও চলতো দারুণভাবে। সবার এক সঙ্গে বসা ছিল এই ক্লাবের প্রধান আয়োজন। কিন্তু কেবলি বিনোদনের উদ্দেশ্য ছিল না।

ক্লাব বোধহয় বলতো, কোনও রাজনীতির সঙ্গেই জড়িয়ে ফেলবে না নিজেদের। রাজনীতিকে প্রশ্রয়ও দিতে চাইত না নিজেদের কাজে এবং কেউ এর মধ্যে রাজনীতি ঢোকাক, ভাবতোও না। কিন্তু এই দেশের নাম যখন 'পূর্ব পাকিস্তান' ছিল, তখন না চাইলেও কিছু রাজনৈতিক বিষয় তো প্রেস ক্লাব চত্বরে ঘটেই যেত। তখন থেকে বহু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সংগ্রামের সূচনা হয়েছে। সংবাদপত্র সংক্রান্ত প্রেস শ্রমিক, সাধারণ কর্মচারী ও সাংবদিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই ক্লাবই। কত না মিছিল, বিক্ষোভের শুরু এইখান থেকেই হয়েছে। শুধু কি তাই, একসময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের কাছে এই প্রেস ক্লাব ছিল 'অভয়স্থান' (অভয়ারণ্য বললাম না)।

এই সেই প্রেস ক্লাব, ১৯৬৭ সালে খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে যখন আমাদের সাহিত্য থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করেছিল এবং পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করতে দ্বিধা করেনি– তখন এই প্রেস ক্লাবকে ঘিরে আমরা প্রথম প্রতিবাদ জমায়েত ডেকেছিলাম সেকালের প্রগতিশীল সংস্কৃতি সংগঠন 'ক্রান্তি'র পক্ষ থেকে। শ্রদ্ধেয় দু-একজন আমাদের উদ্যোগকে রাজনীতির ব্যাখ্যায় ফেলে মিটিং যাতে করতে না পারি, তার চেষ্টাও করেছিলেন। এমনকি প্রেস ক্লাবের তখনকার সাধারণ সম্পাদককে অনেকে কনভিন্সও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দু'জন সিনিয়র সাংবাদিক ক্লাব সদস্যের হস্তক্ষেপে আমরা অনুমতি পেয়ে গেলাম। শুধু তাই নয় আমরা তো সভা করবোই, আর যারা বিরোধিতা করছিলেন তারা তাদের নির্ধারিত স্থানে বৈঠক করবেন। তারপর দুই পক্ষ এক হয়ে যৌথ কমিটি গঠন করবে। এবং তারা সবাই মিলে যৌথ কর্মসূচী পালন করবে। হলোও তাই। প্রেস ক্লাবের লাউঞ্জে বসে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' গঠিত হলো। এই পরিষদ দীর্ঘ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য ও নাটকের আয়োজন করেছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। অভাবিতপূর্ব দর্শক সমাগম ঘটলো। দেখে মোনেম খাঁর তো চক্ষু চড়ক গাছ। শেষ দিনে তাই আইয়ুব খাঁর বংশবদ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খাঁ দুই ট্রাক ভর্তি গুণ্ডা পাঠালো এই অনুষ্ঠানকে ভণ্ডুল করার জন্যে। এইসময় গোটা আন্দোলন ও অনুষ্ঠানাদির সমন্বয় কেন্দ্র ছিল এই প্রেস ক্লাব।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, ষাটের দশকে বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই প্রেস ক্লাব। তার মধ্যে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাংবাদিক ধর্মঘট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচী, পাক-ভারত যুদ্ধ, রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র; '৬৭ থেকে '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের রাক্ষুসী ঘূর্ণিঝড়। আর এ

www.pathagar.com

সবকিছুরই পরিণতিতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। যেহেতু সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যালয় এই প্রেস ক্লাবেই ছিল, তার কারণে ইউনিয়নের সকল কর্মসূচীই এখান থেকেই শুরু হতো এবং শেষ হতো এখানেই। রাজনৈতিক আন্দোলনে পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীর হঠাৎ হামলা, মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ কিংবা গুলিবর্ষণের ঘটনা হরহামেশাই হতো, তাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিতেন এই প্রেস ক্লাবেই। কারণ পুলিশ এখানে সহজে ঢোকার সাহস পেতো না।

এই ষাটের দশকেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের গণবিরোধী সরকার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে রুদ্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে যে আইন জারি করেছিল, সারা পাকিস্তান তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করেছিল। সে আন্দোলন ১৭ দিনব্যাপী পাকিস্তানের সকল সংবাদপত্র বন্ধ ছিল। শুধু বন্ধই থাকেনি– দেশবাসী সকলের সহমর্মিতাও অর্জন করেছিল এবং মালিক কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়েছিল। একবার তো এই আন্দোলনে আমাদের উপলব্ধি খানিকটা পাল্টেও গেল। আগে যেখানে আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতাম, ওই সময় থেকে আমাদের দাবি পেশাভিত্তিক স্লোগানে উচ্চারিত হলো। আমরা বললাম, সাংবাদিকতার স্বাধীনতা চাই। মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। কলমের স্বাধীনতা দিতে হবে। সঙ্গে বেতন বোর্ড, বেতনবৃদ্ধি, রোয়েদাদ ঘোষণা করলেই চলবে না, এর বাস্তবায়নেরও আমরা দাবি তুলেছিলাম।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার বিরুদ্ধে যে মিছিল বের হয়েছিল, আমর তো মনে হয় এত বড় মিছিল বোধহয় পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ আমলে আর বেরোয়নি। এই ঐতিহাসিক বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা মালিক-সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালাম, দৈনিক ইত্তেফাকের মালিক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং দৈনিক সংবাদের আংশিক মালিক ও সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার নিউজ এডিটার এ বি এম মূসা'র খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে। এই মিছিল প্রেস ক্লাব থেকে বেরিয়ে বায়তুল মোকাররম পেরিয়ে নবাবপুর দিয়ে সদরঘাট, সেখান থেকে চকবাজার হয়ে কেন্দ্রীয় জেলের সামনে দিয়ে শহীদ মিনারে না গিয়ে কার্জন হলের পাশ দিয়ে আবার প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয়েছিল।

১৯৭১ এর মার্চ মাসে তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণে গিয়ে ঢাকার সাংবাদিকদের যেভাবে হেনস্তা হতে হয়েছিল, তারই প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ঢাকার এই প্রেস ক্লাবে বসেই কার্যকরী সংসদের বৈঠকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনও সংবাদ তখন থেকে কভার না করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মার্শাল ল' প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খানের জনসংযোগ অফিসারকে নিয়ে এসে আমাদের কনভিন্স করতে পাঠানো হয়েছিল। ফল হয়নি তাতে।

www.pathagar.com

আমি তখন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের (ইপিইউজে) সাধারণ সম্পাদক। মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান পার্লামেন্টের বৈঠক যখন বাতিল করে দিল প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এক আকস্মিক ঘোষণায়, তখন সারা বাংলাদেশ পরিণত হলো গনগনে আগুনের এক চুল্লিতে। সাংবাদিক ইউনিয়ন বের করলো প্রতিবাদ মিছিল। পুরো ভাগে ছিলেন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কে জি মুস্তাফা। বিশাল মিছিল ঢাকা প্রদক্ষিণ করে ফিরলো ক্লাবে।

এই প্রেস ক্লাবে বসে সেদিন আমরা সকল দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। যেহেতু সরকার কিংবা তার প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তখন যেন সাংবাদিদের উপর অযথা হামলা না হয়, তার জন্যে সাংবাদিক ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি বিশেষ আইডেনটিটি কার্ড চালু করেছিল এবং সরকারী নির্যাতনের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। যত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন, সাংবাদিক ইউনিয়ন হয়তো কোনও চ্যালেঞ্জ বা সরাসরি মোকাবেলার সম্মুখীন হয়নি, কিন্তু ঢাকার এই প্রেস ক্লাবকে প্রচণ্ড হামলার শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে প্রেসক্লাবের উপর মর্টার হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। হত না হলেও আহত হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ। কারণ তিনি তখন সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সর্বাধিকারী ও স্বত্বাধিকারীও। তিনি নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করেছিলেন এই প্রেস ক্লাবকে। এছাড়া তিনি ক্লাব অন্তপ্রাণ ছিলেন। কর্মচারীদের মধ্যেও বোধহয় দু-একজন জখম হয়েছিলেন।

ঢাকা প্রেস ক্লাবের একটি দারুণ রাজনৈতিক চরিত্র ছিল। যদিও তারা অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই নিজেদের জাহির করতেন। আমার ধারণা, 'অরাজনৈতিক' বলে কোনও জিনিশের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই নেই। শব্দটি পাল্টে 'নির্দলীয়' শব্দটি ব্যবহার করা যায় এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। এই প্রেস ক্লাব সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। সকল ক্ষমতাসীন দলকে ঘৃণা করেছে। প্রশাসনের বেপরোয়া হানা-মামলার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু এই প্রেস ক্লাবের অতীত গৌরবের সঙ্গে জুড়ে আছে কিছু অহঙ্কার। যেমন, প্রেস ক্লাব নানা অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে অনেকসময় জরাজীর্ণ কিংবা নিদারুণ অস্বচ্ছলতায় ভুগেছে, কিন্তু ক্ষমতার দাপটকে সামান্য প্রশ্রয় দিলেই 'অঢেল প্রাপ্তি' গলগলিয়ে প্রেস ক্লাবকে সুকুমারমণ্ডিত করতে পারতো, তবুও আত্মসমর্পণ করেনি। আত্মবিক্রয় করেনি। আহা রে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান পাকিস্তানকালে কত না চেষ্টা করেছিলেন একবার এই প্রেস ক্লাবে আসতে! কিন্তু ক্লাব পরিচালকদের দৃঢ় মানসিকতার জন্যে কোনওদিন 'তদীয় পদধূলি' দিতে পারেননি। বাংলাদেশ হবার পর একই পরিণতি ঘটেছিল জেনারেল এরশাদের ভাগ্যেও। তিনি কৌশলে এই ক্লাবের আঙিনায় ঢুকতে চেয়েছিলেন। ঢুকতে দেয়া হয়নি। সমরশক্তির কী বৈভবেই না তিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বেচ্ছাচারিতার চরম প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই দেশে। তাকে কেনই বা ঢুকতে দেয়া হবে? এরশাদ লোভ দেখিয়েছিলেন কত না ভাবে, তবুও বরফ গলেনি। অথচ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এই প্রেস ক্লাব যেন আন্দোলনের অঘোষিত দফতরে কিংবা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছিল। হাসিনা-খালেদা কতবার যে ঢুকেছেন এখানে, তার বোধহয় হিসেব ছিল না। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মনে হয় শেখ মুজিবুর রহমান অসংখ্যবার এই ক্লাবে এসেছিলেন আন্দোলনের সময় কিংবা সংগ্রামে পুলিশী হামলার শিকার হয়ে।

১৯৬৩ সালের ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ বাংলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটেছিল। অসহায় মানুষ নিরন্ন জীবনযাপন করছিলেন হাপিত্যেশ করে। গোটা পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্গত মানুষের আর্ত সেবায়। আমি তখন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক। সবে জেল থেকে বেরিয়েছি। উদ্দীপনার সামান্যতম ঘাটতি নেই। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট', তারও দায়িত্ব বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সুতরাং পরিণতিতে আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের কর্মোদ্যোগকে কাজে লাগানোর জন্যে 'ছায়ানট' ভিক্ষা মিছিলের মাধ্যমে সাহায্য হিসেবে অর্থ ও বস্ত্র এবং খাদ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিল। মনে আছে, প্রেস ক্লাব আমাদের কী উদার সহযোগিতাই না সেদিন দিয়েছিল। ছায়ানটের আহ্বানে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, শিল্পী-সাহিত্যিক অনেকেই সেদিন ছায়ানটের ছেলেমেয়ে ও অভিভাবক-কর্মকর্তাদের মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। প্রতিদিন প্রেস ক্লাবে সবাই সমবেত হতাম। আর ক্লাব থেকে বেরুতো মিছিল– কণ্ঠে ছিল সবার 'ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী'। অনন্য এ আহ্বানে মানুষ কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজ তা যারা এই সাহায্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছেন, তারা বুঝবেন। মিছিল শেষে আমরা সবাই ফিরে আসতাম এই প্রেস ক্লাবেই এবং কি পেলাম তার হিসেব মিলিয়ে দেখতাম। শুধু কি তাই, প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ কত, তাও সেই দিনই সংবাদপত্রে প্রচার করা হতো।

এই ক্লাবের সামনেই ছিল ইউএসআইএস লাইব্রেরি। তোপখানা থেকে সেগুনবাগিচা, ঢুকতেই ডান হাতের কোণায় ছিল এই মার্কিন তথ্য দফতর। রাজপথের ধারেই এই ভাড়াটে বাড়িতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানকে তাই প্রায়শই ইট-পাটকেল খেতে হতো। মুক্তিযুদ্ধ শেষেও এই ভবনটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই লাইব্রেরিই। ১৯৭৩ সাল। ভিয়েতনাম দিবসে এলো মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল। ছাত্র ইউনিয়ন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন দেশ শাসনকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অন্তরঙ্গ সহযোগী। এ সত্ত্বেও ঘটেছিল এক নির্মম ঘটনা। মিছিলের উপর চললো গুলি। প্রাণ দিলেন মতিউল-কাদের। অবাধ্য হয়ে উঠলো মিছিল। এমন পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে ভেবে প্রাক্তন ছাত্রনেতা প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদকে পাঠানো হলো পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে। কিন্তু হিতে বিপরীতে হলো। শেষ পর্যন্ত তোফায়েলকে সচিবালয়ে ফিরে যেতে হলো এই ক্লাবেরই পেছন দিয়ে। তিনিও সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন এইখানেই।

এছাড়া কত না মানুষ মনের দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা-যন্ত্রণা জুড়াবার জন্যে ছুটে আসেন এইখানে। এখানে আসেন, কারণ এ ক্লাব সাংবাদিকদের। সুতরাং সাংবাদিকের কাছে মনের কষ্ট, বঞ্চনা, দুর্ভোগ, অবহেলা কিংবা প্রার্থিত বিচারের অযথা বিলম্ব, অথবা অবিচার, অন্যায়,

www.pathagar.com

দুর্নীতি ইত্যাকার নানা ধরনের অভিযোগ এই সাংবাদিককুলকেই জানাতে আসেন নাচার মানুষ।

সেদিনের প্রেস ক্লাব আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে রূপ নিয়েছে। সেদিন মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে এ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সহস্রাধিক মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রদেশের প্রেস ক্লাব। কিন্তু আজ সেই ক্লাবই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত। বিশাল অট্টালিকা উঠেছে প্রাচীন বাংলোটার ধ্বংসস্তূপের উপর। কর্মতৎপরতা বেড়েছে উপার্জনের দিকে। কিন্তু দায়িত্বশীল একটি পেশার সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতটা কর্তব্য পালন করতে পারছে; তার হিসেব করে দেখা উচিত কর্তৃপক্ষের।

লেখক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক ও অধুনালুপ্ত দৈনিক বার্তার সম্পাদক

www.pathagar.com

স্মরণ করি

সিরাজুল হোসেন খান

প্রায় পঞ্চাশ বছর। অর্ধ শতাব্দীরও উপর। মনে হয় সেদিনকার ঘটনা। অবশ্য, অতি স্মরণীয় ঘটনা। ঢাকা প্রেস ক্লাব, বর্তমানের জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার কথা বলছি। বলতে হয়, প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা যেন ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক সম্প্রদায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ব্যক্তিগতভাবে একজন সাংবাদিক ব্যক্তিই বটে। কিন্তু সকল সাংবাদিককে নিয়ে গোটা সাংবাদিক সম্প্রদায় একটি অবিচ্ছিন্ন দেহ। সে দেহেরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রেস ক্লাব স্থাপনার মধ্য দিয়ে। প্রেস ক্লাব উদ্বোধন উৎসবের বিভিন্ন কথা আজও মনে পড়ে। তবে, সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে যে বাড়িটিতে ক্লাব উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রিয়া-কর্ম শুরু হয়ে যায়, সেই উঁচু অনিন্দ্যসুন্দর দোতলা বাড়িটির ছবি। সে ছবি আজও হৃদয়পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। লাল ইটের গড়া লাল টালির ছাউনি, প্রশস্ত বারান্দা এবং চারদিকে খোলা জায়গা ও ফুলের গাছসহ বিভিন্ন গাছ-গাছড়া। এ যেন ছিল একটা বাগানবাড়ি। পাশে ছিল এবং এখনও আছে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয়, যাকে বলা হতো এবং এখনও বলা হয় ইডেন বিল্ডিং। এ বিল্ডিংটি নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে, ইডেন গার্লস স্কুল ও কলেজের জন্যে। সেখানে স্কুল ও কলেজ বছর-দুই হয়েওছিল। তারপর ঘটে ইংরেজ শাসনের অবসান, ভারতবিভাগ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান ও ভারত দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

পূর্ববঙ্গ ছিল পাকিস্তানভুক্ত একটি প্রদেশ। যদিও পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শিক যে ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের 'লাহোর প্রস্তাব', তদনুযায়ী পূর্ববঙ্গ একটি আলাদা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল। কেন হয়নি এবং কেনই-বা প্রায় দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে সেই পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানকে হতে হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ, তা এক ভিন্ন কাহিনী ও দীর্ঘ ইতিহাস। সে কাহিনী প্রাসঙ্গিক না হলেও এতটুকু প্রাসঙ্গিক যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা প্রেস ক্লাব বা পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় প্রেসক্লাব। তার পরিচিতি তাই জাতীয় প্রেস ক্লাব। আবারও বলবো, অভিজ্ঞ স্থপতিদের পরামর্শ নিয়ে প্রেস ক্লাবের সেই পুরাতন লাল দালানটিকে ধরে রেখে এবং তাকে কেন্দ্র করে নতুন বৃহদাকারের ভবন নির্মাণ করলে যে বাড়িতে প্রেস ক্লাব বা সাংবাদিক সম্প্রদায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা সজীব থাকতো এবং প্রেস ক্লাবের অতীত ইতিহাস চিরদৃশ্যমান

www.pathagar.com

থাকতো। প্রসঙ্গ এখানেই থাক।

বলা প্রয়োজন, প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে সাংবাদিক সম্প্রদায় শুধুমাত্র প্রাণ পেয়েছিল তা নয়, গোটা দেশবাসীই প্রেস ক্লাবকে অতি আপন বলে দেখতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। এখনও হয়তো করেন, তবে কতটুকু করেন তা আমার পক্ষে পরিমাপ করার কোনও উপায় নেই। তবে জনসাধারণের মনের যতটুকু খবর রাখি, তা দিয়ে অনুমান করা যায় প্রেস ক্লাব নিয়ে আগের শ্রদ্ধাবোধ তেমন নেই। কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, সাংবাদিকতার মান আগের চেয়ে এখন কমেছে এবং সাংবাদিকতায় ও সংবাদপত্রের সততায় ঘাটতি পড়েছে।

প্রেস ক্লাব জনগণের কাছেও যে দেশ ও জাতির জন্যে প্রাণকেন্দ্র ছিল, সে সম্পর্কে দু-একটি ঘটনার বিবরণ দিলেও বোঝা যাবে। বলে রাখা ভালো, এ ঘটনাগুলো এ দেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস গঠনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তার প্রভাব ফল্গু নদীর প্রবাহের মত আজও বয়ে চলেছে। শুধুমাত্র অনেকেই তা দেখছেন না বা অনুভব করছেন না। অন্তত অনুভব করতে পারলে মঙ্গল হতো।

প্রেস ক্লাব নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গেলে অনেক কথা ও অনেক কাহিনী মনে পড়ে। তার মধ্যে আছে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রেস ক্লাব পরিচালনার বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রেস ক্লাবের সঙ্গে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্কের কাহিনী। প্রথমে দু-একটি National Event বা জাতীয় ঘটনার স্মৃতিচারণ করবো।

১৯৬৩ সাল শেষ হয়ে আসছে। জানা গেল, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির শুরু থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর পরিকল্পনা চলছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব তার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন। অতি বিশ্বস্ত সূত্রসমূহ থেকে এও জানা গেল যে, আইয়ুব খান কিছু সংখ্যক বৃহৎ শিল্পপতির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন এই বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থীদের নেতৃত্বে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমাজ পরিবর্তনের রাজনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করছে। তা ঠেকাতে হবে। এবং ঠেকাতে হলে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বেলে দেয়া। তার চিহ্নিত উপদেষ্টাগণ আইয়ুবকে উগ্র উপদেশ দিয়েছেন যে, 'Communism has to be resisted by communalism'। সে তত্ত্বকথা গ্রহণ করে আইয়ুব খান দৃঢ় পদে এগিয়ে গেলেন। তখনকার রাজনৈতিক পটভূমিও তাকে সহায়তা করলো। সে কথা পরে বলছি।

আইয়ুব খান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে তিনটি প্রধান শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে সে দাঙ্গা শুরু করানো হবে এবং একই সঙ্গে দেশব্যাপী তার বিস্তার ঘটানো হবে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিক্টেটর আইয়ুব তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠালেন। একজন গেলেন চট্টগ্রাম এবং আরেকজন খুলনায়। ঢাকার শিল্পাঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খাঁকে। দাঙ্গা বাঁধানো এবং পরিচালনা ও প্রসারের জন্যে তাদের প্রত্যেককে অনেক লক্ষ টাকা দেয়া হলো। সে টাকা ছিল শিল্পপতিদের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা। চট্টগ্রাম শিল্পাঞ্চলে দাঙ্গা বাঁধানো মোটেও

www.pathagar.com

সম্ভব হলো না। কারণ, সেখানে সর্বত্র শ্রমিকগণ ছিলেন প্রগতিশীল নেতৃত্বে সংগঠিত ও অতি শক্তিশালী। এক কথায় বলা যায়, আইয়ুবশাহী সেখানে কোনও দাঁত ফোটাতে সমর্থ হলো না। ঢাকার শিল্পাঞ্চলেও এমনি সংগঠিত শ্রমিক নেতৃত্বের কারণে দু-একটি ছোটখাট ঘটনা ছাড়া কোনও দাঙ্গা বাঁধানো সম্ভব হলো না। খুলনা শিল্পাঞ্চলে ক্ষুদ্র আকারে হলেও বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কিছু দাঙ্গা ঘটে গেল।

কিন্তু ঢাকায় দাঙ্গা শুরু করা হলো অবাঙালী লোকজনদের টাকা-পয়সা দিয়ে সংগঠিত করে ও বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র সরবরাহ করে মোহাম্মদপুর এলাকায় স্থানীয় সাধারণ মুসলমানদের ওপর আঘাত করে এবং ওয়ারী এলাকায় স্থানীয় হিন্দুদের বাড়িতে চড়াও হয়ে। এমনি পরিস্থিতিতে অবস্থার যখন দ্রুত অবনতি হচ্ছে, তখন মোহাম্মদপুর থেকে সাংবাদিক বন্ধু ও বিশ্ব শান্তি পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক আলী আকসাদ আমাকে ফোন করলেন সকাল ন'টার দিকে। সে মুহূর্তে আমি ছিলাম প্রেস ক্লাবে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন (EPUJ) অফিসে। ইপিইউজে'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেখানে আমি ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আলী আকসাদের ফোন পেয়ে প্রেস ক্লাবে উপস্থিত কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু ও টেলিফোনে ইউনিয়নের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ওইদিনই ঢাকায় উপস্থিত বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের নিয়ে প্রেস ক্লাবে সকাল এগারোটায় এক বৈঠক হবে দাঙ্গা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে। আমি প্রেস ক্লাব থেকে তৎক্ষণাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য জনদের সে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে টেলিফোনে জোর অনুরোধ জানালাম। প্রায় সবাই বললেন, এক্ষুণি আসছি। বেশ কয়েকজন প্রেস ক্লাবে এলেনও। হঠাৎ এগারটার দিকে ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাই আমাকে ফোন করে বললেন, 'সিরাজ সাহেব, ইত্তেফাক অফিসে আতাউর রহমান খান (পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), শেখ মুজিবুর রহমান, শাহ্ আজিজুর রহমান (পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে আওয়ামী লীগের গ্রুপ নেতা) এবং আরও বেশ কয়েকজন চলে এসেছেন। তারা অনুরোধ করছেন, এখনকার বৈঠকটা ইত্তেফাক অফিসে হয়ে যাক।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তা হতে পারে।' তখন প্রেস ক্লাবে নেতৃবৃন্দ যারা ছিলেন, তারাসহ আমরা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক সেখানে চলে গেলাম। মিনিট দশেক পর বৈঠক শুরু হলো।

আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। বিশদ আলোচনার প্রয়োজনও ছিল না। সিদ্ধান্ত হলো, এ বৈঠকেই 'পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হবে। কমিটি হলো। প্রশ্ন উঠলো কাকে কমিটির আহ্বায়ক বা সভাপতি করা হবে ও কাকে সেক্রেটারি করা হবে। নেতৃবৃন্দ এক বাক্যে বললেন, এ বৈঠক ও কমিটি গঠিত হয়েছে সাংবাদিকদের এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে। তারাই বলবেন কমিটি পরিচালনার জন্যে কে কি হবেন। তখন দৈনিক পাকিস্তানের (পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা) ম্যানেজিং এডিটর আলী আশরাফ বললেন, 'আমাদের পক্ষ থেকে সিরাজ সাহেব যা বলবেন, তা-ই আমাদের কথা।' আমি তখন কয়েক মিনিট সময় চেয়ে কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলাম যে, সবচেয়ে প্রবীণ ও সর্বশ্রদ্ধেয় আতাউর রহমান খান সাহেবকে কমিটি প্রধানের দায়িত্ব দেয়া সমীচীন। তবে,

www.pathagar.com

দাঙ্গা প্রতিরোধে যে কাজ, তা বয়সের দিক দিয়ে আতাউর রহমান সাহেবের জন্যে হবে খুবই কষ্টকর। এ কাজে শেখ সাহেবকে আহ্বায়ক করলেই মনে হয় ভালো হবে। আমরা একমত হলাম, আমাদের আলোচনা হলো প্রায় তিন মিনিট। বৈঠকে বললাম, সব দিক বিবেচনা করে আমাদের মত হচ্ছে শেখ সাহেবকে আহ্বায়ক করা যায়। আমার সে প্রস্তাব গৃহীত হলো। তখন প্রশ্ন উঠলো, সেক্রেটারি কে হবেন? নেতৃবৃন্দসহ সবাই বললেন, এ বিষয়ে কোনও আলোচনা ছাড়াই বলা যায় সিরাজ সাহেবকে সদস্য সচিব হতে হবে। আমি রাজি হলাম এই শর্তে যে, সদস্য সচিব হিসেবে আমার নাম অঘোষিত থাকবে। এবং তাই-ই ছিল। প্রায় সোয়া বারোটার দিকে বৈঠক শেষ হলো। সিদ্ধান্ত হলো নবগঠিত দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বিকেল চারটায়, প্রেস ক্লাবে। কথা উঠলো আজই একটা অফিস ঠিক করতে হবে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এক্ষুণি করা যাবে। চলেন তোপখানা রোডে যাই। অফিস হবে প্রেস ক্লাবেরই অতি সন্নিকটে।' শেখ সাহেবসহ আমরা কয়েকজন তৎক্ষণাৎ তোপখানা রোডে এসে বিশিষ্ট দুই প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা আহমদুল কবির ও সাঈদুল হাসান সাহেবদের ৩২ নম্বর তোপখানা রোডস্থ অফিসের এক অংশে 'পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'র অফিস স্থাপন করলাম।

ওইদিনই বিকেল চারটায় প্রেস ক্লাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির বৈঠক বসলো। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ছাত্র ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ। তিনটি সিদ্ধান্ত হলো: দেশবাসীর প্রতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচারপত্র ওইদিনই ছাপতে হবে এবং তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচারপত্রের খসড়া করার জন্যে পূর্বাহ্নেই বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীকে অনুরোধ করে রাখা হয়েছিল। সভায় তিনি খসড়া উপস্থিত করলেন। তা গৃহীত হলো। সে প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও'। ওইদিনই রাত আটটার ভিতর সে প্রচারপত্রের এক লক্ষ কপি কয়েকটি প্রেস থেকে ছাপা হলো। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ও শিল্পাঞ্চলে ওই রাতেই বিলি শুরু হয়ে গেল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার ৪টি দৈনিক– ইত্তেফাক, সংবাদ, আজাদ ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লাল ব্যানার হেডলাইনে ওই প্রচারপত্রটি হুবহু ছাপা হলো। সে এক অভাবনীয় ঘটনা ও তার শুভ ফলও হয়েছিল অপরিসীম। ওই ৪টি জনপ্রিয় দৈনিকে দাঙ্গা প্রতিরোধের আহ্বান দেখে সারা দেশ যুগপৎ চমকে উঠলো ও জেগে উঠলো। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারা দেশব্যাপী দাঙ্গা প্রতিরোধের আবহ সৃষ্টি হলো।

দুই নম্বর সিদ্ধান্ত হলো যে, রাজনৈতিক দলসমূহসহ সকল সংগঠন নিজ নিজ সাংগঠনিক শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেশব্যাপী দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্যে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সে কাজও ওইদিনই রাত থেকেই শুরু হয়ে যায়। তিন নম্বর সিদ্ধান্ত হলো যে, পরদিন সকাল দশটায় 'পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি'র অফিসের সামনে থেকে একটি শান্তি মিছিল বের করা হবে। মিছিল শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে তার রাস্তা বলে দেয়া হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেশ বড় এবং জঙ্গী মিছিল হলো। মিছিলটি যখন তোপখানা রোড, গুলিস্তান রোড পার হয়ে তৎকালীন গভর্নর হাউসের (বর্তমান বঙ্গভবন) পাশ দিয়ে যাচ্ছিল,

www.pathagar.com

তখন তৎকালীন রেল লাইনের অপর পারে ঠাটারী বাজারের দিক থেকে কিছু সংখ্যক অবাঙালী লোক লাঠিসোটা ও দা নিয়ে মিছিলটিকে আক্রমণ করতে আসে। তারা যখন ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে, তখনই মিছিল থেকে অনেক লোক তাদের ধাওয়া করলে তারা পিছু হটে যায়। মিছিলটি তখন ইত্তেফাক অফিসের পাশ দিয়ে হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি ও রেললাইন অতিক্রম করে ওয়ারীতে প্রবেশ করে। সেখানে কিছুদূর গিয়েই দেখা যায়, দাঙ্গাকারীদের দল একটি দোতলা হিন্দুবাড়ি আক্রমণ করেছে। মিছিল থেকে লোকজন তাদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়, এবং সে বাড়ি ও পরিবারটি বেঁচে যায়। সম্মুখ দাঙ্গা প্রতিরোধের এ ঘটনা ও তার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ার সারা দেশব্যাপী এক শুভ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির কাজ চলে প্রায় সার্বক্ষণিক। কমিটির বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি দেশবাসীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দাঙ্গা থেমে যায়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বান ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাঁড়াও'। বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সে দাঙ্গা রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং রুখে দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলবো যে, বাংলাদেশের মানুষ কখনও সাম্প্রদায়িক ছিল না এবং এখনও নয়। যদি কেউ দু-একটি ঘটনার কথা বলেনও, তবে বলবো সে হচ্ছে ব্যতিক্রম এবং নগণ্য। অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল, এ দাঙ্গা প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে দেশটিকে সাম্প্রদায়িক কলুষতামুক্ত রাখা হয় এবং তার প্রভাব আজও বাংলাদেশে বয়ে চলেছে। আজকাল যে 'সাম্প্রদায়িক, সাম্প্রদায়িক' বলে চিৎকার করা হয়, তা প্রকৃতই সাম্প্রদায়িকতা উস্কিয়ে দেয়ার এক কৌশল বটে।

সামরিক শাসক আইয়ুব খান যে বৃহদাকারের দাঙ্গার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটিও অতি সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব 'My Constitution' শিরোনামে সামরিক আইন বলে পাকিস্তানের একটি শাসনতন্ত্র জারি করেন। তাতে জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকার বিলুপ্ত করে সরকারের খাঁচায় আবদ্ধ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার করে মোট আশি হাজার Basic Democrats কর্তৃক নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সহায়তায় ওই একই BD কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। গঠন করা হয় National Democratic Front অতি দ্রুত সে আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র আকার ধারণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও তার ঢেউ গিয়ে লাগে। তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেজামী ইসলাম প্রধান ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জামাতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, সীমান্ত গান্ধী গফফার খানের পুত্র ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান ও সিন্ধুর সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জিএম সৈয়দ NDF-এ যোগদান করেন। কিন্তু NDF যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেহেতু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যোগদান করার পর তার নামকরণ করা হয় Pakistan Democratic Movement। সারা পাকিস্তান জুড়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন জঙ্গী

www.pathagar.com

আকার ধারণ করেছে, তখন ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরের ৩ তারিখ লেবাননের রাজধানী বৈরুতে চিকিৎসারত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দুঃখজনক মৃত্যু ঘটলে সে আন্দোলনে কিছুটা ছেদ ঘটে। এবং তখনই শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ NDF বা PDM ত্যাগ করে। এর বিরোধিতা করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ কয়েকজন প্রবীণ নেতা আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। স্বভাবতই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন বিভ্রান্ত হয়ে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে আইয়ুব খান তখন পূর্বোক্ত মহাদাঙ্গার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সম্মিলিত ফ্রন্ট ত্যাগের কারণে শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি যে ক্ষুণ্ন হয়েছিল, তার বেশ কিছুটা পুনরুদ্ধার হয় পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির সফল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

বলে রাখা দরকার, এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওই দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল প্রেস ক্লাবে এবং তার ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিও ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব ও পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন। বলা বাহুল্য, ওই দাঙ্গা প্রতিরোধের গৌরব আজও জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং সাংবাদিক সম্প্রদায় ধারণ করে আছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি উপলক্ষে এ গৌরবগাথাটি তুলে ধরছি।

ঢাকার প্রেস ক্লাবকে ঘিরে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করবো। আইয়ুব খান তার দাঙ্গা বাঁধানোর পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার মাস দুই পর সমগ্র পাকিস্তানে সংবাদপত্র দলনের এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার সরকার তখন Press and Publications Ordinance নামক একটি আইনের খসড়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তৎক্ষণাৎ সর্বত্র, বিশেষ করে সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কে জি মুস্তাফা, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান (লেখক) এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় ঠিক করেন যে, এর বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সেমতে, ইপিইউজে'র নির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে ইউনিয়নের এক সাধারণ সভায় আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। সে মর্মে পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন দেশব্যাপী প্রেস ফ্রিডম রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে অতি দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হয়। দুই দিনের মধ্যে ইপিইউজে'র জরুরি সাধারণ সভা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র এবং বার্তা সংস্থার অফিস থেকে মিছিল করে সাংবাদিক এবং অন্যান্য সংবাদকর্মীগণ সে সভায় উপস্থিত হন। ওইদিন তিন ঘন্টার জন্যে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র অফিসে কাজকর্ম বন্ধ থাকে। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রত্যেক সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার অফিসে ইপিইউজে'র ইউনিটসমূহের সাধারণ সভা হবে এবং সে সভার কার্যবিবরণী সংবাদপত্রে ছাপানো হবে ও বার্তা সংস্থা টেলিপ্রিন্টারে পাকিস্তানব্যাপী সে সংবাদ প্রচার করবে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের গোটা সাংবাদিক সম্প্রদায় ও সংবাদকর্মীগণ সাত দিনের মাথায় ঢাকা প্রেস ক্লাব থেকে একটি মিছিল বের করবেন। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নকে সারা পাকিস্তানব্যাপী সাংবাদিকদের কালো ব্যাজ ধারণ

www.pathagar.com

করার নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ করা হয়। মোট কথা, প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ওই জরুরি সাধারণ সভায় প্রেস ফ্রিডম আন্দোলনের একটি ছক কেটে দেয়া হয়। পিএফইউজে, বিশেষ করে সভাপতি সফদর কোরেশী ইপিইউজে'র প্রস্তাবনাসমূহের প্রতি দ্রুত সাড়া দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহকে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং লিখিত নির্দেশাবলী ও কর্মসূচী প্রদান করেন।

ইপিইউজে'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাত দিনের মাথায় ঢাকায় প্রেস ক্লাব থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে মিছিল সংগঠিত হয়, তা ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সকল সংবাপত্র ও সংবাদ সংস্থা অফিস বন্ধ ছিল। প্রত্যেক অফিস থেকে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল সহযোগে প্রেস ক্লাবে সমবেত হন। মফস্বল সাংবাদিকদের পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতিও ওই মিছিলে যোগদান করে। তারাও ইতোপূর্বে প্রেস ফ্রিডম আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

মিছিলটি যাত্রার পূর্বে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এক বড় সমাবেশ হয়। সে সমাবেশে মিছিল কোন দিক দিয়ে যাবে, কিভাবে যাবে ইত্যাদি বলে দেয়া হয়। মিছিল সাজানোর ক্ষণিক পূর্বে ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম এবং আরও অনেক প্রবীণ সাংবাদিক মিছিলে যোগদানের জন্যে উপস্থিত হন। তখনকার সংবাদপত্র জগতের সর্বজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও সম্পাদক স্বনামধন্য মওলানা আকরম খাঁ যখন মিছিলে যোগদানের জন্যে প্রেস ক্লাবে উপস্থিত হন, তখন সমবেত সকলে তাঁকে হাততালি দিয়ে সংবর্ধনা জানান।

মিছিল দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে-মাঝে বিরাট বিরাট ব্যানার। সম্মুখভাগে রিকশায় বসে মওলানা আকরম খাঁ। হেঁটে চলেছেন সর্বাগ্রে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, সালাম সাহেব। বিরাট মিছিল। তোপখানা রোড, গুলিস্তান বাণিজ্যিক এলাকা ঘুরে আবার তোপখানা রোড দিয়ে প্রেস ক্লাবে এসে মিছিল শেষ হয়। মিছিলের এই সারাটি পথ সাধারণ মানুষ দু' পাশে দাঁড়িয়ে হাততালি দেয় ও মিছিলটিকে অভিনন্দন জানায়। সারা পথ স্লোগানে স্লোগানে হয় মুখরিত। দর্শকদের অনেকেও স্লোগান ধরেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সংবাদ জগতের মানুষদের সাহসী মিছিল ও সাহসী পদক্ষেপ সারা দেশে এক জাগরণ এনে দেয়।

এমনি এক জাগরণের প্রয়োজনও ছিল। কারণ, স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন তখন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর সাংবাদিক মিছিল হতে থাকে পাকিস্তানের সর্বত্র। নগরে নগরে, শহরে শহরে। সাংবাদিকদের সে আন্দোলনে সারা পাকিস্তান তখন উত্তাল। তাতে ছিল সর্বস্তরের গণতন্ত্রমনা সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ইতোমধ্যে তার কেন্দ্রীয় বিশেষ সভা ডাকে পাকিস্তানের তখনকার রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে। সে সভায় আরও দু' মাসব্যাপী কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। ঘোষণা দেয়া হয় যে প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সারা

www.pathagar.com

পাকিস্তানব্যাপী এ আন্দোলন চলতে থাকবে এবং প্রয়োজন হলে সাংবাদিকগণ সংবাদপত্র বন্ধ করে দেবে। এসব সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী তখন বিশ্ব-সংবাদ হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব সরকার ঘৃণিত অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। তবে তিনি শর্ত দেন যে, সাংবাদিকদের এবং সংবাদপত্রের 'Code of Conduct' প্রণয়ন করতে হবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে। সাংবাদিক ইউনিয়ন বলে দিল সাংবাদিকতার 'Code of Conduct' নির্ধারিত করে সাংবাদিকদের বিবেক ও জ্ঞান। কোনও লিখিত কাগজ বা ফরমান নয়। সেই তথাকথিত 'Code of Conduct' ছাড়াই প্রেস অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করা হলো।

গোটা আন্দোলনটি পাকিস্তানব্যাপী নাম ধারণ করেছিল Press Ordinance Movement। সে মুভমেন্ট দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও দঢ় পদক্ষেপে Move করাতে রাস্তায় নিয়ে এলো। এই পাকিস্তানব্যাপী Press Ordinance Movement-এর জন্ম হয়েছিল প্রেস ক্লাবে এবং আন্দোলনের ক্রিয়াকর্ম ও লাইন নির্ধারিত হয়েছিল এই প্রেস ক্লাবেই। সে গৌরবটিও আজকের জাতীয় প্রেস ক্লাব ধারণ করে আছে। আশা করবো, আমাদের সাংবাদিক সম্প্রদায় এ মহান গৌরবের মান রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় প্রেস ক্লাব, সংবাদপত্র জগত ও সাংবাদিক সম্প্রদায়ের শুভকামনা করি। মনে পড়ে, সাংবাদিকতার মহান পেশা আমার শুরু হয়েছিল পাকিস্তান অবজার্ভারে (বর্তমানের বাংলাদেশ অবজারভার) ১৯৪৯ সালে। এবং প্রেসক্লাবের জন্মলগ্ন থেকে আমি ছিলাম তার সদস্য।

শ্রুতিলিখন: মো: আরিফ-উল-ইসলাম

লেখক সাবেক মন্ত্রী ও পূর্বতন ইপিইউজে'র সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

সাংবাদিক, সাংবাদিকতা, সাংবাদিকের স্বাধীনতা

আমান উল্লাহ

আধুনিক বিশ্বে সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। মানুষের প্রায় যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সরকার জড়িয়ে পড়ছে। প্রশাসনের হাতে অধিকতর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অত্যধিক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া সরকারের কর্মকাণ্ড গোপনীয়তায় আচ্ছন্ন থাকছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রবাহকে আজ আর আগের মত তেমন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। তথাপি দেখা যায়, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য নিয়ন্ত্রণ করতে আজও সচেষ্ট আছেন। অতীতে তারা এ কাজ বেশ কার্যকরভাবে করেছেন, বর্তমানেও করছেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কিছু না কিছু চলতেই থাকবে।

কোনও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত সমাজের স্বীকৃতি ও গুরুত্ব রয়েছে সেখানে নাগরিকদের জানবার অধিকার রয়েছে, কেমন করে তাদের দেশের প্রশাসন এবং সরকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম চলছে। এবং সরকারী কর্মকর্তারা কে কেমন কাজ করছে। কারণ নাগরিকদের যদি এ ধরনের তথ্যনির্ভর জ্ঞান না থাকে, তাহলে তারা সরকার নির্বাচনে বিজ্ঞ তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবেন না। সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জনগণ তাদের সঠিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন না। সম্ভব হবে না ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তথ্যভিত্তিক জনমত স্বৈরাচারসহ সকল কুশাসনের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নাগরিকগণ তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করতে কদাচিৎ সমর্থ হন। আধুনিক বিশ্বে বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতিতে জনগণ তথ্যের জন্যে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর নির্ভরশীল। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম তথ্য সংগ্রহ ও সংবাদ পরিবেশনের মাধমে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন রয়েছে তাদের পেশাগত স্বাধীনতার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সাংবাদিকতার স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে জবাবদিহিতার গণতান্ত্রিক নীতিরই প্রতিফলন। সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকার বা শাসনযন্ত্রের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্রের মালিকের, প্রকাশকের, সম্পাদকসহ অন্যান্য সাংবাদিকের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অধিকার আদয়ের জন্যে নয়। সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে রয়েছে সমাজের সকল সদস্যের সমষ্টিগত অধিকারের নিশ্চয়তা। এ ছাড়া সাংবাদিকতার এ স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত রয়েছে নাগরিকের সংবাদ জানার বা তথ্য লাভের ও তথ্যভিত্তিক মতামত পোষণের অধিকার। এবং সর্বোপরি সাংবাদিকতার স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে সরকার পরিচালনার বিষয়ে নাগরিকের জানার মৌলিক অধিকার। স্বাধীনভাবে এই তথ্য লাভের অধিকার শুধু সাংবাদিকের নিজের পেশাগত অধিকারই নয়। এ অধিকার নাগরিকের তথ্যলাভের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার মত সাংবাদিকতার স্বাধীনতাও রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু সাংবাদিকের দাবিই নয়, এ স্বাধীনতা বৃহত্তর জনস্বার্থে শাসনতান্ত্রিকভাবে মর্যাদার দাবি রাখে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে, নাগরিকের বাক স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের জানার অধিকার। পশ্চিমা উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে বহু পূর্ব থেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সে দেশের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যুক্তরাজ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যা কোনও সরকার বা রাজনৈতিক দল চাইলেও খর্ব করা সম্ভব নয়।

আজ প্রয়োজন বিশ্বের সাংবাদিক ও সকল গণমাধ্যম কর্মীর পেশাগত স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ বিরামহীন সংগ্রাম। আর এ সংগ্রামের জন্যে চাই নৈতিক শক্তি ও অজেয় মনোবল, যা আসতে পারে একমাত্র উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ ও ত্যাগের মনোভাবের মাধ্যমে। সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আসতে পারে সততা ও নৈতিকতা থেকে। আর এই সাহসিকতা ও নির্ভীকতা থেকেই আসবে সংগ্রামে বিজয়, যে বিজয় দেবে সাংবাদিককে তার চির কাঙ্ক্ষিত পেশাগত স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা শুধু দেশের শাসনতন্ত্রেই লেখা থাকবে না। খোদিত থাকবে দেশের জনগণের জাতীয় চেতনা ও উপলব্ধিতে। যে স্বাধীনতা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করবে। সাংবাদিকতা তখনই হবে সার্থক ও অর্থবহ।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে চাই সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা। আর এই বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্যে প্রয়োজন পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্ভীক, সাহসী তেজোদৃপ্ত সাংবাদিক। এ সকল গুণাবলী আসতে পারে শুধু উন্নত মানের ব্যক্তি চরিত্র থেকে। তাই সাংবাদিককে চরিত্রের দিক দিয়ে হতে হবে উন্নতমানের। তাকে হতে হবে দৃঢ়চেতা, নির্ভীক সত্যের সৈনিক। তাকে থাকতে হবে ত্যাগের জন্যে সদা প্রস্তুত। তার থাকতে হবে অজেয় মনোবল, দৃঢ়চিত্ততা ও ধৈর্য। সাংবাদিককে সৃষ্টি করতে হবে সৎ সাংবাদিকতার ঐতিহ্য। তবেই সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের বলিষ্ঠ হৃদয়া-ভাবের প্রকাশ ঘটবে তার সৎ সাংবাদিকতা চর্চায়। তাকে থাকতে হবে সকল রকম লোভ লালসার উর্ধে। তাকে দৈনন্দিন জীবনে ভোগবিলাসের বাসনা পরিহ-ার করতে হবে। কারণ লোভ-লালসা ও ভোগের বাসনা তাকে করে দেবে দুর্বল। আর দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি তেজোদৃপ্ত হতে পারে না। চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকলে সাংবাদিক তার স্বাধীন সত্তা খুঁজে পায় না। যদিও সে কোনও সনদ বা পদক লাভ করতে পারে, কিন্তু পেশাগত কৃতিত্বের জন্যে সমাজ ও জনগণের কাছ থেকে সত্যিকারের স্বীকৃতি পাবে না। সাংবাদিককে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে সত্যনিষ্ঠ পথ থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। সাংবাদিকতার মহান পেশায় এসে নিজেই যে দায়িত্ব বেছে নিয়েছে, সে দায়িত্বে অবহেলা করলে তাকে জনগণ ও সমাজের কাছে ধিকৃত হতে হবে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রকাশের অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর নাগরিকের এই অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ অধিকারকে নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। অতএব নাগরিকের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের মূল এবং প্রাথমিক ভূমিকা হলো সরকারকে তার কার্যকলাপের ব্যাপারে জবাবদিহি করা, সরকারকে প্রয়োজনবোধে সমালোচনা করা এবং সরকারের ব্যর্থতাকে উম্মোচিত করা। অবশ্য সরকারের বিরোধী মহলের অন্যায় কার্যকালাপের সমালোচনা করাও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সংবাদ মাধ্যমের জন্যে এ দায়িত্ব পালন বিশেষ করে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যখন সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, সংবাদমাধ্যম সবসময় সরকারের বিরূপ সমালোচনা করবে তাও কাম্য নয়। আর প্রতিনিয়ত তার ব্যর্থতাই তুলে ধরবে তাও বাঞ্ছনীয় নয়। সংবাদমাধ্যম তার ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং সরকারের কোনও সাফল্য থাকলে তাও তুলে ধরবে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে সংবাদমাধ্যমের এই ধরনের ইতিবাচক ভূমিকার বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে।

সাংবাদিকের পেশাগত স্বাধীনতা প্রয়োজন, দেশ ও জাতির স্বার্থে সৎ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করার জন্যে। অনেকে সাংবাদিকতাকে শুধু পেশা হিসেবে না নিয়ে জীবনের ব্রত (মিশন) হিসেবে নিয়ে থাকে। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সমাজের জন্যে মঙ্গলজনক হবে এবং জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যে হবে সহায়ক। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। তাই সাংবাদিকতা যদি ন্যায়নিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়, তবেই সে সাংবাদিকতা স্বাধীনতার দাবি রাখে। সাংবাদিকতা যদি বস্তুনিষ্ঠ না হয়, তাহলে সেই ধরনের সাংবাদিকতার স্বাধীন চর্চা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং সমাজের জন্যে ক্ষতিকরই হবে।

সাংবাদিকরা প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন যে, সরকার বা সমাজের কিছু কিছু শক্তিশালী মহল তাদের পেশাগত স্বাধীনতা খর্ব করছে এবং সাংবাদিকের পেশাগত স্বাধীনতা নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে সরকারের মনোভাব ও কার্যকলাপের ওপর, তেমনি বেশ কিছুটা নির্ভর করে সরকারের বাইরে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ও বিরোধী দলীয় শক্তির কার্যকলাপের ওপর। এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

শক্তিশালী পেশাজীবী সংগঠন ও শিল্পমালিক বা শ্রমিক সংগঠনের ওপরও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, অনেক সময় সংবাদ মাধ্যমের মালিকদের স্বার্থে সাংবাদিকগণ নিজেরাও স্বাভাবিক সংবাদ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, যা অনভিপ্রেত।

গণবিরোধী স্বৈরাচারী সামরিক বা বেসামরিক শাসনামলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার দরুন দেশে সাংবাদিকতার মানের অবনতি হয়েছে। একই সঙ্গে সাংবাদিকের পেশাগত মর্যাদাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাংবাদিকগণ সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা করতে সমর্থ হননি। তারা অনেক ক্ষেত্রেই পারেননি সত্যকে পাঠক বা শ্রোতার কাছে তুলে ধরতে। অনেক সময়ই তাদেরকে ভীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে অনেক সময়। এমনকি কোনও কোনও সাংবাদিককে সত্যিকার বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকবর্গের রোষানলে পড়ে অনেককে জেল জুলুম সইতে হয়েছে, এমনকি প্রাণও বিসর্জন দিতে হয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিক যেমন তাদের মনের সজীবতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে লোক-মানসকে প্রাণবন্ত ও গতিময় করে তোলেন, তেমনই সাংবাদিককেও তার সৎ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা দিয়ে সমাজ জীবনকে গতিময় করে তুলতে হবে। সমাজ জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে হবে। সত্যের প্রতি সাংবাদিকের নিষ্ঠা এবং স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতার চর্চা এ দু' এর মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন সাংবাদিকের নৈতিক সাহসিকতা। এই সাহসের জন্যে চাই স্বাধীন এক চেতনা ও উপলব্ধি। শুধুমাত্র সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকেই আসতে পারে এ ধরনের স্বাধীনতার চেতনা, বলিষ্ঠ উপলব্ধি এবং অসংকোচে সত্য প্রকাশের সাহস। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বের বিশ্বাস বা ধারণা পেশাগত নীতিবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাধীনভাবে দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালনের জন্যে চাই ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকের প্রতি এক স্বচ্ছ, উদার এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু অনেক সংবাদ মাধ্যমে ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের মধ্যে আজকাল অনেক সময় এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখনই ক্ষমতাসীন হন, তখনই সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। সরকারী শাসনযন্ত্র একদিকে যেমন প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, অন্যদিকে নিভৃতে সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্যে বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সরকারী নেতৃবৃন্দ জনসমক্ষে বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলছেন সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চা করার জন্যে। আর একই সঙ্গে সরকারী তথ্য বিভাগ জনচক্ষুর আড়ালে, অনেক সময় গভীর রাতে পরামর্শ দিয়েছে সত্য সংবাদ প্রকাশ না করার জন্যে। আর এ সকল অবাঞ্ছিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশি ঘটেছে যখন সরকার কোনও বিরোধী বিক্ষোভ বা প্রতিবাদী আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে। তাই যখন এইসব সরকার বিরোধী আন্দোলন বা বিক্ষোভের বিকৃত প্রতিবেদন পাঠক সংবাদপত্রের পাতায় দেখেছেন বা বেতার টেলিভিশনে শুনেছেন, তখন

www.pathagar.com

তারা ঘটনার ভুল ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন বা উপস্থাপনার জন্যে সাংবাদিককেই দায়ী করেছেন। আর এই কারণে জনসমক্ষে সাংবাদিকরাই ধিকৃত হয়েছেন। কিন্তু এর পেছনে যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাঁবেদার আমলাদের অবাঞ্ছিত প্রভাব ও হস্তক্ষেপ থাকে, তা হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করেন না। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, সংবাদ প্রবাহের ওপর এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ শুধুমাত্র সামরিক শাসনের সময় বা স্বৈরাচারী একনায়কত্বেই হয়ে থাকে তা নয়। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ও একই ধরনের হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব অবিচ্ছেদ্য। স্বাধীনতা ছাড়া যেমন দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়, তেমনি দায়িত্বহীন, নীতিবিবর্জিত স্বাধীন সাংবাদিকতা সত্যের বিকৃতি ঘটিয়ে সমাজ জীবনে বিবিধ অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজন সমাজে তার অবস্থানকে উন্নত করা। এটা সম্ভব সাংবাদিকের পেশার প্রকৃত স্বীকৃতির মাধ্যমে। আর তা সম্ভব হতে পারে সাংবাদিকের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে।

কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইলে তাকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ত্যাগের মাধ্যমেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। আর সে স্বাধীনতা রক্ষা করতেও ত্যাগের প্রয়োজন হয়। তাই একই রকমভাবে সাংবাদিককেও তার পেশাগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার সঙ্গে সাংবাদিকের বা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সম্পর্কিত, তাই সাংবাদিককে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা বলছি, তা শুধু নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বৈরাচারী শাসন নয়, তা হলো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সেখানে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির মধ্যে সরকার পরিচালিত হবে, সেখানে থাকবে ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সাংবাদিকতার স্বাধীনতাসহ সকল প্রকার স্বাধীনতা। এবং সেখানে সকল রকম মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার থাকবে অলঙ্ঘনীয়। যে স্বাধীনতা কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বা কোনও দল বা গোষ্ঠী বা কোনও দলীয় সরকারের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করবে না।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এ পেশায় সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এ সকল মূল্যবোধের সর্বজনীন প্রয়োগ আজকাল আর তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না। উচ্চতর পেশাগত মান ও দায়িত্ববোধ শুধুমাত্র কোনও আইন বা নিয়মকানুন প্রয়োগ করে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একই রকমভাবে তা কোনও সাংবাদিকের ব্যক্তিগত শুভবুদ্ধি বা শুভ ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে না। কারণ তার নিয়োগকারী ব্যক্তি বা সংস্থা তার পেশাগত কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারে অথবা সহায়ক হতে পারে। সাংবাদিকের আত্মসম্মান বোধ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা এবং উন্নত মানের পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যে তার নিজের ভেতরে এক তীব্র আবেগ, ইচ্ছা বা উদ্যোগ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময় সাংবাদিক সংগঠনগুলো বলিষ্ঠ

www.pathagar.com

ভূমিকা রেখেছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গণআন্দোলনে যখন রাজনৈতিক দলগুলোও পিছিয়ে পড়েছে, সাংবাদিকেরা তাদের পেশাগত স্বাধীনতা তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার রাজনৈতিক সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে। অন্যান্য অনেক পেশার মত সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমগুলো জনগণের সেবায় নিয়োজিত। তাই জনগণের অধিকার রয়েছে সাংবাদিকদেরকে তাদের কার্যাবলীর জন্যে দায়ী করার। এ ধরনের দায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও প্রেস কাউন্সিলের মত সংস্থা রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায়, প্রেস কাউন্সিলকে পাশ কাটিয়ে সরকার সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন এমনকি বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে থাকেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, যদিও একজন বিচারকের নেতৃত্বে প্রেস কাউন্সিল রয়েছে, তাকে একটি কার্যকর সংস্থা হিসেবে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না কেন? এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের দাবি এবং প্রতিবাদ কেন বারবার প্রত্যাখ্যাত এবং উপেক্ষিত হচ্ছে?

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের কার্যকলাপের ওপর কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, এ কথা কেউ বলবেন না। তবে সে নিয়ন্ত্রণ হতে হবে নীতি ও বিধিসম্মত, যার উদ্দেশ্য হবে নীতিহীন সাংবাদিকতাকে নিরুৎসাহিত করা। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার জন্যে গঠিত ম্যাকব্রাইড কমিশনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ম্যাকব্রাইড কমিশন তার প্রতিবেদনে বলেছে, "সেন্সরশিপ ও সংবাদের ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের অবসান হওয়া উচিত"। কমিশন বলেছে, যে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হতে পারে, সে সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আইনানুগ হতে হবে এবং তা হবে বিচার বিভাগীয় নিরীক্ষণ সাপেক্ষে। এবং এই সকল নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘ সনদ এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা ও সকল আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

যখন আমরা সাংবাদিকতা, সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার নীতিমালার কথা আলোচনা করছি, তখনও পৃথিবীর অনেক দেশের সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাদের স্বার্থের প্রয়োজনে সাংবাদিকতার উপর স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করে চলেছে।

দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও তারই সঙ্গে সাংবাদিকের ওপর অন্যায় ও অসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আগেও ছিল বর্তমানেও আছে। অদূর ভবিষ্যতে এই অন্যায় নিয়ন্ত্রণের অবসান হবে, তার কোনও লক্ষণ বা সম্ভাবনা নেই।

লেখক বার্তা সংস্থা বাসসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক

www.pathagar.com

ক্লাবের প্রথম দিকের কিছু স্মৃতি

মো: নূরুল ইসলাম

১৯৫৪ সালের মে মাস। সঠিক তারিখ এখন আর মনে নেই। পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের কার্যকলাপ শুরু হলো ১৮ নম্বর তোপখানা রোডস্থ লাল দোতলা ভবনটিতে। এখন অবশ্য ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয় অক্টোবর মাসে। এটি ছিল মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাসা। আমরা দেখেছি (ক্লাব প্রতিষ্ঠার আগে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও পার্শির অধ্যাপক ড. আন্দালিব সাদানীকে এখানে বাস করতে। তার আগে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার খাদ্য মন্ত্রী বরিশালের আফজল সাহেব কিছুদিন ছিলেন।

এই ভবনটি পাওয়া যায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি এন. এম. (নিয়াজ মোহাম্মদ) খানের সহায়তায়। তিনি ছিলেন একজন পাঞ্জাবি এবং আই.সি.এস অফিসার। সঙ্গে তাঁকে সহায়তা করেন স্বরাষ্ট্র সচিব আর এক পাঞ্জাবি আই.সি.এস. এম আজফার। এদের সঙ্গে জনাব খায়রুল কবীরের ছিল বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা। প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন– তাঁদের মধ্যে এই খায়রুল কবীর ছিলেন অন্যতম। বলতে গেলে অনেকটা তাঁরই প্রচেষ্টায় ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এন এম খান পূর্ব পাকিস্তানে একজন জনপ্রিয় অফিসার ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকজন এখনও তাঁকে ভুলতে পারে না। এখানকার নিয়াজ স্টেডিয়াম এখনও তারই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও। তাঁকে ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ দেয়া হয়েছে।

১৮ নম্বর তোপখানা রোডের উত্তর পাশে ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য সার্ভিস (ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস)। এই বাড়িটির মালিক ছিলেন রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও আইনজীবী জনাব টি আলী (তফাজ্জাল আলী)। এর লাগোয়া পূর্ব পাশের দোতলা বাড়িটি, যার নাম ছিল 'উশ্রী', তাতে থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অধ্যাপক এস এন রায়। প্রেস ক্লাব ভবনের পশ্চিম পাশে ছিল লাল দোতলা একটি ভবন– নাম চামেরী হাউস। এটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হোস্টেল, এখানে এখন সিরডাপ এর প্রধান কার্যালয়। ক্লাবের পূর্ব দিকে ছিল ইডেন বিল্ডিং, যা এখন দেশের সেক্রেটারিয়েট।

সাংবাদিক সমাজের একটি মিলন কেন্দ্র হিসেবে যেখানে তারা আড্ডা দিতে পারেন, অবসর বিনোদন করতে পারেন, মতামত বিনিময় করতে পারেন এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই

www.pathagar.com

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। ক্লাবের প্রথম দিকে বা এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তদানিন্তন এ.পি.পি'র প্রধান এম এ আজিম, সংবাদের সৈয়দ নূরুদ্দিন, অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী- যিনি প্রথম সেক্রেটারি, কলকাতার স্টেটসম্যানের ঢাকা প্রতিনিধি আব্দুল ওয়াহাব, মর্নিং নিউজ এর আবাসিক সম্পাদক এস জি এম বদরুদ্দীন, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), দৈনিক আজাদের মুজীবুর রহমান খাঁ, (ক্লাবের প্রথম প্রেসিডেন্ট), ইউপিপি'র আব্দুল মতিন (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী, যিনি পরে সেক্রেটারি হয়েছিলেন), নতুন খবর এর সম্পাদক আব্দুল কাদের, অর্ধ-সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান' এর সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের, পাকিস্তানের অবজারভার এর সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ (৬ ফুটের বেশি লম্বা, ঢোলা পায়জামা ও লম্বা কোর্তা পরিহিত থাকতেন সমসময়) প্রমুখ। আরও অনেকে ছিলেন- হাসানউজ্জামান খান, সৈয়দ জাফর আলী, এম আর আখতার মুকুল, এ বি এম মূসা (পরে সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন), এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (পরে সেক্রেটারি ছিলেন), সৈয়দ কামালউদ্দিন (পরে সেক্রেটারি ছিলেন), কে জি মুস্তাফা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, উর্দু দৈনিক পাসবান এর সম্পাদক মোস্তফা হাসান প্রমুখ। পরবর্তীতে ক্লাবের উন্নয়নে এবং কর্মকাণ্ডে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে এ বি এম মূসা, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, এনায়েতুল্লাহ খান, শহীদুল হক, আবুল হাসেম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি ছিলেন। এঁরা ছাড়াও ক্লাবে আসতেন ডেইলি মেইল এর সম্পাদক আজিজুর রহমান, ইয়ং পাকিস্তানের সম্পাদক আজিজ আহমেদ বিলিয়ামনী, ইউপিপি'র আব্দুল গনি, রেডিও পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক সায়েদুল হক, কেন্দ্রীয় রিজিওনাল ইনফরমেশন অফিসার এ বি এম শামসুল আলম (তাঁর আগে ছিলেন আনোয়ার হোসেন), রেডিও পাকিস্তানের ডিরেক্টর পরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দফতরের পরিচালক সাদেকুর রহমান, সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা চিত্রালীর সম্পাদক এস এম পারভেজ প্রমুখ। আরও যাঁরা আসতেন, তাঁদের সবার কথা মনে থাকলেও নাম অনেকেরই মনে নেই। তবে অবজারভারের আব্দুল মতিন, মহিউদ্দিন চৌধুরী, মতিউর রহমান, বদরুল হক, সৈয়দ আসাদুজ্জামান (বাচ্চু)- এঁদের নাম মনে আছে।

১৯৫২ সালের মার্চ মাসে আমি দৈনিক আজাদ এর বার্তা বিভাগের চাকরি ছেড়ে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস (ইউএসআইএস) এ ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দেই। সেই সুবাদে আমি ক্লাবে প্রথম থেকেই সহযোগী সদস্য। প্রথম কয়েক বছর এটি ছিল আমার সেকেণ্ড হোম বা দ্বিতীয় গৃহ। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে রাতের খাবার সবই এখানে খেতাম। আমার জন্যে বিশেষ সুবিধে ছিল যেহেতু অফিস ছিল রাস্তার অপর পাড়ে ১৪ তোপখানা রোডে এবং বাসা ছিল ৫৯/২ নম্বর পুরানা পল্টনে।

দোতলা এই প্রেস ক্লাব ভবনের নিচতলার পূর্ব দিকের রুমটা ছিল রেস্টুরেন্ট-খাবার ঘর, মাঝের ঘরটিতে একটা বড় গোল টেবিলের চারদিকে ছিল কয়েকটি কাঠের ইজিচেয়ার, পাশে স্ট্যাণ্ডে থাকতো খবরের কাগজ ও বিভিন্ন সাময়িকী। এই ঘরটি ছিল প্রধানত সিনিয়রদের আড্ডা দেয়ার জায়গা। পশ্চিম পাশের রুমটিতে ছিল টেবিল টেনিস খেলার ব্যবস্থা। এতে অংশ নিতেন পূর্ব পাকিস্তান পাবলিসিটি বিভাগের নাজির আহমদ (পরবর্তীকালে বিবিসি

www.pathagar.com

খ্যাত), ক্যামেরাম্যান আজাদ খান, দৈনিক পাকিস্তানের ব্যবস্থাপক কবি আহসান আহমদ আশ্‌ক, পরবর্তীতে মর্নিং নিউজ এর সম্পাদক এস. এইচ. হোসেনী, ফতেহ লোহানী এবং আরও অনেকে। আমি প্রায়ই অফিস শেষে বিকেল বা সন্ধ্যায় এতে অংশ নিতাম। টেবিল টেনিস রুমের দুই পাশে কতগুলো বেতের চেয়ার ছিল, যাতে বসে সবাই খেলা দেখতো। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি ছিল কাঠের। ভবনটির দোতলায় একদম পূর্ব দিকের ছোট ঘরটায় থাকতো পুরনো পত্র-পত্রিকা, পরে এতে থাকতেন মর্নিং নিউজের এ. এল (আব্দুল লতিফ) খতিব। মাঝের বড় ঘরটায় ছিল তাস খেলার ব্যবস্থা। এতে রামি এবং ব্রিজই বেশি খেলা হতো। সালাম ভাই প্রায়ই খেলতে আসতেন। আমি একজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলাম। আরও যাঁরা খেলতেন, তাঁরা হলেন সহযোগী সদস্য চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাস, প্রখ্যাত সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ সমর দাস, মর্নিং নিউজের সি.আর. মিটার, সিরাজুর রহমান, স্টেটসম্যানের সংবাদদাতা উইলিয়াম ননী।

নিয়মিত সদস্য এম আর আখতার মুকুল, ফয়েজ আহমদ, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, দাউদ খান মজলিশ, দৈনিক পাকিস্তানের আলী আশরাফ– এঁরাও খেলতেন। বাইরে থেকে আসতেন কলিম শরাফী, সি.এস.পি সাইদুজ্জামান ও শামসুর রহমান খান (ড. জনসন নামে খ্যাত) এবং আরও অনেকে। আমাদের এক বন্ধু শিল্পপতি কে. এ. সাত্তারও আমাদের সঙ্গে নিয়মিত তাস খেলতেন। তিনি একবার ক্লাবের রেস্টুরেন্টের খাবার টেবিলগুলোর জন্যে কতগুলো কভার উপহার দিয়েছিলেন। পশ্চিম দিকের রুমটা ছিল লাউঞ্জ। এখানে পার্টি এবং মিটিং হতো। সন্ধ্যার পরে এখানে আমরা ঘরোয়াভাবে হাউজি খেলতাম। মোটামুটিভাবে স্বামী-স্ত্রী মিলে বোধহয় আমরা ১৫/২০ জনের বেশি ছিলাম না। যদিও ছোট পরিসরে এবং ঘরোয়াভাবে প্রথমে আমরা হাউজি খেলতাম, কিন্তু তা সব সদস্যের জন্যে ব্যবস্থা করতে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন মিসেস বালান (প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি মি. বালানের স্ত্রী), পাকিস্তান অবজারভারের স্পোর্টস রিপোর্টার নূরুল কবীর (কানু), সৈয়দ জাফর আলী এবং আমি। আমরা তখন নিচ তলার দক্ষিণ দিকে যে লন ছিল, তাতে খেলার ব্যবস্থা করি। কলার ছিল ক্লাবের ম্যানেজার দীর্ঘদেহী স্থূলকায় গোলাম মোহাম্মদ। সে ছিল উর্দু ভাষী, তবে বাংলাও বলতো, সব সময় পান চিবাতো। তার কল করা খুবই উপভোগ্য ছিল। কেউ ভুল করে ডাকলে সে বলতো ফলস্ এলারাম। এ নিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হতো। মাঝে মধ্যে আরেকজন উর্দুভাষী (বহিরাগত) বশীর কল করতো। পরে যখন অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন মর্নিং নিউজের মি. এন্ড্রুজ কল করতেন (নামটি সঠিক কিনা এখন আর মনে নেই)। তবে আমরা তাকে ডক (ডাক্তার) বলেই ডাকতাম, তার গায়ের রঙ ছিল খুবই কালো, দেখতে ছিল বেশ লম্বা। তিনি খুব ভালো কল করতেন। বাইরে থেকে অনেকেই হাউজি খেলতে আসতেন। মনে পড়ে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আইসিএ'র (এখন যা ইউএসএআইডি) কর্মকর্তা মাদ্রাজী রাম কৃষ্ণান এবং বব মজুমদার নিয়মিত আসতেন।

দোতলার বারান্দায় প্রায়ই দেখা যেত প্যানোরমা স্টুডিও'র মালিক ফটোগ্রাফার মাহবুব আলীকে (মতি মিঞা) তার বন্ধু কামালের সঙ্গে দাবা খেলায় ব্যস্ত। লাউঞ্জেও কেউ কেউ দাবা

www.pathagar.com

খেলতো। এপিপি'র আবরার আহমদ ও ওজায়ের নিয়মিত ক্লাবে আসতো এবং বেশিরভাগ দিনই ক্লাবে দুপুরের খাবার খেতো। এদের সঙ্গে প্রায় দেখা যেতো দৈনিক পাসবানের রিপোর্টার হাফিজুল হককে- এরা সবাই ছিল অবাঙালী। এদের সঙ্গে আরও যোগ দিত আখতার পয়ামী। তখন ক্লাবের আণ্ডাপুরির খুবই সুনাম ছিল । এই আণ্ডাপুরি খাওয়ার জন্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রায়ই ক্লাবে আসতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নওয়াই ওয়াক্ত এর প্রতিনিধি নাদভী বেশ জমজমাট লোক ছিল, সব সময় শেরওয়ানী গায়ে দিয়ে থাকতো। সবার সঙ্গে সে বেশ জমিয়ে গল্প করতে পারতো।

আমার সঙ্গে ইউসিস এর ডিরেক্টর ফেন্ট্রেস গার্ডনার, ইনফরমেশন অফিসার বিল গ্রীনও ক্লাবের সহযোগী সদস্য ছিলেন। আরও ছিলেন বিআইএস (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস) এর সিরাজুর রহমান (পরে বিবিসিতে চলে যান) এবং তার ব্রিটিশ ইফরমেশন অফিসার- এখন নামটা আর মনে পড়ছে না। অত্যন্ত মার্জিত রুচির ভদ্রলোক ছিলেন। তখন বিআইএস ছিল পুরানা পল্টনে- এখন যেখানে মুক্তাঙ্গন। কাঠের ফ্লোরওয়ালা একটি টিনের বাংলোতে, এর সামনে ছিল প্রশস্ত বারান্দা); আরও ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেস অ্যাটাশে মি. গেইও।

প্রেস ক্লাবের প্রথম দিককার কর্মচারীদের কথা বলতে গেলে যে ক'টি নাম উল্লেখ করতে হয়, তা হলো ক্লাবের বেয়ারা ফরমান আলী, উমিদ খাঁ ও আব্দুল হক। পরের দু'জন যেমনি ছিল কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি ছিল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সবাইকে খাবার পরিবেশন করতো ও সকলের অর্ডার পালন করতো। তাদের স্মৃতি কখনও ভুলবার নয়। তখনকার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। প্রায়ই আমরা সস্ত্রীক ক্লাবে মিলিত হতাম। যাঁরা এতে থাকতেন তাঁরা হলেন- খায়রুল কবীর, সৈয়দ নূরুদ্দিন, এ বি এম মূসা, হাসানউজ্জামান খান, কে জি মুস্তাফা, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সিরাজুর রহমান, এম আর আখতার মুকুল, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এবং আমি । আমাদের স্ত্রীরাও হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরের বন্ধু। এখনও অনেকের মধ্যেই এই বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে।

সেদিনের সেই প্রেস ক্লাব এখন জাতীয় প্রেস ক্লাব। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের লোকদের এটি অত্যন্ত প্রিয় প্রতিষ্ঠান, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও মিলন ক্ষেত্র। দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। এর পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে। দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অহরহ ক্লাবে আসেন। ক্লাবের প্রতি বরাবরই একটা আকর্ষণ ছিল- যা এখনও অটুট আছে। এখনও সময় সুযোগ পেলেই ক্লাবে আসি। ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। এর ভবিষ্যত অগ্রযাত্রা আরও উজ্জ্বল হোক, এই কামনা করছি।

এই লেখায় যদি কোনও তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি থাকে, তা নেহায়েতই অনিচ্ছাকৃত। বয়সের কারণে স্মৃতিশক্তি অনেক হ্রাস পেয়েছে।

লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক, ক্লাবের প্রবীণ সহযোগী সদস্য, বিশিষ্ট জনসংযোগ ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

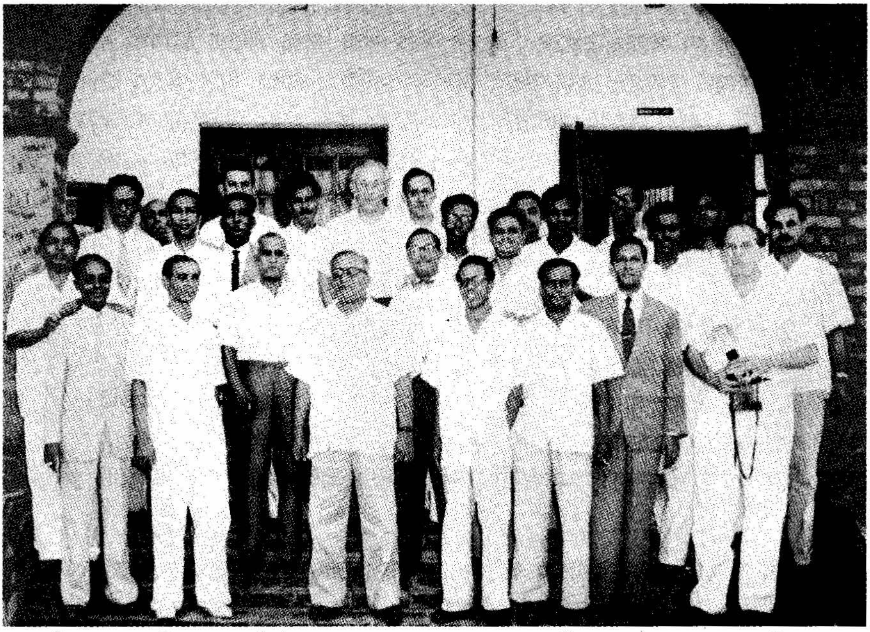

সফরকারী একজন আমেরিকানের সংবর্ধনা উপলক্ষে ক্লাবের বারান্দার সামনে তোলা ছবিতে আবদুস সালাম, এমএ আজিম, এসজিএম বদরুদ্দীন, আবদুল ওয়াহাব, সাইয়েদুল হক, সৈয়দ জাফর আলী, আবদুল মতিন, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, আবুল হাসেম, আহসান আহমদ আশ্‌ক, এবিএম মূসা, ইউসিসের বিল গ্রীন এবং আরও অনেকে (১৯৫৫)

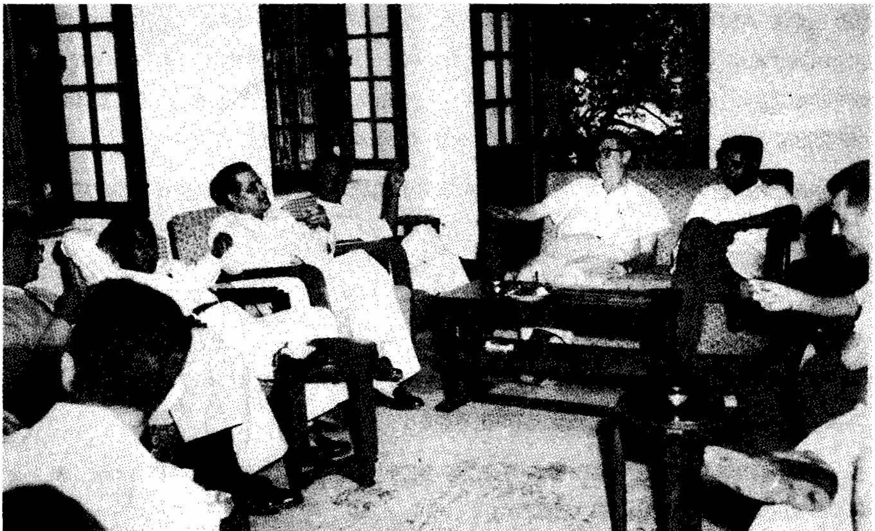

ক্লাবে এক ঘরোয়া আড্ডায় (বাঁ থেকে) আবদুল ওয়াহাব, আবদুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) মোঃ নূরুল ইসলাম, বব হোয়াইট (ইউসিসের ডিরেক্টর), মোস্তফা হাসান (১৯৫৭)

www.pathagar.com

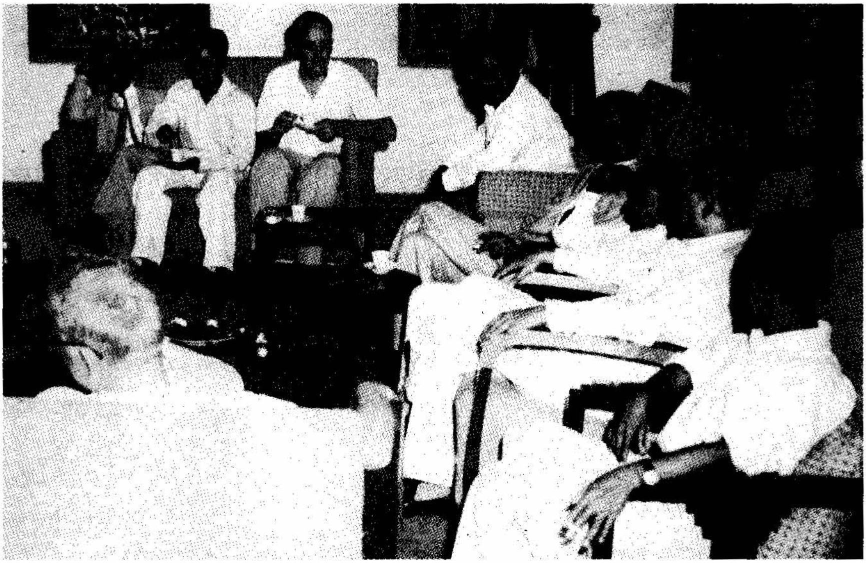

প্রেস ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) জয়নাল আবেদীন, সৈয়দ নুরুদ্দিন, ড.ফিস্ক (ইউসিসের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার), জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল ওয়াহাব, আবদুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও মোঃ নূরুল ইসলাম (১৯৫৭)

ইউসিসের ইনফরমেশন অফিসার বিল গ্রীনের ঢাকা থেকে বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠান শেষে গৃহীত ছবিতে (বাঁ থেকে) এএল খতিব, ড.ফিস্ক (ইউসিসের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার), আবদুল ওয়াহাব, মোস্তফা হাসান, এস. জি. এম. বদরুদ্দিন, বিল গ্রীন, এম. এ আজিম, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), খায়রুল কবীর, আবদুস সালাম, জয়নাল আবেদীন, মোঃ নূরুল ইসলাম, পেছনে ইউসিসের ডিরেক্টর বব হোয়াইট (১৯৫৮)

এই চারটি ছবি লেখক মোঃ নূরুল ইসলামের সৌজন্যে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা: সেকাল ও একাল

ফজলুল করিম

শুরুর দিকে এদেশের সংবাদপত্র কেমন ছিল? কেমন ছিল সাংবাদিকতা? সাংবাদিকরা কেমন ছিলেন, সংবাদপত্রের অফিসগুলোর হাল হকিকত ও পরিবেশ কেমন ছিল, তা আজকের প্রজন্মের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে। আজকে এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তা রাতারাতি কারুর একক চেষ্টায় হয়নি। শুরুর পর্বটা তাই একান্তভাবেই জানা দরকার। এর লিখিত কোনও ইতিহাস নেই। সূচনা পর্বে যাঁরা সাংবাদিকতাকে একটা মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সে সময়কার অধিকাংশ ঘটনা তাঁদের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তাঁরা অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। প্রবীণ যাঁরা আজও বেঁচে আছেন, তাদের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে সে দিনের ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ বছর অনেক ধুমধাম করে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। 'পঞ্চাশ বছরের সাংবাদিকতা: জাতীয় প্রেস ক্লাব' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ তার মধ্যে অন্যতম। স্মরণিকা উপ-কমিটির আহ্বায়ক স্নেহাস্পদ হাসান হাফিজ এ বিষয়ে লেখার জন্যে ফরমাশ দিয়েছে। কিছু না লিখলে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়া হবে। কোন্‌দিন টুক্ করে চলে যাব, কেউ হয়তো জানতেও পারবে না। তাই যে কথা ও ঘটনাবলী এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল, তা রেকর্ড করার এমন একটা সুযোগ হয়তো আর নাও পেতে পারি। ভেতর থেকে একটা তাগিদও অনুভব করলাম। ক্যানভাসটা অনেক বড়। সবটা ভরাট করার ক্ষমতা ও সাধ্য আমার নেই। কিছুটা আঁচড় কাটার চেষ্টা করছি মাত্র।

খবরের কাগজের অফিসগুলো এক কথায় নির্মল আড্ডার আখড়া ছিল। যেমন ছিল প্রেস ক্লাব। এসব আড্ডায় যোগ দিতেন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা এবং সাংস্কৃতিক কর্মী, সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীরা। এক পত্রিকার সাংবাদিকরাও অন্য পত্রিকা অফিসে অবসর সময়ে আড্ডা জমাতেন। এসব আড্ডার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ছিল। আজাদ অফিসের সামনের লনে বিকেলে সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ্ এবং তাঁর সমসাময়িক লেখক যাঁরা মাসিক মোহাম্মদীতে লিখতেন, তাঁরা মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আড্ডায় বসতেন। তাঁদের কথাবার্তায় আলোচনা সমালোচনায় কখনও শালীনতার সীমা অতিক্রান্ত হতো না। সংবাদ অফিসের আড্ডা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে আড্ডা দেয়া মানে প্রচুর খিস্তি-খেউড় এর মহড়া। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে শুরু করে রাস্তার হকার কেউই রেহাই পেতেন না জহুর ভাইয়ের আক্রমণ থেকে। অনর্গল আউড়ে যেতেন তাঁর

www.pathagar.com

বিশেষ বুলি। আশেপাশে কে আছেন, সে দিকে তাঁর কোনও খেয়াল থাকত না। আসলে তিনি খিস্তি করতেন কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বা কাউকে আঘাত করার জন্যে নয়। তাঁর এই বিশেষ বুলি ছিল অত্যন্ত 'হারমলেস'। একটা উদাহরণ দেই– দৈনিক পাকিস্তান (দৈনিক বাংলা প্রথম এই নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নতুন নামকরণ করা হয়– দৈনিক বাংলা) এর পক্ষ থেকে বর্ষ শুরু সংখ্যার জন্যে ঢাকার সকল দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের কতগুলো বিষয় মতামত সংগ্রহ করার জন্যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল– বছরের সেরা সংবাদ কোনটি (নিউজ অব দি ইয়ার)? আমি প্রশ্নমালা নিয়ে একদিন সকালে জহুর ভাইয়ের ধানমণ্ডির বাসভবনে গিয়ে হাজির। তিনি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে টেলিফোনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করা করছিলেন। আমি একখানা প্রশ্নমালা তাঁর সামনে মেলে ধরতেই তিনি একনজর দেখে নিয়ে যে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন তাকে বললেন, 'দৈনিক বাংলা' থেকে একজন এসেছেন কিছু প্রশ্ন নিয়ে। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো– আপনার মতে নিউজ অব দি ইয়ার কোনটি? আমার মতে (একজন রাজনৈতিক নেতার নাম উচ্চারণ করে বললেন) অমুকের যে সিফিলিস হয়েছে, ওটাইতো নিউজ অব দি ইয়ার হওয়া উচিত। এই হলেন জহুর ভাই। কোলকাতার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা উইলিয়াম ননীকে তিনি ডাকতেন 'নুনু' বলে।

ইত্তেফাক অফিসে মানিক ভাইয়ের ঘরেও আড্ডা হতো। সে আড্ডায় জহুর হোসেন চৌধুরীও শামিল হতেন। যেখানে মানিক ভাই সেখানে জহুর ভাই অত্যন্ত নিষ্প্রভ, বিশেষ করে খিস্তির ব্যাপারে। মানিক ভাই জহুর ভাইয়ের মত অনর্গল বিশেষ বুলি ছাড়তেন না। তবে মাঝে মাঝে এমন এক একটা ছাড়তেন, যার তুলনা হয় না। জহুর ভাইকে মানিক ভাই আদর করে 'বাফেলো' বলে সম্বোধন করতেন। জহুর ভাইও সেটা উপভোগ করতেন। মানিক ভাই চটলে ইত্তেফাকের কর্মচারীদের দমাদম চাকরি নট। সকালে যার চাকরি যেত, বিকেলে বা পরদিন তিনি পুনরায় তার পদে পুনর্বহাল হতেন। যাকে সকালে চাকরি থেকে বিদেয় করে দিতেন, তিনি হয়তো আর অফিসে যেতেন না। পথে কোথাও পরদিন দেখা হলে অফিসে কেন যান না জিজ্ঞেস করতেন। চাকরিচ্যুত ব্যক্তি জবাব দিতেন– আপনিই তো কাল অফিসে যেতে নিষেধ করেছেন। মানিক ভাই হেসে বলতেন, ওটা কথার কথা, অফিসে যান।

ইত্তেফাক অফিসের একটি ক্ল্যাসিক গল্প অনেক কাল সবার মুখে মুখে ছিল। ইত্তেফাকের বার্তা কক্ষে তিন জন তোত্‌লা ছিলেন। একদিন তিন জনেরই একই শিফটে ডিউটি ছিল। সম্পাদক জরুরি প্রয়োজনে ফোন করেছেন। প্রথমে ফোন ধরেন শচীন চ্যাটার্জী। তিনি তোতলাতে থাকলে মানিক মিয়া তাকে ধমক দিয়ে অন্যকে ফোন দিতে বলেন। দ্বিতীয় জনও তোতলা। তিনি হ্যা-হ্যা-হ্যা-লো বলার সঙ্গে সঙ্গে মানিক মিয়ার ধমকের চোটে ফোন রেখে দেন। এরপর ফোন ধরলেন রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই), তাঁর তোতলামি শুরু হলে মানিক ভাই আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, 'সব শালা তোতলা এসে জুটেছে আমার অফিসে। আজ সবগুলোকে খেদাতে হবে'– এ বলে ফোন রেখে দিলেন। কিন্তু আখেরে কারুরই কিছু হয়নি।

একবার ইত্তেফাকে ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের পাতায় মজার একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল।

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ: ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাকরাইলস্থ বাসভবন হতে ১০টি হোয়াইট লেগহর্ন মুরগি চুরি হয়েছে। কেউ সন্ধান দিতে পারলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা অফিসেও সম্পাদক সালাম ভাইয়ের রুমে আড্ডা হতো। তবে সে আড্ডা তেমন জমজমাট আড্ডা ছিল না এবং নিয়মিতও হতো না। এখানে যোগ দিতেন সালাম ভাইয়ের বন্ধু-বান্ধব, যাঁদের অনেকেই শিক্ষক বা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং সালাম ভাইয়ের ব্রীজ খেলার পার্টনার ছিলেন। রাজনৈতিক নেতারাও মাঝে-মধ্যে আসতেন। তবে সালাম ভাই প্রেস ক্লাবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স ক্লাবে আড্ডা দিতেন বেশি সময়। অবজারভার পত্রিকায় 'হজরত ওসমান ও স্বজনপ্রীতি' সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় লেখার জন্যে মুসলিম লীগ সরকার অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় এবং সালাম ভাই গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। ওই সম্পাদকীয়তে যা লেখা হয়েছে, তাকে ইতিহাসের উদ্ধৃতি বলা যায়। সৈয়দ আমীর আলীর 'হিস্ট্রি অব সারাসিন্‌স'এ ইসলামের এই খলিফার স্বজনপ্রীতির উল্লেখ রয়েছে। হামিদুল হক চৌধুরী মুসলিম লীগ ত্যাগ করেছেন এবং অবজারভার বিরোধী শিবিরের সমর্থক, তাই একটা উছিলা করে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবজারভার পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সালাম ভাই ছিলেন অনেকটা আপনভোলা মানুষ। তাঁর পোশাক-আশাক কোনও কিছুর প্রতিই খেয়াল থাকতো না। প্রেস ক্লাবে হয়তো খবরের কাগজ পড়ছেন। অফিস যাওয়ার জন্যে রিকশা ডাকা হলো। তিনি হয়তো জুতো খুলে খালি পায়ে আরাম করে বসে আছেন। রিকশা এলে বেয়ারা খবর দিল যে, রিকশা এসেছে। তিনি খালি পায়ে হেঁটে গিয়ে রিকশায় উঠে গেলেন। জুতোর কথা তার খেয়ালই নেই।

অবজারভার পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর হাজারী ভাই (আবদুল গণি হাজারী) নিজে ছিলেন একজন কবি। তাঁর রুমেও মাঝেমধ্যে আড্ডা হতো।। এই আড্ডায় শিল্পী কামরুল হাসান ও সাহিত্যিক সরদার জয়েন উদ্দীনের উপস্থিতি ছিল প্রবল। এঁরা উভয়েই হাজারী ভাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই ত্রয়ীর লীডার ছিলেন হাজারী ভাই। সংবাদপত্রের আধুনিক ব্যবস্থাপনার একজন সফল রূপকার ছিলেন আবদুল গণি হাজারী। সংবাদে শুরু এবং অবজার্ভারে গিয়ে তিনি এ কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কিছুকাল দৈনিক আজাদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে মতান্তরের কারণে তিনি অবজারভার ছেড়ে চলে যান।

আমি যখন দৈনিক মিল্লাতে শিক্ষানবিশ, তখন সিকান্‌দার আবু জাফর মিল্লাতের সম্পাদক। মোহন মিয়া (ইউসুফ আলী চৌধুরী) হলেন এই পত্রিকার মালিক। রাজনৈতিক কারণে এই পত্রিকাটি বের হতো কোর্ট হাউস স্ট্রিট থেকে। সিকান্‌দার আবু জাফর মিল্লাত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী মিল্লাতের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সিকান্‌দার ভাই মোহন মিয়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

মিল্লাত পত্রিকার টাইপ ছিল ভাঙা। নতুন টাইপ কেনার পয়সা দিতে পারতেন না মালিক। ফলে উদ্ভট সব কথাবার্তা ছাপা হতো। যেমন সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খবর ছাপা হলো- 'সলিমুল্লাহ হলের কাম-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা'। প্রেসের কম্পোজিটররা অনেক সময় ফাইনাল প্রুফ দেখার পর নিজেদের ইচ্ছেমত কিছু কথা কম্পোজ করে খবরের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিতেন। যেমন একদিন ছাপা হলো- 'মিস ফাতেমা জিন্নাহ বলেন, নতুন টাইপ না আসিলে কাগজ ছাপা হইবে না।'

মিল্লাত পত্রিকায় একদিন একটা মজার খবর ছাপা হলো। মাদার বক্স নামে রাজশাহীর একজন রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর খবর এভাবে ছাপা হয়: 'মাদার বক্স অমুক দিন অমুক স্থানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি জানান, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল......বৎসর। তিনি আরো জানান.......ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ মৃত মাদার বক্স এর জবানীতে তার কর্মময় জীবনের কথা কাগজে ছাপা হলো।

মিল্লাতের বার্তা সম্পাদক ছিলেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। রাতের শিফটের ইনচার্জ ছিলেন বজু ভাই (বাকশাল আমলে ইত্তেফাকের জেনারেল ম্যানেজার সাংবাদিক বজলুর রহমান)। মিল্লাতের দু'জন সহকারী সম্পাদকের একজন ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, অপরজন আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাকের ভীমরুল)। মধ্যরাত ঘনিয়ে এলে নিউজ টেবিলে শুরু হতো খিস্তি। রাতের পালায় খবরের কাগজের অফিসে অনেকের ঘুম ভাঙাবার জন্যে এই খিস্তি সালসার মত কাজ করতো। প্রায় সব পত্রিকার বার্তা কক্ষে ছাত্রদের আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। সারাদিন ক্লাস করে সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিউজ টেবিলে বসলে কিছুক্ষণ পর ছাত্র নামক সাব-এডিটরদের চোখে রাজ্যের ঘুম এসে হাজির হতো। যারা পেশাদার, তারা রাতের পালায় কাজ করার জন্যে দিনে ঘুমিয়ে নিতেন। ছাত্র সাব-এডিটরদের সে সুযোগ ছিল না। পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলে দেখা যেত অনেক পত্রিকার বার্তা কক্ষ খালি। বিশেষ করে মিল্লাতে এই সংকট ছিল প্রকট। অবজারভারের বার্তা বিভাগে নতুন লোক নিয়োগের শুরুতে হাজারী ভাই জিজ্ঞেস করতেন, আবেদনকারী ছাত্র কিনা? অনেকে মিথ্যা কথা বলে চাকরি নিতেন।

বজু ভাই একবার মিল্লাতে বকেয়ার দাবিদাওয়া নিয়ে অনশন শুরু করলেন। সে এক মজার অনশন। বার্তা কক্ষের পাশে একটা কাঠের বাক্স ছিল। বজুভাই চাদর মুড়ি দিয়ে বাক্সের ওপর শুয়ে অনশন চালাতেন, আর খাবার সময় হলে হোটেলে গিয়ে চুপি চুপি খেয়ে আসতেন। তার এই দু'বেলা নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া সেরে অনশনের কথা আমরা সবাই জানতাম। শুধু জানতেন না কর্তৃপক্ষ। দু' বেলা খেয়েদেয়ে অনশনের নজির পরে দেখেছি ১৯৭২ সালে কলকাতা গিয়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দৈনিক বাংলার বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় আমার পোস্টিং হয়। একদিন অ্যাসপ্লানেডে রাজভবনের গেট বরাবর একটা তাঁবু দেখতে পেলাম। সেখানে অনেক ছেলে-মেয়ে স্লোগান দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তারা অনশন করছেন কয়েক সপ্তাহ ধরে। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এরা। শরণার্থীরা চলে যাওয়ায় এরা বেকার। এখন চাকরির দাবিতে এই অনশন। এতদিন অনশন চালিয়েও দিব্বি বেশ

www.pathagar.com

আছেন এবং জোরে শ্লোগান দিচ্ছেন কিভাবে? জানতে চাইলে উত্তর দিলেন একজন– ‘বুঝলেন না দাদা, রিলে চলছে।’ মানে জানতে চাইলে জানালেন, ৬ ঘন্টা পর পর শিফ্‌ট বদল হয়। একদল খেয়ে দেয়ে এসে অনশনে বসে। ৬ ঘন্টা পর আরেক দল এসে আগের দলকে ছুটি দেয়। বজু ভাইয়ের রিলের সুবিধা ছিল না, তবে একথা বলা যায় যে, খেয়েদেয়ে অনশন করার জনক আমাদের বজু ভাই। পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদীরা তাঁর কাছ থেকেই বোধহয় সিক্রেট জেনে নিয়েছেন।

আইয়ুবের সামরিক শাসনের আগে দেশে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচার কাজের জন্যে মানিক মিয়া মোহন মিয়ার এই দুর্বল প্রকাশনাটি কিনে নেন। পরে পত্রিকাটি যখন বন্ধ করে দেয়া হয়, তখন পাটোয়ারী সাহেব ইত্তেফাকে যোগ দেন। বার্তা সম্পাদক হিসেবে নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী ছিলেন অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট। তাঁর নিউজ সেন্স যেমন ছিল প্রখর, তেমনি সংক্ষিপ্ত হেডিং করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সে সময় সংবাদপত্রে আজকালের মত শিরোনাম লেখা হতো না। ডাবল কলাম আইটেমে বড় হরফের এক লাইনের শিরোনামের নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের আরেকটি শিরোনাম থাকতো। ইনভারটেড পিরামিড স্টাইলে নিউজ স্টোরি বা শিরোনাম, এসবের সঙ্গে আমাদের তখন পরিচয় ছিল না। কাগজের মেক-আপ করতেন রাতের শিফটের প্রেসের ফোরম্যান। বার্তা সম্পাদক মাঝে মধ্যে নিউজপ্রিন্টের প্যাডের পাতায় লীড স্টোরি, সেকেণ্ড লীড ও প্রথম পাতায় কতিপয় ডাবল কলাম আইটেমের উল্লেখ করে ফোরম্যানকে একটা ড্রয়িং দিয়ে যেতেন। ফোরম্যান নিজে মেকআপ সাজাতেন তার মত করে। খবরের জাম্প হেডিংও ফোরম্যান দিতেন। এর একটি নমুনা দিচ্ছি: চট্টগ্রাম থেকে ‘ইস্টার্ণ একজামিনার’ নামে একখানা ইংরেজি দৈনিক বের হতো। ময়মনসিংহের হাসিমুদ্দিন আহমদ, ইনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে জেল খেটেছেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন। এরশাদের আমলেও আরেকবার মন্ত্রী হন। এর বিরুদ্ধে আইয়ুবের আমলে একটি মামলা হয়। মামলাটি আদালতে খারিজ হয়ে যায়। এই মামলার খবরটি ইস্টার্ণ একজামিনার পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়। খবরের শিরোনাম ছিল– “Case against Hashimuddin Collapsed”। খবরের শেষ অংশ শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। শেষ পৃষ্ঠার জাম্প হেডিং ফোরম্যানের দেয়া। জাম্প হেডিং ছিল– “Hashimuddin Collapsed”।

তখন ঢাকা থেকে যে কয়টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো, সেগুলো হলো– দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার এবং মর্নিং নিউজ। মর্নিং নিউজ ছিল প্রচণ্ড বাঙালী বিদ্বেষী। গেট এ ওয়ার্ড নামক একটি জুয়া ছিল এই পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ। অধিকাংশ পাঠক ছিল অবাঙালী।

দৈনিক পত্রিকাগুলোর নিজস্ব কোনও ফটোগ্রাফার ছিল না। প্রথম দিকে অধিকাংশ পত্রিকায় পাসপোর্ট আকারের সংবাদচিত্র ছাপা হতো। আজাদ ছিল প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলোর অন্যতম। নবাবপুরের ওরিয়েন্ট স্টুডিও'র মালিক মাহবুব আলী চলতি ঘটনার কনট্যাক্ট প্রিন্ট ফটোগ্রাফ সরবরাহ করতো আজাদে। তাই ছাপা হতো। ফটোগ্রাফের জিংক ব্লক তৈরি করে

www.pathagar.com

কাগজে ছাপা হতো। অনেক সময় ম্যাগনিফ্লায়িং গ্লাস দিয়ে ছবির বিষয়বস্তু উদ্ধার করতে হতো। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জিংক প্লেটের ব্লক সব কাগজ অফিসেই .থাকতো। ছাপাখানার রোলারের ঘর্ষণে জিংক প্লেটের ডট্ লেপ্টে সমান হয়ে যেত। ফলে কোন্টা কার ছবির ব্লক, তা ঠিক মত ঠাওর করা যেত না। মাঝে মধ্যে একজনের ছবির ক্যাপশনের উপরে আরেকজনের ছবি ছাপা হতো। লিয়াকত আলীর মৃত্যুদিবসে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মিয়া জাফর শাহের ছবি ছেপে নিচে লিখে দেয়া হলো: "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।" ইন্দিরা গান্ধীর স্থলে বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহর ছবি ছাপা হতো।

প্রথম দিকে বাংলা কাগজে অনুবাদের বেলায়ও উদ্ভট সব অনুবাদ পাঠকের হাসির খোরাক যোগাত। ঢাকার সংবাদপত্র জগতে এরূপ কতগুলো উদ্ভট অনুবাদের ঘটনা সে সময় সাংবাদিকদের মুখে মুখে ফিরতো। যেমন– Police patrolled the city whole night. এর অনুবাদ হয়েছে পুলিশ সারারাত শহরে পেট্রোল ছিটিয়েছে। ....batted for a century – এক শতাব্দী ধরে ব্যাটাইয়াছে। আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সময় সেনাবাহিনী একদিন মুক্তি সংগ্রামীদের উপর Automatic weapon ব্যবহার করে। সাব-এডিটর অটোম্যাটিক উইপন এর অনুবাদ করেছেন আণবিক অস্ত্র। শিরোনাম– সেনাবাহিনীর আণবিক অস্ত্র ব্যবহার। Automatic কে তিনি ভুল করে Atomic ভেবে অনুবাদ করেছেন।

চীনের ভারত আক্রমণের সময় একদিন বার্তা সংস্থা ইউপিআই খবর দিল চীনা বাহিনী তাওয়াং দখল করে নিয়েছে। এখানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। বমডিলা থেকে তাওয়াং এর দূরত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে ইউপিআই লিখেছে Tawang five miles from Bomdilla as the crow flies........সাব এডিটর ইংরেজি বাক্যের গঠন বুঝতে না পেরে অনুবাদ করেছেন– চীনাদের আক্রমণে তাওয়াং এর ৫০০ বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের সব কাক উড়ে চলে গেছে।

চীন-ভারত যুদ্ধের এক বছর পর একটি স্থানীয় বাংলা দৈনিকে পুনারায় চীনের ভারত আক্রমণের খবর আট কলাম ব্যাপী ব্যানার। পরদিন দেখা গেল, অন্য কোনও পত্রিকায় এই খবর নেই। ঘটনাটি এরকম: বার্তা সংস্থা ইউপিআই হ্যাণ্ড সার্ভিসে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে কপি পাঠাত। একদিন মোটা একটা বাণ্ডিল পাঠাল। অব্যবহৃত কপি বাণ্ডিলেই থাকতো। এসব বাণ্ডিল অনেকদিন বার্তা কক্ষে পড়ে থাকতো। বিকেলের শিফটে কে একজন ভুল করে বা ইচ্ছে করে এক বছরের পুরনো চীনের ভারত আক্রমণের খবরের ইউপিআই কপি রাতের পালার কপি হিসেবে ফাইলে গেঁথে রেখে যান। কপিতে যেহেতু সনের উল্লেখ থাকে না, তাই রাতের শিফটের ইনচার্জ এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন না তুলে ব্যানার হেড লাইনে খবরটি ছেপে দিলেন।

প্রথম দিকে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো কোনও নিউজ এর ব্যানার করতে হলে কাঠের টাইপ ব্যবহার করতো। দীর্ঘদিন এই কাঠের টাইপের ব্যবহার চলে এসেছিল। দৈনিক পাকিস্তান প্রথম হাতে লেখা ব্যানার ব্যবহারের প্রচলন করে।

www.pathagar.com

পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় একদিন প্রথম নিউজ স্টোরি হিসেবে ছাপা হলো: Shohrawardy's foul play exposed. নিউজ স্টোরিতে কিন্তু এমন কোনও ঘটনা নেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন প্রধানমন্ত্রী। ঢাকায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা হয়। সোহরাওয়ার্দী সে সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাতে কতিপয় সাংগঠনিক বিষয়ে প্রস্তাব নেয়া হয়। ঘটনা নিম্নরূপ: আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী কেএসপি করতেন। অবজার্ভারের পলিসি ছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা। একজন সিনিয়র সাব-এডিটর যিনি আগের রাতে নাইট শিফটে ইনচার্জ ছিলেন, তার মনে হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের একটা খবর পাওয়া গেছে এই সুযোগে একটা ল্যাং মারা যায়। তাই সোহরাওয়ার্দীর ফাউল প্লে এক্সপোজড করে দিলেন শিরোনামের মাধ্যমে, যদিও স্টোরিতে তার নামগন্ধও নেই। হামিদুল হক চৌধুরী যখন মন্ত্রী, তখন একদিন অবজারভার পত্রিকার প্রথম পাতায় একটা খবরের শিরোনামে–"অনারেবল মিনিস্টার হামিদুল হক চৌধুরী"র স্থলে ছাপা হয়েছে "হরিবোল মিনিস্টার .."।

মফস্বলের খবরকে সে সময় তেমন কোনও গুরুত্বই দেয়া হতো না। প্রত্যেক কাগজের ভেতরের পাতায় কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেয়া হতো মফস্বল সংবাদ বা News from the Districts শিরোনামে। ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় খবর অত্যন্ত বাজে সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। আজাদ পত্রিকায় একজন মফস্বল এডিটর ছিলেন, যিনি মফস্বলের সংবাদদাতাদের প্রেরিত খবর সম্পাদনা করে শিরোনাম দিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করতেন। মফস্বল সংবাদদাতাদের একখানা সৌজন্য সংখ্যা পত্রিকা দেয়া হতো। কোনও পারিশ্রমিক দেয়া হতো না প্রথম দিকে। আজাদের মফস্বল সম্পাদক মফস্বল সংবাদের কোনও দায় যেন তার ওপর বা পত্রিকার ওপর না বর্তায়, সেজন্যে এভাবে কপি সম্পাদনা করতেন। রাজশাহীতে বৃষ্টির খবর দিয়ে সংবাদদাতা প্রেরিত খবর এভাবে ছাপা হয়েছে–"রাজশাহীতে বৃষ্টি হয়েছে বলে লোকে বলাবলি করিতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।"

চট্টগ্রাম থেকে একটি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হতো। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিজে যে সম্পাদকীয় লিখতেন, সে সম্পাদকীয় ১২ পয়েন্টে কম্পোজ হতো। পত্রিকার বডি টাইপ ছিল ৮ পয়েন্ট। তিনি একবার আলজিরিয়ার মুক্তিযোদ্ধা জামিলা বুপাশা সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, যা উল্লেখ করার মতো। জামিলা বুপাশাকে ফরাসী সৈন্যরা ধরে নিয়ে পানির গরম বোতল তার প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়। জনৈক ক্যাপ্টেন এই বর্বর কাজটি করেছেন। ফরাসী ক্যাপ্টেনের এই বর্বরতার কাহিনী তখন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রামের উক্ত সম্পাদক তার সম্পাদকীয়তে এই ঘটনার প্যারাফ্রেইজ করে লিখলেন......."রে কাপ্তেন, তুই যে পথ দিয়া মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া এই ধরায় আসিয়াছিস, আজ তোকে যদি সেই পথ দিয়া পুনরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় তখন কি অবস্থা হইতে পারে তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছিস?"

বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে একদা যাযাবর মন্তব্য করেছিলেন এই বলে, "এগুলি আবশ্যকরূপে হাস্যলেশহীন। ধরনটা প্রায় সুনীতি সঙ্ঘের সভাপতির মত শুষ্কং কাষ্ঠং। মনে হয় বুঝিবা সংসারে বীতরাগ নিরন্তর কোমল স্বভাব একদল এডিটর, সাব-এডিটর, রিপোর্টার, প্রিন্টার

www.pathagar.com

ইত্যাদি মিলে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ বিরক্তিতে সেগুলি লিখে ও ছেপে বের করছে। হাসি নেই, চটুলতা নেই, কোথাও একটু লঘু পরিহাসের বাষ্পমাত্র নেই। সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি থেকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন- অমুক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পর্যন্ত সবই যেন পল্টনের সিপাইদের মত খাড়া সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে।"

ঢাকার দৈনিকগুলোতে স্টাফ রিপোর্টারদের আইটেমের, বিশেষ করে স্থানীয় আইটেমের বড় আকাল থাকতো। খবরের সন্ধানে পূর্ব পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েটে রিপোর্টাররা তেমন কেউ একটা যেতেন না। কোনও সাংবাদিক সম্মেলন বা কোনও ভিভিআইপি'র আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দরে সাক্ষাৎকার, তার আগমনের খবর স্টাফ আইটেম হিসেবে ছাপা হতো। তাও আবার কেউ কেউ ঘটনাস্থলে না গিয়ে নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট অনুবাদ করে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে চালিয়ে দিতেন। ইংরেজি কাগজে এজেন্সি রিপোর্টারদের Intro ....পাল্টে দুই প্যারাগ্রাফ লিখে বাকীটা APP adds বলে পুরো এজেন্সি আইটেম ছাপিয়ে দিব। অনেক রাত অবধি প্রেস ক্লাবে তাস খেলে রাত দশটার পর অফিসে গিয়ে স্থানীয় এজেন্সী আইটেম অনুবাদ ছাড়া উক্ত স্টাফ রিপোর্টারের পক্ষে আর কিছুই করার থাকতো না। আজাদের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন সৈয়দ জাফর আলী, আমাদের সকলের মুন্না ভাই। তিনি কলকাতা থেকেই আজাদে। ঢাকার খেলার রিপোর্টও তিনি করতেন। প্রেস ক্লাব থেকে অনেক রাতে অফিসে গিয়ে খেলার খবরের জন্যে ফোন করতেন অবজার্ভারে এ বি এম মূসাকে। মূসা তখন অবজারভারের এর স্পোর্টস রিপোর্টার। একদিন প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব হেরে যায়। রাতে মুন্না ভাই মূসাকে ফোন করে খেলার ফলাফল জানতে চাইলে মূসা জানান যে, মোহামেডান এক গোল জিতেছে। কে গোল করেছে মূসা তাও বলেছেন, পর দিন সব কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে মোহামেডান হেরেছে- আজাদের রিপোর্ট মোহামেডান জিতেছে। মুন্না ভাই দিনের পর দিন খেলার মাঠে না গিয়ে এভাবে ঘরে বসে খেলার রিপোর্ট করতেন। মূসা ইচ্ছে করেই একাজটি করেছিলেন। তারপর মুন্না ভাই আজাদের কোনও একজনকে খেলার পাস দিয়ে মাঠে পাঠাতেন খেলা দেখে রিপোর্ট করার জন্যে।

জুরিখে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এশীয় দেশসমূহের সাংবাদিকতার মান ও অন্যান্য বিষয়ে একটা জরিপ চালায়। চীন বাদে তখন এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা ছিল ১০০ কোটি। তন্মধ্যে মাত্র ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক দৈনিক পত্রিকা ক্রয় করতো। এর মধ্যে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাঠকই হচ্ছে জাপানী। অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র এক কোটি মানুষ দৈনিক সংবাদপত্রের ক্রেতা। তার মানে এক শ' জনের মধ্যে একজন একটি দৈনিক পত্রিকা ক্রয় করতো। এদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কেও আইপিআই জরিপ চালিয়েছিল। ১৯৬১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত পাকিস্তান অবজারভার সম্পর্কে জরিপ রিপোর্টে বলা হয়- ওই দিনের পত্রিকায় দু'টি সরকারী সংবাদ সম্মেলন ব্যতীত আর কোনও ঢাকার খবর পত্রিকায় নেই। এর অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে ১ ফেব্রুয়ারি কেউ এমন কোনও কাজ করেননি, যা সংবাদ হতে পারে। এটা কি সম্ভব?

www.pathagar.com

ওই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে আরও পরে। এ বি এম মূসা অবজারভারের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর বিদেশে যান সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্যে। তিনি ফিরে এসে অবজারভার পত্রিকায় প্রথম পাতায় বড় বড় করে ছবি ছাপাতে শুরু করেন। পত্রিকার মেকআপ গেট আপে পরিবর্তন আসে। দৈনিক পাকিস্তানে হেডিং কম্পোজ করার লুডলো মেশিন আসার পর পত্রিকার গেট আপ পাল্টে যায়। বাংলা পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পাকিস্তানেই প্রথম লুডলো মেশিন আনা হয়। সত্তরের গোর্কির সময় আর্টিস্ট দিয়ে লীড আইটেমের শিরোনাম বড় বড় অক্ষরে লিখিয়ে ছাপানো দৈনিক পাকিস্তান প্রথম শুরু করে। বাংলা কাগজে চলতি ভাষার প্রয়োগও দৈনিক পাকিস্তানে প্রথম চালু হয়। স্টাফ রিপোর্টারকে 'নিজস্ব বার্তা পরিবেশক' প্রথম মিল্লাত (মোহন মিয়ার মিল্লাত) পত্রিকায় লেখা শুরু হয়।

সংবাদপত্র অফিসগুলোতে এখন আর আগের মত সেই আড্ডা নেই এবং আড্ডার পরিবেশ ও সময়ের বড় অভাব। এখন সংবাদপত্র অফিসে প্রবেশ করতে এত সব আনুষ্ঠানিকতা ও নিরাপত্তার বেড়াজাল ডিঙোতে হয় যে, তাতে বিরক্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। কোনও কোনও সংবাদপত্র অফিসে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে দেহ তল্লাশি পর্যন্ত করা হয়। এই জিল্লতি সহ্য করে নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ যায় না খবরের কাগজ অফিসে। চার দশকেরও বেশি সাংবাদিকতা করার পরও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কোনও কোনও .সংবাদপত্র অফিসে প্রবেশ করতে মনে দ্বিধা জাগে।

আগে যে আড্ডার কথা বলেছি, সে আড্ডার একটা খারাপ দিকও আছে। দৈনিক বাংলা অফিসে অনেক সময় রাতের বেলা নিউজ টেবিলে সাব-এডিটররা এবং রিপোর্টিং বিভাগে রিপোর্টাররা বসার জন্যে চেয়ার পেতেন না। ভিজিটারদের চাপ এত বেশি থাকতো যে, রিপোর্টারদের অধিকাংশ চেয়ারই বহিরাগতরা দখল করে বসে থাকতেন। এরা অমুকের কাছে তমুকের কাছে এসেছেন, এই অজুহাতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন। আজাদ অফিসে কিছু টুকিটাকি দ্রব্যাদি চুরি যাওয়ায় একবার কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক/অসাংবাদিক সকল কর্মচারীর দেহ তল্লাশির বিধান করলেন। কোমরে ভোজালিসহ গেটে নেপালী দারোয়ান নিয়োগ করা হলো। সাংবাদিকদের আপত্তির ফলে এই ব্যবস্থা তুলে নেয়া হয়। কারণ মালিক পক্ষের এই বিধানটি ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। একমাত্র দৈনিক আজাদ ছাড়া বাকী সব পত্রিকারই ভাড়া বাড়িতে অফিস ছিল প্রথম দিকে। আজাদ যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়, তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তান আন্দোলনে আজাদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বিনা পয়সায় লালবাগে বিশাল ভূখণ্ড আজাদকে দান করে। একটা বড় টিনের ঘরে ছিল আজাদের ছাপখানা ও অফিস। ভিটি ও দেয়াল পাকা। শীতকালে রাতে তীব্র শীত অনুভূত হতো।

জনসন রোড থেকে পাকিস্তান অবজারভার এবং অবজারভার গ্রুপের আরও দু'টি প্রকাশনা– সাপ্তাহিক পল্লীবার্তা (পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে পূর্বদেশ নামে প্রকাশিত) ও সাপ্তাহিক চিত্রালী এখান থেকে বের হতো। এই প্রকাশনা গ্রুপের জরাজীর্ণ ভবনে যে টয়লেটটি ছিল, তা ছিল জাদুঘরে সংরক্ষণের বস্তু। অবজারভারের বার্তা সম্পাদক এ বি এম মূসা পাকিস্তান প্রেস কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে করে নিয়ে ওই টয়লেট দেখান। সাংবাদিকরা বহুবার দাবি

www.pathagar.com

উত্থাপনের পরও মালিক পক্ষ টয়লেটটির কোনও প্রকার সংস্কার করতে রাজী হয়নি।

এক পত্রিকার সঙ্গে আরেক পত্রিকার আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও নীতিগত বিরোধ ছিল। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আজাদ ও সংবাদের মধ্যে কলমযুদ্ধ চলেছিল কিছুকাল। তা সত্ত্বেও ১৯৬৪ সালে কলকাতা এবং ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ঢাকার দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকগণ সম্মিলিতভাবে এই দাঙ্গার নিন্দা করে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে সাংবাদিকদের জন্যে প্রথম বেতনবোর্ড রোয়েদাদ ঘোষিত হয়। এই রোয়েদাদ কার্যকর করার পর থেকে সাংবাদিকদের অবস্থার উন্নতি এবং কাজের পরিবেশ বদলাতে থাকে। সাংবাদিকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও লেটেস্ট প্রিন্টিং টেকনোলজির ব্যবহারে পত্রিকাগুলোর চেহারা ও গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম রোটারি প্রিন্টিং মেশিন আমদানি করে। দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেফাক, মর্নিং নিউজ পত্রিকায়ও রোটারি আনা হয়। দৈনিক পাকিস্তানে সোলনা অফসেট রোটারি আমদানি করা হয় সুইডেন থেকে। অবজারভারের জন্যে আমদানি করা হয় আরও বড় রোটারি সেলিকা কালার কিং। ইত্তেফাকও লেটেস্ট মেশিন আমদানি করে। সবগুলোই হলো অফসেট রোটারি। এই মেশিনের ছাপা সুন্দর, অত্যন্ত ঝকঝকে এবং এতে নানাভাবে পত্রিকায় ডেকোরেশন করা যায়। এইসব মেশিনের বড় অসুবিধে হলো এগুলোর ছাপার স্পীড কম। সর্বাধিক যে স্পীডের কথা বলা আছে, সে স্পীডে ছাপা যায় না। বড় কারণ আমাদের নিউজপ্রিন্ট। এছাড়া অন্যান্য কিছু আনুষঙ্গিক কারণেও লিখিত মাত্রার চেয়ে ঘন্টায় চার পাঁচ হাজার কম স্পীডে ছাপতে হয়। ১৯৭০ সালে মহা গোর্কির সময় দৈনিক পাকিস্তানের সার্কুলেশন যখন লাখের কাছাকাছি পৌঁছতে থাকে, তখন কাগজ ছাপতে গিয়ে দেখা গেল যে, এসব মেশিনে ঘন্টায় বড় জোর পনের হাজার কপি ছাপা সম্ভব। অবশ্য অফসেট রোটারির চেয়ে বেশি স্পীডের মেশিন বাজারে থাকা সত্ত্বেও এত কম স্পীডের মেশিন আমদানির কারণ তখনকার সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা। হঠাৎ করে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে দৈনিক পাকিস্তানের প্রচার সংখ্যা রাতারাতি এভাবে আকাশচুম্বী হবে, এটা কেউ ধারণা করতে পারেনি। ভোলার চই ঘাটার চরে মানুষ ও সাপ জড়াজড়ি করে মরে পড়ে আছে– দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পাতায় বিরাট আকৃতির এই ছবি ও গোর্কির ধ্বংসলীলার রিপোর্ট দেখে ওই দিন হকাররা দৈনিক পাকিস্তান অফিস ঘেরাও করেছিল পত্রিকার জন্যে। মোট চার দফা মেশিন চালিয়ে পত্রিকা ছেপে হকারদের চাহিদা মেটানো হয়। ১৭ নবেম্বরের ওই ২৫ পয়সা মূল্যের দৈনিক পাকিস্তান সেদিন দু' টাকায় পর্যন্ত হকাররা বিক্রি করেছিল।

ঢাকার পত্রিকার ছাপাখানায় নতুন প্রযুক্তি এলেও এর যথাযথ ব্যবহারের দক্ষ জনশক্তির অভাব ছিল। সাংবাদিকদের বিদেশে ও দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও অসাংবাদিক বিশেষ করে এই sophisticated মেশিনের মেশিনম্যান এবং প্রিন্টারের বড় অভাব ছিল। খবরের কাগজগুলোর লাইনো ও ইন্টার টাইপ মেশিনগুলো obsolete হয়ে যেতে লাগলো। প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটলো দেশ স্বাধীন হবার পর। কম্পিউটার প্রযুক্তি এলো। প্রেসে কাজের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলো। দু-তিনটি বেতন বোর্ড বাস্তবায়িত হবার পর এই পেশার প্রতি

www.pathagar.com

নতুন প্রজন্মের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। মেধাবী তরুণরা এই পেশায় যোগ দিতে লাগলো। প্রকাশিত হতে শুরু করলো নতুন নতুন পত্রিকা। এতে সাংবাদিকদের বাজার চাঙ্গা হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সাংবাদিকদের দরকষাকষির ক্ষমতার তেমন হেরফের হলো না। এর প্রধান কারণ, নতুন যে সব পত্রিকা বেরুতে শুরু করলো এসব পত্রিকার মালিকরা নিজেরাই সম্পাদক হয়ে বসলেন। দু' একজন পেশাদার সাংবাদিক নিয়োগ করে অধিকাংশ নতুন লোক নিয়ে কম বেতনে যাত্রা শুরু হলো তাদের। পুরনো এবং আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছল পত্রিকার সাংবাদিকরা নিজ নিজ পত্রিকায় বহাল রইলেন। নতুন পত্রিকায় সদ্য পাস করা যেসব নবীন স্নাতক ও ছাত্র যোগ দিলেন, তারা অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে নিজেদের মত করে ভুলভ্রান্তিসসহ যা লিখতেন, অনেক ক্ষেত্রে তাদের নামসহ কাগজে তা ছাপা শুরু হতে লাগলো। এতে তারা মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল–পারিশ্রমিকের কথা ভুলে গেলেন। মালিক-সম্পাদক এই ফাঁদে ফেলে অল্প দামে তাদের শ্রম কিনতে লাগলেন এবং তরুণদের শিক্ষার দিকটা হলো সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। নব্বুইয়ের দশকের শুরুতে যখন ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি পাড়ায় পাড়ায় পত্রিকা গজিয়ে উঠতে লাগলো, তখন এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতায় পত্রিকার পাতা ভরে উঠলো। ঢাকা শহর থেকে বর্তমানে যে সব দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার সঠিক সংখ্যা ও নাম কেউ বলতে পারবেন না। এখন দৈনিক পত্রিকা বের করতে কোনও সাংবাদিক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এমন কিছু ছাপাখানা আছে, যাদের সঙ্গে চুক্তি করলে তারা প্রতিদিন পত্রিকা বের করে দেবে। এসব ছাপাখানা থেকে বিভিন্ন নামে পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। জাতীয় সংসদের প্রেস গ্যালারিতে একদিন হঠাৎ এক ছোকরা ঢুকে পড়ে একটা খালি আসনে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ আমার পকেট লক্ষ্য করে দেখতে পেল একটা অতিরিক্ত বলপয়েন্ট রয়েছে আমার কাছে। সে আমার অতিরিক্ত বল পয়েন্টটি চাইলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কোন পত্রিকার সাংবাদিক? সে গোপীবাগের একটি গলি থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার নাম বললো। কখনও ওই নাম শুনিনি এবং এই ছোকরাকেও দেখিনি। আমি তাকে বললাম যে, একটু পরে যখন হাউজে ঝগড়া শুরু হবে, তখন আমি দু' হাতে দুই কলম দিয়ে লিখতে শুরু করবো। কাজেই কলম দেয়া যাবে না।

তবে সব পত্রিকাকে এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিছু কিছু পত্রিকা পেশাদারিত্বের উৎকর্ষের বলে সত্যিই পাঠকের নজর কেড়েছে। মেকআপ, গেটআপ, শিরোনাম, বিভিন্ন ফিচার ও সম্পাদনার গুণে এ পত্রিকাগুলোকে পাঠকরা গ্রহণ করেছে। সংবাদপত্র প্রকাশে যে অবাধ স্বাধীনতা '৯০ এর দশকে দেয়া হয়েছে তার পরিণামে শত শত সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এটা মাও সেতুং এর উক্তি 'শত ফুল ফুটতে দাও' এর মত ব্যাপার মনে হয়। তবে এর প্রয়োজনীয়তা ও মান বিচার করতে গেলে মোহিতলাল মুজমদারের 'পুঁথির প্রতাপ' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। শত ফুল ফোটার সঙ্গে বাজে ফুল ঝরার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার উন্নয়নে একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ না করলে এ লেখা অসমাপ্ত থাকবে। পিআইবি (প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এদেশের

www.pathagar.com

সাংবাদিক ও সংবাদপত্রে নিয়োজিত অন্যদের প্রশিক্ষণ দানের জন্যে। এর ব্যাপ্তি ও কাজের পরিধি দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে পিআইবি রাজধানীর বাইরের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি জেলায় অন্ততঃ একবার করে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের। সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। এছাড়া পিআইবি'তে সাংবাদিকতার একটি ডিপ্লোমা কোর্সও প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের দিয়ে এই প্রশিক্ষণ ও কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্যে এই কোর্স অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

দেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্যে অনুসরণীয় একটি আচরণবিধি রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল এই আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। এই আচরণবিধি প্রয়োগ এবং তা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্যে এই প্রেস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা। এখানে একটি আদালত রয়েছে। সংবাদ ও সাংবাদিকদের জন্যে প্রণীত আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে সে ব্যাপারে এই আদালতে মামলা করা যায়। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে সে ব্যাপারে মামলা দায়ের করা এবং তা নিস্পত্তির জন্যে এই আদালত গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রেস কাউন্সিলের বিধি বিধানের সীমাবদ্ধতার কারণে এখনও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা হচ্ছে। কারণ প্রেস কাউন্সিল আইনে অপরাধীর শাস্তির কোনও বিধান নেই। প্রেস কাউন্সিল শুধুমাত্র অপরাধীকে ভর্ৎসনা করে দিয়ে উক্ত রায় তার পত্রিকায় ছাপার নির্দেশ দান ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের শরণাপন্ন হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা। বর্তমানে অধিকাংশ পত্রিকায় এর উল্টোটা করা হয়। চরিত্র হননের ব্যাপারে কতিপয় পত্রিকার উৎসাহ এত বেশি যে, পত্রিকা পড়ে মনে হয় এই পত্রিকার আদর্শই হচ্ছে মানুষের চরত্র হনন। প্রতিবাদ জানালে পত্রিকা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য যায় যে, মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করার উদ্দেশ্যেই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি হন, সে ক্ষেত্রে উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে টেনে হিঁচড়ে আদালতে দাঁড় করান। তখন জিগির তোলা হয় সাংবাদিকের অবমাননা ও লাঞ্ছনার।

দৈনিক বাংলা বন্ধ করে দিয়ে এদেশের সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের স্বার্থের বড় রকমের ক্ষতি করা হয়েছে। এ দেশের সাংবাদিকতায় দৈনিক বাংলা ছিল Trend setter। অনেকেই বলতেন দৈনিক বাংলা সাংবাদিকদের পত্রিকা। এই পত্রিকা ছিল সাংবাদিকদের জন্যে অনুকরণীয় ও আদর্শ স্থানীয় । সাংবাদিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও সুযোগ সুবিধা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক বাংলা ছিল পথ প্রদর্শক। ওয়েজবোর্ড প্রথম বাস্তবায়িত হতো দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে অন্যান্য পত্রিকায় ওয়েজবোর্ড বাস্তাবায়নের জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হতো। এজন্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন পত্রিকার মালিকরা দৈনিক বাংলাকে দু' চোখে দেখতে পারতেন না। একটি পত্রিকার মালিক অহরহ দৈনিক বাংলার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতেন। এমনকি সংবাদপত্র পরিষদের কর্মকর্তা হয়ে পরিষদের অন্যতম সদস্য

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলার বিরুদ্ধে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে তিনি বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। দৈনিক বাংলা বন্ধ করার জন্যে যে ইউনিয়ন নেতা শেখ হাসিনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আজ তিনি অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। নয় মাস যে পত্রিকা বেতন দিতে পারছে না, সে পত্রিকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি কি আরেকটি ওয়েজবোর্ড নিয়ে নিজের কবর নিজে রচনা করবেন? আজ যারা ইউনিয়নের নেতৃত্বে আছেন, তাদের পত্রিকায় নতুন বেতনবোর্ড বাস্তবায়নের আর্থিক সচ্ছলতা নেই। কাজেই নতুন বেতন বোর্ডের দাবির ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

বর্তমানে সাংবাদিকতার যে হাল, তাতে মনে হয় আমরা নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীনতার নামে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা নৈরাজ্যকে টেনে আনছে। এর দ্রুত অবসান হয়ে সুস্থতা ফিরে আসুক এই কামনা করি।

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সিটি এডিটর

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাব ॥ কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি

বোরহান আহ্‌মেদ

প্রেস ক্লাবের সেই লাল ভবনটা এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐতিহাসিক ভবন। ব্রিটিশ ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন বোসের বাড়ি ছিল এটি। সেদিনের সেই বাড়িটি ছিল বুদ্ধিজীবীদের মিলনমেলা। পাকিস্তানের গোড়ার দিকের ঘটনা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত গুটিকয়েক দৈনিকের সাংবাদিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার। আর শহরের মাঝামাঝি এলাকার এ ভবনটি বরাদ্দ নিয়েছিলেন প্রেস ক্লাবের জন্যে। সে ছিল পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। তার পর থেকে এ ভবনটি সাংবাদিকদের দ্বিতীয় বাসস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ভবনকে ঘিরে একেক সাংবাদিকের অনেক স্মৃতি জড়িত রয়েছে। এর দেয়ালে কান পাতলে আজও শোনা যাবে অনেক সাংবাদিকের জীবনগাথা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিপোর্টিং আর বার্তা বিভাগের সাংবাদিকরা যে যাঁর অফিসে চলে যেতেন। কিন্তু সামনের রুমটির সোফা আলোকিত করে বসে থাকতেন অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালাম, ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আর সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরীসহ বেশ ক'জন প্রবীণ সাংবাদিক। তাঁরা কখনও উজির-নাজির মারতেন, নেতাদের মুণ্ডুপাত করতেন। সেদিনের রাজনীতি নিয়ে চলতো তুমুল তর্কবিতর্ক। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর অর্থনীতি নিয়েও হতো হৈ চৈ।

'৭১-এর ২৫ মার্চের ভয়াবহ রাতে পাকি হায়েনা বাহিনী হামলা করেছিল ক্লাবের পবিত্র অঙ্গনে। কামান দিয়ে লাল ভবনের পশ্চিম পাশের দেয়ালে গোলাবর্ষণ করেছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সেই ভাঙা দেয়াল অমনি অবস্থায় ছিল। ভেতরে ভেঙেচুরে তছনছ করেছিল। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় ফয়েজ ভাইসহ বেশ ক'জন ছিলেন সেই রাতে ঐ ভবনে। তাঁদের ওপরও হামলা হয়েছিল। মারাত্মক আহত অবস্থায় তাঁরা কোনও রকমে আত্মরক্ষা করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তারপর ন'মাস প্রেস ক্লাবটা ছিল অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায়। এর মধ্যেও মাঝে মধ্যে যেতাম অত্যন্ত সন্তর্পণে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রেস ক্লাবের গুরুত্ব বেড়েছিল অনেক বেশি। আমাদের জীবনের সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্কও হয়ে উঠেছিল আরও গভীর। প্রতিদিনই দীর্ঘসময় কাটতো এখানে। প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এমনিভাবে আমারও 'দ্বিতীয় আবাসন' হয়ে উঠেছিল ঐ লাল ভবনটি। ডালপুরি আর লাল চা খেয়ে কত দুপুর আর সন্ধ্যা যে কেটেছে, তা ভাবতে গেলে আজও বিস্মিত হতে হয়!

www.pathagar.com

’৭৪-এ পার্লামেন্টে জারি হয়েছিল একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল ভিন্ন দল ও মতের রাজনীতি। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন গণতন্ত্রমনা অনেক নেতাকর্মী। তাঁরা প্রেস ক্লাবে এসে তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করতেন। ক্লাবের পেছনের মাঠে একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক সিনিয়র সাংবাদিক কথা বলছিলেন। নিম্নস্বরে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল। বিকেল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত যখন তাঁদের সে আলোচনা শেষ হয়নি, তখন কৌতূহলবশত প্রবীণ সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইনি কে? তিনি তখন বলেছিলেন, ইনি হচ্ছেন সর্বহারা দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা। এমনিভাবে গোপন রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেখেছি ক্লাবে। তাঁদের বিক্ষুব্ধ বলিষ্ঠ বক্তব্য শুনেছি। এর অল্প কিছুদিন আগেই পার্লামেন্টে পাস করা হয়েছিল স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট। এ আইনের প্রায় পুরোটাই ছিল সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখলে বা প্রকাশ করা হলে তার বিরুদ্ধে ছিল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি। ’৭৩-এর প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং এ্যাক্ট তো ছিলই। সর্বোপরি ছিল বিজ্ঞাপন বণ্টন নীতিমালা আর নিউজপ্রিন্ট কোটা বরাদ্দ ব্যবস্থা। এ আইনই ছিল সংবাদপত্র নিবর্তনমূলক কালাকানুন। এত কালাকানুন জারি করেও সংবাদপত্রে অনেক দুর্নীতি ও নেতাদের অপকীর্তির খবর প্রকাশিত হচ্ছে দেখে ক্ষমতাসীন অনেকেই তখন বিব্রত হচ্ছিলেন। তাই সরকার দু’একটি বাদে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেবে সর্বত্র জোর গুজব শোনা যাচ্ছিল। এতে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ হয়ে পড়েছিলেন বিচলিত। নীরব নিশ্চুপ। ইউনিয়নের ঐ ছোট্ট রুমটিতে তাঁদের কেউ কেউ চুপচাপ বসে থাকতেন। এমনি সঙ্কটময় অবস্থায়ও গুটিকতক সাংবাদিক মাত্রাতিরিক্ত তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। লম্বা কাগজ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ঘুরে তাঁরা শুরু করেছিলেন বাকশালে যোগদানের স্বাক্ষর অভিযান। বাস ভর্তি করে সাংবাদিকদের নিয়ে গিয়েছিলেন গণভবনে। ঝড়ঝঞ্ঝা আর মুষলধারার বৃষ্টি উপেক্ষা করেও গলায় ফেস্টুন এঁটে বাকশাল অফিসে হাজিরা দিয়ে বিশেষ নেতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন অনেকেই।

এত কিছু করেও সংবাদপত্র বাতিল অধ্যাদেশ ঠেকানো সম্ভব হয়নি। ’৭৫-এর ১৬ জুনে দেশের সকল সংবাদপত্র (ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, Bangladesh Times ও Bangladesh Observer ছাড়া) আর সাময়িকী বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সাংবাদিক, সাধারণ বিভাগ ও প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় এক হাজার সংবাদপত্রকর্মী বেকার হয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন প্রেস ক্লাবে। অনেকেই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এখানে বসে সময় কাটাতেন। বেকার জীবনের সেইসব দুঃসময়ের কথা মনে হলে আজও গা শিউরে ওঠে! ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে গ্রামবাংলার লাখ লাখ মানুষ ছুটছিল শহরের দিকে। কঙ্কালের মতো মানুষগুলো রাজধানীতে এসে ভিড় জমিয়েছিল। রাজনৈতিক দলীয় কর্মকাণ্ড ছিল নিষিদ্ধ– সকল দলমতের মানুষ ছিল স্তব্ধ। সরব হয়ে উঠেছিল রক্ষীবাহিনী। তাদের নির্মম নির্যাতনে সবকিছু হয়েছিল স্তম্ভিত।

এমনি অবস্থায় ১৫ আগস্ট ঘুম ভেঙেছিল কামানের ভয়ঙ্কর গর্জনে। সেই শব্দে বিদীর্ণ হয়েছিল রাতের অন্ধকার। রেডিও খুলতেই শুনেছিলাম আর এক দুঃসংবাদ। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন তাঁর পরিবারের অনেক সদস্য। মহানগরীতে কারফিউ জারি করা

www.pathagar.com

হয়েছিল। ঘন ঘন ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল। এমন আতঙ্কজনক অবস্থায় ঘরে বসে থাকতে পারিনি। ধানমণ্ডি, হেয়ার রোড, মিন্টো রোডের মন্ত্রিপাড়া হয়ে এসে বসেছিলাম ক্লাবে। বিভিন্ন সহকর্মী আর সিনিয়রদের কথা শুনছিলাম। বাকশালের সদস্য হওয়ার জন্যে যারা দু'দিন আগেও চোখ রাঙাত, অশালীন ভাষায় কথা বলত, শায়েস্তা করার হুমকি দিত, তাদের কাউকেই সেদিন আর দেখতে পাইনি। অমনিভাবে দিনের সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছিল। আমরা মাঠে বসে ছিলাম। কখন সূর্য ডুবেছে বুঝতে পারিনি। অন্ধকার নেমে এসেছিল।

ক'দিন পর সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাও যেন সাধারণ মানুষের কাছে স্বাভাবিক হয়েছিল, স্বস্তি ফিরে এসেছিল। একে একে নিষিদ্ধ ঘোষিত পত্রপত্রিকা প্রকাশ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সংবাদ থেকে সংগ্রাম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত হতে লাগল নতুন পত্রিকাও। রাজনৈতিক দলগুলোও আবার তাদের স্বকীয় আদর্শে বিকশিত হতে শুরু করেছিল। শুরু হয়েছিল বহুদলীয় কর্মতৎপরতা।

'৭৬ সালের ঘটনা। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাস। ক'দিন আগে আগা খান এসেছিলেন ঢাকায়। স্বাধীনতার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম ঢাকা সফর। বেশ কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল সেই পাকিস্তান আমল থেকেই। প্রেস ক্লাবের প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনেও তিনি নানা রকম সহায়তা করতেন। তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্যে প্রেস ক্লাবের পশ্চিম পাশের মাঠে বিশাল প্যাণ্ডেল করা হয়েছিল। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল সেটি। সে অনুষ্ঠানে আগা খান দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, ক্লাবের নতুন ভবন করতে যে অর্থ ব্যয় হবে, তার সবটাই তিনি দেবেন। প্রেস ক্লাবের নতুন ভবন নির্মাণ করার কথা অনেকেই ভাবছিলেন, কিন্তু সমস্যা ছিল অর্থের। আগা খানের সেদিনের সে আশ্বাসে অনেকেই তাই খুশি হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পরই কিছুসংখ্যক আমলা সচিবালয় সম্প্রসারণের জন্যে প্রেস ক্লাব এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, সচিবালয়ের দোরগোড়ায় প্রেস ক্লাব থাকার ফলে দুর্নীতিবাজ আমলাদের কোনও অপকীর্তিই আর গোপন থাকছে না! তাঁরা তাই সব সময়ই তটস্থ ছিলেন। এটাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, তাই তাঁরা প্রেস ক্লাবের নামে বরাদ্দকৃত জায়গা বাতিল করেছিলেন। এমনি অবস্থায় প্রেস ক্লাবের জন্যে ছোট্ট এক খণ্ড জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল শিল্পকলা একাডেমীর পাশে। শিল্পকলা একাডেমীও তখন গড়ে ওঠেনি। ওখানে ছিল বিশাল খালি জায়গা। জায়গাটি প্রেস ক্লাব গ্রহণ করবে, না প্রত্যাখ্যান করবে, এ নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির দীর্ঘ বৈঠক হয়। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত এটি গ্রহণ করা হোক। শেষ পর্যন্ত একদিন ম্যানেজিং কমিটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা মিলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিল্পকলা একাডেমীর পাশের জায়গায় খুঁটি গেড়ে প্রেস ক্লাবের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন আমাদের অস্তিত্ব।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্লাবের পুরনো জায়গার জন্যে অনেক তদ্বির শুরু হয়েছিল। তারপর একদিন শুনলাম, ক্লাবের জায়গা অর্থাৎ তোপখানা রোডেই প্রেস ক্লাব থাকবে। তারপর জায়গাটা নতুন করে প্রেস ক্লাবের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। স্বস্তির নিশ্বাস

www.pathagar.com

ফেলেছিলেন সকল সদস্য। এর অল্প কয়েকদিন পরেই আগা খান এসেছিলেন ঢাকায়। আর তাঁকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল যথাযথভাবেই। সেই অনুষ্ঠানেই আগা খান আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রেস ক্লাব ভবন নির্মাণের সকল খরচ তিনিই দেবেন। পরের দিন সকল পত্রিকায় বড় করেই ছাপা হয়েছিল সে খবর। তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি সকাল বেলা প্রেস ক্লাব ও ইউনিয়নের নেতাদের ফোন করেছিলেন। নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি। তারপর সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের বৈঠক হয়েছিল। এনায়েতুল্লাহ খান, নির্মল সেন, কামাল লোহানী, গিয়াস কামাল চৌধুরী, রিয়াজউদ্দিন আহমদসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে। জিয়াউর রহমান পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, প্রেস ক্লাব একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে এর ভবন নির্মাণ করা হলে সাংবাদিকরা কি তাঁদের পেশাগত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবেন? সবাই চুপ! কিন্তু উপায় কি? ভবন নির্মাণের মতো আর্থিক সঙ্গতি ক্লাবের নেই!

জিয়াউর রহমান তখন বলছিলেন, প্রেস ক্লাব জাতীয় প্রতিষ্ঠান, এর ভবন নির্মাণের সকল সাহায্য দেবে সরকার। সরকারের আর্থিক সাহায্যেই নির্মিত হবে ক্লাব ভবন। সেদিনের সে বৈঠকেই তিনি সাংবাদিকদের আবাসিক স্থান বরাদ্দ ও পেশাগত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করারও আভাস দিয়েছিলেন। এর অল্প ক'দিন পরই অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি '৭৯ তারিখে প্রেস ক্লাব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন জিয়াউর রহমান নিজে। এরপর অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে প্রেস ক্লাবের নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। '৮১'র ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়া শাহাদাৎ বরণ করলে ক্লাবের নির্মাণ কাজ বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনিভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় আজকের প্রেস ক্লাবের নির্মাণ কার্যক্রম।

সেই লাল ভবন ভেঙে সেখানেই নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল ভবন। জাতীয় প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকদের দ্বিতীয় আবাসন। তোপখানা রোড দিয়ে চলতে গেলে আজও নিজের অজান্তেই প্রেস ক্লাব ভবনের দিকে চোখ যায়। পুরনো স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে সেই লাল ভবনের স্মৃতি, নতুন ভবন নির্মাণের পর্যায়ক্রমিক দৃশ্যাবলী আর অক্লান্ত পরিশ্রমী কিছু মুখচ্ছবি।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক

www.pathagar.com

আদি ও নবরূপে জাতীয় প্রেস ক্লাব

বেলাল চৌধুরী

সপ্তদশ শতাব্দের শুরুতেই বুড়িগঙ্গার তীর ধরে নদীবন্দর ও রাজমহল থেকে স্থানান্তরিত প্রাদেশিক রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকা শহরের পত্তন ঘটে মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিস্তির হাতে। অবশ্য তখন ঢাকার নামকরণ করা হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর হিসেবে। মজার ব্যাপার, সে আমলেও দোলাইখালের এপার ওপারকে নতুন আর পুরাতন শহর হিসেবে গণ্য করা হতো। লক্ষ্মীবাজার, তাঁতীবাজার, সূত্রাপুর, শাঁখারি বাজার, জালুয়া নগর, বানিয়া নগর, গোয়াল নগর, কুমারটুলি, পটুয়াটুলি ছিল হিন্দু প্রধান। আর চকবাজার, ইসলামপুর, মোগলটুলি, উর্দু রোড, বকশিবাজার, দিওয়ান বাজারের নাম দেখলে টের পেতে দেরি হয় না যে সেসব মোগলদের হাতেই তৈরি। মোগলদের আমলেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিনদেশীদের আগমন ঘটে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ মসজিদ, কেল্লা, কাটরা, গীর্জা ওই সময়কালেরই নিদর্শন।

বিগত শতাব্দের প্রারম্ভিক দুই কি তিন দশকের মধ্যে তৎকালীন যুক্ত বাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক, সামাজিক ঘটনা বাঙালি জীবনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর মধ্যে প্রথমে বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখযোগ্য হলেও জগতসভায় বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি বৃহত্তর পরিচিতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে। এছাড়া ঢাকার অদূরে ও বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও খ্যাতির কথাও কম যায় না। আসলে বাঙালি জীবনে তখন নবজাগরণের ঢেউ। কথাগুলো বলতে হলো ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর প্রেক্ষিতে।

ইতিহাসের পালাবদলে ঢাকা নগরী তখন ইংরেজ শাসনাধীন। মোগল আমলের সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ইংরেজদের হাতে ঢাকা নগরীর রূপান্তরিত হওয়ার নির্দশনের মধ্যে কার্জন হল, হাইকোর্ট ভবন, কোর্ট কাচারি, মিটফোর্ড হাসপাতাল ছাড়াও বঙ্গভঙ্গের কারণে সচিবালয় হিসেবে গড়ে-ওঠা ভবনটি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগের পরে মেডিক্যাল হাসপাতাল ও কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এছাড়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বসবাসের জন্যে ইন্দোসারাসেনিক স্থাপত্যরীতির অনেকগুলো ভবন তৈরি করা হয় মূলত মুখ্য আমলাদের জন্যে। যেগুলো পরে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে হস্তান্তরিত করা হয়। এগুলোর বেশিরভাগই চুনসুরকি ও লাল ইটের গাঁথনিতে নির্মিত হয়েছিল দেশজ আবহাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়-হ্রাসের কথা ভেবে। বছর বছর রেড অক্সাইডের পোচ

www.pathagar.com

দিলেই ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠতো। দিশি, মোগল ও ইংরেজ স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে এই ভবনগুলো গড়া হয়েছিল।

ঢাকা শহরের স্থাপত্যকলাকে সাধারণভাবে চারটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে ১২০৫ থেকে ১৫৭৫ পর্যন্ত মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের কাল। দ্বিতীয়টি ১৫৭৫ থেকে ১৫৫৭ পর্যন্ত মোগল আমল, তৃতীয় পর্ব হচ্ছে ব্রিটিশ আমল ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ অব্দি। এর পরেই আসছে দেশবিভাগ পরবর্তী আজ পর্যন্ত। সোজা বাংলায় তাই ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে প্রাক মোগল যুগ, মোগল যুগ, ব্রিটিশ আমল ও আধুনিক পর্যায়। অবশ্য এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়।

দেশভাগের আগে পর্যন্ত ঢাকা শহর বিবেচিত হতো লেখাপড়া শহর হিসেবে। আসলে খ্যাতিমান শিক্ষকমণ্ডলীকে নিয়ে গড়ে-ওঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কারণে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামেও অভিহিত করা হতো। যেমন ছিলেন এর প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষকবৃন্দ, তেমনই ছিলেন প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী, যারা পরবর্তীকালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠা পান। দেশভাগের পরই প্রকৃতপক্ষে আবার আকৃতি, আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে ঢাকা শহরের গা থেকে ধীরে ধীরে মফস্বল নাম মুছে গিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করে প্রাদেশিক রাজধানী শহরে পরিণত হয়। উপরিউক্ত পূর্বনির্মিত ভবনগুলো একে একে মন্ত্রী-শান্ত্রী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ করা হয়। এরকমই একটি হচ্ছে তোপখানা রোডের জাতীয় প্রেস ক্লাব ভবনটি।

ঢাকা থেকে দেশভাগের আগে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নেহাৎ কম না হলেও পেশাগত জীবিকা গ্রহণকারী সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কয়েকটি ছোটখাটো সাপ্তাহিক ছাড়া সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তদের 'প্রগতি' সেকালে বিরাট সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু ওঁরা ছিলেন তখন ছাত্র। আর অন্য যেসব পত্র-পত্রিকা বেরুতো, সেগুলোতে না ছিল পেশাদারিত্ব, না ছিল সংবাদপত্র বলতে যা বোঝায় তার বৃহত্তর পরিধি। দৈনিক তো ছিলই না বলতে গেলে। তবে শ্রীশ দাস লেন থেকে 'সোনার বাংলা' নামে যে পত্রিকাটি বের হতো, তাতে আজকের খ্যাতিমান কবি শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই অফিস ভবনটিই পরবর্তীকালে লেখক-শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের আড্ডাস্থল বিউটি বোর্ডিং হিসেবে খ্যাত হয়েছিল।

যার ফলে প্রকৃত অর্থে দেশভাগের অব্যবহিত পর পরই প্রচার মাধ্যমে ঢাকার প্রথম পদচারণা। কলকাতা থেকে এলো সাংবাদিকতার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত মওলানা আকরম খাঁর 'আজাদ'। কিছুকাল পরে কলকাতা থেকে আগত কিছু তরুণের উদ্যোগে প্রগতিপন্থী ও ব্যতিক্রমধর্মী দৈনিক সংবাদের প্রকাশ শুরু হলো। আইনজীবী ও তৎকালীন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী সেই প্রথম পত্রিকার জগতে পা রাখলেন ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' এর মাধ্যমে। সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইংরেজিতে তুখোড় আবদুস সালাম সাহেব। তাঁর সঙ্গে প্রথম দিকে ছিলেন কলকাতা থেকে আগত 'রয়িস্ট' মানে এম এন রায়ের ভাবশিষ্য জহুর হোসেন চৌধুরী, কবি হিসেবে খ্যাত

www.pathagar.com

হলেও প্রকাশনায় প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন আবদুল গণি হাজারীও ছিলেন অবজার্ভারে। মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দিয়ে শুরু করে ক্রমে তফাজ্জল হোসেন যিনি মানিক মিয়া নামে খ্যাত মোসাফির নামের আড়ালে 'রাজনৈতিক মঞ্চ' লিখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, ক্রমে তাঁরই সম্পাদনায় দৈনিকে রূপান্তরিত হলো ইত্তেফাক। প্রথম দিকে যার শীর্ষদেশে লেখা থাকতো মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত।

ঢাকা থেকে বেরুতো আরেকটি বাংলা দৈনিক, ইনসাফ। এছাড়া ছিল গোঁড়া মুসলিম লীগের সমর্থক এবং ভাষা আন্দোলন বিরোধী ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ। আর ছিল ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়ার দৈনিক মিল্লাত, কলকাতা থেকে প্রকাশিত আবুল মনসুর আহমদের দৈনিক ইত্তেহাদ- নবপর্যায়ে আবার বেরিয়ে শুধু মুদ্রণ সৌকর্যে নয়, গুণেমানে রুচি আর পেশাদারিত্বে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করলো। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি উর্দু দৈনিকও বেরুতে লাগলো। এর মধ্যে পয়গাম, পাসবান এর কথা মনে পড়ে। এই যখন অবস্থা তখন ঢাকার পত্র-পত্রিকাগুলোর সঙ্গে কলকাতার স্টেটসম্যান, বার্তা সংস্থা পিটিআই ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের দৈনিক কাগজগুলোর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে তখন রীতিমতো একটা নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি হলো। সবাই মিলে নিজেদের মতো করে বসবার, মতামত বিনিময় করবার সর্বোপরি বিনোদন ও গা ছেড়ে আড্ডা দেওয়ার জন্যে একটা ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার ফলেই জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

তদানিন্তন সরকার প্রেস ক্লাবের জন্যে শহরের কেন্দ্রস্থল বিশেষ করে সচিবালয়ের পাশাপাশি বর্তমান প্রেস ক্লাবের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন একটি বাড়ি বরাদ্দ দিলেন। সামনে ছিল বিরাট সবুজ লন, ভেতরে কাঠের সিঁড়িঅলা বেশ বড়সড় দ্বিতল বাড়ি। এইভাবে ঢাকার কর্মরত সাংবাদিক সম্প্রদায়ের জন্যে সেই প্রথম একটি নিজস্ব ক্লাব বাস্তবে রূপ নিল। ঐ বাড়িটি ছিল ঔপনেবেশিক স্থাপত্যরীতির নিদর্শন। যেমন তার জাঁকজমক, তেমনই পোড়া লাল ইটের দ্বিতল বাড়ি কার্পেট-মসৃণ বিস্তৃত সবুজ লন আর গাছগাছালির বিপরীতে বর্ষা বাদ দিলে প্রায় সব ঋতুতেই লাল ইটের বাড়িটিকে সকালে সোনা রঙের কোমল আলো বা বিকেলের পড়ন্ত রোদে এক ধরনের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে তুলতো। সর্বোপরি আশপাশের ঝাঁকড়া মাথা বিশাল বিশাল মেঘশিরীষের গাছ আর চারপাশের পরিবেশের সঙ্গেও বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পাশের চামেরি হাউস যা অফিসারদের ক্লাব হিসেবে তৈরি হয়, যেটি এখন সিরডাপ অফিস ও মিলনায়তন, তার লাগোয়া পাকিস্তান আমলের তৈরি শিক্ষা ভবনটির বেখাপ্পা বাস্তুরূপ দেখলে গাছপালা উদ্যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোনও কিছুরই আর লেশমাত্র সাযুজ্য যেন এক লহমায় উবে যায়।

আরেকটি সৌন্দর্য খনি ছিল এখন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের অফিসের সামনের গোল চত্বরে বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। বসন্তকালে মনে হতো বিশাল বিরাট এক রঙের মেলা বসেছে যেন! দুর্ভাগ্য, পঁচাত্তর পরবর্তী সময় কোনও এক কর্তাব্যক্তির খামখেয়ালিতে যেটিকে নির্মূল করে একটি ফোয়ারা বসানো হয়। যাতে বছরভর শুধুই খরা। না উর্ধমুখী জলধারার রামধনু না রঙের বসন্তবাহার।

www.pathagar.com

স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জাতীয় প্রেস ক্লাব বলে শুরুতে এটা যে সাংবাদিকদের জন্যেই হয়েছিল, তা নয় কিন্তু। প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এখানে নানা গণমাধ্যম ও পেশার কর্মজীবীরা ছাড়াও লেখক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক এমনকি রাজনীতিকদের মিলনমেলার মতোই মনে হতো। খাবার-দাবারের মানও ছিল যথেষ্ট উন্নত, ছিল স্বাস্থ্যসম্মত একটা স্বতন্ত্র স্বাদ ও গন্ধ।

নিচ তলায় সামনের বারান্দার এক কোণে বসে জম্পেশ করে আড্ডা দিতেন সব বাঘা বাঘা কিংবদন্তীর সাংবাদিকরা। এঁদের মধ্যে ছিলেন অবজারভারের সালাম সাহেব, ইত্তেফাকের মানিক মিয়া সাহেব, সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী ত্রয়ী। তাঁদের আলোচনায় গোটা দেশের তো বটেই, এছাড়া বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে, কে কি বলবেন বা করবেন সেসব ইতিহাস, ভূগোল প্রসঙ্গ ঘোরাফেরা করতো। প্রায়শ তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যেত মর্নিং নিউজের সৈয়দ মহসিন আলী, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, এ এল খতিব, সৈয়দ নূরউদ্দিন প্রমুখকে। কখনও তাঁদের চড়া গলা, কখনও লঘু হাস্য পরিহাসের মাঝেও বেশ কড়া ডোজের আদিরস উপভোগ্য হয়ে উঠতো।

দেশের তো বটেই, বিদেশেরও বহু নামজাদা জ্ঞানীগুণীর পদধূলি পড়েছে প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন সময়ে। একথাও ব্যতিক্রম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্বরস্য বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীরা প্রেস ক্লাবের পবিত্রতা নষ্ট করেছিল প্রেস ক্লাবের আঙিনায় সদম্ভ বুটের শব্দ তুলে। হ্যাঁ, ওরা নিজেরা রসাতলে যাওয়ার আগে ঐ একবারই।

সদস্য বা উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে তিনি যে কোনও দলেরই লোক বা সমর্থক হোন না কেন, তাঁদের মধ্যে এখনকার মতো উগ্র রেষারেষি, হিংসা বা বিদ্বেষ দেখা যেত না। তর্কবিতর্ক থাকলেও সেটা ছিল টেবিল নির্ভর এবং সুস্থ স্বাভাবিক করমর্দনের ও গলাগলির। চিন্তা চেতনায় ছিল দেশ ও দশের সার্বিক মঙ্গল বিধান। সবচেয়ে বড় কথা, যা কিছু বিতর্ক বা ভুল বোঝাবুঝি টেবিলেই চুকেবুকে যেত। বর্তমানের অসহিষ্ণুতা সমাজ জীবনকে যেভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে, তার হাত থেকে কি করে নিষ্কৃতি মিলবে, তা কেউ জানে না। এখন না জানলেও সেদিন এসবের বালাই ছিল না বললেই চলে। যেমন বাইরে তেমনই ভেতরেও বিদ্যমান ছিল একটা কলুষমুক্ত আবহাওয়া। প্রেস ক্লাব যথার্থ অর্থেই ছিল পবিত্রতম স্থান।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পুরনোর জায়গায় নতুনের আগমন সবারই কাম্য। কিন্তু কখনও কখনও প্রাচীনেরও একটা ঐতিহ্যিক মূল্য থাকে। আগের প্রেস ক্লাব আর বর্তমানের প্রেস ক্লাবের সঙ্গে কোনও তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়, স্থাপত্যের দিক থেকে পুরনো অর্থাৎ লাল ইটের দ্বিতল বাড়িটি যতটা দৃষ্টিনন্দন ছিল, বর্তমানটি হয়তো ঢের বেশি অর্থ উৎপাদনকারী এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে বাস্তবোপযোগী হলেও উৎকর্ষের দিক থেকে আমাদের পক্ষপাত কিন্তু পুরনোটির দিকেই। শুধু দৃষ্টির আরামই নয়, হৃদয়গ্রাহিতার প্রশ্নে প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ পুনঃসংস্কার করে পুরনো ভবনটি যথাযথভাবে রেখে দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতকল্প উদ্যান রচনার কাজটি হতো মানানসই।

প্রেস ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা যেহেতু অবসর বিনোদনের সঙ্গে জড়িত, সেহেতু খোলামেলা

www.pathagar.com

উন্মুক্ত লন পরিবেশগত দিক থেকেও গাছপালা দিয়ে ঘেরা উদ্যান হলে ইতিহাস, দেশজ বাস্তুশিল্প ও ইউরোপীয় ধাঁচের সম্মিলনে নগরজীবনের ক্রমবর্ধমান রুদ্ধশ্বাস হুড়োহুড়ি গুঁতোগুঁতি থেকে অন্তত কিছুটা হলেও মুক্ত থাকা যেত। সেই সঙ্গে অন্তরঙ্গন ও বহিরঙ্গন ক্রীড়ারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে। যদিও অন্তরঙ্গন ক্রীড়া প্রচলিত থাকলেও বহিরঙ্গন ক্রীড়ায় প্রেস ক্লাবের ভূমিকা খুবই নগণ্য। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সবশেষে জাতীয় প্রেস ক্লাব বলেই এত কথা। না হলে এই ঢাকা শহরেই যখন দেখা যায়, সরকার পরিচালিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ভবনটির অবস্থান হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গুলিস্তানের মোড়ে, যার নিচের তলায় তেহারি-নেহারি, রুটি-কাবাব আর জিলিপি বিক্রি হয়। হায়রে সাহিত্য-সংস্কৃতি! দোতলা-তিনতলার অফিস ঘর আর বই-পুস্তকের সংগ্রহশালায় গেলে আকস্মিক প্রকৃতির ডাকে মানে ছোটটিতেও সাড়া দিতে গেলে নগদ পয়সা গুণে প্রস্রাবাগার ব্যবহার করতে হতো। জানি না এ ব্যবস্থা এখনও বলবৎ কিনা।

ঐ জায়গাটিকে ব্যবসাকেন্দ্রের জন্যে বিক্রি করে সে টাকায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রটিকে কি বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার কাছাকাছি স্থানান্তরিত করা যেত না? বর্তমান জায়গাটিতে একটি অত্যাধুনিক মল বা প্লাজা তৈরি করে ভাড়া দিয়ে যে অর্থ উপার্জন করা যেত, তা দিয়েই তো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রভূত উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মচারীদেরও ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হতো। যাক, ধান ভানতে শিবের গীত আর নয়।

বরং প্রেস ক্লাবের ভালোমন্দের দিকেই দৃষ্টি ন্যস্ত করা যাক। বর্তমানে প্রেস ক্লাব সংলগ্ন আরেকটি মিলনায়তন করা হয়েছে, যেখানে মাঝে মাঝে প্রেস ক্লাব সংক্রান্ত বা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে যেমন মাসিক কবিতা পাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বইয়ের প্রকাশনা উৎসব, বিয়ে-শাদি, গায়ে হলুদ, খৎনা, শোকসভা, স্মরণসভা কি-না হচ্ছে। অবশ্য ভাড়ার বিনিময়ে।

এখন অবশ্য এর পাশাপাশি গত কয়েক বছরে বর্তমান সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক শওকত মাহমুদরা আসার পর মূল ভবনের ভিআইপি লাউঞ্জ হয়েছে যা বইয়ের প্রকাশনা বা কবিতা পাঠ বা সাহিত্য সভা আয়োজনের জন্যে খুবই উপযুক্ত। আর বিভিন্ন সংস্থা, দল ও প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক সম্মেলন বছরভর তো লেগেই আছে।

সত্য-মিথ্যা জানা নেই, বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে বর্তমান ভবনটিকেও নাকি আকাশচুম্বী বহুতল করার প্রস্তাব রয়েছে। তার মানে ভোগ্যপণ্য সমাজের ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে যাচ্ছেন সাংবাদিকরাও। যে সাংবাদিকদের বলা হয় ফোর্থ স্টেট, যার অপর তিনটি শ্রেণী হচ্ছে পার্লামেন্টে বিশপ সম্প্রদায়, লর্ড সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বলা যায়, তাঁদের যদি এই হাল হয়, তবে সমাজে আর থাকে কি? এমনিতেই সাংবাদিকদের নিয়ে নানা অপবাদ আর অভিযোগ। সমালোচকদেরও দোষ দেয়া যায় না। কারণ সাংবাদিকরা নিজেরাই তো শতধা বিভক্ত।

www.pathagar.com

একদা প্রেস ক্লাব আলো করে থাকা সে সব অসমসাহসী ডাকসাইটে সাংবাদিকরা তো আজ বিরল প্রজাতির শামিল।

লেখক বিশিষ্ট কবি, ভারত বিচিত্রার সাবেক সম্পাদক

www.pathagar.com

দেশপ্রেমবোধ বিবর্জিত সাংবাদিকতা নাকি দেশপ্রেমবোধসম্পন্ন সাংবাদিকতা?

চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক

সাংবাদিকতার সংজ্ঞা এবং নীতিমালা প্রসঙ্গে দুনিয়ায় কি নতুন ধরনের কোনও একাডেমিক বিতর্ক শুরু হতে যাচ্ছে? সাংবাদিকদের দেশপ্রেম থাকা উচিত কি উচিত নয়– এমন প্রশ্নে এই বিতর্কের সম্ভাব্য সূত্রপাত ঘটতে পারে। সম্প্রতি একজন আমেরিকান অধ্যাপক বলেছেন: দেশপ্রেমবোধ নাকি সাংবাদিকতা পেশার জন্যে অনৈতিক। গত ৩০ মে ২০০৪ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত 'আমেরিকান অধ্যাপকের মন্তব্য: 'সাংবাদিকদের দেশপ্রেম থাকা অনৈতিক' শীর্ষক সংবাদের কিছু কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

উক্ত সংবাদে বলা হয়, ".......সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের বিখ্যাত প্রথম সংশোধনীর সঙ্গে বিতর্কিত প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের অনেক ধারাই বিরোধপূর্ণ। মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট অদূর ভবিষ্যতে এই আইনকে অসাংবিধানিক বলেই গণ্য করবেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সাতটি দেশের সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি স্কুল অব কমিউনিকেশনের প্রফেসর ড. জন ওয়াটসন এ কথা বলেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট আয়োজিত 'ফ্রিডম অব দ্য প্রেস' শীর্ষক এক বহু অঞ্চলগত তিন সপ্তাহের এক প্রকল্প গত ২৪ মে এখানে শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটনস্থ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনে এই প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। .....কৃষ্ণাঙ্গ প্রফেসর ওয়াটসন সাংবাদিকতায় থাকাকালে অনেক মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন, পেশাদার সাংবাদিকের দেশপ্রেমিক হওয়াটা অনৈতিক। সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা সাংবাদিকদের সাজে না। কেউ অবশ্যই দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতেই পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার কাজ হবে সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে সেনাবাহিনী বা রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশসেবায় মনোযোগ দেয়া।

তাহলে কি আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের সময় নিউইয়র্ক টাইমস ও সিএনএন এর মতো মিডিয়া তাদের নেমপ্লেটের সঙ্গে 'ওয়ার অন টেরর' কথাটি যুক্ত করে ঠিক করেছে? তারা কি তখন মার্কিন প্রতিরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি? প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী যুগান্তর প্রতিবেদকের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর ওয়াটসন স্মিত হেসে কবুল করেন যে, এ কাজ তাদের করা ঠিক হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। ওয়াটসন উপরন্তু পাল্টা প্রশ্ন করেন, আসলেই কি এই যুদ্ধ ওয়ার অন টেরর ছিল? নিজেই

www.pathagar.com

জবাব দেন, হয়তো হতেও পারে । কিন্তু তাতে সাংবাদিকের কী? তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, 'নাইন ইলেভেনের পরে মার্কিন মিডিয়ার একটি অংশ অতি উৎসাহ দেখিয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের অনেকে রিপোর্ট বা খবর পড়তে গিয়ে মার্কিন পতাকার স্টিকার গায়ে চাপিয়েছেন। এই প্রবণতা সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে দুর্ভাগ্যজনক'।

কেমনতর নৈতিকতার দোহাইতে এবং কি ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে সাংবাদিকদের দেশপ্রেম বর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা মি. ওয়াটসন বলেছেন, তা উক্ত প্রতিবেদনে স্পষ্ট নয়। তবে তার ভাষ্যে উল্লিখিত মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে কি আছে এবং তার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের কোনও কোনও ধারা কেন এবং কিভাবে বিরোধপূর্ণ তার সবিস্তার বিশ্লেষণ ছাড়া এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করা দুষ্কর। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে দেশটির কোনও কোনও আইনের বিধি বিধানের বিরোধ বা অসঙ্গতি হয়তো থাকতে পারে; তবে তার উপর ভিত্তি করে সাংবাদিকদের দেশপ্রেমবোধকে তাদের পেশার জন্যে অনৈতিক বলা কতটুকু যুক্তিনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য– এটা বোধহয় অনেক অনেক গভীর মূল্যায়নের বিষয়।

ওয়াটসন-এর কথায় যদি বিশ্বাস করতে হয়, অর্থাৎ যদি এটা মেনে নিতে হয় যে, সাংবাদিকতা পেশায় দেশপ্রেমবোধ থাকা ঠিক নয়– এটা অনৈতিক; তাহলে বর্জন করতে হবে সাংবাদিকতাকে ফোর্থ স্টেট বা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে প্রদত্ত স্বীকৃতিকে। কারণ, রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতির অর্থই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি সাংবাদিকদের দায়বদ্ধতা রয়েছে আর তা অবধারিতভাবে উৎসারিত হবে দেশপ্রেমবোধ থেকে। সেই দেশপ্রেম যদি সাংবাদিকতার জন্যে অনৈতিক বলে বিবেচিত হয়, তাহলে ফোর্থ স্টেট হিসেবে সাংবাদিকতার যে স্বীকৃতি, তার মূলই তো উৎপাটিত হয়ে যায়।

মধ্যযুগে ফ্রান্সে সংবাদপত্রকে ফোর্থ স্টেট বা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর আগে রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ হিসেবে অন্য যে তিনটি স্তম্ভ স্বীকৃতি লাভ করে, সেগুলো হচ্ছে: নোবেলিটি বা অভিজাত সম্প্রদায়, ক্লার্জি বা পুরোহিত বা ধর্মীয় সম্প্রদায় আর সাধারণ জনগণের পাশাপাশি সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, ফোর্থ স্টেটের স্বীকৃতি ছিল তারই প্রমাণ। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও সংবাদপত্রকে প্রদত্ত সেই ফোর্থ স্টেটের স্বীকৃতি বহাল থাকে। কালের বিবর্তনে মধ্যযুগে স্বীকৃত প্রথম দু'টি স্তম্ভের আকার, প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে কেবল। নোবেলিটি বা অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থলে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক্সিকিউটিভ এবং ক্লার্জি বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থলে লেজিসলেটিভ ও জুডিসিয়ারীকে গণ্য করা হয় রাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে; আর কমনারস বা সাধারণ জনগণ মধ্যযুগে যেভাবে একটি স্তম্ভ হিসেবে গণ্য ছিল; এখনও তা আধুনিক বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেবল একটি নয়, মূল স্তম্ভ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। আর ফোর্থ স্টেট বা চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বীকৃতি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও অক্ষুণ্ন রাখা হয়। বলা বাহুল্য, এই পেশায় দেশপ্রেমবোধের অপরিহার্যতা অন্য তিন স্তম্ভের চাইতে বেশিই অনুভূত হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকান আধ্যাপক কিভাবে বলেন যে, দেশপ্রেম সাংবাদিকতা পেশার জন্যে অনৈতিক? আমার মতে, সাংবাদিকতা পেশাকে যদি দেশপ্রেমবিবর্জিত পেশা

www.pathagar.com

হিসেবে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা এবং সেটাকে নৈতিকতাপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে দুনিয়ার রাষ্ট্র ব্যবস্থাও অসার এবং অর্থহীন বলে গণ্য হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

দেশপ্রেমবোধ বিবর্জিত নৈতিক ভিত্তি প্রদানের যে আলামত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, তার সঙ্গে 'অকার্যকর রাষ্ট্রের' ক্যাম্পেইন আর গ্লোবালাইজেশন ফোবিয়ার কোনও যোগসূত্র আছে কিনা এটা বোধহয় চিন্তা করার বিষয়। 'অকার্যকর রাষ্ট্র' নিয়ে একটা তর্ক চলছে দুনিয়ার যত্রতত্র। যে কারণেই এই তর্কের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। কেননা হানাদার পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ একটি রাষ্ট্রকে 'অকার্যকর' ঘোষণা করে জাতিসংঘের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের নীতি থেকে আরও অগ্রসর হয়ে এখন আফগানিস্তান ও ইরাকে সরাসরি সামরিক অভিযান চালিয়ে সেই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। আগে বলা হতো 'মানবিক' কারণে অন্য দেশে হানা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত, এখন বলা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থেই 'অকার্যকর' দেশগুলোতে সামরিক অভিযান চালানো সঠিক। অতএব বাংলাদেশের কপালে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' হওয়ার নামছাপ নিছকই বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সন্ত্রাস ও সহিংসতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার বয়ান নয়। সরকারের ব্যর্থতার ও রাষ্ট্রের ব্যর্থতার মধ্যে ফারাক আছে বললেও এই তর্কের মীমাংসা হবে না। 'অকার্যকর রাষ্ট্র' ধারণাটির সঙ্গে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশেষত মুসলমান জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ইঙ্গ-মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি অর্থাৎ 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নীতি জড়িত।

এদিকে গ্লোবালাইজেশন প্রসঙ্গ নিয়ে সারা দুনিয়ায় গত ক' বছর ধরে যে বাদ-প্রতিবাদ-সংঘাত-সহিংসতা চলছে এবং গ্লোবালাইজেশনের মোড়কে মার্কেট ফাণ্ডামেন্টালিজমের যে কোশেশ চলছে, তাতে বিভিন্ন দেশ এবং জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি, তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, ভূমির উপর অধিকার সবই অস্বীকার ও ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। কর্পোরেট স্বার্থ এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দিন দিন হয়ে উঠছে দুর্দমনীয় দৈত্য।

কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী তার এক সাম্প্রতিক লেখায় বলেছেন, 'আমেরিকা বা মার্কিন সরকারই এখন ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালিজম, ওয়ার্ল্ড ইম্পেরিয়ালিজম বা মার্কেট-ফাণ্ডামেন্টালিজমের মূল নিয়ন্তা নয়। এর নিয়ন্তা এখন গ্লোবাল কর্পোরেশন বা বহুজাতিক কয়েকটি কর্পোরেশন। আমেরিকা তার অত্যাধুনিক অস্ত্রধারী পাহারাদার মাত্র। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও এখন আর বাস্তবে জনগণের ভোটে বা শক্তিতে নির্বাচিত হন না। নির্বাচিত হন এই কর্পোরেশনগুলোর ইচ্ছায়, অর্থে ও কৌশলে।' তার ফলে ক্লিনটন, বুশ-জাতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ক্যালিবার-এর লোকজন আজকাল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার সুযোগ পাচ্ছে এবং তাদেরকে সুযোগ করে দেয়াই হচ্ছে কেবলমাত্র গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলোর আজ্ঞা পালন করার জন্যে। বিশ্বের প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন সম্পূর্ণভাবে এই কর্পোরেট দানবদের কব্জায়। এই মিডিয়া নিরন্তর দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলে প্রচার চালাচ্ছে। এদের প্রচারণার মুখ্য টার্গেট হচ্ছে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জনগোষ্ঠী।

www.pathagar.com

গ্লোবাল কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে জাতিসংঘের 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০০০'-এ বলা হয়েছে: "গ্লোবাল কর্পোরেশন হ্যাভ এনরমাস ইম্প্যাক্ট অন হিউম্যান রাইটস, ইন দি এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট, ইন দেয়ার সাপোর্ট ফর করাপ্ট রিজিমস অর ইন দেয়ার এ্যাডভোকেসি ফর পলিসি চেঞ্জেস। ইয়েট ইন্টারন্যাশনাল ল'জ হেল্ড স্টেটস একাউন্টেবল, নট কর্পোরেশনস।" সাদামাঠা অর্থ হচ্ছে; এই বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোই মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতিবাজ সরকারগুলোকে তারাই সমর্থন যোগায় এবং তাদের নীতিনির্ধারণে খবরদারি করে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন এজন্যে রাষ্ট্রগুলোকে দায়ী করে; এই কর্পোরেশনগুলোকে দায়ী করে না। ড. ওয়াটসন সাংবাদিকতা পেশায় দেশপ্রেমবোধকে অনৈতিক বলে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস চালিয়েছেন, তা মূল্যায়ন করা দরকার। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের স্বার্থ এমনকি রাষ্ট্রের সীমানাও এখন দানবীয় কর্পোরেট স্বার্থের সামনে তুচ্ছ, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পরিত্যাজ্যও বটে। কেননা, তা না হলে গ্লোবালাইজেশনের তথা কর্পোরেট স্বার্থের কব্জায় দুনিয়াকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য!!

লেখক দৈনিক বিকেলের কাগজ -এর সম্পাদক

www.pathagar.com

আমরা পরিবর্তনের পালায়

আলমগীর মহিউদ্দিন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের জন্যে লিখতে গিয়ে আবার সেই পুরনো কথাই বারবার মনের মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকলো। জীবনটা আমাদের এত ক্ষুদ্র এবং অসার! এর পেছনে কি তীব্র নেশায় আমার নিরন্তর ছুটছি। কাউকে বন্ধু বানিয়ে, কাউকে শত্রু বানিয়ে, অবশেষে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অনুভূতির আড়ালে চলে যাচ্ছি। আর যাদের ভালোবেসেছি, যাদের ছাড়া সময়টাকে অসহনীয় মনে হয়েছে, তারাও একসময়ে ভুলে গেছে তাদের এক বন্ধু, একজন সুহৃদ তাদের মাঝ থেকে কখন হারিয়ে গেছে! তবে এই প্রেস ক্লাবের অঙ্গনে বারবার দেখেছি শত্রুরাই কেবল মনে রাখে। জীবনের এই অমোঘ সত্যি কথা ভাবতে ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথেরও ভালো লাগেনি। তাই বোধ করি এই রূপরসময় পৃথিবীর কথা লিখে গেছেন।

ক্ষুদ্র জীবনের কথা এলো, কারণ সেই বন্ধুবর মোজাম্মেল হকের (এপিপি-বিএসএস খ্যাত) সঙ্গে এসে প্রেস ক্লাবের সদস্য হবার দরখাস্ত দিলাম, সদস্য হলাম এবং সেই থেকে (দু-তিন বছর যখন বিদেশে ছিলাম সে সময়টুকু ছাড়া) প্রেস ক্লাবে যাওয়া কোনও একদিন বাদ দিয়েছি মনে পড়ে না। কতদিন হলো, ভাবলাম। তাই তো, চার যুগেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে। যাঁদের সঙ্গে দেখা হলে সম্মানের সঙ্গে সালাম করেছি, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আছেন এবং ক্লাবে তারা আসেন কদাচিৎ।

প্রথম দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। যেমন অনেক স্মৃতিই– তার মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা আমি বহুবার বন্ধুদের বলেছি। শুনলাম, আমি প্রেস ক্লাবের সদস্য হয়েছি। মোজাম্মেল সাহেব এবং আমান উল্লাহ ভাই আমার সিনিয়র, খুব আপনজন। মোজাম্মেল বললেন, এটা সেলিব্রেট করা উচিত। তখন আমান ভাইকে খুঁজলাম। সম্ভবতঃ সেদিন ঢাকায় ছিলেন না। প্রেস ক্লাবের বিল্ডিংটা ছিল লাল ইটের। ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু নাকি এক সময়ে এই বাসায় থাকতেন ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক হিসেবে। ক্লাবে ঢুকতেই ছিল বসার ঘরটি। একটা গোল টেবিলের চার দিকে চারটি আরাম কেদারা ছিল। প্রায়ই সেখানে ঢাকার সংবাদপত্রের দিকপালরা বসতেন। সেদিন তিন জন বসেছিলেন। মানিক মিয়া, আবদুস সালাম এবং জহুর হোসেন চৌধুরী। সম্ভবত দু'জন সেই নিচু টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ধূমপান করছিলেন। আমি ধূমপান করি না– যারা করেন, তাদেরকে প্রায়ই উপদেশ খয়রাত করে থাকি। কিন্তু এঁদের তো সে কথা বলা যাবে না। মোজাম্মেল সাহেবকে বললাম, ক্লাবের একটা এথিকস

www.pathagar.com

থাকা উচিত। আসলে এথিকসের কথা এমনি এসেছিল। আমার আব্বা কখনও তাঁর ছেলেদের টেবিলের উপর পা তুলে বসতে দিতেন না। বলতেন, টেবিলের উপর বই থাকে, তাতে বিদ্যা থাকে। তাকে সম্মান করো। ইংরেজদের মত বেয়াদব হয়ো না। হয়তো বা সেই কথারই পরোক্ষ প্রভাব ছিল। এছাড়া আমাদের অর্থনীতির অধ্যাপক জনাব সুলতানুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন আমাদের এথিকসের গুরু। রাজশাহীর সবচেয়ে ভালো বাড়িটিতে এই চিরকুমার থাকতেন এবং প্রতি মাসে ভোজ দিতেন। সেখানে আসতেন রাজশাহীর এলিটরা। শুনেছি যখন তিনি যুবা ছিলেন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনাররাও এই ভোজে অংশ নিতেন।

স্যার আমায় খুব স্নেহ করতেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়স তখন, প্রায়ই বলতেন আজ কি খবর পাঠালে? আমি তখন রাজশাহী থেকে একাধারে এপিপি, মর্নিং নিউজ, ডন-এ খবর পাঠাতাম। সেও এক মজার ব্যাপার। আব্বার কাছ থেকে কোনও লেখাপড়ার খরচ নিই না। বড় ভাই জনাব মুসাদ্দারুল হককে লিখলাম, আমায় কিছু মাসে মাসে দেয়া যায় কিনা। বড় ভাই তখন দৈনিক মজলুম এর সম্পাদনা করেন। এহতেশাম হায়দার চৌধুরী প্রমুখ সেই পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বড় ভাই আমাকে খবর পাঠাতে বললেন। লিখলেন, তুমি রাজশাহী করেসপনডেন্ট হয়ে যাও। তখন সেই মজার কথা মনে পড়লো। ঘটনাটা সম্ভবতঃ পেশোয়ারের। আমরা দু' বন্ধু কিছু খাবার নিয়ে পার্কের দিকে হাঁটছিলাম। উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার পেশোয়ারের কিচ্ছা-কাহানীর বাজারে যাওয়া। একটা স্যুট বানানোর ইচ্ছে। রাস্তার পাশেই দেখি এক বাড়ির দেয়াল জুড়ে লেখা– করেসপনডেন্ট পাকিস্তান টাইমস। যদিও বড় ভাই পত্রিকা বার করেন। তিনি নয়া জামানা, দিশারী, সর্বশেষ দৈনিক মজলুম বার করেছিলেন। আইয়ুবের মার্শাল ল' তাঁর দৈনিক মজলুম বন্ধ করে দেয়। করেসপনডেন্ট যে সাংবাদিক, আমি তা জানতাম না। বন্ধুকে বললাম, আমিও খবরের কাগজে কত চিঠি লিখেছি। আমিও করেসপনডেন্ট। কই, আমি তো বাড়ির দেয়াল জুড়ে এমন লিখিনি। আমি তখনও ভাবিনি সারা জীবন কাটিয়ে দেব সাংবাদিকতা করে। এর কিছুদিন পরেই আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করেন।

সেই এথিকসের কথা। ঘটনাটি কাকে নিয়ে মনে নেই। তখন প্রেস ক্লাবের ডাইনিং টেবিলে টেবলক্লথ, স্পুন-ফর্ক থাকতো। কে যেন খেতে বসেছে– স্পুন-ফর্কের ব্যবহার বোধহয় জানতো না। দেখলাম, বেয়ারার উমিদ খান এসে বিনয়ের সঙ্গে তাকে ফর্ক ধরা শিখিয়ে দিল। এটা সত্যি, আজকের মত সেকালে ডাইনিং টেবিলে শোরগোল হত কম। এ প্রসঙ্গে মাহবুব ভাইয়ের (ইনডিপেনডেন্ট সম্পাদক) মন্তব্য মনে পড়লো। ভাবীকে দেখতে উগাণ্ডা গেলেন। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানের একটা মজার ঘটনা বলুন।' মাহবুব ভাই বললেন, 'রেস্টুরেন্টে সবাই খাচ্ছে, কেবল চামচের টুংটাং ছাড়া আর কোনও শব্দ শুনতে না পেয়ে চারদিকে আলো-আঁধারের মধ্যে কেবল শাদা শাদা দাঁত দেখতে পেলাম। খাবার-দাবারের ব্যাপারে তাদের এই আচার আমায় মুগ্ধ করেছে।

কে যেন আমাদের বলেছিল– গ্যারুলাস বাঙালী। আমরা কথা বলতে ভালোবাসি। বেশি কথা বলার একটা অসুবিধা হলো, তাতে কিছু মিথ্যে বলতেই হয়। প্রেস ক্লাবের টেবিলে প্রায় দেখি এর শৈল্পিক চর্চা হয় অত্যন্ত উচ্চ মার্গের। আমি নিয়মিত ক্লাবে গেলেও কখনও এর কোনও

www.pathagar.com

পদের জন্যে কখনও আগ্রহ বোধ করিনি। গল্প শোনা এবং খাবারের সময় আড্ডা দেয়াই প্রধান কাজ মনে হয়েছে।

অথচ জাতীয় প্রেস ক্লাব মানুষের– বাংলাদেশের মানুষের মানসে একটা অনন্য প্রতিষ্ঠান। যেখানে তারা তাদের কথা বলতে আসে, যখন অন্য সব জায়গায় তারা তাদের কথা বলে ফেল করে। এখানে কথা বললে কাজ হয়। যদিও সাংবাদিকরা সব কথা খবরের কাগজে লেখেন না– এমন নজির তারা দেখেছেন। এই তো এরশাদের পতন হলো প্রেস ক্লাবের সামনের ডেমনেস্ট্রেশন থেকে। আগে শহীদ মিনার পর্যন্ত এগুলো যেত। এখন তা যায় না। দেশের সকল সরকারই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। এই ফেনোমেনন পৃথিবীর আর কোনও দেশে দেখিনি। ফলে এখন কোনও ডেমোনেস্ট্রেশন প্রেস ক্লাবের সামনে করতে দেয়া হয় না পারতপক্ষে।

একবার সংবাদপত্রের ধর্মঘট হয়েছিল প্রায় ২৭ দিনের মত। এরশাদ ভীষণ খুশি। কিন্তু রাজনীতিবিদরা চাপ দিলেন সে ধর্মঘট ভাঙতে। কারণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সেবার প্রায়ই স্থবির হয়ে পড়েছিল। তবে সে ক'দিন প্রেস ক্লাব ফিরে পেয়েছিল তার সত্যিকারের চরিত্র। সাংবাদিকরা খাচ্ছে-দাচ্ছে আর গুজব ছড়াচ্ছে। কোনও দায়-দায়িত্ব নেই।

আসলে বাংলাদেশে গুজবের কেন্দ্র মোটামুটি চারটি। মতিঝিল পাড়া, প্রেস ক্লাব, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং সচিবালয়। আর সব গুজব প্রেস ক্লাবে এসে রান্না হয়ে আবার নতুন আকারে পল্লবিত হয়। এর কিছু কিছু প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের সংবাদপত্রগুলোতেও। আমি প্রায়ই ঠাট্টা করে বলি, আমরা বড় বেঁচে গেছি– এদেশে লাইবেল ল'র ব্যবহার নেই বললেই চলে। যদি ব্যবহার হতো, বোধকরি শতকরা ৬০ ভাগ পত্রিকা বার হতো কিনা সন্দেহ! লাইবেল সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম। হয়তো বা আমাদের বাঙালিদের ইন্টার-পারসোনাল সম্পর্কের ব্যাপারে নিম্ন ধারণাও এর একটা কারণ হতে পারে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, সমাজের প্রতি স্তরে, বিশেষ করে আমাদের রাজনীতিবিদরা যদি লাইবেল সম্পর্কে ভাবতেন এবং সে মোতাবেক ব্যবহার করতেন, আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন হয়তো এত ক্লেদাক্ত হতো না। আমাদের খোলামেলা বক্তব্য, ভিত্তিহীন কথা-বার্তা, একপেশে ধারণা আমাদের কূপমণ্ডুকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে আমাদের মানবিক গুণাবলীর সত্যিকারের প্রকাশ ঘটছে না। যেমন আমরা বিদেশে বসবাস করতে গেলেও এই বিভেদ ভুলতে পারি না। আজকের প্রাত্যহিক সমস্যা এবং ক্রমান্বয়ে সংকুচিত সম্ভাবনা আমাদের ট্র্যাডিশন ও মূল্যবোধকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাজনীতিবিদরা একে অন্যকে দোষারোপ করে নিজেদের যে প্রধান ভূমিকা এ ব্যাপারে রয়েছে, তার স্খালন করতে চাইছে।

এই ক'দিন আগে প্রেস ক্লাবে আসছিলাম ভলভোতে। দোতালার পেছনের সারিতে দু'জনের সিটে জায়গা পেলাম। অনেক কথার মধ্যে আমি প্রস্তাব করলাম আমাদের দশ জনের মধ্যে একটা ছোট্ট সার্ভে করার। বললাম, আমরা বাংলাদেশের কোন গোষ্ঠী সবচেয়ে খারাপ মেরিট অনুসারে। অবাক কাণ্ড ন'জনই একমত হলো তাদের মতামতে। প্রথমে এলো রাজনীতিবিদ,

www.pathagar.com

তারপর শিক্ষক এবং পরে সাংবাদিক। বললাম, আপনারা ব্যুরোক্র্যাটদের বাদ দিলেন কেন? তাদের একজন বললো, 'রাজনীতিবিদ ঠিক হলে ওরা ঠিক থাকতো। শিক্ষক ভালো ছেলে পয়দা করলে ওরা খারাপ হতো না। আর সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিপালন করলে সমাজটার নেতৃত্ব এতো খারাপ হতো না। সাধারণ মানুষ– যাদের সম্মান, শ্রদ্ধা গত সাড়ে চার দশকের সাংবাদিক জীবনে দেখে এসেছি– এখন এমন করে আমাদের সম্পর্কে ভাবে? খারাপ লাগলো। ক্লাবের অনেককেই সেই কথা বললাম। আশ্চর্য, দু' একজন ছাড়া কেউ তেমন আমল দিল না। অর্থাৎ ভাবখানা এমন, আমরা সাংবাদিকরা তো এমনিই! লোকেরা ভাবুক, আপত্তি কি?

মনটা খারাপ হলো আবারও। তাহলে কি যারা সাংবাদিকতাকে সত্যিকারের ফোর্থ স্টেট হিসেবে ভাবে, তাদেরই কেবল যন্ত্রণা? সত্যিই তো, আমরা সাংবাদিকরা অনেকেই বিত্তবান। অনেকেই সংবাদপত্রকে কেবল তাদের বিত্তের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। সেখানে মানুষেরা কি ভাবলো, নিশ্চয়ই তো গৌণ।

এটা সত্যি, প্রেস ক্লাব অন্য দশটি ক্লাবের মত নয়। এর কোনও কোনও সদস্য অন্য ক্লাবেরও সদস্য। কেউ কেউ বছরে কেবলমাত্র এক দিনের জন্যে আসেন, বেশ সময় এখানে কাটান। অধিকাংশ সময়ই তিনি শোনেন, বলেন কম। যেন সংবাদপত্রের ছুটির দিনের সাপ্তাহিক প্রকাশনা। আর কেউ আছেন প্রতিদিনই আসছেন, যুগের পর যুগ। কিন্তু কেউ তার খবর পাচ্ছেন না। তারা তাসের আড্ডায় ব্যস্ত। যখন সেখানকার অবস্থা চঞ্চল হয়, তখনি তাদের খবর পাওয়া যায়। পাকিস্তানীরা যখন প্রেস ক্লাব লক্ষ্য করে ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছোঁড়ে, তখনও তারা তাসের আড্ডায় নিমগ্ন ছিলেন। এবং ন' মাসে সেই সংগ্রামের দিনেও তাদের আসর কখনও ভাঙেনি। এদের সবাই সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত।

প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনাতে পরিচয় মেলে সাংবাদিকরা আর যাই হোন, তারা ভালো ব্যবস্থাপক নয়। শোনা যায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান টিভির আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। একজন আলোচকের বক্তব্য তাঁর ভালো লেগে যায়। তখুনি তিনি তাকে ডেকে তার অ্যাডভাইজরি সভার সদস্য হবার জন্যে তাকে আমন্ত্রণ জানান। আসলে অনেক সদস্যই ছিল এই আলোচনার অংশীদার। যেমন ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। যাই হোক, সেই এ্যাডভাইজারকে তিনি বেশিদিন সদস্য রাখতে পারেন নি, কারণ তিনি তার বক্তব্য মাঠে প্রমাণ করতে পারেননি।

বাংলাদেশ হবার পর প্রেস ক্লাব তার জন্মস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এটাকে শিল্পকলা একাডেমীর এক অংশে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৎকালীন সরকারকে সাংবাদিকরা মনে করিয়ে দেন একথা বলে যে, তাদের উত্থানে সাংবাদিকদের অবদান একক। একথা স্মরণ করে সরকার যেন এটাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা না করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এসে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করেন এবং বর্তমান ইমারত তৈরিতে সর্বাত্মক সাহায্য করেন।

আমি বলবো, জাতীয় প্রেস ক্লাব পৃথিবীর অন্য সব প্রেস ক্লাবের চেয়ে অনন্য। যদিও এখানে

www.pathagar.com

অনেক উপকরণের অভাব। তবুও জাতীয় জীবনে এর প্রভাব ব্যাপক। পৃথিবীর অন্য দেশে এমন প্রতিষ্ঠানের এই ভাগ্য এবং প্রতিষ্ঠা নেই। বিদেশী প্রেস ক্লাবের কর্মকাণ্ড বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন ব্রাসেলসের প্রেস ক্লাবে শুধু রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা ধূমপান এবং ড্রিঙ্ক করবেন তাদের ব্যবস্থা আলাদা। খাবারের, খেলার (সবই ইনডোর) ব্যবস্থা আলাদা। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। হল্যাণ্ডের লোকেরা তাদের ঘরের পর্দা টানে না। যারা টানে, সে পর্দাগুলো লেসের। কারণ তারা মনে করে একজন ডাচের অন্যজনের কাছ থেকে লুকোনোর কিছু নেই। অথচ হল্যাণ্ডে ফ্রান্সের মত ন্যুডিস্ট ক্লাব দেখিনি। আবার তাদের ক্লাবগুলো প্রায়ই এক্সক্লুসিভ। আসলে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বড়। গৃহ খোলামেলা হলেও আনন্দের স্থানকে তারা একান্ত বানাতে চেয়েছে। আমরা রাজনৈতিক, সামাজিকভাবে এখনও জীবনব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা নির্মাণ করতে সক্ষম হইনি। এবং যা ছিল তাকেও ধরে রাখতে পারছি না। ফলে চলছে এক অরাজকতা।

এর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে পারি। বহুবার বলেছি আমার বন্ধু-বান্ধবদের। আমি চট্টগ্রামে এক সেইলরের কাছ থেকে এনিকার বলে একটা গোল্ড প্লেটেড ঘড়ি কিনেছিলাম। ওটা আমার প্রিয় ছিল। একদিন সেই মোজাম্মেল সাহেবের সঙ্গে প্রেস ক্লাবে চা খেতে এসেছিলাম। তার আগে অফিসে (এপিপি) হাতমুখ ধোয়ার সময়, বেসিনের তাকে ঘড়িটা খুলে রেখেছিলাম। তাড়াহুড়োতে ভুলে রেখে এসেছিলাম। ক্লাবে আসতেই অফিস থেকে টেলিফোন এলো, আমাদের হেড পিয়নের। স্যার, একটা ঘড়ি পেয়েছি, মনে হয় আপনার। আপনাকে পরতে দেখেছি। ধন্যবাদ জানিয়ে ওর কাছে রাখতে বললাম। এর বছর খানেক পরে মোজাম্মেল সাহেবের সঙ্গে প্রেস ক্লাবে যাবার জন্যে অফিস (বিএসএস– এপিপি তখন বিএসএস হয়েছে) থেকে নিচে নামতেই মনে পড়লো, বল পেনটা ভুলে ফেলে এসেছি। আমি মোজাম্মেল সাহেবকে দাঁড়াতে বলে উপরে গেলাম। দেখি কলমটা নেই! ওখানে পিয়নকে জিজ্ঞেস করলাম কলমটার কথা। সে কিছু বললো না। যদিও ছোট্ট ব্যাপার, মনটা খচখচ করতে থাকলো। মোজাম্মেল সাহেব এমন ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে ভাবতে দেখে বিস্মিত হলেন। তবুও ভাবনাটাকে ফেলতে পারলাম না। কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যে ওটা যাবে কোথায়? ক্লাব থেকে ফিরে একটু সাইকোলজিক্যাল অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলাম। পিয়নটাকে (তখন সে আর হেড পিয়ন নেই) ডেকে আমার হাতঘড়িটা দেখালাম। বললাম, তুমি এই ঘড়িটা পেয়ে আমাকে ফেরত দিয়েছিলে, অথচ মাত্র ৭৫ পয়সার বলপেনটার লোভ সামলাতে পারলে না? আমি কেবলমাত্র আন্দাজ করে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে মাথা নিচু করে থাকলো, আর চোখ দিয়ে পানি পড়লো। কিছু বললাম না। তবে সামাজিক অরাজকতার প্রতিফলন দেখলাম তার কর্মকাণ্ডে। মনকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কি ঘটলো এই সহজ, সৎ মানুষটির জীবনে, যে সে অসৎ হয়ে পড়লো? এ ঘটনা যে কেবল আমাদের পিয়নটির জীবনে ঘটেছিল, তা ঠিক নয়। সামগ্রিকভাবে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। তাই কি আজ বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর দুর্নীতিপরায়ণ দেশ বলে পরিচিত হয়েছে? কখনও কখনও প্রেস ক্লাবটাকেও অচেনা মনে হয়! নিজের মনে হয় না তেমন করে।

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের এই যুগে, মানুষ মানুষের সম্পর্ক পশ্চিমা ধাঁচে কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক মাপে চিহ্নিত হচ্ছে। অর্থ সর্বকালেই অর্থবহ ছিল। তবে এখনকার মত নিরেট, হৃদয়হীনভাবে অর্থবহ ছিল না। ফলে মমত্বের স্থান নিষ্ঠুরতা দখল করে নিচ্ছে। তবুও বলবো আজ অর্ধ শতাব্দী শেষে প্রেস ক্লাব সত্যিই অনন্য।

লেখক দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের হালচাল: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ড. সাখাওয়াত আলী খান

কবি, সাংবাদিক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা হাসান হাফিজের সঙ্গে আমার এমনই সম্পর্ক যে, তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমার পক্ষে মুশকিল। কৃতী-পুরুষ হাসান হাফিজ আমার ছাত্র, এ কথা বলতে পেরে আমি গর্ব বোধ করি। এমনি অবস্থায় সময়ের প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও তাঁর অনুরোধে এই লেখা লিখতে বসা।

প্রথমেই তাই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই বলে যে, খুব একটা সুসংহত জ্ঞানসমৃদ্ধ লেখা এটি হবে না। গণমাধ্যম, গণযোগাযোগ তথা যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একজন ছাত্র হিসেবে দু'টি কথা বলাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

মানুষ যে সমাজ গড়ে তুলেছে, তার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। এত বহুমুখী ও বিস্ময়কর যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্য কোনও প্রাণী গড়ে তুলতে পারেনি। পারলে তাদের পক্ষেও হয়তো মানুষের মতই উন্নত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হতো। পশু-পাখির যোগাযোগ প্রক্রিয়া একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং তার পরিধিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পশু-পাখি বা জীব-জন্তু কোনও বিপদের আশঙ্কা দেখলে হয়তো তাদের গোত্রীয় অন্যদের সংকেত দিয়ে সতর্ক করতে পারে, কিন্তু বিপদটি ঠিক কি ধরনের এবং কোন্ দিক থেকে আসছে, তা পরিষ্কার করে বলতে পারে না। কিন্তু মানুষ তা পারে। মানুষের তৈরি 'ভাষা' এক বিস্ময়কর শক্তিশালী যোগাযোগের বাহন। অন্য প্রাণীরও ভাষা থাকতে পারে, কিন্তু তা অনেকটা প্রাকৃতিক এবং জন্মগতভাবেই তা তাদের আয়ত্ত হয়, নতুন করে তারা তা কারও কাছ থেকে শেখে না। মানুষের ভাষা তাদের নিজেদের তৈরি, পরিপার্শ্বের মানুষের কাছ থেকেই তা মানবশিশুকে শিখে নিতে হয়।

মানুষ তার যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে উন্নততর করার জন্যে অহরহ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা চলে নানা পর্যায়ে। শুরুতে মানুষ হয়তো নিজেই নিজের সঙ্গে যোগাযোগ করে, অতঃপর তার যোগাযোগ হয় অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে, যোগাযোগ হয় একাধিক মানুষের সমষ্টি বা গ্রুপের সঙ্গে এবং পরিশেষে হয়তো বিশাল সংখ্যার গণমানুষের সঙ্গে। শেষের পর্যায়ে যে যোগাযোগ, তাকেই আমরা বলি গণযোগাযোগ এবং তা করার হাতিয়ার হচ্ছে গণমাধ্যম।

সমাজ যতই এগুচ্ছে, মানবিক যোগাযোগে যন্ত্রের ব্যবহার ততই বাড়ছে। গণযোগাযোগে যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। কেবল ভালো বার্তা বা মেসেজ তৈরি করলেই চলবে না, তার

www.pathagar.com

জন্যে চাই উন্নতমানের যান্ত্রিক বাহন। ফলে যে যত ভালো যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে, ভালো বার্তা তৈরি সাপেক্ষে তারই জনগণের সঙ্গে তত কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের সক্ষমতা বাড়বে। বিশেষ করে গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার তো রীতিমত বিপ্লব এনে দিয়েছে।

কিন্তু এই পরিস্থিতি কিছু সমস্যারও জন্ম দিচ্ছে। গণযোগাযোগ প্রক্রিয়াটি এখন প্রধানতঃ বিত্তবানদের করায়ত্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় বিদ্যুৎহীন এলাকায়ও হাত ও পায়ের সাহায্যে ট্রেডল মেশিন চালিয়ে পত্রিকা ছেপে তাতে তথ্য সম্প্রচার করা হতো। আদর্শবান কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল। আমাদের দেশেও বাংলা সাংবাদিকতার প্রাথমিক অবস্থায় কাঙাল হরিনাথ নামে এক দরিদ্র অথচ দুর্দমনীয় সাংবাদিক এই কাজ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শোনা যায়, পত্রিকা ছাপার জন্যে ব্যবহৃত তাঁর প্রেসটি ছিল কাঠের তৈরি। আর এখন? ওয়েব অফসেট রোটারি মেশিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাপা হচ্ছে পত্রিকার লক্ষ লক্ষ কপি। একই পত্রিকা একই সঙ্গে ছাপা ও প্রকাশিত হচ্ছে একাধিক স্থান থেকে। পত্রিকা বাহিত হচ্ছে আকাশযানসহ দ্রুতগামী নানা বাহনে। এছাড়া ইন্টারনেটে মুহূর্তের মধ্যেই তা পৌঁছে যাচ্ছে পাঠকদের কাছে।

এই তো হলো মুদ্রণ মাধ্যমের অবস্থা। ইলেকট্রনিক মাধ্যম তো যেন রীতিমত জাদুমন্ত্র, যেন এক ভোজবাজি। স্যাটেলাইটের বা ক্যাবল টিভির কল্যাণে এখন সারা পৃথিবী দর্শকের হাতের মুঠোয়। বেতার সংযোগ বা রেডিও-র ব্যবহার অনেকদিন থেকেই পৃথিবীর মানুষ করে আসছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিশাল অগ্রগতি ঘটলো, যখন ট্রানজিস্টার আবিষ্কৃত হলো। পঞ্চাশের দশকেও এ দেশে ট্রানজিস্টার ছিল এক বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু ক্রমেই দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতাদের মধ্যে। এখন তো তা প্রায় সকল মানুষেরই ক্রয়সীমার মধ্যে।

গণমাধ্যমে ট্রানজিস্টার যে বিপুল পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিল, তাতে যেন মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করেছে ক্যাবল টিভি এবং ইন্টারনেট। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ এতই দরিদ্র যে, কম্পিউটার দূরে থাকুক, একটি শাদা-কালো টেলিভিশন কেনার সামর্থ্য অনেক শিক্ষিত মানুষেরও নেই। নিরক্ষরদের অবস্থা তো আরও খারাপ। এগুলো হয়তো আরও বহুদিন এইসব মানুষের কাছে বিলাস সামগ্রীই হয়ে থাকবে। দেশের জনসংখ্যার বিশাল নিরক্ষর অংশের শীঘ্রই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া রয়েছে কুশিক্ষার গুরুতর সমস্যা। এমনি সময় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে আকাশ-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটছে জনগণের মধ্যে, তা ধারণ করে ইতিবাচকভাবে assimilate করার মত মানসিক শক্তি নেই অনেক মানুষের। তাই হয়তো কারও কারও বদহজম হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ মোটা দাগের এমন এক ভোগবাদী আদর্শে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে যে, মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে আনন্দ আহরণের ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এর জন্যে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৈন্যই অনেকটা দায়ী।

এতদসত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশের মানুষ এখন গণমাধ্যমে মোটামুটিভাবে আসক্ত। রেডিও-টিভির বিপুলসংখ্যক শ্রোতা-দর্শক নিজে এই মাধ্যমগুলোর মালিক হতে না

www.pathagar.com

পারলেও তারা এগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকছে না। প্রতিবেশীর কিংবা কোনও সংস্থার মালিকানাধীন মাধ্যমগুলো তারা প্রায়ই শুনছে বা দেখছে। ইন্টারনেটে সংবাদপত্র পড়ার ব্যাপারটি অবশ্য এদেশে এখনও খুবই সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। তবে শহরাঞ্চলে, এমনকি কোনও কোনও মফঃস্বল এলাকায়ও কম্পিউটার দ্রুত পরিচিতি লাভ করছে। ডিশলাইন দিয়ে ক্যাবল টিভি দেখানো এখন বেশ ভালো ব্যবসা।

অর্থাৎ গণমাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বাংলাদেশেও মোটামুটি রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে উপস্থাপনার মান যে মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। গণমাধ্যমের ভোক্তাদের সঙ্গে আলাপ করলে বোঝা যায় যে, রেডিও-র সাশ্রয়ী মূল্য, টিভির পর্দায় এমনকি মুদ্রণ মাধ্যমে এক প্রকার 'রঙিন বিস্ফোরণ' সত্ত্বেও ভোক্তারা তেমন খুশি নন। এক ধরনের বঞ্চনাবোধে ভুগছেন তারা। সরকারী ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম অতি নিয়ন্ত্রণে প্রায় পঙ্গু, বেসরকারী ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলো নানা নিয়মকানুনের বেড়াজালে সীমাবদ্ধতায় ভুগছে। মুদ্রণ মাধ্যমে অনেক কাঙ্ক্ষিত বিষয় না পেয়ে পাঠকরা আশাহত। অতি বাণিজ্যিকীকরণের পশ্চিমা মডেল অনুসরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এখন প্রায়ই শ্রোতা-দর্শক-পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করছে। আগে আমরা দেখতে পেতাম ইলেকট্রনিক মাধমে কোনও কোনও সংস্থা হয়তো বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান স্পনসর করছে, কিংবা কোনও সংস্থা হয়তো তাদের প্রচারকার্যের জন্যে পত্রিকায় সাপ্লিমেন্ট ছাপছে। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে, সরাসরি সংবাদ প্রচারেও কোনও সংস্থা বা কোম্পানীর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। সংবাদ প্রতিবেদনের ভেতরই বক্স করে তাদের বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তো আরও এক ধাপ এগিয়ে অমুক সংস্থার 'সংবাদ শিরোনাম', তমুক সংস্থার 'খেলার খবর' ইত্যাদি বলে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। এটা করার ফলে সেই মাধ্যমটি ঠিক কিভাবে 'উপকৃত' হচ্ছে তা বোঝা না গেলেও, এটা যে কোনও কিছুর 'বিনিময়ে' হচ্ছে, তা বুঝতে গণমাধ্যম বিশারদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

অপরদিকে বিজ্ঞাপনের আধিক্যেও গণমাধ্যম ভোক্তারা যে বিরক্ত হচ্ছেন, তা বোঝার জন্যে জরিপ চালালে গণমাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবেন বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে। এই উদ্যোগ অবিলম্বে নেয়া দরকার। বিশেষ করে জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের মাত্রা নিয়ে অনেক পাঠককেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায়। অন্যদিকে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপনই তাদের আয়ের প্রধানতম উৎস। পত্রিকা মালিকরা অন্ততঃ তা-ই বলেন এবং বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনও পত্রিকার বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে তাঁরা জানান। অবশ্য 'বিকল্প ধারার সাংবাদিকতা' গড়ে তোলা সম্ভব বলে যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বর্তমান মালিকদের এই ভাষ্য মানেন না এবং তাঁরা 'বাণিজ্যিক' পদ্ধতি ছাড়াও অন্য উপায়ে পত্র-পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপন করে থাকেন। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে মূলধারার সংবাদপত্র বলে পরিচিত পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনকেই অপরিহার্য প্রধান আয়ের উৎস বলে দাবি করা হয়ে থাকে। ফলে বিজ্ঞাপন ছাড়া পত্রিকার পরিচালনা বা উন্নয়ন অসম্ভব,– এটাই তাদের শেষ কথা। ফলে বিজ্ঞাপন পত্রিকায় আসবেই। কিন্তু প্রশ্ন

www.pathagar.com

হচ্ছে, কি মাত্রায় আসবে? বিশেষ করে প্রথম পাতায় খবর ও বিজ্ঞাপনের কোন্ অনুপাত গ্রহণযোগ্য হবে পাঠক ও মালিক উভয় পক্ষের কাছে?

এ সব প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত সদুত্তর থাকা দরকার। বর্তমানে মূলধারার সংবাদপত্রগুলোতে যে হারে প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তাতে এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পত্রিকা মালিকদের কাছে আছে বলে মনে হয় না। অচিরে এ ব্যাপারে পাঠক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মালিকদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সুরাহা হওয়া দরকার। যদি কোনও বিজ্ঞাপনদাতা একটি পত্রিকার প্রথম পাতার পুরোটা জুড়েই বিজ্ঞাপন দিতে চান, তখন তা মালিকপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা-ও বিবেচনায় আনতে হবে। বিজ্ঞাপনদাতা যদি বলেন, 'আমি ক্রেতা এবং আপনি অর্থাৎ পত্রিকার মালিক বিক্রেতা, সে ক্ষেত্রে পুরো প্রথম পাতার মূল্য চুকিয়ে দিয়ে কেন আমি পুরো পাতাটি কিনতে পারবো না?' পত্রিকা মালিকরা বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্লেষণ করবেন আশা করি।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিজ্ঞাপন সম্পর্কেও শ্রোতা-দর্শকদের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে আকর্ষণীয় কোনও অনুষ্ঠানের মাঝে যখন উপস্থাপক হঠাৎ করে তথাকথিত 'ব্রেক' এর ঘোষণা দেন, তখন অনেক শ্রোতা-দর্শকেরই মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের কিছু করার থাকে না। আবার যদি অনুষ্ঠানটি তার সত্যি ভালো লেগে থাকে, তবে উঠে যাওয়ারও ইচ্ছে হয় না। ফলে উপস্থাপক যত বিনয় ও ভদ্রতার সঙ্গেই 'আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন' বলুন না কেন, 'ব্রেক'-এ দেখানো বিজ্ঞাপনদাতার উপর অনেক শ্রোতা-দর্শকই মনে মনে ক্ষুণ্ন হন। মজার ব্যাপার এই যে, যে অনুষ্ঠান যত বেশি জনপ্রিয়, সেই অনুষ্ঠানে এ ধরনের বিজ্ঞাপনী 'ব্রেক' তত বেশি থাকে। এ যেন এক চাপিয়ে দেয়া উপদ্রব। অবশ্য বিজ্ঞাপনদাতা এই 'উপদ্রব' থেকেই ফায়দা পাওয়ার আশায় থাকেন। অধিক গুরুত্বপূর্ণ অথবা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সাধারণতঃ 'প্রাইম টাইম'-এ প্রচার হয় বলে সে সময় বিজ্ঞাপনের রেট-ও বেশি থাকে। বিজ্ঞাপনদাতারা রীতিমত প্রতিযোগিতায় নামেন প্রাইম-টাইমে বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্যে।

অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তথাকথিত প্রাইম-টাইম-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা কি ভাবে লাভবান হন, সে এক রহস্য। হয়তো ব্যাপারটা এই রকম যে, প্রাইম-টাইমে বিজ্ঞাপন দেয়ার আগেই কোনও পণ্য বা সেবা সর্ম্পকে অন্য কোনও উপায়ে ভোক্তারা অবহিত থাকেন এবং বিজ্ঞাপনদাতারা প্রাইম-টাইমে বিজ্ঞাপন দেন এই উদ্দেশ্যে যে, সে সময় বিজ্ঞাপন দিলে তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই তাদের টার্গেট-ভোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তবুও আমি বিনীতভাবে বলবো, গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিজ্ঞাপন প্রদানের ব্যাপারে বিজ্ঞাপনদাতারা দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে গবেষণালব্ধ তথ্যের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তারা আরও লাভবান হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের গণমাধ্যমে নেতিবাচক সংবাদ বেশি থাকে।

www.pathagar.com

কথাটির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি সমাজে নেতিবাচক ঘটনাই বেশি ঘটতে থাকে, তবে গণমাধ্যম তা প্রচার না করে কি পারবে? হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, সমাজে ইতিবাচক ঘটনাও অনেক ঘটছে এবং সেগুলো গণমাধ্যমে আসা দরকার। তবে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর সীমিত ধারণ ক্ষমতা অনেক সময় সে সমস্ত ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি সংবাদ বা ফিচারের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের মাধ্যমগুলোর গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে। এরপরও ইদানিং মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক উভয় ধরনের মাধ্যমেই আরও বেশি উন্নয়ন ও উজ্জীবনমূলক সংবাদ ও ফিচার প্রচারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ এই প্রবণতাকে নাম দিয়েছেন উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এই প্রবণতার সাফল্য কেবল সাংবাদিকদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করবে না। দেশের সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নয়নের ধারা সূচিত না হলে এই সাংবাদিকতা চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। দ্বিতীয়ত, নেতিবাচক সংবাদগুলোর সংবাদমূল্য যদি হয় বিশাল এবং সেই তুলনায় যদি ইতিবাচক সংবাদের সংবাদমূল্য থাকে অকিঞ্চিৎকর, তবে উন্নয়ন সাংবাদিকতার মহান উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। রাজনৈতিক বা অন্যপ্রকার রেষারেষিতে খুন-খারাবি এবং ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকলে তার পাশাপাশি এক চাষীর কলা চাষের সাফল্য দিয়ে তা ব্যালেন্স করা যাবে না।

এরপরও কলা চাষীদের খবর ছাপা হোক, গণমাধ্যমের ভোক্তারা তা চায়। অন্যের সাফল্য যেন অনেকটা নিজের সাফল্য বলেই তারা মনে করে। ভোক্তার বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে এ দেশের কোনও প্রতিভাবান চাষী কিংবা কারিগরের বিস্ময়কর সাফল্যে। এ দেশে নতুন কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজ জানা গেলে অথবা এ দেশের বিশাল নদীগুলোকে মানুষের উপকারে লাগানোর কোনও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বর্ণিত হলে মানুষ তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। বড় হতভাগ্য এদেশের সাধারণ মানুষ, তারা যুগ যুগ ধরে কেবলই দুঃসংবাদ শুনে আসছে। আজ যদি তারা আর তা শুনতে না চায়, তা হলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। কিন্তু সুসংবাদ যারা তৈরি করবেন, যাদের সেই ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে, তারা কি তা হৃদয়ঙ্গম করছেন? নাকি সেই ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুযোগ গ্রহণ করে কেবল আখের গোছানোর কথাই ভাবছেন? কিন্তু হায়, এ ভাবে আখের গোছানো যায় না! নিজ দেশ রসাতলে গেলে সব নাগরিকের আখেরও প্রকারান্তরে রসাতলেই যায়! হয়তো অল্প কিছুদিনের জন্যে বড়জোর এক প্রজন্মের হাতে গোনা লোকেরা এই নেতিবাচক প্রবণতায় লাভবান হতে পারে, কিন্তু প্রজন্মান্তরে তাদের অবশ্যই সেই অপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়।

বুঝতে পারছি কথাগুলো বেশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। তবুও চার দশকেরও বেশিসময় ধরে গণমাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকার পর বাংলাদেশের বর্তমান গণমাধ্যমের হালচাল নিয়ে দু'টি কথা বলার তাগিদে এ সব বিষয় এসে গেল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এই রাজধানী ঢাকা শহরে কোনও দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। খুবই কম ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বেতার কেন্দ্র ছিল ঢাকায়, রেডিও ছিল খুবই অল্প সংখ্যক কিছু বাড়িতে। ঢাকার অধিকাংশ এলাকায়ই তখন বিদ্যুৎ ছিল না, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সারা শহরে বড়জোর কয়েক ডজন মোটরগাড়ি চলতো, ঘোড়ার গাড়িই ছিল প্রধান বাহন। তারপর অর্ধ

www.pathagar.com

শতাব্দীরও কিছু সময়ের পথ-পরিক্রমায় আজ সেই শহরই বিশাল নগরীতে পরিণত হয়েছে। এই উন্নয়নের কাহিনীও আজকের অনেক তরুণ নাগরিকের জানা নেই, তাদেরকে সেই বিস্ময়কর কাহিনী শোনানোর দায়িত্বও গণমাধ্যমের উপরই বর্তায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুব কম সাংবাদিকের পদচারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেবল ঢাকা নগরীই নয়, দেশের প্রায় সর্বত্র ঘটমান এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন তথা উন্নয়নের কাহিনীও আজকের সাংবাদিকের বিশেষ করে ফিচার লেখকের আহরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

দেশের সব কিছুই নিরাশাব্যঞ্জক নয়,- অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাফল্য, বিনির্মাণের দৃষ্টান্ত আছে এ দেশে, সেই কথাগুলো বর্তমান প্রজন্মকে জানানো দরকার। অস্বীকার করবো না, দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ তরুণ প্রজন্মকে বড় বেশি মোটা দাগের ভোগবাদী করে তুলছে, জীবনের সূক্ষ্মতম, গভীরতম আনন্দের সন্ধান থেকে বঞ্চিত তারা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। পকেটে একটি বোমা অথবা পিস্তল হয়তো তাদের সাহস যোগায়, কিন্তু নজরুলের কবিতা তাদের উজ্জীবিত করে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ কমে যাচ্ছে, কেবল টাকা-পয়সা কামানোর উপায় শেখানোকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া খুবই ভালো কথা। কিন্তু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে ভালো মানুষ গড়া, এ কথাটি কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। রাজনীতিতে তরুণ সমাজ সম্পৃক্ত হতে পারে কেবল আদর্শবাদের ভিত্তিতে, কিন্তু তা না হয়ে তারা তাদের অজান্তেই নষ্ট রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পাঁক থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে। এখনও দেশে এমন কিছু গণমাধ্যম কর্মী রয়েছে, যাদের এই সময়ে কিছু করার মত মানসিক সামর্থ্য রয়েছে। সংবাদপত্র কিংবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর যারা হর্তা-কর্তা-বিধাতা, তাদের মধ্যেও নিশ্চয় কিছু দেশপ্রেমিক রয়েছেন, পুঁজিপতিদের মধ্যেও রয়েছেন বেশ কিছু সংস্কৃতিবান মানুষ- আজ তাদেরই এগিয়ে আসার দিন।

দেশ বিপন্ন হলে আমরা কেউই ভালো থাকতে পারবো না, কেননা মানুষ নিয়েই তো দেশ। দেশটিকে একটি সাধ্যমত 'ভালো মানুষের দেশ' হিসেবে গড়ে তোলাও উন্নয়নের একটি বড় শর্ত। অন্যথায় কেবল বস্তুগত উন্নয়ন আমাদের অশান্তি কমাতে পারবে না, বরং তাতে অস্থিরতা বাড়বে। মানুষের জীবন বড় গভীর, বড় অর্থবহ- এই কথাটি আজ সাংবাদিকসহ সবাইকে বুঝতে হবে। গভীর জীবনে আনন্দও গভীর। মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করলেই সেই গভীর আনন্দ হাতের নাগালে আসতে পারে। সমাজে, রাজনীতিতে, সাংবাদিকতায় সেই বোধটা জাগ্রত করতে পারলে হয়তো অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

এই মুহূর্তে এ দেশের সমাজ ব্যবস্থায় কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই কাঠামোর মধ্যেই হয়তো আমাদের আরও অনেকদিন বাস করতে হবে। কাজেই আমাদের অন্ততঃ আরও একটু ভালো কি ভাবে থাকা যায়, সেই চিন্তাই প্রথমে করা দরকার। সাংবাদিকদের উচিত হবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত সমাধানযোগ্য বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা। তাতে ধীরে ধীরে হলেও হয়তো অবস্থার উন্নতি হতে পারে। 'অবস্থাদৃষ্টে হাল ছেড়ে দিয়েছি'- এমন মনোভাব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। দেশ একটা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে,

www.pathagar.com

এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি এই দেশ অমিত সম্ভাবনাময়। কথাটা একেবারে কথার কথা নয়। এটাই তুলে ধরা এবং প্রমাণ করার দায়িত্ব সাংবাদিকদের, তথা গণমাধ্যম কর্মীদের। সবার আগে দরকার জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। এই লক্ষ্য হাসিলে কাজ করতে হলে সাংবাদিক তথা গণমাধ্যম কর্মীদের ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সাংবাদিকরা যে এখন নানা ঘরানায় বিভক্ত হয়েছেন, তার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি এখানে প্রশ্ন তুলতে চাচ্ছি না,- কিন্তু এই রাজনৈতিক ঘরানার বাইরেও অনেক সাধারণ কর্মক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে সাংবাদিকদের লক্ষ্য অভিন্ন। কথাটা বহুল ব্যবহারে প্রায় ক্লিশে হয়ে গেলেও আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি,- দেশ সবার, জাতি সবার। দেশ-জাতির ভালো-মন্দ সবাইকে স্পর্শ করবে। সাংবাদিকদের মত সচেতন, শক্তিশালী, সম্ভাবনাময় গোষ্ঠী এই সময় তাদের যথাকর্তব্য স্থির করতে ভুল করবেন না, বড় আশা নিয়ে এই বিশ্বাস আমরা পোষণ করতে চাই ।

লেখক ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের মাস মিডিয়া এ্যাণ্ড জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সালাম

গাজীউল হাসান খান

মানুষ বিদেশে গেলে কিংবা প্রবাসী হলেও দেশের যাবতীয় খবরাখবরের জন্যে তার মন সর্বক্ষণ উতলা হয়ে থাকে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা এক ধরনের পিছুটান, যা তার জন্মগত। সে কারণেই প্রবাসীরা প্রতিনিয়ত জানতে চায় তাদের আত্মীয়-স্বজনের কুশলাদি এবং দেশের ভালো-মন্দের বিস্তারিত তথ্য বিবরণ। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী মূলত পেশাগত কিংবা জীবিকা নির্বাহের কারণেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। পেছনে ফেলে গেছে তার অতি চেনা ভিটা-মাটি, আত্মীয়-স্বজন এবং নিজস্ব পরিমণ্ডল। তাই দেহটা তার বিদেশে অবস্থান করলেও মনটা পড়ে থাকে দেশে, যা ছেড়ে গেছে সেই পরিমণ্ডলে। প্রবাস জীবনে বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন, তারা তাই জানতে চায় তাদের ফেলে আসা একান্ত ভুবনের সকল খবরাখবর। সম্ভবত সে কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ক্রমশ গড়ে উঠেছে তাদের নিজ ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা।

বাংলাদেশের অভিবাসী কিংবা বহিরাগত শ্রমজীবী মানুষকে কেন্দ্র করে লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টর‍্যান্টো ও টোকিওসহ বিশ্বের বিভিন্ন সমৃদ্ধ নগরী থেকে আজ বাংলা ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা। তাছাড়া, প্রবাস থেকে এখন প্রতিবছরই বের হচ্ছে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন কবিতা সংকলন, গল্প সংগ্রহ কিংবা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জনমত' পত্রিকার বয়স এখন ৩৫ বছর। সেখান থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের জন্যে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় এক ডজন পত্র-পত্রিকা। তাছাড়া, নব্বই দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের বাইরে, অর্থাৎ লণ্ডন থেকে সর্বপ্রথম 'দেশবার্তা' নামে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণে এখন আর টিকে নেই।

দেশের বাইরে বাংলাদেশীদের সর্বাধিক সমাবেশ ঘটেছে যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনে। সেখানে এখন প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক বাংলাদেশী মানুষের বাস। তার পাশাপাশি আটলান্টিকের অপর পারে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর-নগরেও ব্রিটেনের তুলনায় বাংলাদেশীদের সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া কানাডাতেও বাংলাদেশীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নগরীগুলোতে। আজ বাংলাদেশী প্রবাসী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে সে সমস্ত স্থানে যেমনি গড়ে উঠছে বিভিন্ন দোকান-পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তেমনি তার

www.pathagar.com

পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। তথ্য প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত কারণে আজ বিভিন্ন ভাষায় সংবাদের আদান-প্রদান হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন, যা এক যুগ আগেও ঢাকায় এত সহজসাধ্য ছিল না। ঢাকা এখন তথ্য প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমৃদ্ধ বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল-মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাই শুধু ইংরেজিতেই নয়, বাংলা ভাষায়ও বহির্বিশ্বে পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা এখন অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্ভবত ১৯৬২ সালে 'দেশের ডাক' নামে লণ্ডন থেকে প্রথম একটি নিয়মিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন প্রবাসী বাঙালী সমাজসেবক প্রয়াত তোসাদ্দুক আহমদ, এমবিই। তার পশ্চিম লণ্ডনের 'গ্যানজেস' রেস্টুরেন্টের দোতলা থেকে তিনি এ পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। তৎকালীন প্রবাসী বাঙালীদের অধিকার সচেতন করে তোলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এ পত্রিকাটি বের করেন। তখন এ পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তার একমাত্র ভরসা ছিল একটি মুনীর অপটিমা বাংলা টাইপ রাইটার। তখন না ছিল কম্পিউটার, না ছিল কোনও বাংলা ফন্ট। তাছাড়া লণ্ডনে বাংলায় হট মেটাল কম্পোজেরও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাংলা টাইপরাইটারে সমস্ত খবরখবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-কবিতা এবং সম্পাদকীয় টাইপ করে শেষ পর্যন্ত একটি ট্যাবলয়েড সাইজের ডামি শিটে কাঁচি দিয়ে কেটেকুটে সেগুলো সাজিয়ে আঠা দিয়ে লাগানো হত। পাতার পর পাতা এভাবে জোড়াতালি দিয়েই তখন এ পত্রিকাটি বের করা হত। এভাবেই চলেছিল 'দেশের ডাক', প্রায় দু'আড়াই বছর। তারপর কিছুটা সময়ের ব্যবধানে প্রয়াত ওয়ালী আশরাফ সাহেবের নেতৃত্বে এবং সম্পাদনায় বাজারে আসে 'সাপ্তাহিক জনমত'। ১৯৬৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এ পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করে এবং এখনও টিকে আছে। তবে প্রথমে তারাও শুরু করেছিলেন একটি বাংলা টাইপরাইটারকে সম্বল করেই।

প্রয়াত ওয়ালী আশরাফ সাহেব দীর্ঘদিন লণ্ডনে বসবাস করলেও দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে ছিলেন আপাদমস্তক জড়িত। স্বাধীনতার আগে এবং পরে তিনি পর্যায়ক্রমে আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ এবং পরিশেষে বিএনপি'র সঙ্গে জড়িত হন। শেষোক্ত দল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার আগে এরশাদ আমলেও তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। শেষের দিকে বিভিন্ন কারণে তিনি সাপ্তাহিক জনমতের মালিকানা ছেড়ে দিয়ে প্রায় স্থায়ীভাবেই বাংলাদেশে বসবাস করেন এবং পরে ঢাকাতেই ইন্তেকাল করেন। অপরদিকে তোসাদ্দুক আহমদ সাহেব মনেপ্রাণে ছিলেন প্রগতিশীল বাম রাজনীতির ধারক ও বাহক। তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানীর একনিষ্ঠ ভক্ত। লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির একজন গভীর পর্যবেক্ষক ছিলেন। লণ্ডনসহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর-নগরে বসবাসকারী প্রবাসী মানুষকে টেনে তোলার জন্যেই তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবামূলক কাজেই মূলত প্রবাস জীবনটি কাটিয়ে যান।

এদের পাশাপাশি চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আরেকজন প্রগতিশীল মানুষ, ডা. মোর্শেদ তালুকদারও লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক জাগরণ'। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী এ পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন সম্পাদনা করেন। এর আগে

www.pathagar.com

জনাব চৌধুরী তাঁর নিজের পত্রিকা, সাপ্তাহিক 'বাংলার ডাক' চালিয়েছেন বছর দু'এক। তবে শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত দু'টি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সিলেটের মরহুম ডা. বশির আহমদ ১৯৭৭/৭৮ সালের দিকে প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক সুরমা'। ব্রিটেনে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের। সুরমাতে সিলেট অঞ্চলের প্রচুর খবর থাকার কারণে এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেস এবং সম্পূর্ণ কম্পিউটার প্রযুক্তিতে কম্পোজ করা সাপ্তাহিক 'দেশবার্তা' নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করি আমরা। লণ্ডনের ফ্লিট স্ট্রীটের মূলধারা সাংবাদিকতা ছেড়ে প্রগতিশীল রাজনীতি এবং নির্ভীক সাংবাদিকতার স্লোগান দিয়ে আমরা মাঠে নামি। আমাদেরকে আগাগোড়াই বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রয়াত তোসাদ্দুক আহমদ। দেশবার্তা মাসিক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে এবং ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা থেকে কম্পিউটার আনার পরপরই একটি ইংরেজি ক্রোড়পত্রসহ এটি পূর্ণাঙ্গ সাপ্তাহিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এর কিছুদিন পর আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলাদেশী ব্যবসায়ীর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'। কিন্তু প্রায় বছর দেড়েক চালানোর পর জনাব চৌধুরী এ পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে শফিক রেহমান কিছুদিন এটি সম্পাদনা করেন।

বাংলাদেশের অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং কর্মহীনতার কারণে সত্তরের মাঝামাঝি থেকে অভিবাসন নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক বাংলাদেশী ব্রিটেনে গেছে। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায় যোগাযোগ এবং গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। বাংলা টাইপরাইটারের বদলে মুদ্রণ শিল্পে আসে কম্পিউটার প্রযুক্তি। হাতে লেখা পোস্টারের জায়গায় পূর্ব লণ্ডনের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পায় সচিত্র রঙিন বাংলা পোস্টার। এসবের অধিকাংশই আমাদের প্রেসে ছাপা হত। ১৯৯৩ সালে আমি লণ্ডনে পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ছেড়ে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে চলে যাই তথ্য ও প্রেস মিনিস্টার হিসেবে। পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে আবার লণ্ডন ফিরে গিয়ে দেখি ইতোমধ্যে আরও কয়েকটি নতুন বাংলা পত্র-পত্রিকা বাজারে এসেছে। এর মাঝে 'সাপ্তাহিক পত্রিকা', 'বাংলা এক্সপ্রেস' এবং 'ইউরো বাংলা'র নাম উল্লেখযোগ্য।

জানা মতে, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক প্রবাসী'ই প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা, যা প্রকাশিত হয় ১৯৮০ কিংবা '৮১ সালে। এ পত্রিকাটি বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদউল্লাহ'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পর মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব এবং আমি ঢাকার তৎকালীন বেসরকারী সংবাদ সংস্থা এনায় (ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি) কয়েক বছর এক সঙ্গে সাংবাদিকতা করেছি। এরপর নব্বই দশকের গোড়ার দিকে নিউইয়র্ক থেকে এমএম শাহীনের (বর্তমানে নির্দলীয় সংসদ সদস্য) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আজকের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'। পরে ঠিকানা থেকে বের হয়ে মাহবুবুর রহমান, আবু তাহের ও নিয়াজ মাখদুম প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'। এর মাঝে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বাঙালী'। তারপর বাংলা 'পাক্ষিক পরিচয়' সাপ্তাহিক হিসেবে বেরুতে শুরু করে এবং বাজারে

www.pathagar.com

আসে 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'। আমি আমেরিকা ত্যাগ করার পর আরও কয়েকটি চমৎকার বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ইতোমধ্যে বাজারে এসেছে। এদের মধ্যে রয়েছে 'এখনই সময়', 'সাপ্তাহিক কাগজ', 'সাপ্তাহিক দর্পণ', 'সাপ্তাহিক একাত্তর' ও 'বাংলা টাইমস'। আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের খবর ছাড়াও দেশীয় রাজনীতির বিস্তারিত খবরাখবর, নিবন্ধ ও কলাম স্থান পায় এসব পত্র-পত্রিকায়। এদের কাটতিও মোটামুটি ভালো। তবে লণ্ডনের তুলনায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকার ব্যবসায়িক সাফল্য উল্লেখযোগ্য। এর মূল কারণ হচ্ছে নিউইয়র্কের পত্র-পত্রিকায় অনেক ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন থাকে, যা লণ্ডনে খুবই কম। তবে উভয় স্থানেই পত্র-পত্রিকার সঙ্গেই জড়িত রয়েছেন বেশ কয়েকজন নামকরা সাংবাদিক। এর পাশাপাশি উভয় মহানগরীতেই এখন ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশীরা কয়েকটি টিভি চ্যানেল চালু করেছেন। তার মাঝে নিউইয়র্কের 'রূপসী বাংলা', 'বাংলা টিভি' ও 'আই অন বাংলাদেশ' এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'রূপসী বাংলা'র বয়স এখন এক দশকের উপরে। এরা সবাই মূলত সপ্তাহান্তেই অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকেন। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি বাংলা রেডিও সার্ভিস। এর পাশাপাশি লণ্ডনে রয়েছে 'বাংলা টিভি', 'বেকটন টিভি' এবং 'চ্যানেল এস'। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এ চ্যানেলগুলোতে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং দেশের সর্বশেষ খবরাখবরগুলো পাওয়া যায়। দৈনন্দিন খবরের ক্ষেত্রে লণ্ডনের 'সানরাইজ' ও 'স্পেকট্রাম রেডিও'র বাংলা সার্ভিসগুলো বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' এখন পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেখতে পান। তাছাড়া এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান ক্যাবল টিভির মাধ্যমে এখন নিউইয়র্কে দেখা যায়, লণ্ডনেও আগামীতে দেখা যাবে বলে জানা গেছে। এদের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে সম্প্রচার শুরু করেছে এনটিভি। চ্যানেল আই-ও দেখা যাচ্ছে বহির্বিশ্বে। তাছাড়া লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও টর‍্যান্টোর বাংলাদেশী বিভিন্ন দোকান-পাট ও ভিডিও শপে পাওয়া যায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি নেতৃস্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোকিও এবং টর‍্যান্টোসহ বিশ্বের বিভিন্ন সমৃদ্ধ নগরীতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবস্থানগত কারণে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং বিশেষ করে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সংবাদপত্রের বিকাশ ঘটছে ক্রমশ। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং তার প্রবাসী জনগণের জন্যে এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের খবর। গর্ব করার মতো বিষয়। শুধু অর্থবিত্তের প্রেক্ষিতেই নয়, গভীর দেশপ্রেম, জাতিগত মর্যাদাবোধ, দীর্ঘদিনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং গণসচেতনতা থেকেই এ ধারা সূচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকা এবং কলকাতার পর এখন লণ্ডন ও নিউইয়র্কে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যে পরিমাণ আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদি হয়, তা যারা দেখেননি, তাদেরকে বোঝানো যাবে না। এর সবকিছুই সম্ভব হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রয়াসের ফলে। আর প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার সকল কৃতিত্ব প্রবাসী বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলোর। ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি উপলক্ষে

www.pathagar.com

আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি এবং জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। আমরা তাঁদের জন্যে গর্বিত। কারণ দেশ-বিদেশে তারাই আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সেতুবন্ধন। এ জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি আশা করি।

লেখক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

www.pathagar.com

স্মৃতিময় প্রেস ক্লাব

হাবিবুর রহমান মিলন

সাংবাদিক জীবন শুরু করার অনেক আগে থেকে প্রেস ক্লাবে আমার আসা-যাওয়া ছিল। এর মূল কারণ ছিল অগ্রজ আহমেদুর রহমানের সঙ্গে দেখা করা। শৈশব থেকেই আহমেদ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। দশম শ্রেণী পর্যন্ত কখনও প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হননি। সরাইল অন্নদা হাইস্কুল এখনও তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু পারিবারিক সংকটের জন্যে ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। আমার মত ব্রেক-অব-স্টাডি তাঁরও ছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর পর তিনি পাকিস্তান রেডিও'র ঢাকা অফিসে স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে রেডিও'র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এতে নেতৃত্ব দেন তিনি। ফলে তাঁকে চাকুরিচ্যুত হতে হয়। ১৯৫৪ সালে আহমেদুর রহমান মোহন মিয়ার মালিকানাধীন দৈনিক মিল্লাতে যোগ দেন। শুরু করেন 'সাপে-নেউলে' শিরোনামে উপ-সম্পাদকীয় লেখা। মুন্সিয়ানা ঢংয়ে ধারে ও ভারে সমৃদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক লেখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এ লেখার প্রতি নজর পড়ে ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া ও সংবাদের সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর। মানিক মিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৫৬ সালে তিনি যোগ দেন ইত্তেফাকে। কিছুদনের মধ্যেই শুরু করেন 'মিঠেকড়া– ভীমরুল' ছদ্মনামে লেখা। এ লেখা দেশে-বিদেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। শৈশব এবং কৈশোরে মা-বাবাকে হারানোর পর এ ধরণী বক্ষে তিনিই ছিলেন আমার প্রধান ভরসা। তাই মাসে দু' চারবার প্রেস ক্লাবে আসতেই হতো।

প্রেস ক্লাব তখন লাল ইটের দোতলা একটি বাড়ি। একসময় এটি ছিল বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর বাসস্থান। জগৎ বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন থিওরির বোস তিনিই। তাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

কোনও সভ্য-সচেতন জাতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্য, পুরাকীর্তি এবং প্রাচীন শিলালিপি ধ্বংস হতে দেয় না। রক্ষা করে সযত্নে। যেমন মিশরের পিরামিড, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, চীনের মহাপ্রাচীর এবং গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আদি স্থাপত্যকর্ম ইত্যাদি। কোনও দেশে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নিদর্শন নষ্ট হতে পারে, এমন কিছু করা হলে সুপ্রীম কোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করতে দ্বিধা করে না। সাম্প্রতিক নজির হিসেবে ভারতের কথা বলা যেতে পারে। তাজমহল মানবপ্রেমের অমরকীর্তি। ১৬৩০ সালে ১৭ বছরের বিবাহিত জীবনে

www.pathagar.com

১৪তম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মমতাজ মহল মারা যান। পারস্য দুহিতা স্ত্রীর স্মৃতি অমর করে রাখার জন্যে ১৬৩১ সালে সম্রাট শাজাহান এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। দশ হাজার হাতি ব্যবহার করে ভারত ছাড়াও আরব এবং মধ্য এশিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয় মহামূল্যবান নির্মাণ উপকরণ এবং বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের মণি-মুক্তা। ২০ হাজার লোক ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে এর নির্মাণকাজ শেষ করে। পারস্য স্থপতি ঈসা খাঁ এর নক্সাকার। কথিত আছে যে, তাজমহলের অনুরূপ দ্বিতীয় কোনও স্মৃতিসৌধ অন্য কেউ যাতে কোনওদিন নির্মাণ করতে না পারে, এর জন্যে নির্মাতাদের হাত কেটে দেওয়া হয়। অন্ধ করে দেওয়া হয় দু' চোখ। তাজমহলকে ঘিরে উৎসব আয়োজন করা হলে সুপ্রীম কোর্ট সুয়োমোটো নির্দেশ জারি করে। প্রদত্ত রায়ে বলা হয় যে, 'উৎসব আয়োজনে কোনও আপত্তি নেই। তবে তাজমহল চত্বরে বা এর আশেপাশে কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। রাতের বেলা খোলা রাখা যাবে না প্রবেশ পথ।' কেন এই নির্দেশ? এর কারণ এই যে, পাষাণের তৈরি হলেও প্রাচীন কীর্তি কথা কয়। সে কথা অতীত দিনের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সমাজ-জীবনের। এ কথাই নবীন ও অনাগত প্রজন্মের দিকনির্দেশিকা। সামনে চলার দিশারী। জাতির গর্ব ও গৌরবের বিষয়। কিন্তু লাল ইটের প্রেস ক্লাব এখন অতীত দিনের স্মৃতিমাত্র। বর্তমান প্রজন্ম প্রবীণ সাংবাদিকদের কাছ থেকে এখনও হয়তো ওই ছোট্ট দোতলা বাড়িটির নানা কথা শুনতে পায়। অনাগত প্রজন্ম হয়তো তাও পাবে না! অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে এর নানা কর্ম ও কীর্তি।

সে প্রেস ক্লাবে দোতলা ও নিচতলায় কক্ষ সংখ্যা ছিল সমান সমান। মাঝখানের কক্ষটি ছিল মূল লাউঞ্জ। দামী আসবাবসপত্রের বাহুল্য ছিল না। ছিল অজানাকে জানার ভেতর দিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার সুযোগ। সাধারণত এ কক্ষটি আলোকিত করে রাখতেন মানিক মিয়া, দার্শনিক-সম্পাদক আবদুস সালাম, শক্তিশালী লেখক ও সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। মাঝে মধ্যে আসতেন মুসলিম সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ মওলানা আকরম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ প্রমুখ প্রথিতযশা সম্পাদকবৃন্দ। পূর্বপাশের কক্ষটিতে আসর গুলজার করতেন কলামিস্ট ও সিনিয়র সাংবাদিকগণ। এ কক্ষটির লাগোয়া ছোট্ট একটি কক্ষে চা-নাশতা ইত্যাদি তৈরি করা হতো। পশ্চিম দিকে ছিল ছোট্ট একটি লাইব্রেরি। ক্যারাম খেলার কক্ষ এবং সর্ব পশ্চিমে ছিল প্রেস কনফারেন্স রুম। পরবর্তী সময়ে লাইব্রেরি ও কনফারেন্স রুম নিয়ে যাওয়া হয় দোতলায়। মূল লাউঞ্জে বসে সম্পাদকবৃন্দ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাসহ রোম, পারস্য, মিশর ইত্যাদি কত দেশের কত কাহিনী বলতেন, এর ইয়ত্তা নেই। কোনও কোনও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সম্পাদকবৃন্দের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক হতো। বিভিন্ন বিষয়ে মতান্তর হতো প্রায়ই। কিন্তু মনান্তর হতো না কোনওদিন। পূর্বদিকে ক্যান্টিন কাম বসার ঘরটি সর্বক্ষণ মুখর থাকতো কলামিস্ট ও সিনিয়র সাংবাদিকদের আলোচনায়। এদের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ হতো। কিন্তু বিচ্ছেদ হতো না কোনওদিন। কারও অসুখ-বিসুখ হলে বরং মনে হতো গোটা সাংবাদিক সমাজ নিয়ে যেন একটি পরিবার।

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাব ঘিরে এতো কথা, এতো স্মৃতি, যা বলতে গেলে মহাভরতের আকার ধারণ করবে। তা সম্ভব নয় বলে কেবল দু' চারটি স্মৃতি রোমন্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে এক বাক্যে দ্রুত বলছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন একদা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে নন্দিত ছিল, তেমনি তদানিন্তন প্রেস ক্লাবও ছিল জ্ঞান আহরণের আধার। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা-রাজনীতি ইত্যাদি ছাড়াও মানুষের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পাদপীঠ। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ বা দলীয় রাজনীতির ক্লেদ তখন ছিল না। ষাটের দশকে আইয়ুবীয় স্বৈরশাহী সেন্সরশিপ আরোপ করলে প্রেস ক্লাব সাংবাদিক ছাড়াও সত্য জানা ও মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী মানুষের সংগ্রামী মিলনস্থলে পরিণত হয়। পুলিশী হামলা ও বিধি-নিষেধ প্রেস ক্লাবকে প্রতিবাদী ভূমিকা থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। প্রতিদিনই বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ছুটে এসে শক্তি যোগাতেন সাংবাদিকদের। '৬৪'র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন এবং '৬৯'র গণ অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে প্রতিবাদী মানুষের অন্যতম আশ্রয়স্থল ছিল প্রেস ক্লাব। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ব্যাখ্যা ছিল যে, প্রেস ক্লাব বাঙালীর মুক্তির অন্যতম দুর্গ। পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনেক কিছু এখান থেকে হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয় প্রেস ক্লাবে। এতে একটি দেয়াল বিধ্বস্ত হয়। আহত হন প্রবীণ সাংবাদিক, তিনি 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' ফয়েজ আহমদ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রেস ক্লাব ছিল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। '৮০'র দশকের মধ্যভাগ থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড গতিলাভ করে। তখন ১৫ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও সাত দলীয় নেত্রী বেগম জিয়ার কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান স্থান হয়ে পড়ে প্রেস ক্লাব। পুলিশী চণ্ডনীতির মুখে বারবার তাঁরা প্রেস ক্লাবে আশ্রয় নেন। প্রেস ক্লাব দু' নেত্রীর কাউকে দূরে ঠেলে দেয়নি। অবিভক্ত বিএফইউজে'র সভাপতি হিসেবে আমি নিজেও সবসময় দু' নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছি। '৯০ সালে প্রেস ক্লাব থেকেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সূচনা হয়। রিয়াজউদ্দিন আহমদ তখন বিএফইউজে'র সভাপতি। আসা-যাওয়ার পথে বহুবার দু' নেত্রীর পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কুশল বিনিময় ছাড়াও আন্দোলন নিয়ে কথা হয়েছে কখনও কখনও। তখন দু' জনের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি দেখেছি, তা বিনষ্ট না হলে আমাদের জীবনমান মার্কিন পর্যায়ে উন্নীত না হোক, অনেক স্বচ্ছল হতো।

বর্তমান প্রেস ক্লাব আকার আয়তনে বিশাল। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সুসজ্জিত। সুযোগ-সুবিধাও অধিক। প্রতি বছরই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অংশগ্রহণ করার সুযোগ-সুবিধা সংবলিত খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন হয়। রোজার দিনে ইফতারি এবং বার্ষিক ডিনারও বাদ যায় না। সাংবাদিকদের পুত্র-কন্যাদের জন্যে সঙ্গীত শিক্ষা ও শিল্পচর্চার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়বে। এসব কিছুর জন্যে বিভিন্ন সময়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। এরপরও একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির হাওয়া প্রেস ক্লাবকে সমসময় ভারাক্রান্ত করে রাখে। কখনও কখনও মনে হয়, সেদিনের সেই মধুময় স্মৃতি যেন দূর নীহারিকায় বিলীন!

শিক্ষিত সচেতন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই মতাদর্শগত একটা বিশ্বাস আছে। অতীতেও তা

www.pathagar.com

ছিল। কিন্তু আদর্শ ও মূল্যবোধগত বিশ্বাস তখন সম্প্রীতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। টেবিল ভাগাভাগি ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

'চরিত্র পূজা' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'জনতা যখন বিশৃঙ্খল, তখন সে হীনবল। যখন সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ তখন দুর্মর।' এই বক্তব্যের যে মর্মবাণী, তা থেকে আমরা যদি শিক্ষা গ্রহণ না করি, তবে কে করবে? কি করে ফিরে আসবে লাল ইটের ছোট্ট বাড়িটির হারানো ঐতিহ্য? সক্রেটিসের ভাষায় বলা যায় যে, 'জিজ্ঞেস করো নিজেকে, তুমি যা করছো, সেটা তোমার জন্যে ভালো কি মন্দ।'

লেখক দৈনিক ইত্তেফাকের সহযোগী সম্পাদক ও অবিভক্ত বিএফইউজে'র সাবেক সভাপতি

www.pathagar.com

আরাফাতের সাক্ষাৎকার: রোমাঞ্চকর অনুভূতি

জহিরুল হক

এই পৃথিবী থেকে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অক্লান্ত-নিরলস যোদ্ধা, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মুক্তিকামী মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের অবিচল সাহসী প্রতীক ইয়াসির আরাফাতের মহাপ্রস্থান ঘটেছে। ১০ নবেম্বর ২০০৪ ঘোষণা করা হলো প্যারিসের পারসি সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্যালেস্টাইনি জনগণের 'আবু আম্মর' –জাতির পিতা ইয়াসির আরাফাত। ইহুদীবাদী ইসরাইলের গ্রাস থেকে স্বদেশ পুনরুদ্ধারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উৎসর্গ করা সারাটি জীবন আরাফাত কাটিয়েছেন যাযাবরের মত। কখনও মিসর, কখনও সিরিয়া, কখনও জর্ডন, কখনও লেবানন, কখনও তিউনিসিয়ায় জীবন কাটিয়েছেন তিনি। ১৯৯৩ সালে অসলো শান্তি চুক্তি করে ফিরে এসেছিলেন পশ্চিম তীরে– নির্বাচিত হয়েছিলেন প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটির প্রেসিডেন্ট। সামনে ছিল দুস্তর আরও পথ অতিক্রমের পালা– পবিত্র নগরী, তাঁর জন্মস্থান জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন পূরণ। জীবদ্দশায় তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ইঙ্গ-মার্কিন সহায়তায় ইসরাইলের যুদ্ধবাজ শ্যারন সরকার কার্যত জীবনের শেষ ক'টি বছর তাঁকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল রামাল্লায়। রহস্যজনক অজ্ঞাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ২৯ অক্টোবর রামাল্লা থেকে স্থানান্তরিত হলেন প্যারিসে। সংগ্রামী যাযাবর আরাফাতের যাযাবরের মতই মৃত্যু ঘটলো পরবাসভূমে।

আরাফাতের মৃত্যুর পর পশ্চিমা প্রচার ও গণমাধ্যম বলেছে 'Yasser Arafat, the spearhead of an ultimately 'failed' four-decade struggle for statehood died at the age of 75.... পশ্চিমা ও গণমাধ্যমের মন্তব্য অনুযায়ী আরাফাতের সংগ্রাম কি সত্যিই ব্যর্থ (?) হয়েছে? একটি ছাত্র আন্দোলনকে তিনি মুক্তি সংগ্রামের রূপ দিয়েছেন। ষাটের দশকে সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি নিজের এবং পিএলও'র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্যালেস্টাইনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষা করে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়, সারা বিশ্ব আজ এ সত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। অসলো শান্তি চুক্তিও ইসরাইল সরকার করেছে পিএলও'র সঙ্গেই। জাতিসংঘে পিএলও'র রয়েছে পর্যবেক্ষকের আসন। আরাফাতের দীর্ঘ সংগ্রামে কোনও পরাজয় নেই। বহু বাধা-বিপত্তি, পরাশক্তির ষড়যন্ত্র তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। প্যালেস্টাইনের নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত মরুপ্রান্তর, ভূমধ্যসাগরের স্রোতোধারা সাক্ষ্য দেবে আরাফাতের চার দশকের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের ইস্যু আজ এক মহাসত্য। আরাফাতের উত্তরসূরী নেতৃত্ব পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের কুটিল আর্বতে পড়ে যদি বিভ্রান্ত না হয়, তবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র হবেই।

কিংবদন্তিতুল্য মহানায়ক ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে এক দুর্লভ সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়েছিল। ইসরাইলের লেবানন আক্রমণের মাসখানেক আগে পশ্চিম বৈরুতে পিএলও সদর দফতরে, ১৯৮২ সালে। নিস্তব্ধ মধ্যরাতে ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই ঘটনা এখনও আমাকে রোমাঞ্চিত করে। বাইশ বছর আগে সাংবাদিক হিসেবে আমি বৈরুত গিয়েছিলাম। দৈনিক বাংলায় আমার দু'টি রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছিল। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তি গ্রন্থের সম্পাদক আমার সুদীর্ঘকালের সহকর্মী স্নেহভাজন হাসান হাফিজের অনুরোধে বাইশ বছর আগের রিপোর্ট দু'টি পুনঃপত্রস্থ করা হলো। আরাফাতের সাক্ষাৎকারটি ১৯৮২ সালের ২৯ মে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আরাফাতের সাক্ষাৎকার
ইসরাইলের অস্ত্রশক্তি আমাদের মনোবলের কাছে একদিন হার মানবেই

বৈরুত: ঘড়ির কাঁটায় তখনও মধ্যরাত পেরিয়ে যায়নি। আমরা চলেছি প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে দেখা করতে। বৈরুত নিস্তব্ধ। মোহময় রাতের জলসায় বৈরুত এখন আর উদ্দাম হয় না বেলি ড্যান্সারের লীলায়িত ছন্দে। মধ্যপ্রাচ্যের স্বপ্নপুরীতে দু'হাতে পয়সা উড়িয়ে জীবনের সুখ লুটে নিতে এখন আর আসে না পর্যটকের দল। বৈরুতের মদিরা এখন বারুদের গন্ধে ফেরারী।

দিনের আলোয় আকাশে হানাদার ইসরাইলি বিমানের হামলা চলে। নিচ থেকে গর্জে ওঠে বিমান বিধ্বংসী কামান। কখনও ইসরাইলি বোমার আঘাতে ধ্বংস হয় অট্টালিকা। বিরান হয় জনপদ। তবু মরিয়া জীবন চলে ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে।

কিন্তু রাতের বৈরুত অনেক সাবধানী। অনেক সতর্ক। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। সারাদিনের অবিশ্রাম গাড়ির মিছিল স্তব্ধ হয়ে থাকে পার্কিং জোনে। তখন পথে পথে জোরদার হয় মিলিটারি টহল। আল-ফাত্তাহর ফেদাইন আর প্যালেস্টাইন-লেবানিজ জয়েন্ট কমাণ্ডের সৈন্যরা লরি, কামান, মেশিনগান নিয়ে টহল দেয় বৈরুতের রাজপথে। লেবাননের গৃহযুদ্ধের সময় শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সিরীয় বাহিনী। অভ্যন্তরীণ গোলযোগে লেবানন এখনও কাঁপছে। ইসরাইলের বিমান হামলা চলে প্রায় প্রতিদিনই। তাই সিরীয় বাহিনী এখনও লেবাননে আছে। এদের সংখ্যা ৫০ হাজার। রাতের বৈরুতে এরাও সতর্ক টহল জোরদার করে। অসামরিক যানবাহন ও লোকদের থামতে হয় প্রতিটি মিলিটারি চেকপোস্টে। ফেদাইনের টহল গাড়ির গতিও কমাতে হয় সিরীয় সৈন্যের চেকপোস্টে।

বৈরুতে পৌঁছানোর পর পরই পিএলও'র বৈদেশিক তথ্যকেন্দ্র থেকে জানানো হয়, 'আবু আম্মর' (জাতির পিতা) ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে যে কোনও দিন,

www.pathagar.com

যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। তার চেয়েও বড় তাঁর নিরাপত্তার প্রশ্ন। কাজেই দিনক্ষণ কিছুই আগে জানানো সম্ভব নয়।

বৈরুত এসেছি আমরা ৮ মে '৮২ দুপুরে। ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে বিমানবন্দর। উজ্জ্বল রোদ। ভূমধ্যসাগরের শান্ত নীল পানি। উপত্যকাময় বিশাল নগরীর বুকে পাইন আর দেবদারুর সারি। মাঝে মাঝে রক্তজবা আর করবী ফুলের ঝোপ; প্রকৃতির অপরূপ রূপ-লাবণ্য যে কোনও বিদেশীর চোখ নিমেষে আকর্ষণ করে।

আল ফাত্তাহর ফেদাইনের গাড়িতে নির্ধারিত হোটেলের দিকে যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই চোখে পড়ছে যুদ্ধের বিভীষিকা। কয়েক গজ অন্তর অন্তর ইসরাইলি হামলা প্রতিহত করার প্রস্তুতি। বালির বস্তার ফাঁক দিয়ে আকাশমুখী বিমান বিধ্বংসী কামানের নল। কোথাও পাইনের ঝাড়ের নিচে আড়ালে লরির ওপর মেশিনগান নিয়ে বসে আছে প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধা। চোখে পড়ছে ইসরাইলি গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত অট্টালিকা। বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত শেলের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ফ্ল্যাট বাড়ির দেয়াল।

ইহুদিবাদী ইসরাইলের নৃশংস অত্যাচারে স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত প্যালেস্টাইনি জনগণের একটি বিপুল অংশ আশ্রয় নিয়েছে লেবাননে। লেবানন থেকেই পিএলও জোরদার করছে মুক্তি সংগ্রাম। এ কারণেই ইসরাইলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু এখন লেবানন। বৈদেশিক তথ্যকেন্দ্র থেকে আমাদের ইসরাইলের উপর্যুপরি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা, পুনর্বাসন কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল এবং সীমান্ত এলাকা ঘুরে দেখার কর্মসূচি দেয়া হলো। এতে আরও রয়েছে বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৪ মে। রাত সোয়া ১১টা। পিএলও থেকে খবর এসেছে, এক্ষুণি আমাদের যেতে হবে। পোর্টিকোর নিচে গাড়ি থাকবে। চালক আমাদের চিনে নেবেন। হোটেল কক্ষ থেকে প্রস্তুত হয়ে বের হওয়ার জন্যে মাত্র তিন মিনিট সময়।

প্রথম ট্রিপে চালক– পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের চীফ নিউজ এডিটর হুমায়ুন চৌধুরী ও ক্যামেরাম্যান জিয়াউল হককে নিয়ে ছুটলেন। দ্বিতীয় দফায় ফিরে এসে নিয়ে চললেন বাংলাদেশ অবজারভারের ইকবাল সোবহান চৌধুরী, রেডিও'র নিউজ এডিটর নূরুল হোসেন এবং আমাকে।

নিস্তব্ধ বৈরুতে ভূমধ্যসাগরের হাওয়ার চঞ্চলতা ছাড়া জীবনের আর কোনও স্পন্দন নেই। নিঃসঙ্গ রাতজাগা প্রহরীর মতো শুধু স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলছে। সিরীয় চেকপোস্টগুলো ধীরগতিতে অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি নিচ্ছে ঝড়ের গতি। চেকপোস্টগুলো ছাড়া বাকি পথে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে চালক আমাদের নিয়ে এলেন কমাণ্ডোদের নিশ্ছিদ্র প্রহরাবেষ্টিত এক এলাকায়। একটি বহুতল ভবনের ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে নেমে গেলাম আমরা। এখানেই আমাদের সাক্ষাৎকার দেবেন প্যালেস্টাইন মুক্তিসংস্থার নেতা ইয়াসির আরাফাত। কনফারেন্স কক্ষে আমাদের স্বাগত জানিয়ে পিএলও'র মুখপাত্র মাহমুদ লাবাদি বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রাদার আরাফাত আসছেন। তিনি (আরাফাত) বলেছেন, পেশাদার

www.pathagar.com

সাংবাদিক কিংবা গণমাধ্যম কর্মীর সঙ্গে 'ইন্টারভিউ' হিসেবে তিনি এই সাক্ষাৎকারকে মনে করেন না। একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবেন আরাফাত। কাজেই সাক্ষাৎকারের প্রকৃতি হবে অনেকটা অনানুষ্ঠানিক।

রাত ১২টা তিন মিনিটের সময় কনফারেন্স কক্ষে এলেন ইয়াসির আরাফাত। পরনে প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির জলপাই রঙের ইউনিফর্ম। তার ওপর খাকি জ্যাকেট। মাথায় তাঁর ঐতিহ্যবাহী পাগড়ি– কাফিয়া। কোমরে ঝোলানো রিভলবার। আরবি প্রথায় চুম্বন এবং উষ্ণ আলিঙ্গনে অভ্যর্থনা জানালেন সবাইকে। বিরল এক উচ্ছলতা নিয়ে আরাফাত চেয়ারে বসেই বললেন: আমি অসম্ভব গর্বিত। বাংলাদেশের তরুণরা আমাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, এটা এমন এক ঘটনা যে, কোনও আবেগময় ভাষায়ই আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি– বাংলাদেশের তরুণদের কাছে আমি ঋণী। বাংলাদেশের সেইসব পিতামাতা, যাঁরা তাঁদের ছেলেদের প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পাঠিয়েছেন, বলবেন– আমি তাঁদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো। আরাফাত বললেন, হয়তো বাংলাদেশের কোনও এক তরুণই একদিন মুক্ত আল আকসার মিনারে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করবেন। সেদিন আপনাদের-আমাদের মিলিত আনন্দ বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ছুটবে।

এমন সময় একজন সহকারী এসে আরাফাতের হাতে একটি চিঠি দিয়ে গেলেন। চিঠিটা পড়ে তিনি ইন্টারকমে কথা বললেন। টেলিফোনেও কথা বললেন। পাশে বসা মাহমুদ লাবাদির সঙ্গেও কথা বললেন। আরাফাতের এ সময়কার কথাবার্তা ছিল আরবিতে। পরে এতক্ষণের কথোপকথনের সারমর্ম ইংরেজিতে বললেন আমাদের কাছে। আরব লীগের আসন্ন এক জরুরি বৈঠকের ব্যাপারে এসেছে চিঠিটি। এর ওপর তাৎক্ষণিক কিছু সিদ্ধান্ত তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সহকারীদের।

আমাদের সঙ্গে আবার কথা শুরু করার জন্যে সহজ ভঙ্গিতে টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসলেন আরাফাত। কিন্তু আবার এলো টেলিফোন। কথা সেরে গম্ভীর হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। এতক্ষণের হাসিখুশি মুখে একটা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়লো। ফুটে উঠলো অসম্ভব দৃঢ়তার ছাপ। মরু ঈগলের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা জ্বলে উঠলো তাঁর দু'চোখে। কাটা কাটা শব্দে বলে গেলেন–'আনইউসুয়াল মুভমেন্ট অব ইসরাইলি নেভি...। ভূমধ্যসাগরে আজ সন্ধ্যা থেকে ইসরাইলের রণপোতের তৎপরতা বেড়েছে। লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তে পাঁচ-ছয় ডিভিশন ইসরাইলি সৈন্য অবস্থান নিয়েছে। বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে যে কোনও মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। আরাফাত আবার সহজ হলেন। মৃদু হেসে আমাদের বললেন: কিছু মনে করবেন না। আমাকে একটু সময় দিন। ইসরাইলিরা যদি মহা ধুমধামে এসেই যায়, তাহলে ওদের সাদর সম্ভাষণের জন্যে কিছুটা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করি। এরপর প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির সর্বাধিনায়ক পর পর কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। বলাই বাহুল্য, আরবিতে।

ইসরাইলের ব্যাপক হামলার প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আরাফাত বললেন:

www.pathagar.com

হামলা তারা রোজই চালাচ্ছে। লেবাননের আকাশে তাদের জঙ্গি বিমানের আনাগোনা আপনারাও দেখেছেন। আমরাও প্রতিদিনের জন্যে প্রস্তুত আছি। হামলা চালাতে ওদের বাধা কোথায়? অত্যাধুনিক আমেরিকান সমরাস্ত্র ওদের হাতে আছে। আরবদের মধ্যে রয়েছে অনৈক্য। ইরাকের সঙ্গে সিরিয়ার সদ্ভাব নেই। সিরিয়া ও জর্ডনের মধ্যে আছে মতভেদ। ইরান-ইরাক যুদ্ধে লিপ্ত। একমাত্র আশা ছিল মিসর। তারাও এখন ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি করে ইসরাইল-আমেরিকার ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে দুর্জয় মনোবল ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। পুণ্যভূমি জেরুজালেমের পবিত্র প্রস্তরখণ্ডই আমাদের হাতিয়ার। ডেভিড যেমন প্রস্তরখণ্ড মেরে গোলিয়াথকে পরাভূত করেছিল, আমরাও তেমনি প্রস্তর মেরেই ইসরাইলিদের পরাজিত করবো।

ইসরাইলের অস্ত্রশক্তির উল্লেখ করে আরাফাত বললেন: ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে ট্যাংক ছিল ইসরাইলের ১৫০০। এখন আছে ৪ হাজার। তখন জঙ্গি বিমানের সংখ্যা ছিল এক হাজার। এখন সংগ্রহ করেছে দু' হাজার। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি শুধু মনোবল নিয়ে। মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্যে আমাদের ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে। এই ত্যাগের কাছে অস্ত্রশক্তি একদিন পরাজয় মানবেই। তিনি বলে চললেন, একসময় আমাদের কোনও স্বীকৃতি ছিল না। ইসরাইল এবং তার বন্ধুরা বলতো আমরা সন্ত্রাসবাদী। এখন তারাও আমাদের ন্যায়ভিত্তিক অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। আমি যেদিন জাতিসংঘে ভাষণ দিই (১৯৭৪), সেদিন তারা বিক্ষোভ করেছিল। স্লোগান দিয়েছিল 'আরাফাত গো ব্যাক হোম' (আরাফাত বাড়ি ফিরে যাও)। আমি বলেছিলাম– 'দ্যাট ইজ হোয়াই, আই হ্যাভ কাম ফর'– বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যেই তো এখানে এসেছি....। জাতিসংঘের ভাষণে আরাফাত বলেছিলেন, আমার এক হাতে জলপাই শাখা, আরেক হাতে অস্ত্র। বিশ্ববাসী এমন কিছু করবেন না, যাতে আমার হাত থেকে জলপাই শাখাটি খসে পড়ে।

আরাফাতের কাছে প্রশ্ন রাখা হলো– আপনার মতে প্যালেস্টাইনি জনগণের বিজয়ের ক্ষেত্রে বড় বাধা কি? তাঁর উত্তর, আরব দেশগুলোর অনৈক্য। তিনি বললেন, এই অনৈক্যের ফলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, তৃতীয় বিশ্বের দাবি-দাওয়া এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের বিজয় পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি হতাশ নই। কারণ আমি জানি, প্যালেস্টাইনি প্রশ্ন উপেক্ষা করে কিংবা পাশ কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

কথা বলতে বলতে আরাফাত যেন হঠাৎ হারিয়ে যান। অতীতের কোনও স্মৃতিতে কিংবা ভবিষ্যতের কোনও স্বপ্নলোকে উধাও করে দেন শূন্য দৃষ্টি। কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে ডুবে থাকেন তিনি। তারপর বললেন, আমাদের ভূখণ্ডে ব্যাবিলনিয়ানরা অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়েছে পারসিক, গ্রিক, ইহুদি-রোমানরা। এসেছে তুর্কি, ব্রিটিশ, ফরাসিরা। আজ তারা কোথায়?

আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার জন্মস্থান আল কুদস্। বড় হয়েছি জেরুজালেমে। চাচার যে বাড়িতে বাস করতাম, ইসরাইলিরা তা জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার শৈশবের, আমার

www.pathagar.com

কৈশোরের স্মৃতিজড়ানো জেরুজালেম, আল কুদস্-এ আমি এখন যেতে পারি না। ইসরাইলিরা আমার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি বাধা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। জেরুজালেমের মিনার আমার দৃষ্টিতে ভাস্বর। চোখ বুঁজে আমি তা দেখতে পাই।
দৈনিক বাংলা, ৩ জুন ১৯৮২

আকাশে ইসরাইলী বিমান.....
রাস্তায় মেশিন গান হাতে প্যালেস্টাইনি শিশু

বৈরুত: প্রথম দিনের চেষ্টায় ৯ মে আমরা সিডন যেতে পারলাম না। বৈরুত থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের দূরত্বে সিডন। তিন হাজার বছরের ধূলি-ধূসর ইতিহাসের ঐতিহ্যে গর্বিত দক্ষিণ লেবাননের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর সিডন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আধাআধি পথ গিয়েছি। গাড়ির চালক আল ফাত্তাহর ক্যাপ্টেন জেহাদ। সঙ্গে আছেন মস্কো-শিক্ষিত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফেদাইন (মুক্তিযোদ্ধা) জামাল এবং আমাদের গাইড– পিএলও বৈদেশিক তথ্য কেন্দ্রের আবুল ইসা। ইসা সাংবাদিকতায় ডিগ্রি নিয়েছেন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পরে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়েছেন কেমব্রিজে।

রৌদ্র ঝলমল অপরাহ্ন। ভূমধ্যসাগরের সৈকত ঘেঁষে পথ। গায়ে বালি মেখে রৌদ্রস্নান করে সাগরের নীল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন অসংখ্য স্নানার্থী। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর। দেখে কে বলবে, এরা যুদ্ধের আশঙ্কায় সর্বক্ষণের শঙ্কিত নগরীর অধিবাসী! সৈকতের উপরে সারি সারি দূর পাল্লার কামান। লেবাননের সাগর সীমান্ত নিরাপদ রাখার জন্যে ভূমধ্যসাগরের অথৈ নীলের দিকে তাক করা সতর্ক নল। তারই নিচে উদ্বেল জীবনানন্দে জলকেলিতে রত উদ্দাম নারী-পুরুষ।

কিছুদূর যেতেই দেখি, সব গাড়ি ছুটছে বৈরুতের দিকে। কার আগে কে গাড়ি ঘোরাবে, কে কার আগে বৈরুত যাবে– বিশাল পথে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। মুহূর্তে সিডন অভিমুখী সব গাড়ি গতি ফেরালো বৈরুতের দিকে। চঞ্চল হয়ে উঠলো মিলিটারি চেকপোস্টগুলো। ইসরাইল বোমা ফেলেছে সিডনের কাছে। আমাদের গাড়ি দামুরের কাছে একটি মিলিটারি অবস্থানের ভেতর দিয়ে ছুটল বৈরুতের দিকে। বিমান বিধ্বংসী কামান সমানে শেল উদগীরণ করে চলেছে। কেঁপে কেঁপে বাজছে সাইরেন, শাদা পতাকা তুলে একটা এ্যাম্বুলেন্স ছুটে গেল আমাদের গাড়ির পাশ কাটিয়ে। সংবাদজীবী হিসেবে দারুণ রোমাঞ্চিত বোধ করলাম আমরা। কিন্তু আবুল ইসা, জামাল অসম্ভব গম্ভীর। আমরা বিদেশী– আমাদের নিরাপত্তার জন্যে পারলে ক্যাপ্টেন জেহাদ গাড়ি উড়িয়ে নিয়ে হোটেলে পৌঁছান। ফেরার পথে গুটিকয়েক স্নানার্থীকে দেখলাম, স্নানের পোশাক পরেই গাড়িতে স্টার্ট নিচ্ছেন। কিন্তু অধিকাংশই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর হানাহানি থেকে অনেক দূরে–সাগরের পানিতে ধুয়ে ফেলছেন জীবনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ক্লেদ।

সিডনে সেদিন আর যাওয়া হলো না। বিকেল সাড়ে চারটায় আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

আকাশ তখনও ইসরাইলি হানাদার-মুক্ত হয়নি। চতুর্দিক থেকে তখনও গর্জন শোনা যাচ্ছে বিমান বিধ্বংসী কামানের। আমাদের হোটেলের সামনেই কয়েকটি বহুতল ফ্ল্যাট। দেখলাম, একটি ফ্ল্যাটের নিচতলার রেলিং ডিঙিয়ে আট-দশ বছরের একটি ছেলে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। তার পরনে আল ফাত্তাহর ফেদাইনের পোশাক। হাতে একটি সাব-মেশিনগান। সে আমাদের হোটেলের পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে অবস্থান নিল। অত্যাধুনিক ইসরাইলি জঙ্গী বিমানের হামলা প্রতিহত করার জন্যে সাব-মেশিনগান নিতান্তই খেলনার শামিল। কিন্তু যুদ্ধের ঘনঘটা উপেক্ষা করে যে প্যালেস্টাইনি শিশু নিদেনপক্ষে একটি সাব-মেশিনগান নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে– তার দেশপ্রেম, তার অমিত তেজ ইসরাইলের রণসম্ভারের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তিশালী।

সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গেল, সিডনে প্যালেস্টাইনি লিবারেশন আর্মির একটি অবস্থানের উপর ইসরাইল বোমা ফেলেছে। এতে শহীদ হয়েছেন মোট পাঁচ জন। আহতের সংখ্যা সাত।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল বড় উত্তপ্ত। ইসরাইল অধিকৃত প্যালেস্টাইনের সঙ্গে লেবাননের সীমান্ত রয়েছে দক্ষিণে। দক্ষিণের সিডন, পোর্ট অব টায়ার একদম ইসরাইলের তোপের মুখে। ইসরাইল চায় এ এলাকাগুলো দখল করতে। এগুলো দখল করে লেবানন থেকে প্যালেস্টাইনিদের বহিষ্কার এবং সিরীয় বাহিনী প্রত্যাহার করার জন্যে লেবানন সরকারের সঙ্গে বড় রকমের দরকষাকষির সুযোগ খুঁজছে ইসরাইল। প্যালেস্টাইনি জনগণও দক্ষিণ লেবাননের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে প্রস্তুত। ফেদাইন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি, লেবানিজ-প্যালেস্টাইনিয়ান আর্মি এবং লেবানিজ-প্যালেস্টাইনিয়ান জয়েন্ট কমাণ্ড শত্রু মোকাবেলার জন্যে সুরক্ষিত ঘাঁটি গড়েছে এখানে।

ভূমধ্যসাগরের কোলে টলটলায়মান সিডন, যার বর্তমান নাম সায়দা, অতীতেও দেখেছে বহু যুদ্ধবিগ্রহ। অশ্ব ক্ষুরের দর্পিত আঘাতে ধূলায় বিলীন হয়েছে এখানে বহু সভ্যতা। ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার জীবনের নতুন ঐশ্বর্য মাথা তুলেছে আকাশে। সেই লোভে এসেছে নতুন অভিযানকারী। সাগরের অপার স্নেহ মমতায় বেড়ে ওঠা সিডনের সবুজ উপত্যকা বারবার লোভাতুর হামলায় হয়েছে পর্যুদস্ত। তিন হাজার বছর আগে এই নগরীর অধিকর্তা ছিল ফোনেসীয়রা। ফারাওরা বিতাড়িত করে ফোনেসীয়দের। এর পর এই নগর রাষ্ট্রের দখল নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এশিরীয় ও পারসিকরা। আক্রমণ চালায় ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার। আসে রোমানরা। আসে আরবরা। ক্রুসেডের তরঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয় সিডন। মামলুক, অটোমানদের পরে আসে ফরাসিরা।

একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে পোর্ট অব টায়ারে। টায়ারের নাম লেবাননের ম্যাপে 'সুর'। এক সময় যীশু খ্রিস্ট বেশ কিছুকাল সিডন ও টায়ারের পার্বত্য উপত্যকায় বাস করেছেন।

১২ মে আমরা এলাম সিডনে। যাবো আরও দক্ষিণে। টায়ার হয়ে রাশিদিয়া। ইসরাইল সীমান্তে লেবাননের শেষ জনবসতি। ওপারে ইসরাইলের গ্যালিলি শহর। রাশিদিয়া এবং গ্যালিলির মাঝখানে তিন বর্গ কিলোমিটারের মত এক ফালি লেবানিজ ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে মেজর সাদ হাদ্দাদ। লেবাননের সেনাবাহিনীর এক বিদ্রোহী পলাতক অফিসার। তার

www.pathagar.com

দাবি, লেবানন থেকে প্যালেস্টাইনিদের হঠাতে হবে। ইসরাইলের প্রত্যক্ষ মদদে হাদ্দাদের এলাকা এখন বলতে গেলে ইহুদীদের নতুন সম্প্রসারণ।

সাগরের সমান্তরালে সিডনের পথে পড়ে দামুর, জিয়া, রুম্মেলী। সত্তর দশকের মধ্যভাগের গৃহযুদ্ধের ভয়াল স্বাক্ষর বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। কোনওটিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। বিস্ফোরক দিয়ে আমূল ভূমি থেকে উৎপাটন করা হয়েছে কোনওটি। একই সঙ্গে ইসরাইলের বিমান হামলার স্বাক্ষর রয়েছে বাড়ির পর বাড়িতে। শত শত শেলের ছিদ্র দেখা যায় বাড়ির দেয়ালে। ইসরাইলের এই বিমান হামলা হয়েছিল গত বছরের জুন মাসে। এসব বাড়িঘরের অধিবাসীরা হয়তো অনেকেই বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছেন– তারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন অন্য কোথাও। এসব জনপদ এখন বিরান। শূন্য আঙিনায় অনাদরে বাড়ছে শুধু আঙুরলতা।

সিডন বন্দর এখন বন্ধ। যুদ্ধবাজ ইসরাইলিরা বন্দরে এতো জাহাজ ডুবিয়েছে যে, বন্দরের প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ডুবিয়ে দেয়া অসংখ্য জাহাজের মাস্তুল জেগে আছে পানির ওপরে।

প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির দক্ষিণাঞ্চলীয় কমাণ্ডের সদর দফতর থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা রওনা হলাম আরও দক্ষিণে। এখান থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন বাংলাদেশী ডাক্তার শফিকুল ইসলাম। সিডনে পিএলও'র এক হাসপাতালে কাজ করেন তিনি। ট্রান্স-এ্যারাবিয়ান অয়েল পাইপ লাইন ডানে ফেলে আমরা চললাম টায়ারের দিকে। টায়ারের খানিকটা আগেই লিতানি নদী। পাহাড়ি খরস্রোত বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে কলকল করে। গাইড ইসা লিতানির পাড়ে গাড়ি থামিয়ে বললেন: ঐ যে দেখছেন ভাঙা ব্রিজ। ওর ওপরেও গত জুনে ইসরাইল বোমা ফেলেছে। স্ট্র্যাটেজিক আর্মি মুভমেন্টের জন্যে লিতানি ব্রিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন যেতে হয় বেশ ঘুরে।

লিতানির পাড়ে ঘন কমলা বাগান। খেজুর বন। সবুজ পাতার অবগুণ্ঠনে ঝুলছে অজস্র পাকা কমলা। আর আছে টুকটুকে হলুদ রঙের এক ধরনের ছোট ফল। নাম 'একদানিয়া'। বাংলায় অর্থ দাঁড়ায়– নতুন বৌ। এই ফল বাগানের ভেতরে আছে ফেদাইনদের ঘাঁটি। কয়েকজন কিশোর ফেদাইন তখন ডিউটিতে। ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ওরা ডেকে নিয়ে এলো ইনচার্জকে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে। নাম আহমাদ। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি ফেদাইন। বললেন: আমি প্রথম যুদ্ধ করি সিরিয়ায়। বীরত্বের জন্যে আরাফাতের মেডেল পেয়েছি। আমার বীরত্ব অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। আমি রাজনীতি বুঝি। দেশপ্রেমে আমি উদ্বুদ্ধ। আমার ছেলেরাও সবাই রাজনীতি সচেতন। তারাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। আমরা হাসি-মুখে মরে যেতে পারি।

লিতানির তীর থেকে টায়ার হয়ে আমরা চলে গেলাম রাশিদিয়া। বৈরুত থেকে রাশিদিয়ার দূরত্ব প্রায় এক শ' কিলোমিটার। রাশিদিয়ায় সাত হাজার প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুর ক্যাম্প আছে। ক্যাম্প মানে ছোট ছোট পাকা একতলা বাড়ি। প্রতিটি বাড়িতেই এয়ার রেইড শেলটার আছে ভূ-গর্ভে। রাশিদিয়ার এই ক্যাম্প গড়ে ওঠে ১৯৪৮ সালে। গাইড ইসা

www.pathagar.com

জানালেন: তখন থেকে আজ অবধি সাত শ' বার এই ক্যাম্প ইসরাইলিরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ১৯৭৪ সালের পর এই ক্যাম্পে বিমান হামলায় নিহত হয়েছে পাঁচ শ' প্যালেস্টাইনি। আহতের সংখ্যা অনেক বেশি।

ক্যাম্পের ভেতর ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এখানকার জীবন। উঠানে মাচা ভর্তি আঙুর লতা। এখানে-ওখানে ভুট্টার চারা। দু-একটা টম্যাটো গাছ। কেমন যেন এক মমতাময় পরিবেশ। মাটির রঙ রুক্ষ, তবে লাল গোলাপ লাবণ্য ছড়িয়ে রেখেছে সারা আঙিনায়। এই সুন্দর স্নিগ্ধতার মধ্যে আচমকা হানা দেয় মৃত্যু। নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত মানুষগুলো প্রাণ ভয়ে ইঁদুরের মত ঢোকে এয়ার রেইড শেলটারের গর্তে। নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত জীবনের ঘূর্ণাবর্তে থেকেও এরা স্বপ্ন দেখে– প্যালেস্টাইন একদিন মুক্ত হবে। প্রাণ ভয়ে একদিন জীবনের সব সঞ্চয় ফেলে তারা পালিয়ে এসেছিল। মুক্ত প্যালেস্টাইনে আবার তারা ফিরে যাবে বিজয়ীর মত।

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার চীফ রিপোর্টার, বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক

www.pathagar.com

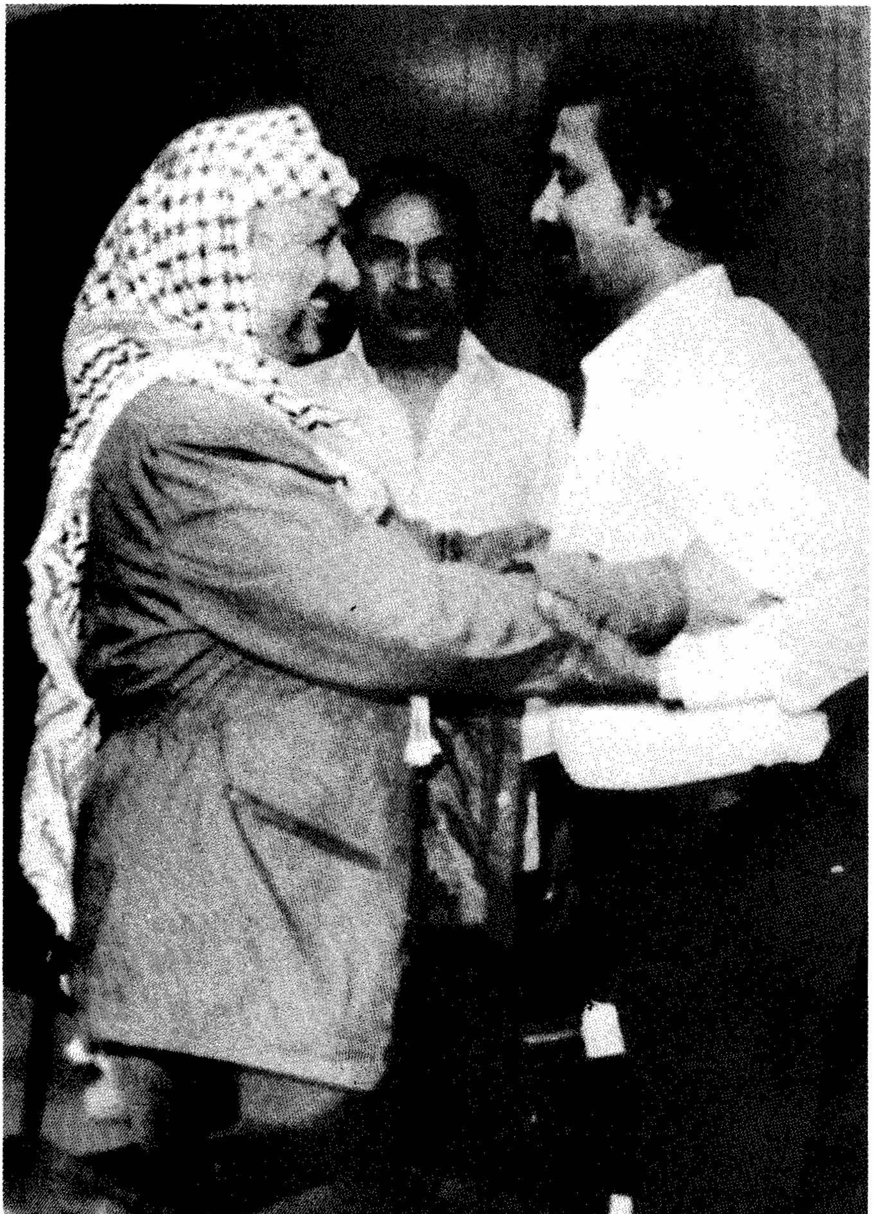

ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে লেখক জহিরুল হক

www.pathagar.com

আমি কি সাংবাদিক ছিলাম?

কে জি মোস্তফা

ডিএফপি থেকে প্রকাশিত সচিত্র বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন সম্পাদক পদ থেকে আমি ১৯৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করি। অবলুপ্ত সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক হিসেবে ১৯৭৬ সালে উক্ত অধিদফতরে প্রথমে সহকারী সম্পাদক, পরে সম্পাদক এবং সবশেষে ঊর্ধ্বতন সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হই। ডিএফপি-তে যোগদানের আগে দৈনিক জনপদে সিনিয়র রিপোর্টার ছিলাম। তার আগে স্বল্প সময় দৈনিক স্বদেশের (পয়গাম) চীফ রিপোর্টার, তারও আগে দৈনিক গণকণ্ঠে চীফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করি।

কথায় বলে, ব্যর্থ স্বামী আর অক্ষম পিতা হচ্ছেন সাংবাদিক। কৈশোরে অনেকের যেমন কবিতা লেখার ইচ্ছা জাগে, যৌবনে সাংবাদিক হওয়ার বাসনা, আবার কারও কারও সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্নও থাকে। আমার অবশ্য তেমন কোনওটাই ছিল না। তবু নিয়তি আমাকে সেদিকেই টেনে নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে সাংবাদিক হওয়ার সূত্রপাত ঘটে। সম্ভবত ১৯৫৭ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষ বাংলা অনার্সের ছাত্র আমি। আমাদের সহপাঠী খায়রুল বাশার তৎকালীন দৈনিক ইত্তেহাদের সহ-সম্পাদক। খায়রুল বাশার প্রিয়ভাজন চপল বাশারের বড় ভাই। এখন তিনি কুয়ালালামপুরে এইডকমের নির্বাহী পরিচালক। বিকেলের শিফটে কাজ করতেন। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা। পড়ালেখার তেমন ব্যাঘাত ঘটতো না। আর্থিক কিছু আনুকূল্যের জন্যে তখন আমার কিছু একটা করার দরকার ছিল। আমি তার কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এবং তারই সহযোগিতায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলাম। দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। যদিও চাকুরি নয়, বেতন নয়, কিন্তু কিসের এক অমোঘ টানে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে ঠিক সময় মতো পত্রিকা অফিসে গিয়ে হাজির হতাম। আমি তখন ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র। নবাবপুর রোডে পত্রিকার অফিস। আজকের মতো তখন এমন অসহনীয় যানজট ছিল না, ছিল না মানুষের অঢেল ভিড়ও। ঢাকার লোক সংখ্যা ছিল বর্তমানের তুলনায় অর্ধেকেরও অনেক কম। ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়া-আসায় কোনও অসুবিধা হতো না।

টেলিপ্রিন্টারে পাওয়া ইংরেজি ছোট ছোট সংবাদ আমাকে অনুবাদ করতে দেওয়া হতো। যতদূর সম্ভব মন দিয়ে করতাম। পরদিন ব্যগ্র হয়ে খুঁজতাম আমার অনুবাদ ছাপার অক্ষরে বের হয়েছে কিনা। ছাপা হলে সারাদিন মনে খুশি লেগে থাকতো। নিজেকে সাংবাদিক ভেবে

www.pathagar.com

গর্ব বোধ করতাম। আর ছাপা না হলে মনটা কুঁকড়ে থাকতো। বুঝি আমার অনুবাদ নির্ভুল ও সঠিক হচ্ছে না। তবু নিয়মিত অফিসে যেতাম। মাঝেমধ্যে অবশ্য নিজেকে অনাহুত মনে হতো।

এর মধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটলো। আমি আগে থেকেই কবিতা লিখতাম। স্কুল ম্যাগাজিন, কলেজ ম্যাগাজিন, এরপর হল ম্যাগাজিন, ডাকসু ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু যে পত্রিকায় আমি বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছি, সেখানে আমার কবিতা বারবার নাকচ হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি চাপলো। আমি নতুন একট কবিতা লিখে চীনা ভাষার এক কবির নাম উল্লেখ করলাম এবং অনুবাদক হিসেবে আমার নাম দিলাম। পরের সপ্তাহে জ্বলজ্বলে অক্ষরে সেই কবিতাটি ছাপা হয়ে গেল।

সে যাক, বেশ কিছুকাল আগে মোসাদ্দেরুল হক নামে এক প্রাজ্ঞ ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মাধ্যমে। বর্তমানের সুসাহিত্যিক প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। ওই ভদ্রলোক বেশভূষায় ছিলেন অতি সাধারণ, কিন্তু চিন্তাভাবনা ও মননশীলতায় বেশ প্রগতিশীল। দীর্ঘদিন তিনি কলকাতায় বসবাস করেছেন। সেখানে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন। খুবই মৃদুভাষী তিনি। আলোচনা করতেন শিল্প-সাহিত্যের নানান বিষয়ে। আমরা অধীর আগ্রহে সেসব কথা শুনতাম। ইতোমধ্যে তাঁর সদিচ্ছা ও উদ্যোগে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে উঠলো। তিনিই তার প্রধান। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আমি এবং আরও কয়েকজন সহপাঠী বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পেলাম। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আমাদের কর্মসূচী নিয়ে সাপ্তাহিক বৈঠক বসতো। আমি সাংবাদিকতা করছি শুনে তিনি আমাকে খুবই উৎসাহিত করতেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। বলতেন, নিয়মিত পত্রিকার সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় পড়তে। সাংবাদিকতার ভাষা আয়ত্ত করার এটাই উত্তম পন্থা। এতে পত্রিকাটির আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হতে পারবে। তাঁর সেই মূল্যবান উপদেশটি আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে অনেক সহায়ক ছিল।

তিনি সম্ভবত বেচারাম দেউড়িতে থাকতেন। ফজলুল হক হল থেকে বেশি দূরে নয় বলে, প্রায়ই আমার কাছে চলে আসতেন। প্রথম প্রথম আমার বেশ ভালো লাগতো। কিন্তু একসময় আমি কিছুটা বিরক্তবোধ করতে লাগলাম। কেননা আমার ক্লাস আছে, টিউটোরিয়াল আছে, আছে বিশ্রাম। কিন্তু তিনি যখন-তখন এসে পড়তেন। রুমমেটরাও বিরক্ত হতেন। তাঁকে কিছু বলতেও পারতাম না, সইতেও পারতাম না। যদিও তিনি সজ্জনের মতই সরল ও উদার মনে আসতেন। এমনি অবস্থায় হঠাৎ করে একসময় তিনি নিরুদ্দেশ। বেশ কিছুদিন তাঁর আর দেখা নেই। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু কিছুদিন পর একদিন ক্লাস থেকে ফিরে এসে টেবিলের ওপর তাঁর লেখা একটা চিরকুট পেলাম। আমি যেন ওইদিনই তাঁর সঙ্গে তৎকালীন জিন্নাহ এভিনিউতে প্রদত্ত এক ঠিকানায় দেখা করি। যাবো কি যাবো না ভাবতে ভাবতে অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হলাম। গিয়ে তো আমার চক্ষু স্থির!

দোতলায় বিশাল এক রুমের দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে, পাশের দেয়ালে ঝকঝকে পিতলের

www.pathagar.com

নেমপ্লেট। তাতে পষ্ট করে তাঁর নাম খোদাই করা– প্রধান সম্পাদক, দৈনিক মজলুম। টুলে বসা লম্বা-চওড়া বিরাট গোঁফওয়ালা এক পেশোয়ারী দারোয়ান। ওয়েটিংরুমে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন সেই সময়কার বেশ কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক। দারোয়ান আমাকে নাম-ঠিকানা লিখে দিতে বললো। অন্যদের বিদায় দেওয়ার পর একসময় আমার ডাক পড়লো। ভিতরে ওয়াল-টু-ওয়াল দামী কার্পেট। সুসজ্জিত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে সুদৃশ্য আর্মচেয়ারে তিনি উপবিষ্ট। সংক্ষেপে আমাকে যা বললেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে রিপাবলিকান পার্টি। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন। সরকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলায় দৈনিক মজলুম নামের ওই পত্রিকাটি প্রকাশ করছেন। তিনি আমাকে ওই পত্রিকায় সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে নিয়োগ দিলেন। শুধু তাই নয়, আমাকে বিকেলে শিফট ইনচার্জের দায়িত্বও প্রদান করলেন। বেতন কত ছিল আজ আর মনে নেই। তবে তা ছিল আমার প্রয়োজনীয় খরচের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ। খুবই খুশির কথা, কিন্তু মনে মনে আমি শংকিত হলাম। আমি কি ওই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবো? অবশ্য ক্রমান্বয়ে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে ফেলাম। এর মধ্যে একদিন সম্পাদক সাহেব আমাকে ডেকে আমার সমবয়সী এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজশাহী থেকে সদ্য বিএ পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। আমার শিফটে সহ-সম্পাদকের কাজ করবেন। সম্পাদক সাহেবের নির্দেশ, আমার তো শিরোধার্য। কয়েকদিনের মধ্যে লক্ষ্য করলাম, অন্যান্য অনেকের তুলনায় তাঁর অনুবাদকর্ম অনেক নিখুঁত। ক্রমশ তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো। জানতে পারলাম তিনি কবিতা লেখেন। লেখক নাম জিয়া হায়দার। আজকের খ্যাতিমান কবি অধ্যাপক ড. জিয়া হায়দার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে তিনি আমার সহপাঠী হলেন। আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হলো।

বেশ কিছুদিন সাংবাদিকতার নেশায় বুঁদ হয়ে রইলাম। পড়াশোনায় তেমন মনোযোগ নেই। ক্লাস ফাঁকি। আপাতত কোনও অভাব অভিযোগও নেই। স্বস্তিতে দিনগুলো কাটছিল। কিন্তু ভাগ্যে বুঝি এত আয়েশ সইলো না। একদিন ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, দেশে মার্শাল ল' জারি হয়েছে। জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। দৈনিক মজলুমও বন্ধ হয়ে গেল। যে যেদিকে পারলো আত্মগোপন করলো। আমি অগত্যা সুবোধ বালকের মতো পড়াশোনায় মন দিলাম। আমি যে ছাত্র ছাড়া আর কিছু নই! কবিতা চর্চা আগের মতই চলতে লাগলো। ১৯৫৯ সালে 'ডাকসু' আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় কবিতায় প্রথম হয়ে সনদপত্র লাভ করলাম। ইতোমধ্যে শ্রদ্ধেয় আবু হেনা মোস্তফা কামালের অনুপ্রেরণায় গান লেখা শুরু করি। ১৯৬০ সালে 'রাজধানীর বুকে' ছায়াছবিতে তালাত মাহমুদের গাওয়া 'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো' গানটি লিখে জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ। বেকার জীবন। চাকুরির কোনও প্রকার হদিশ না পেয়ে অবশেষে ঘনিষ্ঠ জনদের পরামর্শে ব্যবসায় নামলাম। ব্যবসাস্থল চৌমুহনী, নোয়াখালী। সে কালের বহুল প্রচারিত সিনে সাপ্তাহিক চিত্রালীর সম্পাদক ছিলেন এস এম পারভেজ। গীতিকার হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা ছিল। ইনি আমাকে নোয়াখালীতে চিত্রালীর

www.pathagar.com

করেসপণ্ডেন্ট হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দিলেন। একই সঙ্গে ব্যবসায় ও নোয়াখালীর সাংস্কৃতিক জগতে বিচরণ, অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই সতীন নিয়ে একত্রে ঘর করা বেশি দিন টিকলো না। যে কপাল নিয়ে ঢাকা ছেড়ে ছিলাম, একদিন সে কপাল নিয়েই ঢাকা ফিরে এলাম। ইতোমধ্যে ৫/৬ বছর অতিক্রান্ত হলো। ১৯৬৭ সালের দিকে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণরোষ চরমে উঠলো। প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ ও মিছিল। তখনকার এক প্রগতিশীল সাপ্তাহিকী 'জনতা'। সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও পণ্ডিতব্যক্তিত্ব এম আনিসুজ্জামান। তিনি আমাকে কাজ করার সুযোগ দিলেন। রিপোর্টিং, সাব-এডিটিং, ফিচার লেখা, যখন যা প্রয়োজন সবই করতে হতো।

এদিকে গণবিক্ষোভ-গণরোষ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এক সময় আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। ক্ষমতায় এলেন ইয়াহিয়া খান। গণবিক্ষোভও অব্যাহত। মাঝে মাঝে হরতাল, মাঝে মাঝে কারফিউ। অবস্থার সাময়িক অবসান ঘটলো সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণায়। এম, আনিসুজ্জামান সাহেব দৈনিক আজাদের সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন। তিনি আমাকে সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই তিনি আমাকে নতুন এক চাকুরির প্রস্তাব দিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রী ও তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা কফিলউদ্দিন চৌধুরীর প্রেস সেক্রেটারী। ভালো বেতন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ তথা তাঁরও জয় সুনিশ্চিত। মন্ত্রিসভায়ও তাঁর অন্তর্ভুক্তি অবধারিত। সেই সুবাদে আমারও সরকারী চাকুরি হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এমন লোভনীয় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। সাদরে আমি তা গ্রহণ করলাম। জনাব কফিলউদ্দিন চৌধুরীর নির্বাচনী এলাকা বিক্রমপুরের বহু জনসভায় তাঁর ভাষণ, বিভিন্ন সময় তাঁর বিবৃতি তৎকালীন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে বেশ ভালোভাবে কভারেজ করাতে পারতাম । তিনি আমার কর্ম-তৎপরতায় খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। মাঝে মাঝে বেতন ছাড়াও খুশি মনে বেশ কিছু টাকা দিয়ে দিতেন। কিন্তু সুখের দিন কখনও বুঝি একই রকম যায় না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি সীমান্তের ওপারে চলে গেলেন। যুদ্ধশেষে রোগে-শোকে-বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে দেশে ফেরেন। কিছুকাল পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

অনেক রক্ত ঝরিয়ে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। বিশ্বের দরবারে এক নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো। নতুনভাবে শুরু হলো নতুন দেশের জয়যাত্রা। সংবাদপত্র জগতেও এলো পরিবর্তন। নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন নতুন পত্রিকার আবির্ভাব। এমনি এক নতুন পত্রিকার নাম 'দৈনিক গণকণ্ঠ'। বলিষ্ঠ এর ভূমিকা, কণ্ঠ এর প্রতিবাদী। ১৯৭৩ সালের ২০ জানুয়ারি এর যাত্রা শুরু। সম্পাদক দেশবরেণ্য কবি আল মাহমুদ। যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। নির্বাহী সম্পাদক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আহমাদ। কিছুকাল আগে যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। আরেকজন মুক্তিযোদ্ধা হলেন বার্তা সম্পাদক, নাজিমুদ্দিন মানিক। আমার ওপর ন্যস্ত হলো চীফ রিপোর্টারের দায়িত্ব। তখন গণকণ্ঠে কর্মরত বেশ ক'জন খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। কবিদের মধ্যে আল মাহমুদ ছাড়াও ছিলেন কবি দিলওয়ার, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, আবু কায়সার, অসীম সাহা,

www.pathagar.com

মাশুক চৌধুরী, আবিদ আজাদ, আবু করিম, মোস্তাফিজুর রহমান। কথাকারদের মধ্যে তোহা খান, রমেন দত্ত, কায়েস আহমেদ, আলাউদ্দিন আহমদ, আবদুল হাফিজ, জহুরুল ইসলাম, আসফউদ্দৌলা প্রমুখ। শিশু ও কিশোর পাতা সম্পাদনা করতেন আজকের কম্পিউটার-ব্যক্তিত্ব মোস্তফা জব্বার।

গণকণ্ঠ ছিল মূলতঃ জাসদের মুখপত্র। তাদের রাজনৈতিক দর্শন যাই থাকুক, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ হবে শোষণমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত, এটা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। তখন সর্বক্ষেত্রে যে সব গ্লানিকর ও ক্ষতিকর কাজ চলছিল, গণকণ্ঠ সেই সব কথা সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিচ্ছিল। সাহসিকতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে পত্রিকাটি অতি শীঘ্রই পাঠকদের হৃদয়মন জয় করে ফেললো। জনমানুষের প্রতিনিধি তথা জাতির বিবেক হিসেবে একজন সাংবাদিক যে কত বেশি ক্ষমতাবান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে, দৈনিক গণকণ্ঠে থাকাকালীন আমার সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ওই সময়কার একটি ঘটনা বলি। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে অসংখ্য পরিত্যক্ত বাড়ি ও ছোটবড় শিল্প-কারখানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সরকার ওইগুলোর দায়িত্বে এক একজন পরিচালক নিযুক্ত করেন। এরূপ একটি শিল্প-কারখানার এক পরিচালক একদিন সকালে আমার বাসায় এসে হাজির। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, আমার ঘরে বসে আমার স্ত্রীর হাতের এক কাপ চা পান করা। আমার তো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। আমি বিনীতভাবে জানালাম, তাঁর মতো একজন অভিজাত ব্যক্তিকে বসাবার বা আপ্যায়ন করার মতো যথাযথ ব্যবস্থা আমার নেই। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। এদিকে আমিও অটল। অবশেষে থলে থেকে বিড়াল বের হলো। ওই দিনেরই গণকণ্ঠে লুটপাট ও আত্মসাতের একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। আর তিনি ছিলেন সেটার প্রধান হোতা। বললেন, আমি যদি ওই খবরটির ভুল স্বীকার করে একটি সংশোধনী ছাপিয়ে দেই, তিনি আমাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। আমি সবিনয়ে আমার অপারগতার কথা জানালাম, কিন্তু তিনি মরীয়া। আমাকে তিনি এটা-ওটা, বড় অংকের নগদ, এমনকি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই আমি রাজী হচ্ছি না দেখে তিনি আমাকে বেশ শাসিয়ে গেলেন। বললেন, কপালে আমার দুঃখ আছে । কিছু প্রাপ্তির লোভ ছিল না বটে, কিন্তু আমার মতো দুর্বলচিত্তের একজন মানুষের পক্ষে ভয় পাওয়ারই কথা। পরিণামে সৎসাহসের যে জয় হয়, অবশেষে সেটাই প্রমাণিত হলো। যাহোক, নিস্প্রাণ কলমে কী করে প্রাণ সঞ্চার করা যায় এবং যারা গোপন তথ্যের খোঁজ রাখে তাদের কাছ থেকে সেসব তথ্য কেমন করে সংগ্রহ করা যায়, গণকণ্ঠের সাংবাদিকগণ সে ব্যাপারে যেন স্বশিক্ষিত ছিল।

গণকণ্ঠ কিন্তু তার দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বেশি দিন টিকে থাকতে পারলো না। ক্রমান্বয়ে দীপশিখা নিভু নিভু হয়ে এলো। এই অবস্থায় নিতান্ত জীবনধারণের তাগিদে আমি অন্য পত্রিকায় সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। অচিরে তা পেয়েও গেলাম। পাকিস্তান আমলের দৈনিক পয়গাম তখন দৈনিক স্বদেশ নামে প্রকাশিত হচ্ছিল। এতে চীফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পেলাম। প্রীতিভাজন মোহিতুল হক রঞ্জু আমাকে পেয়ে খুশি। কিন্তু কয়েকদিনের যাওয়া-আসার পর আমার উৎসাহে ভাটা পড়লো। পত্রিকাটির পরিবেশ কেমন যেন অগোছালো, প্রাণহীন।

www.pathagar.com

কাজকর্মে সবারই শিথিলভাব।

ইতোমধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় দৈনিক জনপদ আত্মপ্রকাশ করলো। বার্তা সম্পাদক স্বনামধন্য কামাল লোহানী। চীফ-সাব সুঅভিজ্ঞ বোরহান আহমেদ। চীফ রিপোর্টার অর্থনৈতিক বিষয়ে বিজ্ঞ এরশাদ মজুমদার। সাহিত্য ও ফিচারের দায়িত্বে খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক এখলাসউদ্দিন আহমদ ।

জনপদের ঝকঝকে অঙ্গসজ্জা, পরিপাটি প্রকাশনা, মনোগ্রাহী সংবাদ পরিবেশনা, প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকের জাদুকরী ভাষায় মর্মস্পর্শী 'কলাম' অচিরেই পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আমি আবদুল গাফফার চৌধুরীর সান্নিধ্য লাভ করি। এবং তখন থেকেই তাঁর গুণগ্রাহী। আমাকে তিনি জনপদে সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ করেন এবং কূটনৈতিক খবর সংগ্রহের দায়িত্ব দেন। প্রশাসনের ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর সমালোচনায় মুখর আবদুল গাফফার চৌধুরীর সাহসিকতাপূর্ণ সেইসব ঐতিহাসিক কলামগুলো শুধু পাঠকদের প্রাণমনই উদ্বেলিত করতো না, সহকর্মীদেরকেও উজ্জীবিত করতো। বড় বড় আমলার দফতরে তাই রিপোর্টার হিসেবে আমাদের সমাদর বেড়ে গেল। অনায়াসে প্রবেশাধিকার পেয়ে যেতাম। এতে আমাদের গর্ব যেমন ছিল, ছিল আত্মমর্যাদাবোধও।

পাঠকমহলে জনপদের কদর যতই বাড়তে লাগলো, আমাদের তৎপরতা এবং দায়-দায়িত্বও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেন বেড়ে যেতে লাগলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দৈনিক একবার আমাকে যেতে হতো। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান তথা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা ও সহযোগিতার খবরাখবর প্রায়ই থাকতো। ওই সময় একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মহাপরিচালকের সাক্ষাতের আশায় তাঁর পি.এ-এর রুমে বসে আছি। পি.এ সাহেবের টেবিলের ওপর বেশ কয়েকটি ফাইল। আমি আড়চোখে দেখতে পেলাম একটির ওপর লাল কালিতে মোটা মোটা 'ক্রস' অংকিত, অর্থাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় পি.এ সাহেবের ডাক পড়লো ভেতরে। আমিও বেরিয়ে পড়লাম এবং টেলেক্স রুমে গিয়ে পূর্ব পরিচিতি নিজ জেলাবাসী এক সহকারীর সহযোগিতায় খুঁজে বের করলাম সংক্ষিপ্ত ওই খবরের ডুপ্লিকেট কপি– 'পাকিস্তান অমুক তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।'

সন্ধ্যায় অফিসে হাজির। সেদিন কারও কাছে লীড করার মতো নিউজ ছিল না বলে বার্তা সম্পাদক সাহেব ক্ষুব্ধ। অগত্যা আমি টেলেক্সের ওই ক্ষুদ্র কপিটা তাঁর হাতে দিলাম। উল্লসিত হয়ে তিনি উপস্থিত সবার জন্যে পরোটা-কাবাবের অর্ডার দিলেন। পরদিন তিন কলামে বাইলাইন লীড নিউজ।

কিন্তু ভোরেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকজন অফিসে এসে হাজির । তারা আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। আমার হাতের লেখা ওই রিপোর্টের কপিও হস্তগত করলেন। প্রেস ক্লাবে এসে জানতে পারলাম, জনপদ থেকে আমাকে বারবার টেলিফোন করা হচ্ছে। এলেই যেন যোগাযোগ করি। ফোনে চীফ রিপোর্টার এরশাদ মজুমদারকে পেলাম। তিনি আমাকে তক্ষুণি অফিসে চলে আসতে বললেন। ভয়ে ভয়ে গেলাম এবং সব কিছু শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম।

www.pathagar.com

স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা আমার জন্যে আবার আসবেন। এরশাদ আমাকে অভয় দিলেন। তারা এলে তাদের প্রশ্নের জবাবে কি কি বলতে হবে শিখিয়ে দিলেন। এরশাদ নিজের কাঁধেই যেন সব দায়-দায়িত্ব তুলে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা এলো এবং আমাকে নিয়ে যেতে চাইলো। বললেন, ঘন্টাখানেক পরেই ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু এরশাদ আমাকে একা যেতে দেবেন না। তিনি জেদ ধরলেন, তাঁকেও সঙ্গে নিতে হবে। অবশেষে দু'জনকেই নিয়ে গেল গোয়েন্দা অফিসে। তারা বারবার আমার কাছে জানতে চাইলো ওই খবরের উৎস সম্পর্কে। তাদের জেরার মুখে আমি এরশাদের শেখানো বুলি আওড়াতে লাগলাম। অর্থাৎ ওই খবর আমি নিজে সংগ্রহ করিনি। চীফ রিপোর্টার সাহেব ডিকটেশান দিয়েছেন, আমি সেই মতো লিখেছি। তারা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে একা রেখে এরশাদকে চলে যেতে বলছেন। এরশাদ অটল, তিনি আমাকে একলা রেখে কিছুতেই যাবেন না। এরশাদ অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে তাদেরকে বললেন, জনপদ পত্রিকার অন্যতম মালিক একজন মন্ত্রী। যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, মন্ত্রীমহোদয় সেটা দেখবেন। যাই হোক দিনভর জেরা এবং এরশাদের সাহসী মোকাবেলা ও অব্যর্থ যুক্তিতে একসময় তারা আমাদের মুক্তি দিলেন। মুক্ত হলাম বটে, কিন্তু মানসিক চাপ ও শারীরিক ক্লান্তিতে আমার ভেঙে পড়া অবস্থা। সেদিন একজন সহকর্মীর বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে মানসিক ঔদার্য, সাহসিকতা ও সহমর্মিতা এরশাদ মজুমদার দেখিয়েছেন, তা কোনওদিনই ভুলে যাওয়ার নয়।

যাই হোক, একদিন দৃঢ় পদক্ষেপে যে চমকপ্রদ যাত্রা শুরু করেছিল দৈনিক জনপদ, শেষের দিকে তার অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। আর্থিক অব্যবস্থার কারণে শনৈঃ শনৈঃ ডুবায়মান। ইতোপূর্বে সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরী লণ্ডন চলে গেছেন তাঁর রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার্থে। একসময় হাল ধরতে এলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাংবাদিক মাহবুবুল হক, এলেন শ্রদ্ধেয় এ বি এম মূসা। এদিকে তখন গুজব, সরকার মাত্র ৪টি পত্রিকা রেখে বাকী সবগুলো বন্ধ করে দেবেন। সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন 'নিউজপেপার ডিক্লারেশন এনালমেন্ট অর্ডিন্যান্স' ঘোষিত হলো। মাত্র ৪টি ছাড়া বাকী সব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। যারা বেকার হয়ে পড়লেন, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে তারা সরকারী চাকুরিতে বহাল হলেন। অবলুপ্ত সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে আমিও তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরে সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিলাম। যোগদানের তারিখ থেকে বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত হলাম। এখানে প্রথমে কিশোর পত্রিকা নবারুণ, পরে মাসিক পূর্বাচল, তারপর সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, সর্বশেষ পাক্ষিক সচিত্র বাংলাদেশ সম্পাদনায় নিযুক্ত হই। পাশাপাশি কিছুকাল স্কাউট পত্রিকা 'অগ্রদূত'এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করি।

দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিকতা ছাড়াও এককালে আমি 'নূপুর' নামে একটি মাসিক বিনোদন পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। প্রকাশক ছিলেন অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহমদ। বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক আখতার-উন-নবী, সাঈদ তারেক, অভিনয় কুমার দাশ প্রমুখ এতে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া সাপ্তাহিক 'রমনা'য় কিছুদিন 'নীলখাম রঙিন চিঠি' নামে একটি কলাম লিখতাম। সে

www.pathagar.com

যাই হোক, সাংবাদিক জীবনের সব ঘটনা মনে থাকার কথা নয়। এই আত্মস্মৃতি জীবনখাতার কয়েক পাতা মাত্র।

প্রসঙ্গতঃ বলি, আমাদের সময়ে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এখন তো কয়েক শ'। প্রশ্ন হচ্ছে জাতির বিবেক বলে পরিচিত এই বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক নিয়মিত কি বেতন পান? শোনা কথা, বেতন না হলেও নাকি চলে। চাই শুধু একটি 'আইডেন্টিটি কার্ড'। এখন বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের অন্যতম টোটকা মুক্তবাজার অর্থনীতি। সবকিছুই বিবেচ্য পণ্যের মাপকাঠিতে। খবরও একটা পণ্য। গোপন খবর ও গোপন তথ্যের বিকিকিনিতে নাকি দারুণ লাভ! অনায়াসে সচ্ছলতা বা সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। মুনাফাই যখন জীবন, আর মূল্যবোধের নতুন মন্ত্র 'আমি', কাজেই আমির স্বার্থই বড়। 'জাতির বিবেক সাংবাদিক'– রক্ষণশীল যুগের ওই মনোভাব এখন আর কি ধোপে টেকে? তাই বুঝি নতুন নতুন পত্রিকার নিত্য আবির্ভাব!

লেখক সচিত্র বাংলাদেশ-এর সাবেক ঊর্ধতন সম্পাদক

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের এখন মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়

মতিউর রহমান

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এখন প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। সাংবাদিকরা যেভাবে প্রায়ই প্রতিহিংসা ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, তাতে নির্ভীক সাংবাদিকতাকে এগিয়ে নেওয়া বা টিকিয়ে রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বিশেষত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতার মাত্রা ভয়াবহ। সেখানে একের পর এক সাংবাদিক হত্যা চলছে। সর্বশেষ (২৭ জুন ২০০৪) খুন হলেন খুলনা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক জন্মভূমি' পত্রিকার সম্পাদক এবং খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি হুমায়ুন কবির বালু। এর ৫ মাস ১৩ দিন আগে একই শহরের দৈনিক সংবাদ-এর প্রতিনিধি মানিক সাহা সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় নিহত হন। গত এক দশকে এভাবে ১৩ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে মাত্র দু'টি হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। বাকি একটিরও হয়নি (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জুন ২০০৪)।

সম্প্রতি ঢাকা ও সিলেটের ১৭ জন সাংবাদিকের কাছে 'মৃত্যুপরোয়ানা' পাঠানো হয়েছে। বরগুনার পাঁচ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এ বছরেরই গোড়ার দিকে রাজশাহীতে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছিল চরমপন্থী একটি সংগঠন। এই হুমকির পর অনেক সাংবাদিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। সাতক্ষীরায়ও নয়জন সাংবাদিকের ওপর 'মৃত্যুপরোয়ানা' জারি করা হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে সাংবাদিকদের হত্যা-নির্যাতনের পটভূমিতে এসব হুমকিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক সাংবাদিক রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিশেষত ক্ষমতাসীন সরকারের (যারাই যখন ক্ষমতায় থাকে) সমর্থক সন্ত্রাসী, অপরাধী চক্র এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের দ্বারা হামলা ও হয়রানির শিকার হন। এসব হত্যা-নির্যাতন-সন্ত্রাসের পাশাপাশি আমরা দেখি সরকার ও বিরোধী দলের উচ্চপর্যায়ের নেতা-নেত্রীরা তাদের স্বার্থে লাগলে বা তাদের কোনও সমালোচনা হলে শুধু সাংবাদিক নয়, সমগ্র প্রচারমাধ্যমের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই সাংবাদিকতা পেশাটি এখন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীন সাংবাদিকতা করা আজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস' (সিপিজে)

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নির্যাতনকারী দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে। এ অবস্থার মধ্যেও রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা সাধ্যমতো তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছেন। দেশে চলমান সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার, রাজনৈতিক হানাহানি ও মিথ্যাচারের স্বরূপ উদঘাটন করে চলেছেন।

আমরা জানি, দেশের গণমাধ্যমের ওপর আমাদের সাধারণ মানুষ, শিক্ষিত-সচেতন সমাজের নির্ভরশীলতা অনেক। এ তো আমরা জানি যে, বিগত পাঁচ দশক বাংলাদেশের মানুষের আনন্দ-বেদনা আর উত্থান-পতনের সঙ্গে সংবাদপত্রের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দেশের গণমাধ্যম সম্পর্কে অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও এ সত্য সকলেই মানেন যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের মানুষের গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশেও পুনরায় স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করে আনার সংগ্রামে দেশের সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের আরও অনেক ছোট-বড় ঘটনার সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংবাদপত্র সমাজে ও পরিবারে স্থায়ী ভূমিকা তৈরি করে নিয়েছে।

আমরা জানি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিন দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রের অর্জনগুলো এখনও তেমন বড় গলায় বলার মতো কিছু নয়। বরং বিগত তিন দশকের রাজনীতির বন্ধুর পথের উত্থান-পতনের ঘটনাবলি আমাদের এখন আর তেমনভাবে আশাবাদী করে তুলতে পারছে না।

আমরা, বাংলাদেশের নাগরিকরা সেই ১৯৫২ সাল থেকে ভাষা, গণতন্ত্র আর প্রগতির দীর্ঘ গণআন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিপুলভাবে অংশ নিয়েছি। বহু নির্যাতন, বহু রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। তারপরও গণতন্ত্রের জন্যে আমাদের লড়াই-সংগ্রাম থেমে থাকেনি। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হই। কিন্তু, কোথায় গণতন্ত্র? কোথায় আমাদের অগ্রগতি? যত আমরা বলি, তত বড় সাফল্য তো আমাদের নেই। নব্বইয়ের সফল গণআন্দোলন ও স্বৈরতন্ত্রের পতনের পর বিগত এক দশকের বেশি সময়ে তিনটি সংসদীয় নির্বাচন হয়েছে। আমাদের দুই প্রধান দলের অধীনে তিনটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনটি সরকারের অধীনেই সমাজ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, কালো টাকা ও সন্ত্রাসের প্রভাব বেড়ে চলেছে বিপুলভাবে। সন্ত্রাস আর বিপুল কালো টাকা ছাড়া কারও পক্ষে এখন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব। আমরা তো এখন দেখতেই পাচ্ছি, সংসদে পঞ্চাশ বা ষাট দশকের সেসব আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার বা ছোট ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদদের জায়গা ছিল, তা এখন ক্রমাগত দখল করে ফেলছেন কোটিপতি শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, সন্ত্রাসী, সুযোগসন্ধানী বা অবৈধ অর্থের মালিকরা। কীভাবে আরও সম্পত্তি ও অর্থের মালিক হওয়া যায়– আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে এখন চলছে তারই এক উদগ্র প্রতিযোগিতা।

নব্বইয়ের আন্দোলনে বিজয়ের পর সমাজে এমন একটা প্রত্যাশা জন্মেছিল যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দু-তিনটি সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলে এবং একটি দশকজুড়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা হলে দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

সুস্থ ও সহনশীল রাজনীতির ধারায় ফিরে যাবে দেশ। কিন্তু বাস্তবে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বরং একমত হবো যে, গত ১২ বছরে তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেলেও দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনি। বরং সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের জায়গায় আমরা পেয়েছি নির্বাচিত স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। সহনশীলতার বদলে অসহিষ্ণু ও প্রতিহিংসার রাজনীতিই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে। এ রকম এক অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতিতে দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে প্রবল হতাশা।

দেশের এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে অতীতের মতো লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী তথা বৃহত্তর নাগরিক সমাজের ভূমিকার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সামনে চলে আসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা হতাশার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি যে, নাগরিক সমাজও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। তার একটি প্রধান কারণ, আমাদের বুদ্ধিজীবী বা নাগরিক সমাজও দেশের বিভক্ত রাজনীতির ধারাতেই মূলত বিভক্ত। এই বিভক্তি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শুধু নয়, প্রশাসনের সর্বস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্য দিকে, দেশের মিডিয়া বিশেষত সংবাদপত্র জগতের পরিস্থিতিও খুব ভালো কিছু নয়। দেশে এখন সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক। কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের জরুরি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতেও তাদের মধ্যে কোনও ঐকমত্য নেই। এমনকি সংবাদপত্রের নিজস্ব স্বার্থ বা প্রয়োজনে সংবাদপত্রের মালিকরা এক হতে পারেন না। সম্পাদকদের অবস্থাও একই রকম। কোনও বিষয়ে একত্রে বসে কথা বলারও পরিবেশ নেই। সাংবাদিকরা তো বহুদিন ধরেই বিভক্ত। তাদের দু'টি ইউনিয়ন। এ সব কিছুর পেছনে সক্রিয় রয়েছে দেশের রাজনৈতিক বিভক্তির প্রভাব। দলনিরপেক্ষতার নীতি মেনে যারা কাজ করার চেষ্টা করছেন, তাদেরকে নানামুখী চাপের মধ্যে থাকতে হয়।

আবার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ পুরো মিথ্যা নয়। আমরা জানি, সাংবাদিক নামধারী কিছু অসৎ মানুষের জন্যে কখনও কখনও গোটা সাংবাদিক সমাজকে নিন্দিত হতে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাংবাদিকতা পেশায় নৈতিকতা, সততার কোনও বিকল্প নেই। নৈতিকতা বিবর্জিত সাংবাদিকতা দেশ, মানুষ এবং গণমাধ্যমের জন্যে অশুভ ফলই শুধু বয়ে আনতে পারে।

শুরুতেই আমরা বলেছি, দেশের বেশ ক'টি এলাকায় সাংবাদিকদের পক্ষে নির্ভয়ে সাংবাদিকতা করাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় সাংবাদিকদের আত্মগোপন করে থাকতে হয়। ওসব এলাকায় ঢাকা থেকে সাংবাদিক পাঠিয়ে সাংবাদিকের পরিচয় না দিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে হয়। চট্টগ্রামের মতো শহরে, এমনকি ঢাকায়ও এখন সন্ত্রাসীরা হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনের সাহস পাচ্ছে। এ সবই সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে আছে। এ অবস্থায় স্বাধীন সাংবাদিকতার সপক্ষে দলমত নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঐকমত্য থাকতে হবে। তা না হলে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

আমরা জানি, গণমাধ্যম একা চলতে পারে না। প্রতিদিন পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মুখোমুখি

www.pathagar.com

হতে হয়। প্রতিদিন তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। তার মূল শক্তি জনগণ। সংবাদপত্রকে আরও একটি বাধা থেকে মুক্ত হতে হবে। যা ছাড়া সত্যিকার অর্থে দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের স্বপ্ন সুদূরপরাহত হয়ে থাকবে। আমাদের দেশে সরকারী কাজের গোপনীয়তা রক্ষার নামে ১৯২৩ সালের 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' বলে একটি অতিপুরনো আইন রয়েছে। সে আইনের কারণে সরকারের কোনও দফতর বা সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না। কেউ তা দেয় না।

তথ্যপ্রবাহ অবাধ রাখার জন্যে শুধু উন্নত দেশগুলোতেই নয়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশেই এখন এ ধরনের পুরনো আইন বদলে নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এতে সেসব দেশের সরকার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি আর অপকর্মের বহু তথ্য ও দলিল শুধু সংবাদপত্র নয়, সাধারণ নাগরিকদেরও হাতের নাগালে চলে আসছে। ফলে সরকার বা প্রশাসনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সহজতর হচ্ছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিয়ে আমাদের সরকার বা মন্ত্রীরা মাঝে মধ্যে কিছু কথা বলেন। এর বেশি কিছু আমরা জানতে পারি না।

গত বছর ৩০ অক্টোবর (২০০৩ সাল) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাসী, ফলে 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' শিথিল করার উদ্যোগ নিয়েছে। কীভাবে, কোথায় ওই আইন শিথিল করা হবে, এ সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আবার অন্য দিকে, মাঝে মধ্যে সরকারের ভেতরে, মন্ত্রী-সাংসদদের মধ্য থেকে এমন কথাবার্তাও আসে যে, সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাদের মধ্যে তথ্য গোপন করার ব্যবস্থাকে আরও দুর্ভেদ্য করার ভাবনা-চিন্তাও কাজ করে। এটা হলে অসৎ রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ প্রশাসক, অবৈধ ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের আরও সুযোগ বৃদ্ধি হবে। এ সম্পর্কে এখন আমাদের সম্মিলিতভাবে অবাধ তথ্যপ্রবাহের জন্যে 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' বাতিল ও নতুন আইন প্রণয়নের দাবি তোলা এবং এ বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

সকল সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকির মধ্যে গণমাধ্যম রাষ্ট্র ও সমাজে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও দেশের মানুষ গণমাধ্যমকে আস্থায় নেয়, বিশ্বাস করে। বিপন্ন মানুষ যখন সর্বক্ষেত্রে অসহায় বোধ করে, তখন তারা গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। শত ঝুঁকি সত্ত্বেও আমাদেরকেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

লেখক দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক

www.pathagar.com

উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও জাতীয় উন্নয়ন

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

'উন্নয়ন সাংবাদিকতা'– এই দু'টি কর্মবাচক ও গুণবাচক কথা প্রচলিত, উচ্চারিত এবং কোনও কোনও সংবাদপত্রেও শ্লোগান বা নীতি তথা আদর্শ ও উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত। উল্লিখিত কথা বা শব্দ দু'টির অন্তর্নিহিত অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করতে হলে শব্দ দু'টির আলাদা আলাদা অর্থ এবং সমবায় অর্থ সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হয়। প্রথমে ধরা যাক 'উন্নয়ন' শব্দটির কথা। উন্নতি শব্দ থেকেই 'উন্নয়ন' শব্দটির ব্যবহার। উন্নতি শব্দ বা কথাটির সাধারণ অর্থ হলো, ভালো বা শুভ এবং কল্যাণকর কিছু অর্জন করা, যে অবস্থায় যা আছে তার চেয়েও ভালো স্থানে অবস্থান করা। উন্নতি সর্বক্ষেত্রেই হতে পারে, যেমন সমাজ-জীবনের, রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং এক কথায় দৈশিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে। ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, দেশীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 'উন্নতি'ই আকাঙ্ক্ষিত। উন্নতি হতে পারে সামাজিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে মানবজীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে। 'উন্নতি' শব্দটির অর্থ ও ক্ষেত্র –এর প্রকাশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে যে আলোকপাত করা হলো, তার পরিপ্রেক্ষিতেই 'উন্নয়ন' শব্দটির গুণবাচক দিক এবং অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

উন্নতি করা বা তা অর্জনের জন্যে যে প্রচেষ্টা এবং সে-ক্ষেত্রে যে সাধনা বা সিদ্ধি–তাকেই সাধারণভাবে বলা যেতে পারে 'উন্নয়ন'। ইংরেজিতে Development কথাটির বাংলা অর্থ বা প্রতিশব্দ 'উন্নয়ন'। ইংরেজি-বাংলা অভিধানে Develop ('ডেভেলপ') শব্দটির বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে ১. বিকাশ করা; ২. প্রকাশ করা ৩. বেড়ে উঠা; উন্নতি করা; ৪. বিকশিত হওয়া। এছাড়া 'ডেভেলপ' (Develop) শব্দটির বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞান-সংক্রান্ত অর্থও রয়েছে– যেমন ১. রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে প্রচ্ছন্ন ছবি প্রকাশ করা বা ফুটিয়ে তোলা ২. স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাওয়া। আর ডেভেলপমেন্ট (Development) –এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা অর্থ হলো ১. বর্ধন, ২. উন্নয়ন, ৩. সম্প্রসারণ, ৪. ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ ৫. রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে আলোকচিত্রের প্রকাশ। বস্তুত, 'উন্নতি' বলি আর 'উন্নয়ন' বলি– যাই বলি না কেন, উভয়ের মূলেই রয়েছে অধোগতি বা বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ, উর্ধ বা উন্নত স্তরে আরোহণ অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বস্তরে সত্য, সুন্দর, শুভ ও

www.pathagar.com

কল্যাণের ক্ষেত্রে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন। এই নিরিখেই উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল (তথা তৃতীয় বিশ্ব) ও উন্নয়নশীল বিশ্ব– এসব কথাও প্রচলিত এবং সংবাদপত্রে বহুল ব্যবহৃত।

শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ– সাধারণভাবে তাকেই বলা হয়ে থাকে উন্নত দেশ এবং উন্নত দেশসমূহ নিয়ে যে এলাকা বা বিচ্ছিন্ন এলাকার সমবায়– তাকেই বলা হয় উন্নত বিশ্ব। অন্যদিকে, যেসব দেশ শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং অর্থনীতিতে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ– সেসব দেশকেই সাধারণত বলা হয় অনুন্নত দেশ এবং এসব দেশের সমবায়ে যে বিশ্ব গঠিত (অর্থাৎ যে অঞ্চল গঠিত) তাকেই বলা হয় অনুন্নত বিশ্ব। উন্নয়নশীল দেশ বলে যেমন কথা বা দেশের পরিচয় আছে, যেমন আছে উন্নয়নকামী দেশ বা বিশ্ব, তেমনি আছে তৃতীয় বিশ্ব। এক কথায় বলতে গেলে, যে সব দেশ বা দেশসমূহ দারিদ্রপীড়িত, জনবহুল, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এবং সোজা কথায় যেসব দেশ ও এলাকার মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, সেই দেশ এবং দেশসমূহ নিয়েই প্রধানত তৃতীয় বিশ্ব গঠিত। 'উন্নয়নশীল' আর 'উন্নয়নকামী'– এই দু'টি শব্দের মধ্যেও রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। 'উন্নয়নশীল' কথাটির সাধারণ অর্থ হলো, যে বা যারা (ব্যক্তি হতে পারে, পরিবার হতে পারে, সমাজ হতে পারে, রাষ্ট্র হতে পারে– এমনকি এসবের সমবায়ও হতে পারে) উন্নতি করে চলেছে অর্থাৎ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় ও পথে আছে। অন্যপক্ষে, 'উন্নয়নকামী' কথাটির অর্থ হলো, যে বা যারা উন্নয়ন করতে চায়, উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষী, কিন্তু এখনও উন্নতি সাধন বা উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিতরূপে করতে পারেনি। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা উন্নয়নের পথে বড় বাধা। আর সবচেয়ে বড় বাধা হলো বিপুল জনসংখ্যা ও ব্যাপক দারিদ্র। দারিদ্রের কারণে যেমন উন্নয়ন করা যায় না, তেমনি উন্নয়নের অভাবেও দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হয় না।

এ আলোচনায় 'উন্নয়ন' সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। এখানে 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' সম্পর্কে কিছু আলোক প্রক্ষেপণ করা যেতে পারে। 'সাংবাদিকতা' বিষয়টি সাধারণ জনগণের– এমনকি শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত জনগণের কাছে যতটা জানা এবং সংবাদপত্রে যতটা পরিচিত, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' বা ইংরেজিতে যাকে বলে ডেভেলপিং কিংবা ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম (Developing or Development Journalism) এই দু'টি কথা ততোটা জানা, বোধগম্য এবং পরিচিত নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, 'সাংবাদিকতা' হচ্ছে এক ধরনের পেশা, আর সাংবাদিকরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে চাকুরি করার মাধ্যমে অর্থাৎ লেখনী চালিয়েই 'সাংবাদিকতা' করে থাকেন, জীবন-জীবিকা অর্জন করেন। সংবাদপত্রেরও রয়েছে নানা ধরন, চারিত্র্য, আকার ও প্রকার এবং স্বভাব-প্রকৃতি। দৈনিক, সান্ধ্যদৈনিক, প্রভাতী দৈনিক, ট্যাবলয়েড সাইজের দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাময়িকপত্র– ইত্যাদি কত ধরনেরই না সংবাদপত্র রয়েছে। তবে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের যে সংজ্ঞা আর দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকার কথাই বলা হোক না কেন, দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন দেশ-বিদেশের এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের নানা খবর ও বিভিন্ন বিষয়ক খবর নিয়ে পাঠকের দ্বারে হাজির হয় বলেই

www.pathagar.com

এর নাম সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ। সংবাদপত্রে অবশ্য শুধু খবরই থাকে না, থাকে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন, সংবাদভাষ্য, সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ, কলাম, চিঠিপত্র, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বহু কিছু। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় তো সংবাদপত্রে থাকেই। তবু সংবাদের এবং প্রতিবেদন ও সংবাদভাষ্যের প্রাধান্যের কারণেই দৈনিক পত্রিকাকে বলা হয় 'সংবাদপত্র' অর্থাৎ 'খবরের কাগজ'।

সংবাদপত্রের প্রধান দায়িত্ব যেমন দেশ-বিদেশের ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন, তেমনি এর পাশাপাশি দেশ-দুনিয়ার মানুষের জীবনের বহুবিধ সমস্যা সংকটের চিত্র ও আলেখ্য তুলে ধরা, সেসব সমস্যা-সংকট উত্তরণের যথাসম্ভব পথ বাতলানো, দিক-দর্শন বা নির্দেশনা প্রদান। প্রত্যেক সংবাদপত্রই প্রথমে দেশীয়, জাতীয় এবং পরে আন্তর্জাতিক। যেসব সংবাদপত্র দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়– বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় বিশেষত ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ছাড়া সেসব সংবাপদপত্রের পরিচয়, বক্তব্য ও আবেদন বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানো কঠিন। আমাদের দেশে বহুসংখ্যক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও অন্যান্য ধরনের সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশীয় ভাষা, জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলায় প্রকাশিত হয় বৃহত্তম সংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় মাত্র কয়েকটি সংবাদপত্র ও সাময়িকী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন লাখ লাখ বাংলাদেশী বাঙালী, ভারতীয় বাঙালী এবং অন্যান্য দেশের বাঙালী অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী রয়েছে। বিদেশ থেকে বিশেষত ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলা সংবাদপত্রও প্রকাশিত হচ্ছে– তার আকার এবং প্রকার যাই হোক। সুতরাং বাংলা সংবাদপত্রের ও সাময়িকীর বিশেষত উন্নতমানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর এক ধরনের বিশ্ববাজারও রয়েছে। তবে দৈনিক পত্রিকার চেয়ে সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রিকার চাহিদাই বেশি। সুতরাং বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকীকে যেমন দেশীয় ও জাতীয় প্রয়োজনে উন্নতমানের হতে হবে, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় অধিকতর আত্মনিয়োগ করতে হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এবং প্রয়োজনেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হবে, অবদান রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে 'জাতীয় দৈনিক' কথাটি আমাদের বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য, যদিও অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও তা অপ্রযোজ্য নয়। আমাদের দেশের বাংলা ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য এ কারণে যে, বাংলা আমাদের দেশের বৃহত্তম গোষ্ঠীর মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। জাতীয় দৈনিক সেসব সংবাদপত্রকেই প্রধানত বলা হয়, যেসব সংবাদপত্র জাতীয় ভাষায় (আমাদের ক্ষেত্রে বাংলায়) প্রকাশিত হয়, যেসব পত্র-পত্রিকা জাতীয় সমস্যা-সংকট, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম-সাধনা ও বৃহত্তর জনগণের তথা সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্র ও আলেখ্য তুলে ধরে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা বলে, জনগণের দারিদ্র বিমোচনের পথ সন্ধান দেয়, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্রবিমোচনের কথা বলে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশ ও জাতির তথা জনগণের সমস্যা-সংকট, অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম-সাধনা যেসব ইংরেজি ভাষার (অন্যান্য ভাষারও) পত্র-পত্রিকা তুলে ধরে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পেশ করে, সেসব পত্র-পত্রিকাও এদিক থেকে জাতীয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উন্নয়ন সাংবাদিকতা যেমন সাংবাদিকতার মানের উন্নয়ন, সংবাদপত্রের মান ও প্রকাশনা-সৌন্দর্যের উন্নয়ন, তেমনি জাতীয় উন্নয়নে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের ভূমিকা আর অবদানও বটে। দেশ ও জনগণের তথা সমগ্র জাতির নানামুখী উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো, দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন এবং জনজীবনের নানা সমস্যা-সংকটের সমাধান দেশের সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু প্রচার ও গণমাধ্যম সংবাদপত্রকে বলা ফোর্থ স্টেট (Fourth State) বা চতুর্থ স্তম্ভ এবং বিশেষভাবে জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করে, এই শক্তি ও সম্পদ কাজে লাগিয়ে এবং দেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ কিভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন তথা সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন করা যায়, সে বিষয়ে দেশের সরকার ও জনগণকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে, কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সরকারের উন্নয়ন কাজের ভালো দিক তুলে ধরে ও সব ধরনের মন্দ কাজের ও ভুল-ভ্রান্তির গঠনমূলক সমালোচনা করে সংবাদপত্র বিরাট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত সব সংবাদপত্রের বিশেষত জাতীয় দৈনিকসমূহের এটা এক বড় দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

জনবহুল ও দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর বাংলাদেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ও জাতীয় উন্নয়নে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা পালন ও অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। বিশ্বের যেসব দেশ উন্নত ও বিত্তশালী– সেসব দেশের সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও উন্নত, মান ও গুণগত বিচারে এবং প্রকাশনা-সৌকর্যেও। উন্নত ও বিত্তশালী দেশে উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রয়োজন ততটা নেই, যতটা আছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল এবং উন্নয়নকামী দেশে। মনে রাখতে হবে, 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা' কথাটিতে যেমন সাংবাদিকতার উন্নয়ন সাধন অর্থাৎ মান বাড়ানো বোঝায়, তেমনি জাতীয় উন্নয়নে সাংবাদিকতার তথা সংবাদপত্রের ভূমিকা এবং দায়িত্ব পালনের প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতিও বোঝায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও জাতীয় উন্নয়নে সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ভূমিকা এবং অবদানের কথা বলতে গেলে এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গত তিরিশ বছরের পরিধিতে এদেশে যেমন বহুসংখ্যক নতুন দৈনিক সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে, অনেক সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকাই যেমন মান ও গুণগত উৎকর্ষে ও প্রকাশনা-সৌকর্যে আকর্ষণীয়, তেমনি উন্নয়ন সাংবাদিকতায় এবং জাতীয় উন্নয়নেও অনেক পত্র-পত্রিকারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর এ দেশের একশ্রেণীর মানুষ যেমন বিপুল বিত্তবেসাতের তথা ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়েছে, দেশের রাজধানী মহানগরী ঢাকা

www.pathagar.com

উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে এবং অসংখ্য সৌধমালা ও বিশাল বিশাল আধুনিক বিপণী গড়ে ওঠার দরুন 'মেগাসিটি' তে পরিণত হয়েছে, দেশের অন্যান্য অনেক শহর-বন্দরও উন্নয়নের স্পর্শে নবরূপ লাভ করছে, তেমনি অনেক দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে আধুনিক ও উন্নতমানের চেহারায় এবং প্রকাশনা-সৌকর্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে। তবে এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে যেমন দারিদ্রপীড়িত এদেশের জনসংখ্যার বড় অংশই একরূপ বঞ্চিত, তেমনি বেশিরভাগ সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্রিকাও উন্নয়ন সাংবাদিকতার ও সংবাদপত্রের উন্নত ও আধুনিক রূপের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এ যেন অনেকটা প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতোই।

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

www.pathagar.com

ক্রীড়া সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রা চলবেই

মুহম্মদ কামরুজ্জামান

ছোট বেলার স্বপ্ন অনেক সময় জীবনের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে। আমার জীবনে সে রকম কিছু ছিল না। তবে লক্ষ্য একটা ছিল– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বড় কোনও চাকুরে হওয়ার লক্ষ্য। ছোটবেলা থেকে আইনজীবী পিতার একমাত্র ছেলে হিসেবে আইনজীবী হওয়ার আশা থাকলেও সুপ্ত একটা বাসনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আর সে বাসনা ছিল কোনও বড় পেশা নয়, ছোট পেশার পেশাদার খেলোয়াড় হওয়া। আর তা হলো ক্রিকেটের টেস্ট খেলোয়াড় অথবা ফুটবলের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় অথবা বিলেতের সি বি ফ্রাই, আর্থার মিলটন বা ডেনিশ কম্পটনের বিল ইন্টারন্যাশনাল বা দু'টি ভিন্ন খেলায় দেশের প্রতিনিধিত্বকারী দ্বৈত আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হওয়া। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় তো দূরের কথা, প্রাদেশিক খেলোয়াড়ই হতে পারিনি। ক্রিকেটে প্রাদেশিক ট্রায়াল এবং ফুটবলে জেলা ও সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় হওয়া কম গৌরবের ব্যাপার ছিল না।

পত্রিকায় আমার সাংবাদিক হওয়াটা ছিল এ্যাকসিডেন্টাল বা দুর্ঘটনামাত্র। পত্রিকা পড়ার নেশা ছোটবেলা থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরুনোর পর হঠাৎ করেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দু'টি নিবন্ধ পাঠালাম দু'টি ভিন্ন পত্রিকায়। একটি ইংরেজি অপরটি বাংলায়। যথাসময়ে দুটো ছাপাও হলো। তারপর সংবাদপত্রে রিপোর্টার হওয়ার প্রস্তাব এলো প্রায় অযাচিতভাবে। তখনও ওকালতি পাশ করিনি। ফাঁকা সময়টা কাজে লাগানোর জন্যে রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়ে সাংবাদিক বনে গেলাম। প্রায় চল্লিশ বছর এ পেশায় কাটাবার পর এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে বুঝতে পারি– সাংবাদিকতাই ছিল আমার জীবনের জাডিগ (ZADIG), ডেসটিনি বা নিয়তি। না হলে ক্রিকেটার, ফুটবলার বা আইনজীবী হওয়ার লক্ষ্য ত্যাগ করে সাংবাদিকতা পেশায় আটকে পড়ার অন্য কোনও অর্থ আমি আজও খুঁজে পাইনি।

সাংবাদিকতায় আমার ক্ষেত্র ছিল স্পোর্টস বা খেলাধুলা। অর্থাৎ ক্রীড়া সাংবাদিকতা। খেলাধুলা নিজে করায় এই বিষয় সম্বন্ধে আমার আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও পড়াশুনার নেশা ছিল। এ পেশায় ঢোকার অনেক, অনেক আগেই আমার নিজের একটি স্পোর্টস লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলাম। ক্লাস সিক্স-সেভেন এ পড়ার সময় ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, ইউসিস লাইব্রেরি ও ভারতীয় তথ্য বিভাগ লাইব্রেরিতে গিয়ে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী পড়ার অভ্যাসের ফলে খেলাধুলার সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার সুযোগ হয়েছিল। এ ছাড়া খেলাধুলা বিষয়ক বই, সাময়িকী

www.pathagar.com

কিনে নিজের সংগ্রহে রাখার আনন্দ রফ্‌ত করেছিলাম। এ পেশায় ঢোকার বছর দশেক আগে এক সাময়িকীতে খেলার ওপর আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। তা পড়ে বন্ধুদের প্রশংসা ও উৎসাহ আমাকে প্রায়ই এখানে সেখানে লিখতে উৎসাহ যোগাতো। সাংবাদিকতা এবং সাংবাদিক সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সম্ভ্রম ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই আমাকে পেশা হিসেবে নিতে হবে, কখনও কল্পনাও করিনি। আগেই বলেছি, সাংবাদিক পেশায় যাওয়াটা ছিল আমার নিয়তি। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বা আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট না হওয়ায় এ নিয়তিকে আমার খণ্ডন করা কখনও সম্ভব হয়নি।

মাঝ ষাটের দশকে সাংবাদিকতা করা এবং এ পেশায় নিজেকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নেয়াটা আমার জন্যে ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলা কোনও পত্রিকায় খেলাধুলার সংবাদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনও পাতা তো দূরের কথা, সব মিলিয়ে এক কলাম স্থানও বরাদ্দ ছিল না। পত্রিকার যে কোনও পাতায় খেলার সংবাদ ছাপা হতো। সেসব তা খুঁজে নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে পড়তে হতো। ব্যতিক্রম ছিল বাংলা দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। আজাদের শেষ পাতার ওপরের দিকে সব মিলিয়ে কলাম খানেক স্থানে খেলার সংবাদ ছাপা হতো। বেশিরভাগই স্থানীয় খেলাধুলার খবর। পত্রিকায় বিদেশী খবর বলতে ছিল তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হকি, ক্রিকেট, ফুটবল, স্কোয়াশের খবর। ঢাকায় তখন খেলাধুলা খুব বেশি একটা হতো না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের খেলার খবর এখানের দু' একটা পত্রিকায় ছাপা হতো।

পত্রিকায় যোগ দেয়ার পরই খেলার খবর বেশি করে দিতে লাগলাম। আগে শুধু গুরুত্বপূর্ণ খেলার খবর ও গোলদাতা বা স্কোরার বা উইকেট-টেকারদের নাম ছাপা হতো। কিন্তু এখন থেকে খেলার বর্ণনা ও মাঠের খেলোয়াড় বা খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনার রিপোর্ট লিখে খবরের কলেবর বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের উল্লেখযোগ্য খেলার খবর সংগ্রহ করে নিউজ টেবিলে দিতাম। মাঝে মাঝে ছাপা হতো। আবার কখনও কখনও কোনও খবরই যেতো না। মন মুষড়ে পড়তো। সোজাসুজি বার্তা সম্পাদককে বললাম, পত্রিকায় খেলার খবর সব না দিয়ে অন্য যেসব খবর ছাপা হয়, সাধারণ পাঠকের কাছে তার চাহিদা কম। দৃষ্টান্ত দিয়ে তাকে দেখিয়েও দিলাম। সঙ্গে দাবি জানালাম খেলার খবরের জন্যে পুরো একটা পাতা নির্ধারিত করে তাতে খেলার খবর বেশি করে ছাপাতে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ প্রথমে রাজি না হলেও পরে আমার একজন সহযোগী বরাদ্দ করে এই পরিশ্রমী কাজে আমাদের পুরোপু-রি ব্রতী করে তুললেন। মাত্র দু'জনকে দিয়ে খেলার জন্যে পুরো একটি পাতা বরাদ্দ করানো বেশ অকল্পনীয় হলেও বছর খানেকের মধ্যে সে দাবি আদায় করা এ দেশের পত্রিকার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এটা একটা উল্লেখ্য মাইল ফলকও বটে। আমাদের কাছে এটা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং তার মুখোমুখি হয়ে এতে জয়ী হতে বদ্ধপরিকর হলাম।

১৯৬৮ সালে তদানিন্তন 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় দৈনিক এক পাতা খেলার সংবাদ দিয়ে পাতা ভরানো ভীষণ পরিশ্রমের কাজ হলেও তা পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে চাহিদা বাড়ানো ছিল এক দারুণ ব্যাপার। সে সময় কলকাতার আনন্দবাজার, সত্যযুগ, বসুমতী, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকাও খেলার খবরের জন্যে পুরো পাতা বরাদ্দ পায়নি। অন্ততঃ এই একটা ব্যাপারে আমরা বা আমাদের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান অগ্রণী রয়ে গেছে। পুরো পাতায়

www.pathagar.com

স্থানীয় খেলার বিস্তৃত বিবরণ ছাড়াও খেলোয়াড় বা খেলার কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, বিদেশী আন্তর্জাতিক খবর, খেলার ফিচার, প্রতিদিনের খেলার ইংরেজি খবরের অনুবাদ, খেলোয়াড় ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের ছবি এবং স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ খেলার এ্যাকশান ফটো পাঠকদের কাছে এ পত্রিকার চাহিদা বাড়িয়ে দিল। বাড়িয়ে দিল এর কাটতি। সবচেয়ে বড় কথা হলো– এ পত্রিকার খেলার পাতা সবার আলোচনার একটি বিষয়ে পরিণত হলো। আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, পাঠকদের আগ্রহ, রুচিবোধ ও চাহিদার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে আমরা আমাদের ক্রীড়া সাংবাদিকতা চালিয়ে গেছি। তবে এতে কখনও কোনও অহংবোধ বা অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি পাইনি; বরং সমাজের এক বিশেষ শ্রমিকের মত পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করে খুশি হয়েছি। তৃপ্তি পেয়েছি।

ঠিক এ সময়েই বড় ধরনের একটি ক্রীড়ানুষ্ঠান আমাদের ক্রীড়া সাংবাদিকতা পেশাকে নতুন এক বড় অগ্নিপরীক্ষার সামনে ঠেলে দিল। এতদিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল ও এ্যাথলেটিকসের রিপোর্ট লিখে নিজেদের সামর্থ প্রমাণ করেছি। ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচ, পাকিস্তান অলিম্পিক, আরসিডি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও শ্রীলংকা ক্রিকেট দলের বেসরকারী সফরের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের রিপোর্ট লিখে পাঠকদের মন ভরাতে পারবো কি? এটা দৈনিক পাকিস্তানের ক্রীড়া বিভাগের কাছে শুধু আরও বড় এক চ্যালেঞ্জই ছিল না, ছিল আমার শিক্ষা, সামর্থ ও যোগ্যতারও বড় অগ্নিপরীক্ষা। বর্ণময় রিপোর্টিং এ নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী হওয়ার চেয়ে রিপোর্টিং এর লড়াইয়ে একটা ব্রেকথ্রু বা কোনও উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্য বা স্পৃহা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এ কাজে মনের টান থাকায় সাফল্য ও স্তুতি এলেও প্রগলভতায় ভাসতে পারিনি। তবে অবাধ অথচ প্রচ্ছন্ন পরিতৃপ্তিতে দেহ ও মন দুই-ই ভরে উঠেছিল।

আরও একটা অগ্নিপরীক্ষা অপেক্ষা করছিল। আর সেটা হলো '৬৮ সালের মেক্সিকোর বিশ্ব অলিম্পিক। না, অলিম্পিকে গিয়ে সেখান থেকে খবর পাঠানো নয়। বিভিন্ন নিউজ এজেন্সি থেকে মেক্সিকো অলিম্পিকের খবর পত্রিকায় অনুবাদ করে খেলার পাতাকে বর্ণময় করে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। তারও আগে অলিম্পিক শুরু বা উদ্বোধনের দিন দৈনিক পাকিস্তান কর্তৃক ষোল পাতার 'মেক্সিকো অলিম্পিক স্মরণিকা বা ক্রোড়পত্র' প্রকাশনা ছিল এ দেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় মাইলফলক। যখন বাংলা দৈনিকে খেলার খবরের জন্যে একটা পুরো পাতা বরাদ্দ করা ছিল অচিন্ত্যনীয়, ঠিক সেই সময় খেলার জন্যে একটা পুরো পাতা বরাদ্দ ছাড়াও অলিম্পিকের জন্যে ষোল পাতার 'ক্রোড়পত্র' প্রকাশ সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকার কথা। এসব ঐতিহাসিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরেছি বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

এছাড়াও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের রিপোর্ট করার জন্যে ঢাকা থেকে রিপোর্টার পাঠানোর প্রক্রিয়া ট্রাস্ট পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানই প্রথম চালু করে। এমনকি জাতীয় এ্যাথলেটিকসের খবর পত্রিকায় সুচারু ও বিশদভাবে প্রকাশের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এ পত্রিকা। খবরের স্বার্থে এবং অবশ্যই সব

www.pathagar.com

খরচ দিয়ে এ কাজ করানোর কথা দৈনিক পাকিস্তানের আগে আর কোনও পত্রিকা ভাবেনি। তাই ভালো খবর পরিবেশন এবং সরেজমিনে তদন্ত করে ইন-ডেপথ রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে ট্রাস্ট পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তানের অবদান এক কথায় অনস্বীকার্য। গতানুগতিক রিপোর্ট থেকে কথ্য ভাষায় আধুনিকতার ছাপসহ রিপোর্ট সাধারণ পাঠকের মন কেড়ে নেয় এবং এর কাটতিও বেড়ে যায় অভাবনীয়ভাবে। এছাড়া বাংলা পত্রিকার মধ্যে দৈনিক পাকিস্তানই অফসেটে ছাপা হওয়ায় এর অঙ্গসজ্জা, গেটআপ, মেকআপ ও নতুন ধরনের হেডিং এর বৈচিত্র্যে তা সাধারণ পাঠকের মন, রুচি ও আগ্রহে পরিবর্তন এনে তাদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। খেলার খবর ছাড়াও খেলার পেছনের নানা ঘটনা এবং কিছু অজানা ঘটনার প্রকাশ সাধারণ ক্রীড়ানুরাগী পাঠকের চিত্ত জয় করতে থাকে।

রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সত্তা শুধু সাংবাদিক নয়, এ দেশের বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের সামনে খুলে দিল সুযোগের অসংখ্য দরজা। স্বাধীনতা একটি জাতিকে যে কতখানি এগিয়ে দিতে পারে, তা ক্রমেই বোঝা গেল। অবশ্য দেশের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হলো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের। সেই সঙ্গে বেড়ে গেল পরিশ্রম ও দায়িত্ব। বেড়ে গেল পত্রিকার সংখ্যা, বেড়ে গেল তার কলেবরও। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যে সাংবাদিকদের অনেক কিছুর অভাব থাকলেও তারা এর মোকাবেলা করতে পিছপা হলো না। নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থ প্রমাণের সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। সাংবাদিকদের সামনে অবাধ সুযোগ। তবে তার সদ্ব্যবহার করা সহজ নয়। নতুন দেশ, নতুন মানুষের সামনে সম্ভাবনার অনেক দরজা খোলা থাকলে তার মধ্য থেকে সুযোগ নিয়ে সাফল্য পাওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না। আর সেরকম অবস্থায় অনেকে চলে এলেন ক্রীড়া সাংবাদিকতায়। আর অপার বিস্তৃত এ সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া বেশ কঠিন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্রীড়া সাংবাদিকতার পরিধি এত বিস্তৃত হয়েছে এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকরা তাদের মেধা-মনন ও সামর্থ দিয়ে এতে সাফল্য করায়ত্ত করছে দেখে পরিতৃপ্তিতে মনে ভরে যায়। পত্রিকায় আধুনিকতার ছোঁয়ায় রঙ ও রিপোর্টের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ পত্রিকা জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েও হার মানেনি, বরং তাতে সফলভাবে জয়ী হয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার গুণে সাংবাদিকদের অনেক সুবিধা, বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতা বৃদ্ধি হলেও কিছু পত্রিকা সরকারী ওয়েজ বোর্ড ও অন্যান্য সুবিধা না দিয়ে কোনও রকমে সাংবাদিকদের দিন গুজরানের ব্যবস্থা করে। তাতে সাংবাদিকতার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এতে স্বাধীনতার যে সুফল, তা সাংবাদিকরা পেতে ব্যর্থ হয়। তবে এর সঙ্গে ভালো কিছু দিকও দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ পত্রিকায় দু-তিন বা চার জনকে নিয়ে স্পোর্টস ডেস্ক বা স্পোর্টস সেকশন গঠন ছিল পত্রিকা ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের এগিয়ে যাওয়ার এক উজ্জ্বল দিক। খেলাধুলা রাজনীতির মতই ক্রমে গুরুত্ব পাওয়ার ব্যাপারটি পত্রিকা ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্যে ছিল এক দারুণ উৎসাহের ব্যাপার। একই খবর কে কিভাবে উপস্থাপন করে ক্রীড়ানুরাগী পাঠকের মন ভরাতে পারে, তার প্রতিযোগিতা ক্রীড়া সংবাদিকতাকে এক নতুন মাত্রা এনে দিল। বোঝা গেল ক্রীড়া-সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রা রুখে দেয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

১৯৭২-৭৩ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে সফরকারী ইংল্যাণ্ড ও স্বাগতিক ভারতীয় দলের ক্রিকেট টেস্ট আমাদের পত্রিকা দৈনিক বাংলা (সাবেক দৈনিক পাকিস্তান) থেকে কভার করার সুযোগ হয়েছিল। এরপর থেকে ঢাকার ক্রীড়া সাংবাদিকদের সুযোগ এসে গেল বিদেশের মাটিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ, এশিয়ান গেমস, অলিম্পিক গেমস, কমনওয়েলথ গেমস বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচের রিপোর্ট কভার করে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির। এ সুযোগ নিল দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলো। ক্রীড়া সাংবাদিকরা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় শুধু সফলই হলেন না, সাংবাদিকতার এই বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে দেশের খেলাধূলার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখলেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভূমিকা ও অবদান কম গর্ব ও গৌরবের নয়। তবে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় ফুলটাইম রিপোর্টারের প্রয়োজন এবং তা পার্টটাইম সাংবাদিকদের দিয়ে পূরণ করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে, তা সত্যিই নিন্দনীয়। পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে সৎ ও নিষ্ঠাবান হলে ত্যাগী ও দক্ষ ক্রীড়া সাংবাদিকদের অবদানে এই পেশা আরও মহান হয়ে উঠবে– জোর গলায় এ কথা বলতে পারি। সাংবাদিকদের কাজই হচ্ছে দেশ ও মানুষের কল্যাণ করা। তাই যথাযথ দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির সেবায় ক্রীড়া সাংবাদিকরা অন্য সব সাংবাদিকদের তুলনায় এগিয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। জোর গলায় এ কথা বলতে আমি মোটেও কুণ্ঠিত নই।

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার ক্রীড়া সম্পাদক

www.pathagar.com

আঠারো নম্বর তোপখানা রোড

এরশাদ মজুমদার

এই শিরোনামে চট করে যে কেউ এই ঠিকানাটা চিনতে পারবেন না। এই বাড়িটার পূর্বে রাস্তা, তারপরেই বহু বিখ্যাত বাংলাদেশ সচিবালয়। যেখানে মন্ত্রী-সচিবরা বসেন। এই বাড়িটার পশ্চিমে চামেরী হাউস। এখন এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থা সিরডাপের অফিস। উত্তরে তোপখানা রোড। সে হিসেবেই বাড়িটার নম্বর আঠারো। দক্ষিণে সরকারী গাড়ি রাখার বড় একটি বাড়ি, তার পাশেই লাগোয়া ডেসার অফিস।

এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন, এটা কোন বাড়ি এবং কি তার নাম? এটা হচ্ছে বিখ্যাত জাতীয় প্রেস ক্লাব। এক সময় এটা একটা লাল বাড়ি ছিল। তখন এর মালিক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন বোস। লাল বাড়িটা বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা। ওই বাড়িটা ভেঙেই বর্তমানের বিশাল ভবনটি তৈরি করা হয়েছে।

ওই লাল ভবনটি নিয়ে ১৯৫৪ সালে আমাদের মুরুব্বীগণ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সরকারের গণসংযোগ পরিচালক মরহুম খায়রুল কবীর। প্রখ্যাত সিভিল সার্ভেন্ট এন এম খান ছিলেন তখন চীফ সেক্রেটারি। তিনিই মাসিক ১০০ টাকা ভাড়ায় লাল বাড়িটা নবগঠিত প্রেস ক্লাবকে দেন। ক্লাবের প্রথম কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মরহুম মুজীবুর রহমান খাঁ, মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব।

রচনার গ্রাহ্যতা বাড়াবার জন্যে জমি সংক্রান্ত কিছু তথ্যের আশায় গিয়েছিলাম ডিসি অফিসে। ডিসি আবদুল বারী কাল বিলম্ব না করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কারণ, রেকর্ড রুমে ক্লাবের জমির ব্যাপারে তেমন কোনও তথ্য নেই। এস এ দাগ ৬৪১ ও ১ নম্বর খতিয়ানে জমির পরিমাণ ৩ একর ৩৮ শতাংশ। পুরো জমিটা এখন প্রেস ক্লাবের দখলে নেই। জমিটা এখন পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। সব মিলিয়ে জমির পরিমাণ তিন একরের বেশি নয়। জমির পূর্বের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে, সঠিক উত্তর কারও কাছে পাওয়া যায়নি।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে এ এলাকায় মন্ত্রী ও সচিবদের বাড়ি নির্মাণ করা হয়। তখন থেকেই জমি ও বাড়ির মালিকানা সরকারের অধীনে চলে আসে। এর আগে

www.pathagar.com

এসব জমি ছিল জমিদারদের নামে। কেউ বলেন ঢাকার নবাবদের নামে, আবার কেউ বলেন গাজীপুরের জমিদারদের নামে। এখন থেকে হাত দিলে প্রেস ক্লাবের একটা ইতিহাস তৈরি করা কঠিন হবে না। তবে আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কাজটা করতে আগ্রহী। এখন থেকে কাজটা শুরু করলাম। এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাহায্য কামনা করছি। ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও সহযোগিতা পাবো বলে আশা রাখি। এ ধরনের একটা বই লেখা অতি জরুরী বলে আমি মনে করি।

লাল ভবনটির ব্যাপারে ক্লাব সদস্যদের অনেকের আবেগ জড়িত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পুরনো বাড়িটা রেখেই নতুন একটা বাড়ি তৈরি করা যেতো। যেমন পশ্চিম দিকের চামেরী ভবন। যেখানে এখন সিরডাপের অফিস রয়েছে। পুরনো বাড়িটা রেখেই সেখানে নতুন অনেক বাড়ি উঠেছে।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান নিজে উদ্যোগ নিয়েই জমিটা বরাদ্দ করেন। একটু আগ্রহ থাকলে পুরো জমিটাই (৩.৩৮ একর) ক্লাব পেতো। তেমন আগ্রহ হয়তো ছিল না! জিয়াউর রহমানই নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরীণ সাজগোজ হালে অনেক বেড়েছে। আড্ডা দেয়ার জন্যে বিরাট একটা এসি লাউঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই লাউঞ্জে একটা বিরাট টিভিও আছে। যদিও এতে ভালো কিছু দেখার সুযোগ নেই। ডাইনিং রুমটাতেও এসি আছে। তবে রুমটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট। দুপুরবেলা খাবারের সময় খুবই ভিড় হয়। বেশ শব্দও হয়। বসার চেয়ারগুলো আরেকটু ভালো হলে সবাই খুশি হতো। তবে আরও ভালো হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা সাত শ'র একটু উপরে। ক্লাবে নিয়মিত আসেন প্রায় দু'শো সদস্য। এর বেশিরভাগই রিপোর্টার আর ফটো সাংবাদিক। ইদানিং রেডিও, টিভির বেশ কিছু নতুন সাংবাদিক সদস্যপদ লাভ করেছেন। পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে বলে ক্লাবের সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে।

ক্লাব প্রতিষ্ঠার লগ্নে যাঁরা সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন জীবিত নেই। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের বয়সও আশির কাছাকাছি। এদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত ক্লাবে আসেন তাঁরা হচ্ছেন এ বি এম মূসা, সবার মূসা ভাই। বয়স, অসুস্থতা কিছুরই ধার ধারেন না। নিয়মিত ক্লাবে আসেন, আড্ডা মারেন, পত্রিকায় কলাম লেখেন। তারপর নিয়মিত আসেন কে জি ভাই। হাসানউজ্জামান খান, আমাদের প্রিয় হাসান ভাই। তিনিও নিয়মিত ক্লাবে আসেন। ক'দিন আগে সন্তোষদা মারা গেলেন। তিনিও বেশ সিনিয়রদের একজন।

সবশেষে ফয়েজ ভাইয়ের কথা বলছি। ফয়েজ ভাই এখনও তরতাজা। আড্ডায় ওস্তাদ। ফয়েজ ভাই, মূসা ভাই আর মুকুল ভাইয়ের গল্প ও আড্ডার কথা পরে এক সময় লিখবো। বঙ্গবন্ধু নাকি এঁদের তিনজনকে ফজা, মোকলা, মূসা বলে ডাকতেন। এই তিনজন নাকি তাঁর

www.pathagar.com

জন্যে আপদ বিপদ মুসিবত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মুকুল ভাই নাই।

'আঠারো নম্বর তোপখানা রোড' নামে একটি আড্ডা বিষয়ক বই লিখতে গেলে, আমি মনে করি সব জেনারেশনের সদস্যদের নানা মত এতে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আমার লক্ষ্য হচ্ছে, এটাকে একটা মূল্যবান গসিপ বা আড্ডার বই হিসেবে দাঁড় করানো।

সর্বশেষে রিয়াজ আর শওকতের কথা বলতে হয়। তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান। তাঁদের সময়েই ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে। এবার তাঁদের অনেক কিছু করার আছে। আশা করি, তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে এ কাজ সমাধা করতে পারবেন। স্থান ও সময়ের জন্যে লেখাটি মন মতো করতে পারিনি। আশা করছি, বইতে সব বিষয় আনতে পারবো।

লেখক দৈনিক ফসলের প্রধান সম্পাদক

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের শতবর্ষ

সৈয়দ আবুল মকসুদ

যে ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠিত, তার সংবাদপত্রের ইতিহাস ১৫৭ বছরের। এ অঞ্চলের প্রথম পত্রিকা *রঙ্গপুর বার্তাবহ* প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকার প্রথম সংবাদপত্র *কবিতা কুসুমাবলী* প্রকাশিত হয় ১৮৬০ অব্দে। এটির উদ্যোক্তা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র ও ব্রজসুন্দর মিত্র। উনিশ শতকে বর্তমান বাংলাদেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিকসহ মোট সংবাদপত্র ও সাময়িকী বেরিয়েছে ২৪০টির মতো। সেগুলোর অধিকাংশই এতো ক্ষুদ্র, ক্ষণজীবী ও গৌণ যে, পূর্ববঙ্গের বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের মাধ্যম মূলত বাংলা, তবে প্রথম থেকেই ইংরেজিতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান যুগে ঢাকা ও কোনও কোনও জেলাশহর থেকে উর্দুতেও সংবাদপত্র বেরিয়েছে। যেমন ৪৭-পূর্বকালে হাকিম হাবিবুর রহমান প্রকাশ করেন *আল মাশরেখ* এবং *যাদু* এবং পাকিস্তান-আমলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো দু'টি উর্দু দৈনিক *পাসবান* এবং *ওয়াতান*।

১৯৪৭-এ যখন উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে, তখন পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে একটিও দৈনিক প্রকাশিত হতো না। চট্টগ্রাম থেকে মাস কয়েক অর্ধ-সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশের পর এস এম বজলুল হকের সম্পাদনায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ আত্মপ্রকাশ করে *জিন্দেগী*। ঘোষণা দেয়া হলো: 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র'। চট্টগ্রাম থেকে আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* এপ্রিল ১৯৪৭-এ। তারপর একে একে বেরোয় চট্টগ্রাম থেকে *পয়গাম* (আগস্ট ১৯৪৭), ঢাকা থেকে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক *পাকিস্তান* (১৫ আগস্ট ১৯৪৯), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* (১৯৪৯), মহীউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *দৈনিক ইনসাফ* (১৯৫০), খায়রুল কবীর সম্পাদিত *দৈনিক সংবাদ* (মে ১৯৫১), মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদিত *দৈনিক মিল্লাত* (১৯৫২), মহীউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *দৈনিক আমার দেশ* (১৯৫২), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত *দৈনিক ইত্তেফাক* (ডিসেম্বর ১৯৫৩) এবং কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* (১৯৫৫) প্রভৃতি। বাংলাদেশে ইংরেজি সংবাদপত্রের ইতিহাসও গৌরবজনক। আবদুস সালামের সম্পাদনায় ১৯৪৯ অব্দে আত্মপ্রকাশ করে উঁচুমানের দৈনিক *পাকিস্তান*

www.pathagar.com

অবজারভার। অবিলম্বে এই পত্রিকা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুখপত্রে পরিণত হয়।

আধুনিক সংবাদপত্রের সহোদর হলো সংবাদ সংস্থা। গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ বাংলাদেশেও সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমান্তরালভাবেই অবস্থান করছে। দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ, ফিচার প্রভৃতির একটি বিরাট অংশ পরিবেশিত হয় সংবাদ সংস্থা থেকে। ১৯৪৭ পরবর্তীকালে এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (এপিপি), পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (পিপিআই) এবং স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (বিপিআই), ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সী (ইএনএ) এবং ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) প্রভৃতি আধুনিক বার্তা সংস্থা দেশের সংবাদ প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং রাখছে। প্রযুক্তিগত কারণে এতোকাল সংবাদ সংস্থার মাধ্যম ছিল ইংরেজি, সম্প্রতি ইংরেজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাও।

১৯৪৭-এর ২০ জুলাই মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক *বেগম* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও জাতির উন্নতি, মঙ্গল সাধন। নূরজাহান বেগমের সম্পাদনায় *বেগম* ১৯৫২ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকা থেকে। এরপর লায়লা সামাদের সম্পাদনায় *অনন্যা* (১৯৫৫), বেগম জেব-উন নিসা আহমদের সম্পাদনায় *খেলাঘর* (১৯৫৫) এবং কামরুন্নাহার লাইলীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *অবরুদ্ধা* (১৯৫৮) নারী সাংবাদিকতার পথ নির্মাণ করে। আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো সাংবাদিকতা পেশায়ও নারী গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও বাস্তব, কীর্তি ও অপকীর্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রভৃতি ধারণ করে রেখেছে বাংলাদেশের সংবাদপত্র। বাংলাদেশের দেড় শ' বছরের সংবাদপত্র বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস। শুরু থেকেই এ দেশের সংবাদপত্র রাজনীতিঘনিষ্ঠ এবং এ ভূখণ্ডের রাজনীতি প্রায় অব্যাহতভাবে এই শতক জুড়েই রয়েছে অস্থির ও আন্দোলনমুখী। শতাব্দীর সংবাদপত্র জুড়েও রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ শুধু নয়, বিশ্লেষণও। প্রথম থেকেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রে লক্ষ্য করা যায় তিনটি স্পষ্ট ধারা: প্রগতিশীল, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িক প্রভৃতির মধ্যে কোন পাঠকের কোন ধরনের সংবাদপত্র পছন্দ, তা তার নিজস্ব ব্যাপার। কারণ সংবাদপত্রে সাংবাদিকদের স্বাধীনতার একটি সীমা রয়েছে, কিন্তু পাঠকের স্বাধীনতা সীমাহীন। সে তার পছন্দের কাগজটিই শুধু পাঠ করে।

পৃথিবীতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধঃপতিত মানুষ বিরল নয়। ব্যক্তিগতভাবে কোথাও কোনও সাংবাদিকের পদস্খলনের জন্যে গোটা সম্প্রদায় দায়ী হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে এ দেশের মূলধারার সাংবাদিকগণ শতাধিক বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষেই রয়েছেন। তারপরেও বাংলাদেশের সংবাদপত্রের

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতা ও ভুলভ্রান্তির শেষ বিচারক পাঠকই। কখনও কখনও বাকস্বাধীনতাহীন শ্বাসরুদ্ধকর শাসনব্যবস্থার মধ্যে সাংবাদিকদের অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহসী না হওয়ার জন্যে অনেক কোমলমতি পাঠক আক্ষেপ করেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না যে, যখন সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত-পা গুটিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে ঘরে বসে রইবে তখন শুধু সাংবাদিকগণ তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে, তা কি করে সম্ভব?

কুড়ি শতকের বাংলাদেশের জনগণের সকল সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সকল মুহূর্তেই সাংবাদিকগণ একাত্ম থেকেছেন। যেমন এ দেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় ১৯৭১-এ প্রবাসে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ। দেশমাতৃকার মুক্তির আকুতি নিয়ে প্রকাশিত সেই সব সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ অবরুদ্ধ দেশের বাইরে অবস্থান করে স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্যদিকে দেশের ভেতরে থেকে যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকে পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন। সেই গৌরবময় আত্মদানের জন্যে অনাগত শতাব্দীর সাংবাদিকগণ চিরকাল তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। তাঁদের সঙ্গেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন গত ১০০ বছরের খ্যাত-অখ্যাত, সুপরিচিত, অপরিচিত অগণিত সাংবাদিক, যাঁরা আমাদের সংবাদপত্র শিল্পকে সগৌরবে একুশ শতকে পৌঁছুতে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে অবদান রেখেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাটি ছিল রয়েল আকারের আট পৃষ্ঠা– এক মাসে বেরুতো মাত্র একবার। ১৪৪ বছর পরে আজ প্রতিদিনই নানা রঙে শোভিত শত শত ফর্মা মুদ্রিত সংবাদপত্র পাঠকের দরোজায় পৌঁছে যাচ্ছে সূর্যোদয়ের আগেই। পরিমাণে নয় পরিবর্তন এসেছে সকল ক্ষেত্রেই: বিষয়বস্তু, ভাষা ও অঙ্গসজ্জা প্রভৃতিতে। নির্ভীক ও অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের সংবাদপত্রের সংখ্যা আজ বাংলাদেশে অল্প নয়। যদি আমাদের মাতৃভূমি কোনও অস্বাভাবিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পতিত না হয়, তাহলে একুশ শতকের প্রথম দশকেই এ দেশের বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার সংবাদপত্রই পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশের সংবাদপত্রের সমকক্ষতা অর্জন করবে, কোনও সন্দেহ ছাড়াই এ আশা পোষণ করতে পারি।

আধুনিক গণমাধ্যমে সাম্প্রতিককালে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে: ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যম– রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রভৃতি। একসময় অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমের ফলে সংবাদপত্রের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে। কিন্তু ব্যাপারটি হয়েছে একেবারেই বিপরীত। প্রতিদিন সংবাদপত্রের চাহিদা বাড়ছেই। সুতরাং এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সংবাদপত্রের কোনও বিকল্প নেই। বিশেষ করে পৃথিবী যতোই অগ্রগতি অর্জন করছে এবং সংঘাতসংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে, সংবাদপত্র ততোই অপরিহার্য হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর একটি কথা স্মরণ করা দরকার।

www.pathagar.com

আমরা যখন আম বা আপেলের কথা বলি, তখন ভালো আম বা আপেলকেই বুঝিয়ে থাকি– খাওয়ার অনুপযোগী বা পচাগুলোকে নয়। আমাদের দেশে যেমন আন্তর্জাতিক মানের সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি পনের-কুড়ি বছর যাবৎ অত্যন্ত নিম্নমানের অজস্র দৈনিকও প্রকাশিত হচ্ছে। এবং সেসব নিম্নমানের কাগজ শুধু যে মফস্বল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তা নয়, বড় শহর এমনকি রাজধানী থেকেও বেরুচ্ছে। বাংলাদেশ নিউজপ্রিন্টে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিপুল পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট আমাদের আমদানি করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে যথেচ্ছ এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় খবরের কাগজ প্রকাশ স্রেফ অপচয় ছাড়া কিছু নয়। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার কর্তৃপক্ষ থাকা উচিত।

অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আজ আমরা পশ্চাৎপদ। সমস্যায় জর্জরিত দেশ। কিন্তু এই অবস্থায়ও যে দু' একটি ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অসামান্য, তার মধ্যে রয়েছে আমাদের সংবাদপত্র।

লেখক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিতব্য দৈনিক 'সুপ্রভাত বাংলাদেশ' এর সম্পাদক

www.pathagar.com

স্মৃতিময় পাঁচ দশক, নানা কথা

মাশির হোসেন

জাতীয় প্রেস ক্লাবের বিগত ৫০ বছর এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিবর্তন একই সূত্রে গাঁথা। প্রেস ক্লাবের সঙ্গে যেমন ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়েছে জাতীয় শব্দটি, তেমনি তদানিন্তন পূর্ব বাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তান পরিশেষে পরিণত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। এর ফলে বিচিত্রমুখী প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছি। এত বিরাট পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ অতীতে কারও ভাগ্যে হয়েছে কিনা জানি না এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

আমাদের সমকালে এই ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে কম বেশি সকলেই যুক্ত ছিলেন। কারও ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ, আবার কেউ বা পরোক্ষে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি, কেউ সুযোগের ফসল তুলতে পেরেছেন। আবার কারও ভাগ্যে সৌভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি। এমনটিও ঘটেছে। এই দূরপাল্লার যাত্রার শুরুতে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই আমার বেশ কিছু বন্ধু প্রবাসে পাড়ি জমান। কারও ব্রত উচ্চ শিক্ষা, কেউ বা নিছক ভাগ্য সন্ধানে চলে যান ভিন মহাদেশে। বাংলাদেশ হওয়ার পরও তেমনটি ঘটেছে। অনেকেই পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে। তবে তাদের অনেকেই দেশ-চিন্তা মুক্ত হননি। বরং দু' পর্বেই অনুভব করেছি দেশের ভালো-মন্দের ব্যাপারে তাদের অপরিসীম আবেগ। যা আমাকে মুগ্ধ না করে পারেনি।

১৯৫৪ সাল প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠালগ্ন, আর আজ ২০০৪ সালে তারই সুবর্ণজয়ন্তি উদযাপন করছি আমরা। এক দিকে সুখময় স্মৃতির অপার আনন্দ। অন্য দিকে কত চেনা মুখ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা– এ দুইয়ের সম্মিলন এক কঠিনতর ব্যাপার। কেবল ভুক্তভোগীর পক্ষেই এটা অনুভব করা সম্ভব।

এ সময়কালে জাতীয় জীবনের অনেক ঘটনায় প্রেস ক্লাবও নীরব সাক্ষীর মত তার ভূমিকা পালন করেছে। বলা চলে, পাঁচ দশকব্যাপী সংঘাতময় জাতীয় জীবনে প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রেস ক্লাব। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে যেমন রয়েছে টানাপোড়েন, বিরতি, তেমনি রয়েছে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের উতরোল সময়। সেই মুক্তি সংগ্রামে আমাদেরই বন্ধু, সহকর্মী অনেক সাংবাদিক শাহাদাত বরণ করেছেন। সেসব লড়াকু কর্মমুখর সহকর্মীর মুখ ভুলি কি করে? আজ অবাক চোখে দেখি, তাদেরই উত্তর-প্রজন্ম

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেস ক্লাবকে একেবারে ভিন্ন মাধুর্যে গড়ে তুলছে। শুধু ভবনগত অবকাঠামোই নয়, এর মানস বিহার অনেক বিস্তৃত। তাই ভাবি, আসলে হারানো বলতে কিছু নেই। সবই অমূল্য সঞ্চয়। বর্তমানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টের পাই অতীত ও ভাবীকালের করমর্দন। ব্যক্তির পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। জাতীয় প্রেস ক্লাবের গুরুত্বটা কোথায়? এক কথায় বলা চলে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা অর্জন অথবা রক্ষার মধ্যেই কেবল প্রেস ক্লাবের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়ে। গুরুত্বটা কোথায় এরও একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমরা যখন সদ্য যুবা, সেই সময় থেকে এই পরিণত বয়সে উপনীত হয়েও প্রত্যক্ষ করছি প্রেস ক্লাব ও তার কর্মকাণ্ড। একাত্তরের আগে এদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। আর সাংবাদিকের সংখ্যাও ছিল এখনকার তুলনায় খুবই কম। একটি বিষয় আমাকে মাঝে মধ্যে নাড়া দেয়। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি, সেই ৫০ এর দশকে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্বসূরী সাংবাদিকরা যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন এখনকার দিনে সংখ্যাগতভাবে সাংবাদিকের সংখ্যা বহুগুণে বাড়লেও সেই মর্যাদার আসনে এই পেশার কাউকে তেমন একটা দেখতে পাই না।

খোলাসা করেই বলি, সেসময়ে আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুস সালাম, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), খোন্দকার আবদুল হামিদ, তোহা খান প্রমুখ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, এর বাইরে বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সে কারণে তাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অথচ বর্তমানে ব্যতিক্রম ছাড়া শীর্ষ পর্যায়ের কোনও সাংবাদিককে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে দেখি না। এ কারণে বিষয়টি গবেষণাযোগ্য বলে মনে হয়।

সালটা ১৯৫৬। আমি তখন ছাত্র। কাজ করি ইত্তেফাকের স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ে। বয়সের তুলনায় মনের চাঞ্চল্য ছিল বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই রিপোর্ট জমা দিয়ে কেটে পড়াতেই ছিল আমার ঝোঁক। নিজের লেখা ছাপা হচ্ছে, এতেই আমি মুগ্ধ। অথচ বাদ সাধতেন লাল কোর্তা খ্যাত ওলি ভাই। কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইতেন না। কোনও একটি নিউজ ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, এটা অনুবাদ করো। আমিও তড়িঘড়ি করে অনুবাদ সেরে দে-ছুট। তাঁর সেই স্নেহের কথা আজও আমাকে আকুল করে।

সেকালে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই সাহিত্য চর্চা করতেন। এরা সবাই মূলত খবরের কাগজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমেদ হুমায়ূন, শামসুর রাহমান, নির্মল সেন– এরকম আরও অনেকে। হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের বদৌলতে তখনই সর্বত্র তিনি পরিচিত। এছাড়া আধুনিক কবি ও গল্পকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতির পাল্লাটা কম ভারী নয়। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ইত্তেহাদে 'লিডার' (আজকের ভাষায় উপ-সম্পাদকীয়) লিখতেন। আর 'আমার ভায়ের রক্ত রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' খ্যাত আবদুল গাফফার চৌধুরী তো ছিলেনই।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং অপরদিকে হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর তথা আমাদের রাজনীতি ছিল ভিন্ন। এছাড়াও আমাদের আরও কিছু বন্ধু সাব-এডিটর ছিলেন। আমি তখন বি এ ক্লাসের ছাত্র। তারাও ছাত্র ছিলেন। এদের মধ্যে দু' একজন পরবর্তীতে সিএসপিও হন। বোরহানসহ অনেকেই ক্রমান্বয়ে সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়িত হলে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পরিবর্তে খবরের কাগজে যোগ দেন। আবদুর রহিম, শহীদুল হক (মোর্শেদ) প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে দাউদ খান মজলিস, আবেদ হোসেন (মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথিকৃৎ আবুল হুসেনের ছেলে) প্রমুখ ছিলেন ডেস্কে। অবশ্য বেশিরভাগ ছাত্রেরই কর্মস্থল ছিল 'সংবাদ' এ। অবশিষ্টরা ছড়িয়ে ছিলেন আজাদ, অবজারভার ও ইত্তেফাকে। সেসময় সাংবাদিকতা পেশায় যাঁরা এসেছিলেন, মানসিকভাবে ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সকলেই ছিলেন এ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট পন্থী। কে জি মুস্তাফা, এম আর আখতার মুকুল, ফয়েজ আহমদ এরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় এস্টাব্লিশমেন্টের বিরোধিতায় অবদান রাখেন।

প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। সমাজ জীবনে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও কেন জানি সেই সেকেলে মানসিকতা আজও অনেকের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রবীণ এনায়েতুল্লাহ খান, আতাউস সামাদ প্রমুখ ছিলেন সে যুগে নবীনদের অগ্রদূত। দীর্ঘদিন যাবত প্রবাসী মাহবুব জামাল জাহেদীর নামের উল্লেখ এক্ষেত্রে অপরিহার্য। এস এম আলী ও মাহবুব জামাল জাহেদী অভিন্ন হৃদয়ের এই দুই বন্ধু ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে একই রিকশাযোগে একই দিনে অবজার্ভারে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দু'জনই বিদেশে দু'টি খ্যাতিমান ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক হন।

সেকালে প্রবীণরা অনুজপ্রতিম অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ সহযোগীকে কোনও কটু কথা বলেছেন এরকমটি কখনই শুনিনি। প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন যোগসূত্র, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে কে জি মুস্তাফা ও এ বি এম মূসার কথা। সিংহলের নাগরিক এ এল খতিব অতিশয় বিদগ্ধ জন ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রেস ক্লাবের স্থায়ী বাশিন্দা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ এল খতিব মর্নিং নিউজে দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান।

পাকিস্তান আমলে প্রধানত দু'টি খবরের কাগজ– সংবাদ ও অবজারভার-এর সাংবাদিকরাই প্রেস ক্লাবে বেশি সময় কাটাতেন। মূলত জহুর ভাই, সালাম সাহেব, মানিক ভাই এঁদের পুরোভাগে ছিলেন।

আমাদের অবস্থা ছিল অনেকটা 'না ঘরকা না ঘাটকা' গোছের। কেননা, কাজ করেছি প্রতিক্রিয়াশীল কাগজে। আর ভূমিকাটা ছিল অতি বামের। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ একথা আনন্দের সঙ্গে বলতে পারছি যে, বাংলাদেশে বর্তমানে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করছে। এটা যে কত বড় পাওয়া, নবীন সাংবাদিক বন্ধুদের পক্ষে আদতেই সেটা অনুমান করা কঠিন। পেশাগত নিষ্ঠা এবং তাদের মেধাগত অর্জনকে স্মরণে রেখেই

www.pathagar.com

একথা বললাম। বলতে দ্বিধা নেই, গণমাধ্যম এতটা বিস্তৃত হবে, সেটা সেকালে ছিল আমাদের ভাবনারও অগোচরে!

শ্রুতিলিখন: আহমদ আখতার

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার বিশেষ প্রতিনিধি

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেস ক্লাব

এ. এস. এম হাবিবুল্লাহ

ঢাকার সাংবাদিকদের দ্বিতীয় বাস গৃহ নামে পরিচিত 'জাতীয় প্রেস ক্লাব'। দু'জন রাষ্ট্রনায়ক-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাথমিক উৎসাহ ও সহযোগিতা এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সক্রিয় সাহায্য ও অবদান এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান ও ঢাকা জেলার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ড. এ এম এম শওকত আলীর (কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব) অবদানও।

রমনা পার্কের বিপরীতে শিল্পকলা একাডেমী সংলগ্ন সরকারী জমিতে বঙ্গবন্ধু এক বিঘা জমি বরাদ্দ করে ক্লাবের নিজস্ব ভূমি হিসেবে অনুমোদন দান করেন প্রথম। কিন্তু শিল্পকলা একাডেমীর অনুরোধে পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বর্তমান স্থানে জমি বরাদ্দ, পুরনো বিল্ডিংয়ের মূল্য পরিশোধ ও নতুন ক্লাব ভবন নির্মাণে সম্পূর্ণ খরচ বহনের নিশ্চয়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

তিন বার (মোট পাঁচ বছরে) ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে'র সম্পাদক বর্তমানে দৈনিক নিউ এজের এনায়েতুল্লাহ খান সভাপতি ও আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। তখন কোনও ফোরাম ছিল না। সবাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্বাচনে অংশ নিতেন। পাকিস্তান আমল থেকে সরকারের প্রদত্ত একটি বাংলো প্যাটার্নের দ্বি-তল বাড়িতে ক্লাবটি চলছিল। পত্রিকা অফিস ও নিউজ এজেন্সিগুলো ক্লাবের মোটামুটি কাছাকাছি। ফলে সদস্যদের এ স্থানটির প্রতি খুবই দুর্বলতা। যা হোক, এক বছর মেয়াদের প্রথম বছর আমাদের কার্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধনে হাত দেয়। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের সকল সংশোধনী পাশ হয়। সংশোধন করে 'জাতীয় প্রেস ক্লাব' নামে নামকরণ এবং ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ এক বছর থেকে দুই ক্যালেণ্ডার বছর করা হয়। অবশ্য স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব মৌখিকভাবে 'জাতীয় প্রেস ক্লাব' নামে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বড় সমস্যা ক্লাব পরিচালনার জন্যে নিজস্ব কোনও ফাণ্ড ছিল না। বাড়ি ভাড়া দেয়ার প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। গোড়া থেকে ক্লাব সভাপতি এনায়েতুল্লাহ খান নিজস্ব জমি ও ভবন তৈরির ওপর জোর দিয়ে আসছিলেন। অবশেষে, ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। প্রেস সেক্রেটারী জনাব তোয়াব খানের মারফৎ দেখা করলাম একদিন

www.pathagar.com

রাত্রে এনায়েতুল্লাহ খানের নেতৃত্বে। শেরে বাংলা নগর নতুন গণভবনে। ক্লাব কমিটির সদস্য গিয়াস কামাল চৌধুরী, নির্মল সেন ও ফয়েজ ভাই ছিলেন। আমাদের আবেদন, পুরনো ক্লাব ভবন দেয়া হোক ক্লাবকে। জোরাজুরি করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী রাজী হলেন- কিন্তু পুরনো স্থানে নয়। শিল্পকলা একাডেমী সংলগ্ন জমিতে। এক বিঘা। সামনে এক বিঘা জমি থাকবে উন্মুক্ত, উভয়ের ব্যবহারের জন্যে। রাস্তার অপর পাশে রমনা পার্ক। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হবে সুন্দর। আরেক কারণ বললেন, সরকারের ইচ্ছা পুরনো ক্লাবটি সেক্রেটারিয়েটের ভেতর নিয়ে নেয়া। সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কস সেক্রেটারি মঈনুল ইসলাম সাহেবকে ফোনে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। আর জানালেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে। পরদিনই সে জমিতে কাঁটাতারের বেড়া এবং সাইন বোর্ড 'জাতীয় প্রেস ক্লাবের নিজস্ব সম্পত্তি' টাঙিয়ে দিলেন ওয়ার্কস সেক্রেটারি সাহেব।

আর্কিটেক্ট বাবরকে নিয়োগ দান করা হলো আধুনিক বহুতল ভবনের প্ল্যান করার জন্যে। ক্লাব সভাপতি বুঝিয়ে দিলেন- কি কি হবে সে ভবনে। জমি হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল। কয়েক মাস গড়িয়ে গেল, ভূমি রাজস্ব প্রশাসন থেকে জানা গেল, ক্লাবকে জমি দান সংক্রান্ত কোনও লিখিত আদেশপত্র নেই। জমি দানের বিষয়টি কার্যকর করা হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক আদেশের ভিত্তিতে। শেষ পর্যন্ত, শেখ সাহেব আদেশপত্র সই করেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫-৪র্থ সংশোধনীর পর)।

১৯৭৪-এর শেষভাগে ক্লাবের বাৎসরিক ডিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ক্লাব-সভাপতি ও আমি গণভবনে গেলাম বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি হওয়ার দাওয়াত দিতে। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন, তবে এখন নয়। খালি হাতে ক্লাবে যাবেন না। 'কাগজ হাতে নিয়ে যেতে চাই।' জানালাম, সামনে আমাদের ইলেকশন। বললেন, 'জানি তোরাই জিতবি। কাগজ (জমি লিজ সংক্রান্ত) হাতে নিয়ে ক্লাবে যাবো। কে. জি'-কে আনতে হবে সে সময়।' কে.জি মুস্তাফা সাহেব তখন বৈরুতে রাষ্ট্রদূত।

জমি হস্তান্তর হলো জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে। ঢাকা জেলার ডেপুটি কমিশনার ও কালেক্টর ড. এ এম এম শওকত আলী জানালেন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের জমি লিজ দেয়া সংক্রান্ত সরকারী কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। জমি হস্তান্তরে তিনি প্রস্তুত। দিন-তারিখ স্থির করে শিল্পকলা একাডেমীর পাশে ক্লাবের জন্যে বরাদ্দকৃত এক বিঘা জমিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ডেপুটি কমিশনার শওকত আলী ঢাকা জেলার কালেক্টর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাব সভাপতি এনায়েতুল্লাহ খানের হাতে জমি হস্তান্তর করলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সবাইকে অবাক করে জনাব শওকত আলী ক্লাবকে ৩০ হাজার টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন।

পরদিন সকালে এনায়েতুল্লাহ খান হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন- 'শওকত কি অনুমতি নিয়েছিল?' (....... ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের)? বললাম, তাঁকে (শওকত) যতটুকু জানি, তিনি যদি মনে করেন তবে কারও পারমিশন নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। অবাক আমিও হয়েছিলাম। কারণ এক মন্ত্রীর কথা জানতাম, তিনি ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব পরিদর্শনের সময় দু' হাজার টাকা ডোনেশন দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ক্লাব সে টাকা আর পায়নি।

www.pathagar.com

ড. শওকত আলী পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দেয়ার আগে 'এপিপিতে' (এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান) ছিলেন কয়েক মাস। আমরা সহকর্মী। মাত্র ১৫০ টাকা বেতনে (এপ্রেন্টিস)। সাংবাদিকতা ছেড়ে দিলেন। জগন্নাথ কলেজ নাইট সেকশনে যোগ দিলেন ইংরেজি পড়াতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের প্রিয় ছাত্র তিনি। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। যা হোক, ক্লাবের অনুষ্ঠানের আগের দিন জানতে চাইলেন- 'ক্লাবকে আমি কি দেবো?' ময়মনসিংহে মন্ত্রীর অভিজ্ঞতা মনে পড়লো। তাই পরামর্শ দিলাম ক্লাব লাইব্রেরির জন্যে বই ও খেলার সরঞ্জাম দিতে।

পরবর্তী সাত দিনের ভেতর নারায়ণগঞ্জের এস-ডি-ও আমার সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথমে ২৫ হাজার টাকা ও পরের বার ৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করলেন ডেপুটি কমিশনারের পক্ষ থেকে। ড. শওকত আলীর দেয়া টাকা আমাদের জন্যে অনেক ছিল তখন। সে টাকায় ক্লাবের নিজস্ব তহবিল গঠন করা হলো। সাহসে বুক ভরে উঠলো– ক্লাব ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে। অনেক টাকার দরকার। কোথায় পাব? ভরসা ছিলো ক্লাব সভাপতি এনায়েতুল্লাহ খানের উপর– তাঁর নেতৃত্বে সফল হবে।

কিছুদিন পর শিল্পকলা একাডেমীর পক্ষ থেকে বলা হলো, তাঁদের কমপ্লেক্সের জন্যে অনেক জায়গা দরকার। অনুরোধ, আমাদের জন্যে বরাদ্দকৃত জমি (শিল্পকলা সংলগ্ন) ছেড়ে দিতে। একদিন তথ্যমন্ত্রী জনাব আকবর কবীর সাহেব এলেন ক্লাবে। সে প্রসঙ্গ উঠলো আলোচনা কালে। আমাদের তরফ থেকে বলা হলো, আমাদের পুরনো ভবন ফিরিয়ে দেয়া হলে, আমাদের আপত্তি নেই। এ ভবনের প্রতি সবারই একটা দুর্বলতা ছিল।

আবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো বাৎসরিক ডিনার অনুষ্ঠান করার। আমার জানা মতে, এর আগে এ অনুষ্ঠান হয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করার। রিজোলিউশনসহ অফিসিয়েলী পত্র দ্বারা তাঁকে জানানো হলো। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ক্লাব সভাপতি এনায়েতুল্লাহ খানের নির্দেশে ক্যান্টনমেন্টে তাঁর সদর দফতরে তাঁর এবং বেগম খালেদা জিয়ার নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে এলাম আমি তাঁর (জিয়া সাহেব) হাতে। সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট মনজুর আহমদ।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানের হোটেল ঢাকা শেরাটন) এ্যানুয়েল ডিনার হলো। অবশ্য, দু-একজন অন্য কথা তুলেছিলেন- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে, এ সময়ে পাঁচ তারা হোটেলে ভোজ সভা করার যৌক্তিকতার প্রশ্ন। যা হোক, ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সিনিয়র সাংবাদিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁরা মেনে নিলেন। বেগম খালেদা জিয়াও এসেছিলেন ভোজ সভায়। স্বাগত ভাষণ দিলেন ক্লাব-সভাপতি এনায়েতুল্লাহ খান। জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর ভাষণে ক্লাবের পুরনো স্থান ও ভবন জাতীয় প্রেস ক্লাবকে দেয়ার ঘোষণা দেন। সঙ্গে ক্লাবকে আড়াই লাখ টাকা দান এবং পুরনো ভবনের মূল্য (সম্ভবতঃ ৬২ হাজার টাকা) সরকার কর্তৃক পরিশোধ করার ঘোষণা। সে অনুষ্ঠানে তৎকালীন তথ্য সচিব জনাব এবিএম গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। ভোট-অব-থ্যাংকস্ প্রদান করি আমি, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে।

www.pathagar.com

এর কিছুকাল পর ক্লাব পরিদর্শনে এলেন প্রিন্স করিম আগা খান। তাঁর সম্মানে (সম্ভবতঃ ১৯৭৮/৭৯) ক্লাব প্রাঙ্গণে ভোজ সভা হলো। আগা খান হর্ষধ্বনির মাধ্যমে ক্লাবের নতুন ভবনের জন্যে ১০ লাখ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেন। বিদায় নেয়ার সময় গাড়িতে ওঠার সময় এনায়েতুল্লাহ্ খান ও আমাকে তিনি আশ্বাস দেন– আবার আসবেন ক্লাবে। আগা কাউন্সিলের সঙ্গে কথা হয়েছিল– ক্লাব ভবনের একটা উইং আগা খানের নামে করা হবে। অবশ্য সে প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

ভোজ সভা অনুষ্ঠান আয়োজনে নাভানা মোটরসের জনাব হাবিবুল্লাহ্ খান যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি পরে জিয়া মন্ত্রিসভায় তথ্য মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর সময়ে প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) আত্মনির্ভরশীল এবং উন্নত নিউজ এজেন্সি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যে পাকিস্তানের প্রভাবশালী উর্দু দৈনিক জং এর পরিত্যক্ত বিল্ডিং (হোটেল পূর্বাণীর পাশে) বাসসকে সরকারের তরফ থেকে দান করেন।

পরবর্তীকালে ক্লাব সভাপতি এনায়েতুল্লাহ্ খান জিয়া মন্ত্রিসভায় ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেয়ায় বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক জনাব শহীদুল হককে ক্লাব সভাপতি করা হয়। নতুন ভবনের (বর্তমান স্থানে) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নাম কার্য নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন জমির দলিল সম্পন্ন হতে হতে আমাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্লাবের নতুন ভবন নির্মাণে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নেন। তাঁর শাহাদাৎ বরণের পর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সরকারী অনুদান দেয়া অব্যাহত রাখেন।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

বিজয় আমি দেখেছি

আফতাব আহমেদ

পয়লা ডিসেম্বর ১৯৭১, বিকাল ৩টা। সবেমাত্র দুপুরের খাওয়া সেরে একটু শুয়ে পড়েছি। বাইরের বারান্দায় বুটের আওয়াজ। কর্কশ গলায় বললো, 'দরওয়াজা খোলো, জলদি দরওয়াজা খোলো।' কালবিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি যমদূতের মত তিনজন পাঞ্জাবী সিপাহী, হাতে রাইফেল ও স্টেনগান। ভিতরে ঢুকেই এঘর-ওঘর ঘুরে দেখতে লাগলো। শোয়ার ঘরে ঢুকেই স্টীল আলমিরা খোলার ইঙ্গিত দিল। আলমিরা খুলে দিলাম। তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করলো। কী খুঁজছে, জানি না। তবে কিছুই নিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করলো, 'তুম কোন্ হো'? জবাবে বললাম, 'ম্যায় আখ্‌বার কা নোমান্দে হ্যায়।' 'ও তোম আখ্‌বার ওয়ালা হ্যায়, ঠিক হ্যায়' বলে পাশের বৈঠকখানায় ওরা বসে পড়লো। দেখেই বোঝা যায়, ওরা বড়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত। ঘরে কিছু চানাচুর ও বিস্কুট ছিল। তাই ওদের খেতে দিলাম। জগ ভর্তি পানি ও গ্লাস। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করছে না। হঠাৎ একজন বলে উঠলো, 'পহেলা তোম খালো,' এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। একটু বিস্কুট কিছু চানাচুর খেয়ে পানি খাই। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চোখের পলকে সব খেয়ে ফেললো। এক জগ পানিও শেষ করে দিল। বেরিয়ে যাবার সময় শুধু বললো, 'তোম আচ্ছা আদমী হ্যায়। বহুত শোকরিয়া।' ঠিক এমনি ঘটনা আরও একবার ঘটেছিল। রমজান মাস। ইফতারের সময় হঠাৎ ৫ জন পাঞ্জাবী সৈন্য ও মিলিশিয়া বাসায় ঢুকে পড়ে। 'জলদি পানি দেও, ইফতার করনে হোগা।' সঙ্গে সঙ্গে পানি ও সব ইফতার ওদের দিয়ে দিলাম। তখনও আমাকে আগে খাইয়ে পরখ করে নেয়। আমার পরম সৌভাগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের বাকি সময়টা ওরা আর কখনওই আমার বাসায় ঢোকেনি বা কোনও হয়রানি করেনি।

৩ ডিসেম্বর '৭১। হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে আকস্মিকভাবে পাক-ভারত যুদ্ধ বেঁধে যায়। ফলে ভারতীয় সৈন্যরা জল স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। এই সুযোগে বাংলার বীর মুক্তিযোদ্ধারাও ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চোরাগোপ্তা হামলা অব্যাহত রাখে।

৫ ডিসেম্বর '৭১। মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ যতো বাড়তে থাকে, পাকসেনারা ততই ক্ষিপ্ত হয়ে নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর তার দুই দালাল সংগঠন রাজাকার ও আল বদরদের নিয়ে অত্যাচারও বৃদ্ধি করে। পাক-ভারত বিমান যুদ্ধ এখন তীব্র। ভারতীয়দের আক্রমণে বিমান বাহিনী ও ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনিতে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। বোমা হামলায় ঢাকা

www.pathagar.com

বিমান বন্দরের রানওয়েতে বিরাট বিরাট পুকুরের সৃষ্টি হয়। সব ক'টা স্যাবর জেট বিমান ধ্বংস করে ফেলে। লড়াইয়ের তৃতীয় দিনেই বাংলার আকাশ স্বাধীন হয়ে গেল। সারাদিন ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলো অবাধে আকাশে উড়ে পাক সামরিক কনভয় ও ঘাঁটিগুলোতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। পিণ্ডির সোলজাররা জলে-স্থলে সর্বত্র মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে। এক কথায় পাকবাহিনী এখন সব দিক থেকে মহাবিপর্যয়ের মুখে।

এদিকে পাক আর্মির সহায়তায় তার দোসররা ৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে আমার উত্তর শাহজাহানপুরের বর্ণালী স্টুডিও'র তালা ভেঙে তছনছ করে এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ক্যামেরা ও নগদ ক্যাশ লুটে নেয়। মুক্তিবাহিনীর বীর সন্তানদের এটা যে একটা আস্তানা, বোধহয় তারা জেনে গেছে।

ডিসেম্বর মাসের ৬ থেকে ১৫ তারিখ– এই ১০ দিন পাক বাহিনীর জন্যে বড়ই অভিশপ্ত সময়। মুক্তিসেনা ও মিত্র বাহিনীর বীর জওয়ানরা এখন ঢাকা বিজয়ের পথে। ঢাকার পতন অত্যাসন্ন। ঢাকাবাসীদের শহর ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার জন্যে মিত্রবাহিনী নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগের হিড়িক চলছে। মিত্রবাহিনীর কামানের পাল্লার মধ্যে এখন ঢাকা শহর। ঘন ঘন কামানের রকেট শেল এসে পড়ছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে। দিনরাত কাঁপিয়ে তুলছে ঢাকার রাজপথ-জনপদ। নিয়াজীর সেনাবাহিনী এখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও অবরুদ্ধ। তাদের মনোবল ভেঙে গেছে এবং ত্রাস বাড়ছে। সামরিক ও বেসামরিক অনেকে এখন আত্মসমর্পণের পক্ষে। গভর্ণর মালেকও সদলবলে পদত্যাগ করেছেন। জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিণ্ডিকে বলেছিলেন: ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯ টার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা।

ডিসেম্বরের এই ১০ দিনের ইতিহাস একদিকে যেমন বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময়, অন্যদিকে বাঙালীর চির অশ্রু বিসর্জনের মর্মন্তুদ বেদনাদায়ক অধ্যায়ও। এই সময়ের মধ্যে বর্বর পাক বাহিনী ও তার দোসররা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে দেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। সুপরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় তালিকা মোতাবেক দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকসহ অগণিত বুদ্ধিজীবী ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারান। আনুষ্ঠানিকভাবে পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের আগ পর্যন্ত ডিসেম্বরের এই ১০ দিন আমিও এখানে-সেখানে গোপনে রাত কাটিয়েছি। বাসায় রাতে থাকিনি। আমার বর্ণালী স্টুডিওতে পাক সেনারা আঘাত হানার পর থেকেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিই।

১৫ ডিসেম্বর রাতে বিবিসি, আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতারের খবরে প্রকাশ, আগামীকাল জেনারেল নিয়াজী সদলবলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে প্রায় রাজী হয়েছেন। শুধু এখন সময়ের হেরফের।

১৬ ডিসেম্বর '৭১। আমার জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত দিন। অতি আগ্রহ ভরে রেডিও অন করে বসে আছি সকাল থেকে। প্রায় ১০টার দিকে আকাশবাণী ঘোষণা করলো- জেনারেল নিয়াজী বিনাশর্তে তার বাহিনীসহ আত্মসমর্পণে রাজী। মিত্রবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব

www.pathagar.com

বেলা ১২টা নাগাদ ঢাকা যাবেন নিয়াজীর সঙ্গে আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা পাকা করতে। দেখি, ঘরের লোকজন বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকার মিলিটারি ক্যাম্প ও চেকপোস্ট থেকে সৈন্যরা কাঁধে রাইফেল নিয়ে দলে দলে হেঁটে বা লরিতে ক্যান্টনমেন্টে ফিরছে। ক্যাম্পগুলোতে তাদের বহু পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র অনেকে নিয়ে যায় এবং সুযোগমত পলায়ন বা প্রত্যাবর্তনরত পাক সেনাদের ওপর চোরাগোপ্তা গুলি করলে জবাবে তারাও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায়। অপ্রয়োজনীয় এই গোলাগুলি যখন ঢাকা শহরের অনেক মহল্লায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছে, তখন বহু উৎসাহী হতাহত হয়। শহরের এই চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যামেরা কাঁধে করে ভেসপা মোটর সাইকেলে খিলগাঁও সিপাইবাগের বাসা থেকে দুপুরে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওয়ানা দিই। পাক মোটর (বর্তমান বাংলা মোটর) হয়ে বিমান বন্দর সড়ক দিয়ে কাওরান বাজার রেলওয়ে ক্রসিং (সোনারগাঁও হোটেলের মোড়) পর্যন্ত গেছি, এমন সময় দেখি বিপরীত দিক থেকে ৮/১০টা দামী কার, জীপ ও লরি বোঝাই সৈন্য আমাকে অতিক্রম করলো। আমার মনে হলো, নিশ্চয়ই মিত্রবাহিনীর অফিসার ও জওয়ান এরা। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে এদের অনুসরণ করলাম দ্রুতগতিতে। হোটেল সাকুরার মোড়ে গাড়িগুলো পার্ক করে অনেকেই রেডক্রসের নিরাপত্তা জোন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (এখনকার ঢাকা শেরাটন) চলে গেলেন। হোটেলে অবস্থানকারী বহু বিদেশী ক্যামেরাম্যান বাইরে বেরিয়ে এলো।

এখানে উল্লসিত জনতার সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের কোলাকুলি চলছে। কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে মুক্ত মানুষগুলো। একটা জীপে বসে মিত্রবাহিনীর এক ব্রিগেডিয়ার দেখছেন এবং হাসছেন। এই জীপের বনেটে দাঁড়িয়ে আমি ও একজন বিদেশী ক্যামেরাম্যান ছবি তুলছি। হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল, গুলি বিনিময় শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমরা রাস্তায় শুয়ে পড়ি। এই গোলাগুলি দু' মিনিট স্থায়ী হয়। পরে দেখতে পাই ওই জীপে বসা ব্রিগেডিয়ার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। ক'জন পাঞ্জাবী সৈন্যও মারা পড়েছে। বাকীরা দু'হাত উপরে তুলে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সামনাসামনি যুদ্ধ কখনও দেখিনি। দুই গ্রুপের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে আমরা ক'জন সাংবাদিক ক্রলিং করে নিরাপদ স্থানে সরে যাই। বেলা প্রায় ২টায় এই অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক ঘটনার এক নীরব সাক্ষী আমি। মুহূর্তের মধ্যে হোটেল থেকে জেনারেল রাও ফরমান আলী ও জেনারেল জ্যাকব বেরিয়ে এসে সবাইকে শান্ত হতে বলেন: 'আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বলে রাও ফরমান আলী আকুল আবেদন জানান সমবেতদের উদ্দেশ্যে।

যাহোক, ঘটনার এখানেই শেষ। প্রয়োজনীয় ছবি তুলে আমি একা প্রায় ৩টার সময় রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) উপস্থিত হই। দেখি মোটা দড়ি বেয়ে বেয়ে সামরিক হেলিকপ্টার থেকে মাঠে মিত্রবাহিনীর বেশ কিছু জওয়ান নেমে পজিশন নিল। অদূরেই পাতা রয়েছে একটি কাঠের টেবিল ও দু'খান চেয়ার। টেবিল ক্লথও নেই। আনুষ্ঠানিক অস্ত্র সমর্পণের জন্যে দু' লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাক সেনাবাহিনীর কয়েকজন চৌকশ অফিসার ও জওয়ান। দূরে দাঁড়িয়ে উৎসাহী জনগণ এগুলো প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

করছে। বিকাল ৪টার পর পরই ভারতের ইস্টার্ণ কমাণ্ডের অধিনায়ক জেনারেল অরোরা ও পাক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী সদলবলে রেসকোর্স ময়দানে এসে পৌছান। সঙ্গে রয়েছেন মেজর হায়দার, মেজর শফিউল ও আরও অনেকে। হৃষ্টপুষ্ট নিয়াজীকে চুপসানো বেলুনের মত লাগছিল। আর্মির প্রথা অনুসারে মিত্রবাহিনীর জওয়ানরা জেনারেল নিয়াজীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। কিন্তু নিয়াজী আনমনে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অভিবাদন কিংবা প্যারেড পরিদর্শন কোনওটাই করলেন না তিনি। উপস্থিত সবাই হতবাক! এরপর জেনালের নিয়াজীকে টেবিলের ওপর সাজানো আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর দেয়ার জন্যে নিয়ে আসা হয়। আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের আগে দলিলটি তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দাঁড়িয়েই পড়তে থাকেন। তারপর বেলা প্রায় সাড়ে ৪টার সময় চেয়ারে বসে দলিলে স্বাক্ষর করেন জেনারেল নিয়াজী এবং পরে প্রতিস্বাক্ষর করেন জেনারেল অরোরা। পেছনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, মেজর হায়দার প্রমুখ ও মিত্রবাহিনীর অফিসাররা। একটু দূরেই সমবেত উল্লসিত জনতা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে স্লোগান দেয়– জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্তটি আগামী প্রজন্ম ও ইতিহাস রচয়িতাদের জন্যে ক্যামেরা বন্দী করতে পারায় আমি আনন্দিত ও গর্বিত। ডিএফপি'র ক্যামেরাম্যান মোবিন ভাইকেও এদিনের সব ঘটনা তাঁর মুভি ক্যামেরায় ধারণ করতে দেখেছি। ফটো সাংবাদিক মরহুম মানু মুন্সীও এই সারেণ্ডার অনুষ্ঠানে শেষের দিকে উপস্থিত থাকেন। বীর বাঙালীর রক্ত সাগর থেকে জন্ম নিল এক নতুন রাষ্ট্র– বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হলো, বাঙালীর স্বপ্ন হলো সার্থক।

উপসংহার:

মহান ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাঙালীর দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের সাহসী ভূমিকা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপট এবং রক্ত পিচ্ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধুর ঘটনাবলী, সফলতা ও বিজয়ের গৌরবকে ধারণ করেন ফটো সাংবাদিকরা। তাদের গৃহীত ঐতিহাসিক দুর্লভ সংবাদচিত্র ব্যতিরেকে আজ পর্যন্ত কেউই বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারেননি। সম্ভবও হবে না কোনওদিন। ফটো সাংবাদিকদের মূল্যবান ছবি দিয়েই ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জির পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড বানানো হয় ঘুরে ফিরে। অথচ, দুঃখজনক হলেও সত্য যে যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না এই ফটো সাংবাদিকদের। তাঁরাও যে গুণীজন, এ কথা কেউই ভাবেন না। ফটো সাংবাদিকদের পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার করা হয়। যা আদৌ কারও কাম্য নয়। তবুও তাঁরা হতাশ নয়। পেশাগত দায়িত্ব পালনে তাঁরা মোটেই পিছ পা নন। সত্যকে বাঙ্‌ময় ও ভাস্বর করে তোলার জন্যে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা।

লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগে যে বাংলাদেশের সৃষ্টি, আমাদের নানা অবহেলায় তা ক্রমশঃই ম্লান হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মুক্তমতি দেশপ্রেমিক নাগরিকমাত্রই হুমকির সম্মুখীন। এদেশের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসকে নানা ছলে বিতর্কিত করার নিরন্তর অপচেষ্টায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

অপশক্তির বিস্তার রোধ করতে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। আমাদের স্বপ্ন-চেতনা বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে– ঘটেছে বর্গীর হামলা। এই অভিঘাতগুলোকে মোকাবেলার জন্যে আমাদের গ্রহণ বর্জনের সচেতনতাকে আরও তীক্ষ্ণ করা প্রয়োজন, আরও স্পষ্ট করা দরকার।

'যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায় ....আমাদের ঠিক তার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে...........।' সব দেখে শুনে অনেক দুঃখে কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মিথ্যা ইতিহাসের কুহেলিকা অপসারণ করে, সত্য ইতিহাসের আলোকে স্বদেশকে উজ্জ্বল করে দেখানোই তো আমাদের সকলের ব্রত হওয়া উচিত।

লেখক দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র ফটো সাংবাদিক

www.pathagar.com

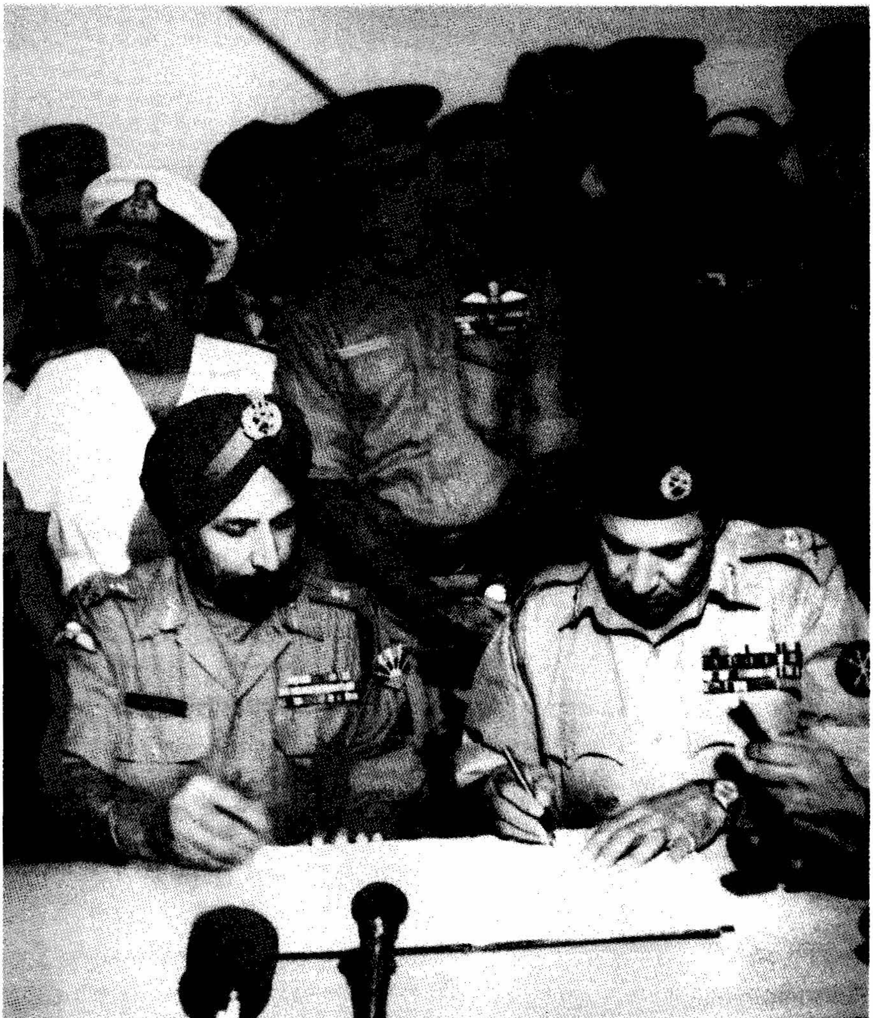

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর কাছে পাক-সেনাদের আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দৃশ্য

ছবিঃ আফতাব আহমেদ

www.pathagar.com

অর্থনীতির খোলা ময়দানে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা

ড. গোলাম রহমান

'সাংবাদিকের স্বাধীনতা' বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে শুরুতে অনেকেই তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন। এই ভেবে যে, সমাজের সকলের মতই সাংবাদিকরাও গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন। অতএব, এদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি পৃথক করে নতুন কোনও মাত্রায় আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে কী? সম্প্রতি একজন সাংবাদিক কথা প্রসঙ্গে বিষয়টিকে তির্যকভাবে দেখলেন। তিনি বললেন, সাংবাদিকরা স্বাধীন হলে নাকি সমাজে 'এনার্কি' সৃষ্টি হয়ে যাবে। উনার ধারণা এই যে, সাংবাদিকরা স্বাধীন হলে তাঁরা যা খুশি করবেন এবং তা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হবে। শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকের একজন সাংবাদিকের এই মন্তব্য অবশ্য নতুনভাবে আমার চিন্তা-চেতনাকে সাজাতে সাহায্য করেছে। আমার মনে হয়েছে 'স্বাধীনতা' বিষয়টি আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। যদিও আমরা জানি যে, সাংবাদিকের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিংবা সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সমার্থক নয় এবং এই জটিলতার কারণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকের স্বাধীনতার বিষয়টি সময়ে সময়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি আমরা উচ্চারিত হতে শুনেছি বিভিন্ন সময়ে একইভাবে। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের কারণে শিল্পীর স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতারই অন্তর্গত বিষয়। শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন হয়েছে।

সাংবাদিকের স্বাধীনতা যদি সাংবাদিকতার স্বাধীনতার অংশ হয়, তাহলে কোনও সংশয় থাকে না। আবার সাংবাদিকতার স্বাধীনতাও কতখানি পাঠক-বান্ধব সেটিও বিবেচ্য। সাংবাদিকতার স্বাধীনতা হচ্ছে সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা, বিভিন্ন মতামতকে সম্মান প্রদর্শনের স্বাধীনতা এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার প্রশ্নে কয়েকটি পক্ষ বিদ্যমান। কখনও কখনও আমাদের সমাজে এক পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অপর পক্ষের স্বার্থহানি ঘটে, তাই এ ধরনের প্রসঙ্গ আমাদের তাড়িত করে। স্বাধীনতার প্রশ্নটি তখন পেশার দায়িত্ব পালনের মুখোমুখি একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাংবাদিকতায় স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বশীলতার প্রসঙ্গটি বড় হয়ে দেখা দেয়।

সংবাদপত্র আজকাল শুধু নিত্যদিনের সংবাদ জানার জন্যেই নয়, বরং পাঠকের দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গীও। সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। বিষয়ের বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গটি সঙ্গত কারণেই আলোচনায় আসে। আজকের স্যাটেলাইট টিভি

www.pathagar.com

চ্যানেলের বাহুল্যে প্রতিক্ষণের সংবাদ ভোক্তা-জনগণের চোখের সামনে হাজির। প্রতি মিনিটে ঘটমান বিশ্বের অনেক দৃশ্যই আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারি টিভির পর্দায়, আর এই দৃশ্যমান ঘটনাসমূহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র চিরকালই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে আসছে; কিন্তু ইদানিংকালের পাল্লা দিয়ে চলার বিষয়টি লক্ষ্যযোগ্য বিভিন্ন কারণে। স্যাটেলাইট টিভির সঙ্গে সংবাদপত্রের এই অসম প্রতিযোগিতায় পত্রিকাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে অনেক কলাকৌশল। সম্ভবত এই কৌশলও সর্বদিক থেকে সংবাদপত্রকে আরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করেছে এবং সংবাদপত্রের পাঠককে একটি নতুনতর স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে সংবাদপত্র তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের কলেবর আরও বৃদ্ধি করেছে।

সংবাদপত্রকে একসময় সমাজের দর্পণ বলা হয়েছে। সাংবাদিকতাকে সেবামূলক পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এখন এই দুটো বিষয়কেই নতুনভাবে ধারণাবদ্ধ করতে হবে। সাংবাদিকতা পেশাকে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই পাশ্চাত্যের কাঠামোতে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না। তবু আমাদের দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগেই গণমাধ্যমের উন্নয়নের বিবেচনা শিক্ষিত জনসমষ্টির কাছে কাম্য। আমরা আমাদের সংবাদপত্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যতোটা অবলোকন করি, তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে, সাংবাদিকতার দায়িত্বশীলতাকে এবং সমাজের প্রতি এঁদের অঙ্গীকারকে। যে কারণে সাংবাদিকতায় জনগণের যে প্রত্যাশা, তা বেশি হলেও, বিশিষ্ট হলেও, মন্দ কিছু নয়।

আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার ভূমিকাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বর্তমানের অর্থনীতির খোলামেলা ময়দানে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষার সুযোগে প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্যই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনে উজ্জীবিত। পুঁজির স্বার্থরক্ষা করে ব্যবসায়ীদের বাঁচিয়ে রাখার কৌশলই এখন প্রায় সর্বস্বীকৃত। তাই গণমাধ্যম ব্যবসাও তারই রেশ ধরে ব্যবসা করছে, টিকে থাকছে– এটা বলা বাহুল্য। সংবাদপত্র, রেডিও, ছায়াছবি-এসবই বাজার অর্থনীতির 'কল্যাণে' একেকটি বিশেষ ব্যবসা, তা কখনও আন্তঃব্যবসায়িক দ্বন্দ্বেও লিপ্ত। ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে তাই টিভি চ্যানেলের সঙ্গে পত্রিকাকে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। আগেই বলেছি যে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সংবাদপত্রগুলো বেশি দায়িত্বশীল হয়েছে। কারণ পাঠকের সন্তুষ্টির কথা একে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হয়, পাঠকের কাছে অনেক দ্রুত খবরের কাগজ পৌছাতে হয়, বিনোদনের উদ্দেশ্যে পত্রিকাকে রঙিন করতে হয় এবং বেশি পৃষ্ঠা দিতে হয়, আরও কতো কী!

মূল কথা হলো, পত্রিকাকে সাজাতে হয় পাঠকের দৃষ্টিকে প্রলোভিত করার জন্যে এবং প্রতিদিন সকালে একটি নতুন পণ্য হিসেবে পত্রিকাকে বাজারজাত করার জন্যে অনেক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পাঠক যেহেতু প্রতিদিন সাত থেকে দশ টাকায় একটি পত্রিকা কিনে পড়েন এবং তার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকেন, সেহেতু এই পণ্যটি ভোক্তাদের চাহিদা এবং প্রত্যাশা পূরণে যথেষ্ট দায়িত্বশীল। নিন্দুকেরা ভিন্ন কথাও বলে। বলে থাকে যে, আজকাল

www.pathagar.com

বড় বড় সংবাদপত্রগুলো যতোখানি না পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে, তার চেয়ে বেশি করে প্রলোভিত এবং প্রতারিত। ধরা যাক, যে কোনওদিনের ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, যুগান্তর, ইনকিলাব কিংবা ডেইলি স্টার– এগুলোর প্রথম পৃষ্ঠা। কোনওদিন চার ভাগের তিন ভাগ বিজ্ঞাপন, কোনওদিন অর্ধেক পৃষ্ঠা কিংবা কম করে হলেও এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু ভোক্তা হিসেবে আমার অধিকারকে কি কোনও একটি পত্রিকা কোনও সম্মান দেখায়? পাঠক হিসেবে আমি প্রথম পৃষ্ঠায় কোনও বিজ্ঞাপন দেখতে চাই না– এ কথাটি কি তারা জানেন না; কিংবা জানতে চান না কেন? কোনও কোনও প্রকাশক/সম্পাদক হয়তো বলবেন, তারা বিজ্ঞাপন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ না করলেও অন্যেরা করবে। তাই তারা কেন ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? বিজ্ঞাপনের জন্যে পাঠকের সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে সমীকরণটি তারা করতে পারেন। অথচ প্রকাশক/সম্পাদকের একটি 'কনসেনসাস'ই পাঠকদের কথা বিবেচনা করার এরকম একটি সিদ্ধান্তের জন্যে যথেষ্ট নয় কি? পাঠকের প্রয়োজন-প্রত্যাশাকে যদি সংবাদপত্র আমল না দেয়, তাহলে তাদের দায়িত্বপরায়ণতা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় বৈকি! শুধু প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনই নয়, ভেতরের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের পরিমাণ (কোনও কোনও কাগজের ক্ষেত্রে) সংবাদের পরিমাণের তুলনায় অসহনীয় বাহুল্য, এমনকি কোনও কোনও বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং বিষয়বস্তু ক্ষয়িষ্ণু সমাজচিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উদাহরণ টেনে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করবো না, তবে সেখানে সংবাদপত্রের দায়িত্বের বিষয়টি ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে নিশ্চয়ই কোনও সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রথাসিদ্ধ বিজ্ঞাপন প্রকাশ ছাড়াও কোনও কোনও পত্রিকায় আজকাল দেখা যায় বিভিন্ন সংবাদের মাঝখানে ছোট্ট আকৃতির বিজ্ঞাপন। তা কখনও প্রথম পৃষ্ঠার বিশেষ কোনও সংবাদের শীর্ষে বা মাঝে কিংবা খেলার পাতা এবং অন্যান্য পাতায় কোনও একটি আইটেম-এর শীর্ষে কিংবা মাঝখানে। একই ধরনের চর্চা রয়েছে আজকাল টেলিভিশন সংবাদ প্রচারেও। যেমন তাজা শিরোনাম, সিটিসেল শিরোনাম, পারটেক্স খেলার খবর ইত্যাদি। পাঠক-দর্শকরা দেখে দেখে হয়তো অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন! কিন্তু পেশার স্বাধীনতা কী এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে না? নামী দামী এসকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোনও অপকীর্তির সংবাদ প্রকাশ, প্রচারের চ্যালেঞ্জ কী এই সকল সংবাদপত্র কিংবা টিভি চ্যানেল সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে? হয়তো সময়ই এর উত্তর দেবে।

ইদানিং দেখা যায়, সংবাদপত্র নিজেই কোনও বিশেষ গোলটেবিল বৈঠক করছে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের ডেকে সমস্যা, সংকট এবং সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করছে। অতঃপর তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করছে। এটি একটি নতুন ধারা। সংবাদপত্রের সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং পৃষ্ঠা ভরে বিস্তারিত এই রিপোর্ট পাঠককে গভীর বিশ্লেষণ পাঠের সুযোগ দিচ্ছে- এই দুই বিবেচনায় অনন্য। আগে অন্যেরা পত্রিকার জন্যে এ ধরনের আয়োজন করতেন। এসব গোলটেবিল আবার দেখা যায় কোনও পত্রিকার সঙ্গে যৌথভাবে স্পন্সরকৃত, অর্থাৎ অপর প্রতিষ্ঠানটি পত্রিকাটিকে আয়োজনে সহায়তার জন্যে অর্থ প্রদান করছে এবং পরে এটি প্রকাশিত হচ্ছে। এক অর্থে পত্রিকার কলাম কিনে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি, অথচ এটি বিজ্ঞাপন

www.pathagar.com

নয়। এই অভিনবত্বে যে এক ধরনের 'কারসাজি' আছে, এটা কিন্তু বোঝা যায়। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, সংবাদপত্র কি প্রকারান্তরে দায়িত্বশীলতার আদর্শ থেকে সরে আসছে না?

একটা সময় ছিল যখন বলা হতো, সংবাদের আড়ালে অর্থাৎ সংবাদের মধ্যে যেন কোনও পণ্য কিংবা সেবার বিজ্ঞাপন না থাকে। শহরের কোনও অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠান হলে সে হোটেলের নামটি এড়িয়ে যাওয়া হতো। অথচ ইদানিং হোটেলের জনসংযোগ কর্মকর্তার ছবি ও পরিচিতি হোটেলে আগত অতিথির সঙ্গে সংবাদ হিসেবে ছাপা হয়। পত্রিকায় ছাপা হয় বিভিন্ন পণ্যের পরিচিতিমূলক সংবাদ (?), বিজ্ঞাপন হিসেবে নয়। কোনও কোনও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন এবং একই বিষয়ের খবর এক পত্রিকায় ছাপা হতেও দেখা যায়। তখন পাঠক কিন্তু বিভ্রান্ত হন কোন্‌টি বিজ্ঞাপন, আর কোন্‌টি খবর তা বুঝতে। এসব থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অশুভ আঁতাত লক্ষ্য করা যায়। সাংবাদিকরা এসব বিষয় ইচ্ছে করলে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে পারেন। সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সমাজের ভালোমন্দ, সংকট-সম্ভাবনা, ব্যত্যয়-ব্যঞ্জনা– এ সবকিছুই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে চাই। নিত্যদিনের পাঁচালি সাংবাদিকের মূল্যায়নে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কখনও পাঠক এসব নিয়ে ভাবেন, কখনও উদ্বিগ্ন হন, কখনও কোনও ঘটনায় যথেষ্ট মর্মাহতও হন। হালকা রস-সঞ্চারকারী সংবাদও আজকাল কম প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সমাজের এ দর্পণে আমাদের সমাজচিত্র কতোটুকু প্রতিফলিত হয়? অনেকেই তাই বলে থাকেন, আমাদের এ দর্পণটি ভাঙা, বিবর্ণ। Ambiguous mirror বলেন কেউ। ভাঙা আয়নায় তাই সমাজের সব প্রতিচ্ছবি ভাঙা ভাঙা দেখায়। আমরা ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে চাই না। চাই না সমাজের ছবি দেখতেও। এই আয়নাটিকে উপযুক্ত করে তোলা দরকার। কেউ যেন এ আশা না করেন যে, আয়নাটি আপনা থেকেই জাদুর আয়নার মত রাতারাতি সুন্দর হয়ে উঠবে!

আজকাল কোনও পাঠক একাধিক পত্রিকা পড়ে তথ্যের গভীরতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তথ্যের বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছেন। একটি প্রসঙ্গ, একটি সংবাদ পরিবেশনের ধরন-ধারণ কিংবা আঙ্গিকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পৃথক দু'টি পত্রিকা পড়ে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হচ্ছেন যে, তিনি পত্রিকা পাঠ থেকে বিরত থাকতে পারলে নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করতেন। সংবাদের তথ্যবিভ্রান্তি শুধু সংখ্যাগত কিংবা পরিমাণগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকছে না। লেখকের (সাংবাদিক?) ইচ্ছা এবং আচরণের খেয়ালখুশিতে পর্যবসিত হচ্ছে। কখনও বিষয়টি পত্রিকার নীতি কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনীতিশূন্য কোনও জীবনব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে না, যে সব সংবাদই সেই সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতি থেকে সরে যাবে। কিন্তু সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠতার ওপরই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সত্য সবসময়ই 'সত্য', যার কোনও আংশিক বাস্তবতা নেই, অর্ধ-সত্য বলে কিছু নেই। অর্ধ-সত্য মিথ্যারই নামান্তর এবং তা ভয়ঙ্কর।

সংবাদপত্রের নীতির কারণে সংবাদের গুরুত্ব বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তার 'ট্রিটমেন্ট' বিভিন্ন হতে পারে; কিন্তু তথ্যের বিকৃতি ঘটার কোনও সুযোগ নেই। সরকার সমর্থক পত্রিকা

www.pathagar.com

আর বিরোধী দল সমর্থক পত্রিকা, বলা বাহুল্য যে, রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখবে। পাঠকরাও এটুকু বোঝেন যে, দু'ধরনের পত্রিকায় বিষয়বস্তুগত পার্থক্য থাকবে। সংবাদের তথ্যগত নিরপেক্ষতা বজায় রেখে স্বীয় দলের কথাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরা হবে। কিন্তু তথ্য এমনভাবে পরিবেশন করা হবে না যাতে করে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন! আজকাল দু'টি ভিন্ন পত্রিকা পাশাপাশি পড়তে গেলে পাঠক এতোই বিভ্রান্ত হন যে, তিনি কোনও পত্রিকার খবরই নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে পারেন না এবং ঘটনার বিবরণ কিংবা সংবাদটি জানতে গিয়ে তিনি বেশি বিব্রত হন। এমন অনেক উদাহরণ আমাদের জানা। সেগুলো এই স্বল্পপরিসর আলোচনায় ব্যক্ত করতে চাই না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কোনও দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে ঘটনার বিস্তৃতি কিংবা গভীরতা যাই হোক, প্রায়ই দেখা যায় সরকারী সূত্রে নিহত বা আহতের সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর প্রবণতা থাকে। তার ফলে সংবাদে অনেক সময় সরকারী সূত্রের আহত/নিহত হওয়ার তথ্যের গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয় পাঠকরা অবগত আছেন। এসব সংখ্যার সামান্য হেরফের পাঠকমনে তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তবে একটি অগ্নিকাণ্ডে ৫০ জনের নিহত হওয়ার খবর যদি মিথ্যা তথ্য হিসেবে ছাপা হয়, সেক্ষেত্রে পাঠক প্রতিক্রিয়া সত্যি সত্যি ভাঙা আয়নার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় সংবাদপত্রকে (যেহেতু একটি জাতীয় দৈনিকে এমন সংবাদও ছাপা হয়েছে)। পাঠক আর কতোটা সহনশীল হবেন? আজকাল প্রতিদিনের কাগজে যে পরিমাণ দুঃসংবাদ থাকে, তাতে করে সকালে ঘুম থেকে উঠে পত্রিকা পড়ে যে কোনও পাঠকের মেজাজের দায়-দায়িত্ব নেয়ার ভার সংবাদপত্র এবং সমাজ উভয়কেই নিতে হবে বৈকি! তার ওপর যদি বিকৃত তথ্যের প্রবাহ কিংবা তথ্য বিভ্রান্তির ওজন পাঠককে বইতে হয়, তা খুবই পরিতাপের।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের দায়িত্বশীলতার বিষয়টি তাই আজকে অনেক পাঠকেরই উচ্চারিত প্রশ্ন। আরেকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা সমীচীন বলে মনে হচ্ছে, তাহলো- সংবাদ ব্যতীত মতাশ্রয়ী লেখালেখি। আজকাল পত্রিকায় প্রভূত পরিমাণে মতাশ্রয়ী লেখা ছাপা হচ্ছে। এটি একটি নতুন প্রয়াস। অনেকেই আজকাল স্বনামে দেশের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছেন। খুবই ভালো কথা। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'নানা মত নানা পথ'-এর সন্নিবেশ আমাদের চিন্তা-চেতনাকে আরও শাণিত করবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, যিনিই একটি বিষয়ে আলোচনা করবেন, শুধু তার ওপরই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে না। সংবাদপত্রকেও তার আংশিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। লেখকের মতামতই বড় কথা নয়, ভাষার ব্যবহার, তথ্যের সমন্বয়, যুক্তি-নির্ভরতা এসব কিছু মিলিয়ে একটি লেখার সার্থকতা। অথচ পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন মতাশ্রয়ী এসব লেখায় যথেষ্ট তথ্যের ভুল, ভাষার ভুল, যুক্তির অসারতা পাঠককে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই এসব লেখা, পাঠকমনে ধারণা হতে পারে, সম্পাদনার টেবিল ডিঙিয়ে মুদ্রিত হয়ে যায়। সম্পাদনার টেবিলের যে দায়-দায়িত্ব, সেটি পালিত হয় না। যথার্থভাবে সম্পাদনা করা হলে এসব ভুল-ভ্রান্তি, তথ্যের যথেচ্ছ ব্যবহার পাঠককে দুর্ভাবনায় ফেলতো না। এতে করে সংবাদপত্রের নিজস্ব চেহারাটি বড় দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়। দর্পণটি এতোই

www.pathagar.com

ঘোলাটে যে, তাতে যা-ই দেখা যাক, সবই ধোঁয়াটে, আবছা আঁধারে নিমজ্জিত মনে হয়। সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। যে সংবাদপত্র একটি মতাশ্রয়ী লেখা প্রকাশ করছে, সেক্ষেত্রে শুধু মতামতের কারণেই লেখাটির গুরুত্ব নির্ভর করছে, নাকি লেখাটির অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে? নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে পরের বিষয়টিই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক বহুল প্রচারিত পত্রিকাও বিষয়গুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন করে না।

রিপোর্ট প্রকাশের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব সংবাদপত্রের একান্তই নিজের, যদিও রিপোর্টারেরও আংশিক দায়িত্ব থাকে। মতাশ্রয়ী লেখার ক্ষেত্রে দায়িত্ব সংবাদপত্রের ওপর বর্তায় এবং পাশাপাশি লেখকের ওপর বর্তায়। শুধু লেখকের নামের ওপর ভিত্তি করে লেখার মান নির্ণয় করতে গেলে এ সমস্যা থেকেই যাবে। যখন মুদ্রিত হয়ে লেখাটি বের হবে, তখন সংবাদপত্রকে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে বৈকি! আজকে সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলতা শুধু উন্নত দেশের বাজার অর্থনীতির ওপর ভর করে আমাদের মতো দেশে চালালে যথার্থ হবে না।

একজন সাংবাদিক যখন সংবাদ লেখেন, তখন তাতে তাঁর মত কিংবা মন্তব্য মেশান না। শাদামাঠা সংবাদে (Straight-jacket news) ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ সংক্ষেপে বিবৃত করেন। ব্যাখ্যামূলক সংবাদে (Interpretative news) তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ করেন। যখন একজন সাংবাদিক সংবাদ ছাড়া অন্য কিছু লেখেন- যেমন কলাম, আর্টিক্ল বা বাই-লাইন আইটেম, তখন সেখানে তিনি তাঁর মতামত উপস্থাপন করতে পারেন। সম্প্রতি একজন সিনিয়র সাংবাদিক সরকারী সংবাদ সংস্থা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মূল কারণ হচ্ছে, তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর মত প্রকাশ করে লিখতে গেলে শর্তারোপ করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন কাগজে স্বনামে বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতেন। এটি নিশ্চয়ই তাঁর চাকরির দায়িত্ব থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর নিজস্ব মতামতের ওপর নির্ভর করে তাঁর এসকল নিবন্ধ/কলাম পাঠক সমাজে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে মত প্রকাশের অধিকারই হচ্ছে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। একটি সমাজে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার মাত্রা নিরূপিত হয় সেই সমাজের গণতান্ত্রিক আচরণের ওপর। তাই কোনও ব্যক্তির স্বাধীন পেশার আচরণকে শৃঙ্খলিত করা মানে তাঁর স্বাধীনতা হরণেরই নামান্তর। 'When men are not forced, they are free. They cannot be forced into freedom'. (Dr. Sachin Sen, The Press and Democracy, 1957).

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনও কোনও সময় কোনও কোনও পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। কারণ হচ্ছে সংবাদপত্রটি পাঠকের প্রত্যাশায় অতিরিক্ত আশার আলো সঞ্চারিত করে। আবার কখনও কখনও সংবাদ কিংবা মতামত প্রকাশে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব থাকলে এরকমটি হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পত্রিকার সম্পাদক/প্রকাশককে আরেকটি সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। সেটি হচ্ছে, কোনও রাজনৈতিক বিষয়কে সরকারী দল হিসেবে মেনে নেয়া যায় না, কিন্তু যখন তারাই আবার বিরোধী দলে থাকেন, তখন তা অপরিহার্যভাবে মেনে নিতে হয়। এরকম ক্ষেত্র সংবাদপত্রের জন্যে ঝামেলার, কিন্তু এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে যখন একটি সংবাদপত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বদলের সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গে তাদের অবস্থানও পাল্টে ফেলে, তখন পাঠককুল বিভ্রান্তিতে পড়েন। সেক্ষেত্রে সম্পাদকীয় নীতি পরিবর্তনের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাঠকের জন্যে থাকা উচিত, তা থাকে না। পাঠকরা বিভ্রান্ত হন, প্রতারিত হন।

দেশে কিংবা বিদেশে বড় রকমের ঘটনা গণমাধ্যমের প্রধান উপজীব্য। যেমন ঘটেছিল ইরাক যুদ্ধের খবর পরিবেশন নিয়ে। বিদেশী টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদি যেভাবে ফলাও করে যুদ্ধের খবর পরিবেশন করেছে, তাতে মনে হয়েছিল দুনিয়ার অন্য কোনও প্রান্তে যেন কিছুই ঘটেনি, শুধুই যুদ্ধ। আমাদের সংবাদপত্রও তাই করেছে। যুদ্ধই হলো বড় এজেণ্ডা, নির্দ্বিধায় বড় এজেণ্ডা, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ও কম-বেশি গুরুত্ব পেতে পারে। বিদেশী গণমাধ্যম তো পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। এর আগে একটি দৈনিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সে সময় আমি বলেছিলাম যে, বিবিসি, সিএনএন, স্কাই নিউজ ইরাক যুদ্ধের খবর পরিবেশনে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এই হারানো গৌরব, বিশেষ করে বিবিসি ওয়ার্ল্ড উদ্ধার করতে পারবে কি? পারলেও কতোদিন লাগবে? আমাদের সংবাদপত্রগুলো পাঠকদের খুশি করতে গিয়ে দায়িত্ব থেকে অনেকটা সরে গিয়েছে। 'মিথ্যা প্রত্যাশা' সৃষ্টি করে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। জেনে-শুনেই তাসের ঘরের মতো আকাঙ্ক্ষা উস্কে দেয়া হয়েছে। কোনও শহরের পতনের খবর টিভিতে প্রচারিত হচ্ছে, পরের দিন খবরের কাগজে সেটাই উপস্থাপিত হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা গেল তার উল্টো এবং তার পরদিন এ বিষয়ে আর কিছু নেই। অর্থাৎ বানানো খবর শুধু পাঠককে খুশি করার জন্যে। এ যেন সন্তানকে ভর্ৎসনা না করার ভয়ের মতো, পড়াশুনা না করে না করুক, তবু গাল-মন্দ করা যাবে না, পাছে সন্তানের মন খারাপ হয়! পাঠকরাও যেন তাই, বিদেশে যুদ্ধের জন্যে সত্য খবর প্রকাশ করলেও যদি পাঠকের মন খারাপ হয়!

আমাদের সাংবাদিকতায় 'এথিক্স' মানা হয় না– এমন কথা প্রায়ই আলোচনায় আসে। ধর্ষিতা নারীর ছবি ছাপানো, দায়ী ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ কিংবা ধর্ষককে রেহাই দেয়ার প্রবণতা– এসব নিয়ে প্রায়ই সাংবাদিকতায় অবহেলার কথা বলা হয়। কোনও কোনও পত্রিকার এসব বিষয়ে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও সেগুলো যথাযথভাবে পালিত হয় না। কথা এবং কাজের গরমিল লক্ষ্য করা যায়। ভয়াবহ ছবি, মানুষের লাশের, দুর্ঘটনার কিংবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাওয়া বিকৃত ছবি ছাপা হচ্ছে অনেক কাগজেই। পারিবারিক কাগজ হিসেবে দাবি করে যেসব পত্রিকা, তারাও কিন্তু এসব টো টো পালন করছে না। অহেতুক পাঠককে কোনও কোনও ইস্যুতে মাত্রাতিরিক্ত টেনশন করতে বাধ্য করা হচ্ছে প্রায়ই। আমাদের সমাজে নতুন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে বিষয়ের সমাধান না বলে 'প্যানিক' সৃষ্টি করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। আজকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানিতে আর্সেনিক দূষণের কথা কিংবা মাদক নেশা ইত্যাদির কথা এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে কার্যকর এবং দায়িত্বশীল যোগাযোগ হচ্ছে না। এইচআইভি/এইডস, রাতকানা রোগ কিংবা ফলমূল শাকসব্জিতে হরমোন ও কীটনাশকের কথা সবই বলা হচ্ছে। কিন্তু এমন সব বিষয়ে সংবাদ কিংবা আলোচনা প্রকাশ করলে তার প্রভাব সমাজে কেমনভাবে পড়বে, সেটাও সাংবাদিককে বিবেচনা করতে হবে। এখানে এমন বিষয়গুলোকে লিখতে পারার যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ নিতে হবে

www.pathagar.com

সাংবাদিককেই। এটাই তার পেশার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নইলে এইচআইভি আক্রান্তের কথা কিংবা মাদক আসক্তের কথা বা আর্সেনিক সংক্রমণের কথা লিখলেই তা 'আত্মঘাতী' (কাউন্টার প্রডাক্টিভ) হতে পারে। নিশ্চয়ই কোনও সাংবাদিক ইচ্ছে করে কাজটি করবেন না। তার প্রভূত সদিচ্ছা থাকলেও বিষয়টি বুমেরাং হতে পারে।

বিষয়গুলো অত্যন্ত টেকনিক্যাল, এগুলো নিয়ে নতুন ধারার সাংবাদিকতা প্রচলিত হতে পারে। তাহলে সাংবাদিকতায় দায়িত্বশীলতার নতুন প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি হবে। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার জন্যে পেশাজীবীদের মধ্য থেকে বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এটি পেশারই প্রধান দায়িত্ব। 'Independent media can contribute to the betterment of nations and societies. In order to do so, however, they must often undergo their own self-improvement process. '(Frederick W. Schieck, 'Independent Media's Role in Building Democracy' http:usinfo.state.gov/journals/itgie/0203/ijge/gj01.htm). দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সাংবাদিকতার দায়িত্ববোধ পাশাপাশি বিবেচনা করতে হবে। নইলে এই বিবর্ণ, ভাঙা আয়নায় সমাজের সার্বিক চেহারাটাও বিবর্ণ এবং ভাঙাই দেখা যাবে। সংবাদপত্র তথা অন্যান্য শক্তিশালী গণমাধ্যমকে তাই বিবর্ণ হতে দেয়া যাবে না। সচেতনভাবেই সাংবাদিকতা করতে হবে।

লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

অসমাপ্ত পেশা

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

পেশার জন্যে নেশা একটি বড় উপলব্ধি। এ উপলব্ধিকে লালন করতে পারলে নেশার মধ্য দিয়ে পেশার শিখরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। আমার জীবনে আমি নেশা আর উপলব্ধিকে লালন করতে পেরেছি বলেই অদ্যাবধি সাংবাদিকতা পেশায় নিযুক্ত আছি। জীবনের বাকি দিনগুলোও সাংবাদিকতার নেশায় কাটাতে চাই। ছাত্র জীবনে আমি একটু সময় করে চায়ের দোকানে বসে বিকেলে খবরের কাগজ পড়েছি নিয়মিত। দৈনিক আজাদ আর ইত্তেফাক পত্রিকা পড়ার সুযোগ হয়েছে বেশি। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার গুরুত্ব তখন খুব একটা না বুঝলেও দেশ-বিদেশের খবর পড়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা, আবার তর্ক-বিতর্কও করেছি অনেক।

আমি যখন আইএ ক্লাসের ছাত্র, তখন আমাদের গ্রাম নবীগঞ্জে (নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে) একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। আয়োজক আমরাই ছিলাম– কয়েকজন বন্ধু। সকল আয়োজনের মধ্যে একটি বিশেষ আয়োজন ছিল সাংবাদিকদের দাওয়াত করা। যথারীতি দাওয়াতে সাংবাদিক (দুই জন) এলেন। এলেন বললেই শেষ নয়, এলাকায় সাংবাদিকদের আগমন হয়েছে শুনে অনেকের মনে কৌতূহল হলো। শ্রদ্ধা সহকারে তাদেরকে এক নজর দেখার আগ্রহে যেন নাটক দেখার আগ্রহই অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। সাংবাদিক দুই জনের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা দেখে, তখন থেকেই মনের এক কোণায় সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছাটাকে লালন করেছিলাম।

১৯৬৪ সালে দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমি তখন বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। একদিন আমার নিকট আত্মীয় এবং বন্ধু আলহাজ্ব জহিরুল হক আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে বললো, 'তুই দৈনিক পাকিস্তানের চীফ রিপোর্টার আলী আশরাফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবি। আমি তাকে তোর কথা বলেছি, নারায়ণগঞ্জের প্রতিনিধি করার জন্যে।' জহির তখন দৈনিক আজাদে দক্ষতার সঙ্গে ফটো সাংবাদিকতায় নিয়োজিত ছিল বলে অনেকের তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

জহিরের কথামত পরদিন ঢাকার মদন মোহন বসাক রোডে (টিপু সুলতান রোড) দৈনিক পাকিস্তানের অফিসে গিয়ে আশরাফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। জহির পাঠিয়েছে বলে জানাই। আমাকে বসতে বলে তিনি দুই হাতের কব্জি একত্র করে আমার নাম এবং লেখা পড়া

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম। তারপর এক এক করে শুরু করলেন, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ভাসানী, কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল এবং দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা। এরপর নারায়ণগঞ্জের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে। অনুভব করলাম আমি ঘামছি। উত্তর যা দিয়েছি তাতে মনে হয়েছিল, আমার আশা বুঝি পূরণ হবে না! টেবিলের ওপর রাখা কলিং বেল চাপ দিয়ে পিয়নকে বললেন দুই কাপ চা দিতে। চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে আশরাফ ভাই বললেন, 'সাংবাদিক হবেন, আরও বেশি জানতে হবে, পড়তে হবে।'

দুই জনের চায়ের কাপ যখন খালি, তখন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে নিয়ে নিউজ এডিটর আবদুল তোয়াব খান এবং মফস্বল এডিটর শামসুল আলম সাহেবের কাছে গেলেন। বললেন, 'নারায়ণগঞ্জের জন্যে একে ট্রায়ালে রাখলাম, দেখবেন।' এখন থেকে নিয়মিতভাবে কাজ শুরু করো– বলে তিনি তাঁর কক্ষে গিয়ে বসলেন। আমি সালাম দিয়ে ওই দিনের মত বিদায় নিলাম।

দুই দিন পর আমি একটি সচিত্র ফিচার নিয়ে অফিসে গেলাম এবং বার্তা সম্পাদক তোয়াব খানের হাতে দিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে লেখা এবং ছবিটি নিয়ে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলেন। পরদিন পত্রিকায় দেখলাম– ছবিসহ ফিচারটি ছাপা হয়েছে । আনন্দ আর উৎসাহ নিয়ে সেদিন থেকে শুরু হলো আমার সাংবাদিকতার পেশা। উল্লেখ্য যে, তখন থেকেই আমি ফটো তোলা এবং রিপোর্ট লেখার কাজ এক সঙ্গে শুরু করেছিলাম। মাত্র সাত দিন কাজ করার পর মাসিক পঁচাত্তর টাকা, কলাম লাইন দশ পয়সা এবং ফটো প্রতি পাঁচ টাকা করে নারায়ণগঞ্জের সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োগপত্র পেলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক বাংলা নামে বের হয়। এই সময় আমাকে স্টাফ ফটো সাংবাদিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। একই বছর আমি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করি। তখন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ পাওয়া একজন সাংবাদিকের কাছে খুবই গর্বের বিষয় ছিল। ক্লাবের সদস্য হয়ে দেশের স্বনামধন্য সাংবাদিকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল। দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক– তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরীসহ আরও অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিকদেরকে সালাম দেয়ার এবং তাঁদের কথা শোনার সুযোগটি পেতাম না যদি না প্রেস ক্লাবের সদস্য হতাম!

দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য হয়ে আমি মনেই করতে পারি না যে, হয়তো কোনও একদিন এই ক্লাবের আঙিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তৎকালীন দোতলা লাল ভবন থেকে বর্তমানের বিশাল প্রাসাদ আকৃতির এই ভবনটিতে প্রতিদিন শত শত সাংবাদিক এবং নানা পেশার নানা শ্রেণীর মানুষের আগমন ঘটে। সভা-সেমিনারসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান হচ্ছে রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জাতীয় প্রেস ক্লাবে। বেশি কিছু না বলে বলা যায় প্রেস ক্লাবের ডালপুরি হয়তো মন্ত্রের মত সবাইকে আকৃষ্ট করে।

সুদীর্ঘ ৩৯ বছর সাংবাদিকতা পেশায় আছি এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য হওয়ার গৌরব

www.pathagar.com

অর্জন করতে পেরেছি। গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়ে আসছে ব্যাপকভাবে। আনন্দঘন পরিবেশে ক্লাব সদস্যদের পরিবারবর্গ নানা রকম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র এবং উন্নত মানের নৈশ ভোজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা সমাপ্ত হয়। এতে করে সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মেলামেশা ও কুশল বিনিময় হয় প্রতি বছর।

বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। মরহুম মোস্তফা সারোয়ারের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে ছাত্র মিছিলে অংশ নিয়ে যখন স্লোগান দিচ্ছিলাম– রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, তখন পুলিশের অতর্কিত হামলায় আহত হই। সাংবাদিকতা পেশায় এসে ঊনসত্তরের গণ আন্দোলনের রিপোর্ট ও ছবি নিতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম বহুবার। রাজনৈতিক পক্ষ-বিপক্ষ দলের নেতা কর্মীদের হুমকির তোয়াক্কা না করে পেশার কাজ করতে হয়েছে আপোসহীনভাবে। তখনকার আমলে সাংবাদিকের কলমের কাছে রাইফেলের গুলি পরাভূত হতো। ক্রমান্বয়ে গণআন্দোলন রূপান্তরিত হলো স্বাধীনতার আন্দোলনে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের (মেজর জিয়া) স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার পেশার কাজ করতে হয়েছে জীবন বাজি রেখে। 'আখ্‌বারকা নোমায়ান্দা' অর্থাৎ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি শুনলে বর্বর ঘাতক পাক সেনারা কি মনে করতো জানি না, তবে পথ ছেড়ে দিতো। কখনও কখনও নারায়ণগঞ্জের সেনা কন্ট্রোলরুমে সাংবাদিক সম্মেলনে ডাক পড়তো। মুক্তিযোদ্ধাদের উপর কিভাবে আক্রমণ হবে, নদীপথে, স্থলপথে কোন্ কোন্ এলাকায় সেনা পাঠাবে, সে সম্পর্কে খবর আহাম্মক মেজর সাহেবরা সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করতো। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতাম মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার নূরু মিয়া চৌধুরী বাচ্চুর কাছে লোক মারফত সংবাদ দিয়ে। সাধারণ মানুষের উপর পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের ছবি তোলা আর প্রতিদিনের খবরাখবর গুপ্তচরের মত পাঠানোর দায়িত্ব ছিল আমার। এছাড়া শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত করাও আমার নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাস অবশ্য গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করতে পারিনি আমি। কারণ আগস্ট মাসের শুরুতে নারায়ণগঞ্জ শহর আর শহরতলীতে ছড়িয়ে পড়েছিল কুখ্যাত রাজাকার বাহিনী। পাক সেনা ও মিলিশিয়া বাহিনীর অত্যাচার আর হত্যাযজ্ঞের কারণে আমি শহর ছেড়ে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব দিকের গ্রামাঞ্চলে চলে যাই। সেখানে শহর থেকে আগত অগণিত নারী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গ্রামে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছিল। তখন গ্রামের যুব সম্প্রদায়কে একত্রিত করে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে লেগে পড়ি। এভাবে পুরো চার মাস কাটানোর পর অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সূর্যের সন্ধান পাই। ওইদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর আনুমানিক বেলা দেড়টার সময় ভারতের মারাঠা রেজিমেন্টের এক মেজর বন্ধুর সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে যাত্রা শুরু করি। সোনারগাঁও থানার কাইকারটেক নামক স্থান হতে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পার হয়ে সন্ধ্যার পর আমরা আদমজী নগরে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেই। ওই রাতের প্রচণ্ড

www.pathagar.com

শীত জীবনে কোনওদিন ভুলতে পারবো না। মেজরের ওভারকোটের ভিতর জড়োসড়ো হয়ে আমাকেও শীতের কবল থেকে বাঁচতে হয়েছিল। সেই রাতে স্বাধীনতার আনন্দে ভুলে গিয়েছিলাম পুরো নয় মাসের কষ্ট আর দুর্ভোগ। পরদিন ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, চলে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় এসে লাখো মানুষের আনন্দ উল্লাস দেখে থমকে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম পেছনে ফেলে আসা অসংখ্য শহীদের কথা মনে করে। সময় করে সেদিন কেরানীগঞ্জে শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিলাম আমার নববিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।

কথায় বলে জীবন থেমে থাকে না। আমার বেলায়ও তাই হয়েছিল সেদিন। আস্তে আস্তে সকল দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে ফিরে এলাম নিজ পেশায়, ক্যামেরা নিয়ে ছুটে গেলাম রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে। সেখানে দেখলাম বুদ্ধিজীবীদের লাশ ইটের ভাটায় পড়ে আছে। অগণিত নারী পুরুষের লাশ হাত-পা-চোখ বাঁধা অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। কুকুর, কাক, চিলেরা পবিত্র লাশের উপর বসে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। সেই করুণ দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করে ফিরে এলাম ওইদিনের মত। আদমজী মিলের দক্ষিণ পাশের খালে হত্যা করে পাক বাহিনী ফেলে দিয়েছিল অসংখ্য মানুষের লাশ, সেখান থেকে কিছু দূরে এসো ডিপোর ভিতরে অগণিত মা-বোনদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এরকম বধ্যভূমির অনেক সচিত্র করুণ প্রতিবেদন আমি লিখেছিলাম দৈনিক বাংলায়।

পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত হয়েছি বহুবার। ১৯৭৫ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলাম। আহত অবস্থায় নিহত সাংবাদিকসহ অন্যান্য নিহত এবং আহতদের ছবি তুলে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলাম।

উনচল্লিশ বছর যাবত সাংবাদিকতা পেশায় থেকে আমার সৌভাগ্য হয়েছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশকে দেখার। এ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক উত্থান পতন সবকিছুই যেন চোখের সামনে ছবির মত ভাসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে গিয়ে পেশাগত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এরপর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঐতিহাসিক এবং স্মরণকালের সর্ববৃহৎ নামাজে জানাজার ছবি ক্যামেরায় বন্দী করতে পেরেছি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে স্বচক্ষে দেখা এবং তাঁদের ছবি তুলতে পারা আমার পেশার উল্লেখযোগ্য সার্থকতা। এখানে আরও উল্লেখ করতে হয় পোপ জন পল, মাদার তেরেসা, বিশ্ববিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর ছবি তোলার কথা। খ্যাতিমান অভিনেতা দিলীপ কুমার, হেমা মালিনী, শাবানা আজমী প্রমুখের ছবি তুলেছি। এছাড়া দেশ-বিদেশের অনেক রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের ছবি তোলার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে।

সুদীর্ঘ সময়ের হাজারো ঘটনার মধ্যে আমার পেশা জীবনের স্মরণীয় দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৭৪ সালে কালবৈশাখী ঝড়ে রাজধানী ঢাকা শহর লণ্ডভণ্ড হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত ধ্বংসলীলার ছবি তুলে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, কারণ ওই রাতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছিল প্রচণ্ড। বিদ্যুতের অভাবে ছবি তৈরি করতে পারছিলাম না। তখন রাত প্রায় দু'টা। ডার্করুমে বসে বুদ্ধি খুঁজতে লাগলাম, কিভাবে ছবিগুলো তৈরি করা যায়। ফিল্ম প্রসেস বিদ্যুৎ ছাড়াই করা যায়, কিন্তু ছবির বেলায় বিদ্যুৎ ছাড়া হয় না। হঠাৎ মাথায় এল কন্ট্রাক্ট প্রিন্টের কথা। সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভগুলো ১০১২ ব্রোমাইড পেপারের উপর রেখে পারদবিহীন আয়না নেগেটিভের উপর চাপ দিলাম। অন্ধকারের মধ্যে এবং আন্দাজের উপর এই কাজ করছিলাম। পাশের রুম থেকে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে ডার্করুমে রাখা নেগেটিভের উপর মোমের আলোটি দশ সেকেণ্ডের মত ঘুরিয়ে মোমটি নিভিয়ে ফেলি। পরে ব্রোমাইড পেপারটি কেমিক্যালে প্রসেস করে হাইপোতে ফিক্সড করি। এবারে মোমের আলোর সাহায্যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করি এবং ছবিগুলো তৈরি করে ফেলি। নিখুঁত ছবি দেখে বার্তা সম্পাদক ফওজুল করিম (তারা ভাই) ওই রাতের মত আমাকে ছুটি দিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা সাভার অঞ্চলে ধানক্ষেতে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার ছবি তোলা। রাত আটটার সময় সম্পাদক কবি শামসুর রাহমান আমার বাসায় পিয়ন দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন বিধ্বস্ত উড়োজাহাজের ছবি তুলে আনার জন্যে। তখন আমি তোপখানা রোডে থাকতাম। যেমন নির্দেশ, তেমন কর্তব্য পালন। রাতের বেলা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিলাম সাভারের উদ্দেশ্যে। সাভার বাজারের পশ্চিমে নদীর পাড়ে গিয়ে জানতে পারলাম, সেখান থেকে আরও প্রায় এক মাইল উত্তরে যেতে হবে। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক এবং নৌকা ছাড়া সেখানে যাওয়া যাবে না। আশেপাশে পারাপারের জন্যে কোনও নৌকাও নেই। তখন নদীর তীরে বেঁধে রাখা ছোট একটি নৌকায় মাঝি দিন শেষে রান্না করছিল। এই অবস্থায় আমার বেবি ট্যাক্সির ড্রাইভার মাঝিকে সাংবাদিক সাহেব যাবেন বলে অনেক জোরাজুরি করতে লাগলো। মাঝি প্রথমে যেতে রাজি না হলেও পরে রাজি হলো। নৌকায় ঘটনাস্থলের কাছে গিয়ে দেখি, একটি হ্যাজাক লাইটের আলোতে উড়োজাহাজটি ঝকঝক করছে। বিপদ দেখা দিল আবার। কারণ একটি নৌকায় থেকে পুলিশ এলাকাটি পাহারা দিচ্ছিল, আর এস আই সাহেব কোনওক্রমেই ছবি তুলতে দেবেন না। অনেকক্ষণ কথা বলার পর জানতে পারলেন আমাদের পত্রিকার সম্পাদক কবি শামসুর রাহমান আমাকে পাঠিয়েছেন। এস আই সাহেব কবির একজন ভক্ত। কিন্তু তিনি নিরুপায় হয়ে বললেন, 'ঘটনাস্থলে বিমানের সিকিউরিটির লোকজন আছে, ছবি তুলতে দিলে আমার চাকরি থাকবে না। বুদ্ধি করে বললাম যে, আমি একবার মাত্র ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রেফতার করে নৌকায় নিয়ে আসবেন। যেমন বুদ্ধি তেমন কাজ। ক্যামেরা আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। মাত্র একবার ক্লিক করার পর ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটির লোকজন আমাকে ঘেরাও করে ধরে ফেললো। নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এস আই সাহেব হুঙ্কার দিতে দিতে আমাকে নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার করে তার নৌকার পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে আমার নৌকায় তুলে দিলেন। আরও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম ঢাকায় ফেরার পথে। রাত তখন দেড়টা। বেবি ট্যাক্সির চাকা পাংচার। দশ মিনিটের মধ্যে চাকা পাল্টিয়ে নিল বেবি ট্যাক্সি চালক। পরদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় বিধ্বস্ত বিমানের ছবিটি ছাপা হয়েছিল।

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলার আলোকচিত্র সাংবাদিক হয়ে পঞ্চম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের পর প্রতি মাসে আমি চব্বিশ হাজার টাকা বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। এই অবস্থায় মাত্র চার মাস যেতে না যেতেই বিগত আওয়ামী সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। শুধু দৈনিক বাংলাই নয়, ট্রাস্টের আরও একটি পত্রিকা বাংলাদেশ টাইমসসহ দু'টি সাময়িকী (বিচিত্রা এবং আনন্দ বিচিত্রা) বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে বেকার হয়ে পড়ে অনেক সাংবাদিক ও কর্মচারী।

সাংবাদিকতা পেশায় থেকেই মৃত্যুকে বরণ করতে চাই। তাই অর্থ কষ্টের কথা চিন্তা না করে দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় কাজ করছি। জীবনে বিষয়-সম্পত্তি তো দূরে থাক, সামান্যতম মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুও করতে পারিনি। কর্তব্য কাজে পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ করেছি। বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে পরিবেশের উপরও বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এছাড়া আমি বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়েও অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কাজ করার আগ্রহ আমার এখনও আগের মতই আছে এবং করছি। পেশার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছি মহান একুশে পদক। এছাড়া এসকাপ পুরস্কারসহ আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত ফটো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

লেখক একুশে পদক প্রাপ্ত, দৈনিক দিনকালের সিনিয়র ফটো সাংবাদিক

www.pathagar.com

'আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন!'

এম. তাজুল ইসলাম

স্মৃতির ক্যাসেটে ধারাবাহিকভাবে জীবনের প্রতিটি দিনক্ষণ, প্রতিটি ঘটনা ধারণ করা থাকে না। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং সুখ-দুঃখের ঘটনাবলী গাঁথা হয়ে থাকে রঙবেরঙের স্মৃতির মালায়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের অর্ধশতাব্দীর ঘটনাবহুল ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি দেশের জন্ম, তার শৈশব-কৈশোরের অস্থিরতার স্মৃতি, একটি জেনারেশনের পূর্ণতা লাভ এবং একটি পেশার উত্থান ও এগিয়ে চলার ইতিকথা। সাংবাদিকতা, আর এর সঙ্গে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলা আরেকটি নতুন পেশা জনসংযোগ। প্রেস ক্লাবের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার চল্লিশ বছরের সম্পৃক্ততা। আজ অনেক কথাই মনে পড়ে, অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে। জীবনের দুঃখময় ঘটনাবলী আমি শেয়ার করতে পারি না বা চাই না, আনন্দের মুহূর্তগুলো সবার সঙ্গে ভাগ করে নেয়ায় দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করি। একেকটি ঘটনা, তা সুখ, দুঃখ বা কৌতুকপ্রদ, যাই হোক না কেন, তার মধ্যে ফুটে ওঠে সমকালীন মানুষ, দেশ ও সমাজের গতিপ্রকৃতি ও মন মানসিকতাসহ একেকটি চিত্র।

প্রবীণ সাংবাদিক, যাঁদের অনেকেই এখন সম্পাদক এবং কেউ কেউ ইতোমধ্যে হয়েছেন গত, তাঁদের যখন সাংবাদিকতায় চলছে হাতেখড়ি, তখন জনসংযোগ পেশায় আমি দিচ্ছি হামাগুড়ি। সেই সময় তোপখানা রোডে লাল দোতলা প্রেস ক্লাব ভবনে আমার প্রবেশ, সহযোগী সদস্য হিসেবে। টেলিফোনে শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত নাদুসনুদুস, সেকালের প্রবীণ বেয়ারা আবদুল হকের কণ্ঠ, "হেরেস কেলা-আ-ব" আজও কানে বাজে। ঐ ভবনটি হয়ে ওঠে আমাদের জীবনেরই একটি অংশ, শরীরের ফুসফুসের মত। বিভিন্ন পত্রিকা পড়া, আড্ডা দেয়া, রাজা-উজির মারা, গুজবে কান দেয়া, ক্যারাম, টেবিল টেনিস বা তাস খেলা এবং শীতকালে পিছনের লনে নিছক রোদ পোয়ানোর জায়গা ছিল এই প্রেস ক্লাব। সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার সকালে তো জমজমাট।

সেদিনগুলো ছিল বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সময়। দেশে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। অতীতের সেই বৈচিত্র্যময় ঘটনাবহুল দিনগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই আমার অজান্তেই আমার গাড়ি ঢুকে পড়তো লাল ভবনটির চত্বরে। কি জমজমাট আড্ডা! কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সদস্যদের মধ্যে। দৈনিক বাংলার প্রয়াত আলী আশরাফ একবার চায়ের টেবিলে কোনও এক আন্দোলনে তাঁর সম্পৃক্ততার ফলে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপন

www.pathagar.com

করার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'তখন আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড চলিয়া গেলাম, বুঝলা?' ফয়েজ আহমদ ভাইয়ের তির্যক প্রশ্ন, 'তুমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড গেলা! কোথায়?' 'ক্যান্, বরিশালে।' 'কি কইলা? কোন সময়?' 'এত প্রশ্ন কিসের, জুলাই মাসে।' 'অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি না।' চিকন মানুষেরা সাধারণত রগচটা হয়। ছিপছিপে, লম্বা বরিশালের আলী আশরাফ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে টেবিল থাপড়ে বললেন, 'তুমি বিশ্বাস না করিলে কি হইবে, কি আইবে যাইবে, পুলিশরে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমারে খুঁজিয়া পাইছিল কিনা'? উনি যতই বলেন, ফয়েজ ভাই ততই অবিশ্বাসের মাথা নাড়েন। বললাম, 'ফয়েজ ভাই, উনি তো স্থান, কাল পাত্র সবই বলে দিচ্ছেন, আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?' 'ক্যাম্‌নে বিশ্বাস করুম? আচ্ছা তুমিই কও তাজুল, জুলাই মাসে, মানে ভরা বর্ষায় কেউ বরিশালে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাইতে পারে? আশরাফ যদি কয় 'আণ্ডারওয়াটার' চলিয়া গেলাম তাহলে বিশ্বাস করা যায়।' অবজারভারের দুর্ধর্ষ বার্তা সম্পাদক এ বি এম মূসা, আজাদের আবদুল আউয়াল খান, এম. আর. আখতার মুকুল, পূর্বদেশ-এর এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, সদ্য প্রকাশিত হলিডের এনায়েতুল্লাহ্ খান, মর্নিং নিউজ-এর শহীদুল হক, এ.এল.খতিব, দৈনিক পাকিস্তানের আলী আশরাফ, এনা'র হাসান সাঈদ, অবজারভারের আতাউস সামাদ, আবদুর রহিম, ফাজলে রশীদ, আরও কত মুখ চোখে ভাসে। শামসুল হুদা (আলহাজ্ব), হৈ-হুল্লোড় করা জহিরুল হকসহ ফটো সাংবাদিকদের দল। সবাই তখন তরুণ।

গত কয়েক দশক ধরে চলে আমাদের সংবাদপত্র তথা মিডিয়া জগতের বিস্তার, গতিশীলতা, বৈচিত্র্য, নবীন সাংবাদিকদের প্রবেশ এবং নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আমার জনসংযোগ কর্মতৎপরতার তাল মিলিয়ে চলা। আমার সুদীর্ঘ পেশাগত জীবনে প্রবীণ-নবীন এই সাংবাদিকদের সহযোগিতা, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব মূলতঃ এই ক্লাবকে ঘিরেই হয়েছে আবর্তিত। জমেছে কত মধুর স্মৃতি। অর্জিত হয়েছে কত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি করেছি ব্যক্তিগত ও মানবিক সম্পর্ক কোনও সংকট মোকাবেলায় কত সহায়ক হতে পারে। জনসংযোগ ও সাংবাদিকতা একে অপরের সম্পূরক। সংবাদ জগতের আস্থা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন নিজের সংস্থা ও দেশ সম্পর্কে জ্ঞান, শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তিতে এই সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

আমার প্রথম কর্মস্থল ওয়াপদার বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্ভরশীল ছিল কাপ্তাই এবং আর দু'একটি ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর। কাপ্তাই বিগড়ালেই দেশের এবং ঢাকার বিরাট অংশে অন্ধকার, আর পত্রিকা থেকে অবিরাম টেলিফোন। হাতিরপুলে তৎকালীন এক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সামাল দেয়া হতো কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা ভাইটাল ইনস্টলেশন-গভর্নর হাউস, সেনানিবাস, মেডিক্যাল ও রেলওয়ে হাসপাতাল ইত্যাদি। তখন অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো মতিঝিল থেকে। সংস্থার অভ্যন্তরে জনসংযোগ করে মতিঝিলের কয়েকটি ভবনকে 'ভাইটাল ইনস্টলেশনের' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পরদিন সংস্থার ওপর সমালোচনার তীব্রতা অনেক লঘু হয়ে যেত। ঝড়বৃষ্টির এক ভোর রাত্রে মোহাম্মদপুর থেকে মূসা ভাইয়ের ফোনে ঘুম ভাঙল। তাঁর বাসায় বিদ্যুৎ নেই। খোঁজ নিয়ে আধঘন্টার মধ্যে আসবে বলে জানিয়ে ভাঙা ঘুম জোড়া লাগিয়ে আবার ঘুমিয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

ঘন্টাখানেক পর ভোরে আবার ফোন। হেসে বললেন, "হে-হে-হে, থ্যাংক ইউ। আইস্যা গ্যাছে। এখন ঘুমান। চা খাইতে আইসেন।" শেষের কলটি ছিল আবার ঘুম ভাঙানোর দুষ্টামি। আর ঘুম আসে না। আধ ঘন্টা পর ভোর ছ'টায় আমি তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির। সারারাত ঘুমাতে না পেরে এখন ফ্যানের বাতাসে গভীর ঘুম থেকে উঠে আসা মূসা ভাই আমাকে দেখে হতবাক-'আরে! কি ব্যাপার?' 'কি ব্যাপার মানে? আমার চা কোথায়?'

তখন জনসংযোগ পেশা বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করত না। এ যেন শস্তা প্রচার আর প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে সত্যকে আড়াল করার ডিপার্টমেন্ট। বিমানে থাকাকালীন এক মন্ত্রী মহোদয় বিমানের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে ফোনে জানতে চাইলেন তাঁর পাঠানো একজনের চাকরি এখনও হয়নি কেন? এম.ডি বললেন, 'স্যার, মুশকিল হচ্ছে যে, ওর না আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, না কোনও অভিজ্ঞতা, তাই কোথাও দিতে পারছি না।' 'তাই নাকি, তাতে সমস্যা কি? ওরে 'ফিয়ারু' (পি.আরও) বানায়ে দেন।' স্তম্ভিত এবং মনক্ষুণ্ন হয়েছিলাম। আমাদের দেশে নীতিনির্ধারক এবং ব্যবস্থাপকদের ধারণা যে, জনসংযোগ পেশায় তেমন লেখাপড়া বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। শুরু থেকেই আমার মনে ইচ্ছা এবং জেদ ছিল যে আমার পেশাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে শস্তা প্রচার ও সত্য গোপনের জন্যে জনসংযোগ নয়, বরং সংস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার একটি বাহন। ফলে অনেক সমস্যা, বাধা, অসুবিধা ও চাপের সম্মুখীন হতে হলেও এই উদ্দেশ্য সাধনে সাংবাদিকদের সহায়তা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নিয়তির লীলায় কর্মক্ষেত্র বঙ্গভবনে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে থাকাকালীন একবার অর্ধদিবস (৬টা-২টা) হরতালের দিন বেলা ১টায় এক মন্ত্রী মহোদয় ফোনে বললেন যে, কিছুক্ষণ পর যখন কিছু গাড়ি বের হবে, কিছু দোকানের শাটার উঠবে, ঐ সময় টেলিভিশনের ক্যামেরায় ঐ ছবিগুলো তুলে সন্ধ্যায় টেলিভিশনে দেখিয়ে বলা যাবে যে হরতাল তেমন হয়নি। বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, 'হাজারো মানুষের মত আমি নিজেও হেঁটে এসেছি, দোকানপাট বন্ধ দেখেছি এবং সর্বোপরি এটা আমার কাজ নয়, এর জন্যে মন্ত্রণালয় আছে। তারা টিভিকে বলতে পারে। তাছাড়া এই ক্যামেরা শুধু বঙ্গভবনের জন্যে। সরি স্যার, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' উচ্চতম পর্যায়ে অভিযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু কপাল কোঁচকানো ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি এবং আর কখনও এ ধরনের কোনও অনুরোধ আমাকে করা হয়নি। বিভিন্ন চাপের মুখে সাংবাদিকদের ভূমিকা কিন্তু অতুলনীয়। একবার সন্ধ্যায় পি.আই.ডি থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেস এ্যাডভাইস দেয়া হয় যে অমুক বার্তা সংস্থার অমুক নিউজটি ছাপা যাবে না। পরদিন সকালে একটি বাংলা দৈনিকে প্রথম পৃষ্ঠায় 'সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না' এই বুদ্ধি খাটিয়ে সংশ্লিষ্ট ঐ বার্তাসংস্থার বরাত না দিয়ে 'গতরাতে ভয়েস অফ আমেরিকা জানায়...' বলে প্রথম পৃষ্ঠায় ঐ সংবাদটিই ছাপা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের মাথা চুলকানো ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

পারস্পরিক বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সংস্থা ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসযোগ্যতা বিদেশেও সাংবাদিকদের সঙ্গে কাজকর্মে খুবই সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। ওয়াশিংটন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের লাউঞ্জের সীমিত জায়গায় বিভিন্ন দেশের পতাকা বসানোর

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় শেষ দরখাস্তকারী হয়েও ক্লাব সভাপতি ও তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় অনেককে ওভারটেক করে আমার দেশের পতাকা স্থান পেয়েছিল, যা এখনও সগর্বে শোভা পাচ্ছে এবং চিরদিন থাকবে। তৎকালীন কলকাতার সানডে পত্রিকার সম্পাদক, বর্তমানে এশিয়ান এজ-এর প্রধান সম্পাদক এম.জে.আকবর আশি দশকের প্রথম দিকে একবার ঢাকায় এলেন। বাংলাদেশ বিমানে আসছেন শুনে সংস্থার জনসংযোগ প্রধান হিসেবে তাঁকে আমি রিসিভ করে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার পথে শুনলাম, গত তিন বছরে বাংলাদেশে এটা তাঁর তৃতীয় সফর। বললাম, 'যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি এক কথায় এই দেশকে কিভাবে বর্ণনা করবেন?' বললেন, 'এ নিয়ে গত তিন বছরে যতবারই এসেছি প্রতিবারই দেখেছি নতুন রাষ্ট্রপতি।' (প্রথমে দেখেন জিয়াউর রহমান, দ্বিতীয় বারে বিচারপতি আবদুস সাত্তার এবং এবার জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ)। এক কথায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কথাটি বলে দিলেন। যে কাজে তাঁর আগমন, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার গ্রহণ, তার সময় নির্ধারণ না হওয়ায় দু'দিন পর ফিরে গেলেন। সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পর তিনদিন পরই আবার এলেন। এবার তাঁকে বললাম, 'মি. আকবর, বাংলাদেশ অনেক বদলে গেছে, স্থিতিশীল হয়েছে।' 'কি রকম?' 'আপনার এর আগের সফরে যে রাষ্ট্রপতি ছিলেন, এ সফরে দেখবেন সেই একই রাষ্ট্রপতি বহাল রয়েছেন।' অট্টহাসি হেসে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুমি একটা আস্ত বদমাইশ।' সেই যে বন্ধুত্বের শুরু, তা ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে এখনও অটুট রয়েছে।

জনসংযোগ পেশায় গুরুতর ও চ্যালেঞ্জে ভরা অনেক ঘটনা ও দায়িত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে আফগানিস্তান। তিন দশকের যুদ্ধ শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরই সুযোগ আসে বিধ্বস্ত দেশটি কয়েকবার সফর করার। সেটা ২০০২ সালের কথা। বাতাসে তখনও বারুদের গন্ধ, মাইন অধ্যুষিত দেশ, কোথাও কোথাও খণ্ড যুদ্ধের রেশ। এমন বিপদসঙ্কুল দেশটিতে এত কিছুর পরও মনে হয়েছে দেশটা আমার দেশের চেয়েও নিরাপদ। ঢাকার চেয়েও নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করেছি অজানা অচেনা শহর কাবুলে, জালালাবাদে, কত মফস্বল শহরে এবং গ্রাম-গ্রামান্তরে। আমার দায়িত্ব ছিল তৎকালীন কর্মস্থল ব্র্যাকের কর্মসূচী আফগানিস্তানে শুরু করার জন্যে অনুমতিপত্র বা রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা এবং নতুন সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন করা। আমার কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে, জনসংযোগের পন্থাই কাজগুলোকে সহজ ও দ্রুততর করবে। একই সঙ্গে দায়িত্ব ছিল 'প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানের অনুরোধে যুদ্ধ পরবর্তী আফগানিস্তানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠানো। ভাবতে ভালো লাগে যে, ঐগুলোই ছিল বাংলাদেশের কোনও পত্রিকায় সরাসরি কাবুল থেকে পাঠানো প্রথম নিয়মিত প্রতিবেদন। ঐ সময় কাবুল শহরের আনাচে-কানাচে তো বটেই, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবন পদ্ধতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বপ্ন, সমস্যা ও জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভের উদ্দেশ্য অনেক ঘুরতে হয়েছে। মেয়েরা আবার শুরু করেছে স্কুলে যাওয়া, নারী কর্মীরা ফিরে আসছেন কর্মক্ষেত্রে, বোরকার অবগুণ্ঠন ধীরে হলেও সরে যাচ্ছে। এক গ্রামে দেখি,

www.pathagar.com

এক আফগান তার বোরকা পরিহিত বিবিকে নিয়ে ধূসর ও কঙ্করময় পথে কোথায় যেন চলেছে। বিবি আগে এবং বেশ কয়েক পা পেছনে চলেছে আফগান পোশাক ও টুপি পরিহিত কর্তা। গাড়িতে আমাদের আফগান সঙ্গী এক সাংবাদিককে হেসে বললাম, 'যেখানে আগে সাহেব চলতো আগে আগে, পিছু পিছু হাঁটতো বিবি, আজ তো দেখি এই অল্পসময়ে তোমার দেশে নারী প্রগতি এত দ্রুত এগিয়ে গেছে যে পাশাপাশি তো নয়ই, বরং বিবি চলেছে আগে আর তাকে অনুসরণ করছে সাহেব বাহাদুর।' সঙ্গী বন্ধু মিটমিট করে হেসে বললেন,'কাউকে যদি না বলো তো, হঠাৎ এই নারী প্রগতির কারণটা বলি। এই এলাকায় মাটির নিচে অনেক মাইন বিছানো আছে। যদি ফাটে তো ফাটবে আগে আগে হেঁটে যাওয়া বিবিজানের পায়ের চাপে, আর সাহেব বাহাদুর তখন পেছন ফিরে নিজের জান নিয়ে দেবেন দৌড়!'

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখনীতে ফুটে ওঠা আফগানদের 'শুভ্রতম হৃদয়ের' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এত যুদ্ধবিগ্রহ, দুঃখকষ্টের মধ্যেও প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পরেও কলুষিত হয়নি। তাদের মূল্যবোধ রয়েছে অটুট, তা অপরিবর্তিত দেখে বিস্মিত হতে হয়। রুক্ষ অবয়বের আড়ালে সুমধুর ব্যবহার, সততা ও অতিথিপরায়ণতা ছাড়াও প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধের জন্যে ওদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি। অনেক দেশ দেখার অভিজ্ঞতায় কোন্ দেশের মানুষকে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, দেশে ফেরার পর একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, 'আফগানিস্তানের মানুষকে। অবশ্য সব দেশেই কিছু বজ্জাত লোক আছে।' প্রশ্নকর্তা হেসে মন্তব্য করেছিলেন, 'তা ঠিক, এই যেমন আমাদের দেশেও কিছু ভালো লোক আছে।' যে দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলাম, তা সফলভাবে সম্পন্ন হবার পর ঐ সংস্থার কর্মকাণ্ড আফগানিস্তানে শুরু হয়, যা এখন ঐ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশের নাম খুব সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয় আফগানিস্তানে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সাহিত্যে বিশ্বের দরবারে আমাদের শূন্য অবদানের কথা স্মরণ করে প্রয়াত হুমায়ুন আজাদ আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 'আমরা পৃথিবীকে প্রকৃতপক্ষে কিছুই দিইনি।' লেখাটি পড়ার পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। হলে বলতাম, বাংলাদেশ বিশ্বকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়নি। বাংলাদেশ বিশ্বকে উপহার দিয়েছে তার উদ্ভাবিত ক্ষুদ্র ঋণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, যা বহু দেশে আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মিডিয়ার আরেক অঙ্গ টেলিভিশনে ১৯৬৫ সালে বাংলা সংবাদ পাঠক হিসেবে আমার প্রবেশ। প্রথম দিন নিদারুণ ভীতিসহ ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া কণ্ঠে ঢোঁক গিলতে গিলতে গলদঘর্ম হয়ে কোনও রকমে ১০ মিনিটের সংবাদ পাঠ করার পর বহু দিন আর ডাক আসেনি। একদিন সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে বিটিভির বার্তা সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরীর জরুরী ফোন, 'এক মিনিট দেরি না করে এক্ষুণি চলে আয়। ভীষণ দরকার।' কিছুই না বুঝে দ্রুত ডি.আই.টি (রাজউক) ভবনে পৌঁছে গেলাম। এক গোছা স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে হুমায়ুন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। নিউজ রিডার আসেনি। আমাকে খবর পড়তে হবে। সর্বনাশ! মাত্র ৪/৫ মিনিট বাকি, তাছাড়া তিন চার জন অনুবাদকের এক এক রকম হাতের লেখা আগে একবার পড়ে না নিলে, দুর্বোধ্য শব্দগুলো নিজের হাতে লিখে না নিয়ে ক্যামেরার সামনে

www.pathagar.com

যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। পড়তে পড়তে কোথাও বুঝতে না পেরে হঠাৎ আটকে গেলে ক্যামেরা অর্থাৎ দর্শকদের সামনে কপাল কুঁচকে একবার ক্যামেরা, আরেকবার এদিক ওদিক অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকানো যে কি বিব্রতকর! জাতির সামনে এক মহা কেলেঙ্কারি। হুমায়ুন টানতে টানতে মেকআপ রুমে নিয়ে বললো, 'আরে সর্বনাশ, পাঞ্জাবি পরেছিস।' বলে আমার পাঞ্জাবি খুলতে শুরু করল। 'এ কি! করিস কি! ভদ্রলোকের জামাকাপড় নিয়ে টানাটানি!' ওর শার্টটা আমাকে পরিয়ে দিল। 'হায় হায়, টাই কোথায়?' অনুষ্ঠান ঘোষক সরকার ফিরোজউদ্দিনের টাইটা পুরো না খুলে মালার মত মাথার উপর দিয়ে বের করে আমাকে টাইভূষিত করে দিল। আর একই সঙ্গে মেকাপম্যান আমার মুখে পাউডার লাগিয়ে দিলে বগলদাবা করে আমাকে নিউজ বুথে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা আটকে দিল। চেয়ারে বসে লম্বা শ্বাস নিয়ে মনিটরে তাকাতেই দেখি আমার চেহারা ভেসে উঠেছে। দর্শককে শুকনো মুখে কাষ্ঠ হাসি দিয়ে পড়া শুরু করলাম। প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যেও মাঝে মাঝে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে মনে মনে দর্শককে বলি, 'আমার পরনের টাইটা ফিরোজের, তার নিচে শার্টটা হুমায়ুনের, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না যে তারও নিচে আমার পায়জামা এবং স্যাণ্ডেল।' কিভাবে সময় পার হলো জানি না। বের হতেই দেখি হুমায়ুন দাঁড়িয়ে। খুব রেগে গিয়ে বললাম, 'কোনও মানে হয়? ছি, ছি, কেমন পড়লাম জানি না। এভাবে জাতির সামনে লজ্জা দেয়ার কোনও মানে হয়?' আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কনগ্রাচুলেশনস! চমৎকার পড়েছিস।' 'মানে? নার্ভাস হইনি?' 'একটুও না। কারণ আজ নার্ভাস হওয়ার সময়ই পাসনি!'

আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন যে, আমার প্রথম দিনের প্রথম সংবাদটি কি ছিল? উত্তরে বলি, 'মনে নেই, তবে শুরুটা মনে আছে-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেছেন......।' প্রতিদিন সরকার প্রধানকে দিয়েই সংবাদ শুরু করতে হবে, তা সেই সংবাদের নিউজ ভ্যালু শূন্য হলেও। ইটিভির পথ অনুসরণ করে বর্তমানে অন্যান্য টিভি চ্যানেলেরও সংবাদ বেশ উন্নত হয়েছে। কিন্তু শাদা-কালো থেকে রঙিন হওয়া ছাড়া বিটিভির সংবাদের কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে কাউকে বলতে শুনিনি। অবশ্য অনেক সীমাবদ্ধতা ও বিধিনিষেধের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয় সেটাও ঠিক। মনে পড়ে, একবার এক বিদেশি প্রতিনিধি দলের নেতা এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপের সময় বিটিভি প্রতিনিধির এক প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় খবর পড়তে গিয়ে দেখি ঐ সংক্রান্ত সংবাদটির মধ্যে বিটিভি'র নিজস্ব প্রশ্ন ও তার উত্তরটি নেই। প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম, সরকারী বার্তা সংস্থা বাসস'র স্টোরিতে ঐ অংশটুকু নেই বলে দেয়া গেল না! তবে নিজ উদ্যোগে মাঝে মাঝে সংবাদ পরিবেশনের 'দুঃসাহসিক' উদাহরণ যে নেই তা নয়। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রায়শই কোনও সংবাদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে প্রাপ্ত কোনও বিশেষ সংবাদ বা তথ্য 'আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন' বলে জুড়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ এটা আমাদের এক্সক্লুসিভ, যা আর কেউ জানতে পারেনি।

একবার ঈদের দিনে সন্ধ্যায় টিভি সংবাদে কোথায় কোথায় জামাত হয়েছে, রাজা-উজির কে কোথায় নামাজ আদায় করলেন ইত্যাদির পর গম্ভীরভাবে বলা হলো, 'আমাদের সংবাদদাতা

www.pathagar.com

জানতে পেরেছেন যে নামাজের পর মুসল্লীরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন!' কৌতুক নাট্যাভিনেতা আবদুল জলিল সাংবাদিক বন্ধু ফাজলে রশীদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দোস্ত, সংবাদদাতা এটা জানলো কি করে?'

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নির্মিত হয়। কার্জন হলসহ একাধিক সরকারী ভবন এবং পরবর্তীকালে তোপখানা রোডে সেগুলোরই একটি লাল রঙের ভবনে স্থাপিত হয় প্রেস ক্লাব। ঐতিহাসিক সেই ভবনটিও সম্প্রসারণের কারণে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! হারিয়ে গেল উপমহাদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সঙ্গে ভবনটির যোগসূত্র। ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তিতে আজ বারবার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ঐ ভবনটি। এরই পাশে একই সময়ে নির্মিত ভবনটিরও কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মূল ভবনটি অটুট রেখে তারই স্থাপত্যের সঙ্গে মিল রেখে সুন্দরভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে বর্তমানের সিরডাপ-এর কার্যালয়। ক্লাবের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা অসম্ভব ছিল না। বর্তমানে দেহের কলেবর বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাকচিক্য সত্ত্বেও ভয় হয়, এবার হারিয়ে না যায় আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির আত্মা।

সাংবাদিকতায় তথা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে এখন অনেক তরুণ মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, যাদের আছে অনুসন্ধিৎসু মন আর ক্ষুরধার লেখনী। এদের অবদানে বৃদ্ধি পেয়েছে সাংবাদিকতার মান, বিশেষ করে বাংলায়। কিন্তু একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যানুসন্ধানী সাহসী এই তরুণ সহযোগীদের জীবনের ঝুঁকিও। সারা দেশে চতুর্দিকে যে অবক্ষয়, হতাশা এবং উদ্বেগ, তার মধ্যে মানুষ আজ আশার আলো দেখে এদেরই মাঝে। যাঁরা নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, যাঁরা সত্যিকার অর্থে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নন, বরং সাধারণ মানুষ তথা জাতির বিবেক। এরা নিশ্চয়ই আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের গৌরবময় ঐতিহ্য।

লেখক ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশের পরিচালক, বিশিষ্ট জনসংযোগ ব্যক্তিত্ব

www.pathagar.com

আঠারো তোপখানা– একটি ঠিকানা

সালেহ্‌ চৌধুরী

আঠারো নম্বর তোপখানা রোড– একটি ঠিকানা, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ঠিকানা। আর যথার্থ অর্থে আমাদের তথা ঢাকার সকল সাংবাদিকের ঠিকানা। সে কেবল এ জন্যেই নয় যে, আমরা এই প্রেস ক্লাবকে আমাদের দ্বিতীয় নিবাস (ইংরেজিতে আওয়ার সেকেণ্ড হোম) বলতে ভালোবাসি বলেই। আদতেও প্রেস ক্লাব আমাদের, ঢাকার সাংবাদিকদের ঠিকানা হিসেবেই ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল।

অনেক সময়ই দেখতাম, গ্রাম থেকে কারও আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিত জন ঢাকায় এসেছেন। নাম জানেন, জানেন সাংবাদিক– কিন্তু ঠিকানাপত্তর কিছুই বলতে পারেন না। ওরা সোজা চলে আসতেন প্রেস ক্লাবে। উদ্দিষ্ট সাংবাদিককে না পেলেও, তার হদিস পেতে কোনও অসুবিধে হতো না। আমাকে খুঁজতে আসা অনেকেও এভাবেই আমার অফিস কিংবা বাসায় পৌঁছে গেছেন।

বলছি 'সাংবাদিকদের ঠিকানা', এই সঙ্গে মনে হচ্ছে বিষয়টিকে কি সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে না? 'ঢাকা প্রেস ক্লাব' থেকে আজকের 'জাতীয় প্রেস ক্লাব' তো প্রকৃত অর্থে এই জনপদের সফল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও ঠিকানা হিসেবে কাজ করে এসেছে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রেস ক্লাবের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠতে শুরু করে, তার সার কথা হচ্ছে সংস্কৃতির বিচিত্র অঙ্গনের পুরোধা ব্যক্তিবর্গের মিলন তীর্থ। রাজনীতিক থেকে আমলা, সঙ্গীত-নাট্যকর্মী, কবি-সাহিত্যিক, চারুশিল্পী, অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ, এক কথায় সব অঙ্গনের সেরা মানুষেরা এই ক্লাবটির প্রতি প্রাণের টান অনুভব করতেন। নিয়মিতই তারা এ ক্লাবে আসা-যাওয়া করতেন। আর এর সুবাদে পারস্পরিক দেয়া-নেয়ায় সাংস্কৃতিক উত্তরণের পথ সুগম হয়ে উঠতো।

'ক্লাব' অর্থ তো সংঘ, সমিতি, মিলন কেন্দ্র। অভিধানে কিন্তু আরও একটি অর্থও আছে– 'মুদ্গর, লগুড়'। সোজা কথায় লাঠি। আমাদের প্রেস ক্লাব কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্থেও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। একটু স্ববিরোধী শোনালেও এ নিয়েও আমাদের গর্ব বোধ করার কারণ আছে।

এখানে বলে রাখা ভালো, ১৯৫৪ সালে তখনকার ঢাকায় মুষ্টিমেয় সাংবাদিকদের স্বপ্ন সফল করে যে প্রেস ক্লাবের গোড়াপত্তন হয়, তার পরিবেশটা খুব একটা সুস্থ বা প্রশংসনীয় ছিল

www.pathagar.com

না। বাংলাদেশে তখন চলছিল ৯২-ক ধারা, তথা গবর্ণরের শাসনের নামে এক ধরনের জঙ্গী শাসন। আপত্তিকর শাসনের আওতায় এই প্রেস ক্লাবের ফায়দা লাভের নজির কিন্তু এতেই শেষ না। আজকের প্রেস ক্লাব কমপ্লেক্স বাস্তবায়নের অর্থ যোগানোর অঙ্গীকার এসেছিল সামরিক শাসক থেকে 'হাঁ-না' ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে। আর সে অর্থ পাওয়া যায় পরবর্তী স্বৈরশাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছ থেকে।

এই ধরনের যোগাযোগ কিন্তু ক্লাবের সচেতন সদস্যদের নিজেদের সামাজিক অঙ্গীকার তথা দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মুসলিম লীগ, আইয়ুব শাহী থেকে এরশাদ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়েই প্রেস ক্লাব তথা তার সদস্যেরা বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে গেছেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে প্রেস ক্লাব থেকে পরিচালিত সাংবাদিকদের ভূমিকাকে অনেকেই শেষ কার্যকর আঘাত হিসেবে গণ্য করে থাকেন। একেই বলছি মিলন কেন্দ্রের লগুড় হয়ে ওঠা। আর এই সাহসী ভূমিকা বিভিন্ন সময় ক্লাবের উপর দুরাচারদের আঘাতও ডেকে এনেছে। আমাদের তৃপ্তি, ক্লাব নেতৃত্ব আর সদস্যেরা এতেও কখনওই মাথা নোয়াননি।

আঠারো তোপখানা রোড, এই ঠিকানাটা মনে এলেই যে ছবিটি চোখের সামনে প্রথম ভেসে ওঠে, তা কিন্তু আজকের বিশাল কমপ্লেক্স নয়– লাল রঙের একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। জাতীয় প্রেস ক্লাব কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সে বাড়িটা হারিয়ে গেছে। হারিয়ে না গেলেই ভালো ছিল! কেননা সেই বাড়িটারও একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল। এক কালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্যে নির্মিত সেই বাড়িটায় বাস করে গেছেন 'বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের' উদ্ভাবক সাহিত্য-সঙ্গীত রসিক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

জানি, হলে ভালো হতো, এমন অনেক কিছুই বাস্তবে হয় না। না চাইলেও অনেক কিছুকেই হারিয়ে যেতে দিতে হয়। তারপরও বলতে হয়, স্মৃতির পীড়ন সব সময় যুক্তির শাসন মানে না। সেই যে বলেছি, সমাজের সফল ক্ষেত্রের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের মিলন ক্ষেত্র, এর থেকে ক্রীড়াবিদেরাও বাদ ছিলেন না। বিশিষ্ট খেলোয়াড়েরা যেমন ক্লাবে আসতেন, তেমনি খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায়ও প্রেস ক্লাবের ভূমিকা ছিল গৌরবজনক। ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের ক্লাব উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। আর বাংলাদেশের দাবা-আন্দোলনকে আজকের স্তরে নিয়ে আসার পেছনে কোনও সংস্থা যদি কার্যকর অবদান রেখে থাকে, তার একটি প্রেস ক্লাব এবং অপরটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাব, তা মানতেই হবে।

আদি কাল থেকেই দাবা এই জনপদের এক প্রিয় খেলা। কিন্তু আধুনিক দাবা চর্চায় আমরা ছিলাম পিছিয়ে। শ্রদ্ধেয় দাবাগুরু, জাতীয় অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা তথা বাংলাদেশে আধুনিক দাবা আন্দোলনের গোড়াপত্তন ঘটালেও সেদিন পর্যন্ত দাবা আগ্রহী খেলোয়াড়দের খেলা বৈঠকখানায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, 'দাবাগুরু' অভিধাটির উদ্ভাবন আর প্রথম প্রয়োগ করেছিল এই ক্লাবেরই অন্যতম সদস্য আহমেদ নূরে

www.pathagar.com

আলম। ওই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠায় কার্যকর অবদান রাখে প্রেস ক্লাব আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাব।

ক্লাব দু'টিতে যে কেবল নিয়মিত দাবা চর্চা চলতো তাই না, প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে এ দু'টি ক্লাবের সুযোগ-সুবিধের ব্যবহারও ছিল অবাধ। সেই 'লাল বাড়ির' নিচের একটি কামরায় অনেকগুলো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়েদের জন্যে আয়োজিত তেমনি এক প্রতিযোগিতায় খেলতে এসেই আজকের খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার রাণী হামিদ প্রথমবারের মতো ক্রীড়ামোদী মহলের নজরে আসেন। এই আবির্ভাব তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথেও মদদ যুগিয়েছে সন্দেহ নাই।

তারও আগে শিশু প্রতিভা নিয়াজ মোরশেদ (পরে উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যাণ্ডমাস্টার) -কে তো এই ক্লাব তার নিজেরা একজন করে নিয়েছিল প্রায়। 'সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত' এই ক্লাবের কোনও সুযোগই কিশোর নিয়াজের না পাওয়ার ছিল না। ব্যাপারটা ঘটে এ ভাবে: প্রেস ক্লাবে বরাবরই এক-দু' প্রস্থ দাবা মওজুদ থাকতো। আগ্রহী সদস্যদের কেউ কেউ বারান্দায় দাবার আসর বসাতেন। এতে সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন এ দেশের প্রথম আলোকচিত্র সাংবাদিক মতি ভাই (প্যানোরমা স্টুডিওর মালিক)। মাঝে মধ্যে নগরীর নামী-দামী খেলোয়াড়েরাও এসে এসব আসরে ভিড়ে পড়তেন। দাবাগুরু তো তাঁর জীবনের শেষ দিকেও সেগুনবাগিচার বাসা থেকে টুকটুক করে হেঁটে প্রেস ক্লাবে এসে হাজির হয়ে যেতেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এলেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার আনাতোলি লুতিকভ। লাটভিয়ার (তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গ) লুতিকভই ছিলেন বাংলাদেশে আসা প্রথম গ্র্যাণ্ডমাস্টার। দাবা আন্দোলনে এ ছিল এক বড় ঘটনা। সমঝদার সংগঠন জাতীয় প্রেস ক্লাব এই দাবা ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জানায়। আর এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় একটি প্রদর্শনী খেলা। যাতে এক সঙ্গে তিরিশ জন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন গ্র্যাণ্ডমাস্টার লুতিকভ। আট বছরের শিশু নিয়াজও সে আসরে খেলতে বসেন। আর উনত্রিশ জন খেলোয়াড় পরাজিত হলেও নিয়াজ গ্র্যাণ্ডমাস্টারের সঙ্গে ড্র করে চমক সৃষ্টি করেন। কেবল দাবামোদীরাই নন, প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যই এই প্রতিভাবান শিশুটিকে আপন করে নেন। কিছু দিনের মাঝেই বেদনাদায়ক এক ঘটনা এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, নিয়াজের দাবা অনুশীলনের জায়গা পাওয়াও কঠিন হয়ে দেখা দিল। এ সময় প্রেস ক্লাব আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব সহযোগিতা না দিলে, দাবার জগতে ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই প্রতিভার বিকাশ কঠিন হতো, সন্দেহ নাই।

এ প্রসঙ্গে দাবা অন্তঃপ্রাণ মতি ভাইয়ের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। ক্লাবে দাবার আসর জমিয়ে রাখার পেছনে তার ভূমিকাই ছিল প্রধান। সঙ্গে থাকতেন তারই বন্ধু এবং তার মেহমান হিসেবে ক্লাবের প্রায় নিয়মিত সদস্য হয়ে ওঠা এন এইচ কামাল। এন এইচ কামাল যা খেলতেন, তার চেয়ে বেশি ছিল দাবা নিয়ে তার পড়াশুনা । ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ওদের সঙ্গে অনুশীলন করে নিয়াজ বেশ উপকৃত হয়েছেন।

মতি ভাই ছবি সরবরাহ করেও সাহায্য করতেন। তার প্যানোরমা স্টুডিও নিয়াজের জন্যে

www.pathagar.com

ছিল সদা উন্মুক্ত। বিদেশে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় ছবি সবই ওখান থেকে করে দিতেন। কখনও কোনও পয়সা নেননি। ঢাকায় দাবা চর্চার ভিত্তি প্রসারে যে প্রতিযোগিতাটি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তা হচ্ছে মহানগরী দাবা লীগ। প্রতিযোগিতাটি যখন চালু হয়, তখন একদিকে যেমন পর্যাপ্ত দল ছিল না, অন্যদিকে ছিল না এমন বড় প্রতিযোগিতা আয়োজনের মতো কোনও জায়গাও। প্রেস ক্লাব এই দুই অভাব মোচনেই এগিয়ে আসে। দল গঠন করে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের বারান্দা আর নিচের কামরাও ছেড়ে দেয়া হয় প্রতিযোগিতায় ব্যবহারের জন্যে। আজ ভাবতে অবাক লাগে, অমন বড় প্রতিযোগিতাকে ক্লাবের স্বল্প পরিসরে ঠাঁই দিতে গিয়ে সদস্যেরা কতো অসুবিধাই না ভোগ করেছেন! তবে এ নিয়ে তখন কাউকে মুখ কালো করতেও দেখিনি।

নিয়াজ মোরশেদের প্রতি ক্লাব কর্মকর্তা আর সদস্যেরা যে ভালোবাসা প্রদর্শন করেন, তাতে কার্যত আকর্ষণীয় এই খেলাটির প্রতি তাদের মমতাই প্রকাশ পেয়েছে। যার সেরা প্রকাশ ঘটে ১৯৮৬ সালে নিয়াজ মোরশেদের সংবর্ধনায়। সদ্য কৈশোর ছাড়ানো নিয়াজ তখন গ্র্যাণ্ডমাস্টার খেতাব পেয়ে গেছেন। এ কেবল নিয়াজের ব্যক্তিগত মর্যাদা অর্জনই ছিল না, এ ছিল ব্যক্তি সাফল্যের পথ ধরে গোটা জাতিরই অভাবিত এক গৌরব অর্জন। মধ্য প্রাচ্য থেকে বার্মা আর মঙ্গোলিয়া থেকে শ্রীলংকা নিয়ে গঠিত দাবা-অঞ্চলে নিয়াজ মোরশেদই হচ্ছেন প্রথম গ্র্যাণ্ডমাস্টার। সঙ্গত কারণেই প্রেস ক্লাবেও তাতে আনন্দের সাড়া জাগে। আর এ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নবীন গ্র্যাণ্ডমাস্টারকে দেয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সদস্যের মর্যাদা। নিয়াজের আগে কোনও ক্রীড়াবিদকে এমন মর্যাদা দেয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য যে, একই অনুষ্ঠানে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাসকেও সংবর্ধনা আর সম্মানিত সদস্যের মর্যাদা দেয়া হয়। এ ঘটনায়ও খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রেস ক্লাবের আগ্রহই প্রকাশ পায়।

সেই 'লাল বাড়িটা' থেকে সংস্কৃতি বিকাশে সহযোগিতার যে ধারা শুরু হয়, এ সবই তারই পরিণতি। আমরা অবশ্যই এ নিয়ে গর্ব করতে পারি। করিও। একই সঙ্গে একটা ভাবনা মনকে পীড়িতও করে। তা হচ্ছে এই, এক কালে সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণকর কর্মের আর ভাবনার ঠিকানা হয়ে ওঠা ছোট্ট বাড়িটার বিশাল বিস্তার ক্রমেই যেন তাকে সীমিত করে তুলছে। গুণীজনের পদভারে ক্লাব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠতে এখন আর দেখা যায় না বললেই চলে। দাবার কথাই যদি ধরি, ড. কাজী মোতাহার হোসেনের মতো ব্যক্তিত্ব ক্লাবে এসে দাবা খেলছেন কিংবা বঙ্গবন্ধুর মতো সরকার প্রধান ক্লাবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে দেখতে নিজেও তাতে জড়িয়ে পড়ছেন, এমন ঘটনা কি আজ কল্পনাও করতে পারি?

প্রেস ক্লাব দীর্ঘদিন তার ঐতিহ্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে পেরেছে। অনেকেই মনে করেন, এর মূলে কাজ করেছে সাংগঠনিক ব্যাপারে তার কিছু রক্ষণশীল নীতি। সাংবাদিকদের জন্যেই ক্লাব, কিন্তু সাংবাদিক মাত্রেরই এই ক্লাবে প্রবেশের পথ সহজ ছিল না। একটা কঠিন প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে যেতে হতো। সদস্যপদ প্রদানের এই কড়াকড়ি যে কখনও দুঃখজনক ঘটনার জন্ম দেয়নি, তাও না। যেমন নিয়ম ছিল, একজন কেউ 'কালো গোল্লা' (ব্ল্যাক বল) ছুঁড়লেই সদস্যপদের আবেদন খারিজ হয়ে যাবে। এই নিয়মের কবলে পড়ে কবি শামসুর

www.pathagar.com

রাহ্মানের মত গুণী ব্যক্তিত্বের প্রার্থিতাও খারিজ হয়ে যায়। পরে চেষ্টা করেও তাঁকে সদস্য হতে রাজি করানো যায়নি।

আরেকটা নিয়ম ছিল (বা আছে) কেবল সাংবাদিকই সদস্য হতে পারবেন। প্রয়াত কবি ও জনপ্রিয় কলাম লেখক (কালো প্যাঁচার ডায়েরি) আবদুল গণি হাজারী অ্যাল হেলাল প্রকাশনায় (দৈনিক অবজারভার গ্রুপ) ব্যবস্থাপনার উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাজটি যেহেতু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত, তাই চাইলেও তাঁর পক্ষে সদস্য হওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যাপারটা তাঁর মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার ঘটায়। যা জন্ম দেয় ব্যঙ্গাত্মক হলেও চমৎকার একটি কবিতার। আবদুল গণি হাজারীর অন্যতম সেরা এ কবিতা 'প্রেস ক্লাবে আমরা ক'জন' গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'এক মুঠো ধান' এ। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেও আজ বেশ মজা লাগে! সতত পরিবর্তনের মাঝ দিয়েই জীবনের এগিয়ে চলা। চিরাচরিত এ পথ ধরেই প্রেস ক্লাবও এগিয়ে চলেছে। হয়তো এর অনেক কিছুই সময় সময় বেদনার্ত করে, তবু শত পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয় সার সত্য হচ্ছে, প্রেস ক্লাব আমাদের ঠিকানা- আনন্দঘন অস্তিত্বের মিলনায়তন।

একটা কথা অবশ্য বলতেই হয়। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে সত্য। তবে কোথায় যেন একটা ফাঁকও ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে। সদস্যদের মধ্যেকার সংহতি বোধে কেমন যেন ভাটা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই তো প্রবীণ সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের সম্ভবত মাত্র দু'জন (কে জি মুস্তাফা ও এ বি এম মূসা) এখনও আমাদের মাঝে বর্তমান। আর অনেক পরে এসেও আমরা যারা প্রবীণত্বের সীমায় পৌঁছে গেছি, তাদের সঙ্গেও নবীন সদস্যদের বয়সের দূরত্ব প্রজন্ম-কালের। একাত্মবোধের ঘাটতির কারণ কি এটাই? হতেও পারে। তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষের এ নিয়ে ভাবা দরকার। দরকার এমন কিছু তৎপরতার, যার মাধ্যমে পারস্পরিক জানাশোনা আর মমত্ববোধ বিকশিত হতে পারে। এমন একটা মনোভাবের অভাব ঘটলে প্রেস ক্লাবের ঐতিহ্য বিকাশ তো দূরের কথা, তা বজায় রাখার কল্পনাও হবে দুরাশা।

লেখক মুক্তিযোদ্ধা, অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক

www.pathagar.com

পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে কিছু কথা

আবদুল মতিন

১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চের মধ্যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে তারা মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। অপর পক্ষে ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি দখল করে। প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজয় বরণ করেন। ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের নেতা এ কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের কুক্ষিগত কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এই পরাজয় মেনে নিতে পারেনি।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পূর্ববঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের ১০ দিন আগে (২৩ মার্চ) যুক্তফ্রন্ট বিরোধী মহলের প্রচারণার ফলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে নিয়োজিত বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে এক ভয়ানক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৫ মে নারায়ণগঞ্জের অদূরবর্তী আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দ্বিতীয় দাঙ্গা সংঘটিত হয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কুচক্রী মহল মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হক সাহেবের কলকাতা সফরকালে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। নিউইয়র্ক টাইমস্ এর রিপোর্টার ক্যালাহান প্রেরিত এক রিপোর্টে ফজলুল হক সাহেবের বক্তব্য যুক্ত-বাংলার সমর্থনসূচক বলে ব্যাখ্যা করা হয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার ফজলুল হক সাহেবকে করাচীতে ডেকে পাঠায়। ৩০ মে সন্ধ্যাবেলা ফজলুল হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিসভার কয়েক জন সদস্য করাচী থেকে বিমানযোগে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার পর এক বেতার-ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ফজলুল হক সাহেবকে পাকিস্তানের শত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ববঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল বলেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গ সরকারকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। ৩১ মে ফজলুল হক সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা বিমানে থাকা কালেই পূর্ববঙ্গে সংবিধানের ৯২-ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়।

মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা ঢাকায় এসে নতুন গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নতুন চীফ সেক্রেটারি নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে। এন. এম. খান প্রথম থেকেই সম্পাদকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তৎপর হন।

www.pathagar.com

দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বার্তা সংস্থার সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির এক বৈঠকে তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থে পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন প্রবর্তনের সমালোচনা করা চলবে না। সরকারী নীতির সাধারণ সমালোচনা সহ্য করা হবে। তবে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও প্রাদেশিক গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা পরিহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকদের সাহায্য করার জন্যে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বিবেচনা করতে তিনি রাজী আছেন।

ইতোপূর্বে গঠিত প্রেস ক্লাবের জন্যে একটি বাড়ি ভাড়া কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করার জন্যে প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রধান সাংবাদিক খায়রুল কবীরের বাসায় মিলিত হন। এই বৈঠকে প্রেস ক্লাবের জন্যে একটি বাড়ির ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারির সাহায্য প্রার্থনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর যাঁরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক 'সংবাদ' এর বার্তা সম্পাদক সৈয়দ নূরুদ্দিন, পিটিআই এর প্রতিনিধি পি এম বালান্ এবং 'দি স্টেটস্ম্যান' এর প্রতিনিধি আবদুল ওয়াহাব।

প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে প্রেস ক্লাবের জন্যে প্রয়োজনীয় বাড়ির ব্যাপারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার ফলে অনেকগুলো সরকারী বাড়ি খালি পড়ে ছিল। তার মধ্যে ১৮ নম্বর তোপখানা রোডের বাড়িটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় সেটিকে প্রেস ক্লাবের জন্যে বরাদ্দ করার অনুরোধ জানানো হয়। এই বাড়িতে এককালে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী আবু হোসেন সরকার থাকতেন। বাড়িটি যথাসময়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের নামে বরাদ্দ করা হয়। (১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংবিধান সংশোধন করে পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবকে জাতীয় প্রেস ক্লাব নাম গ্রহণ করা হয়)।

উল্লিখিত বরাদ্দ লাভের ব্যাপারে খায়রুল কবীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এন. এম. খানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তখন প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও মি. খান তাঁর মাধ্যমে সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫১ সালে তিনি জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে প্রাদেশিক সরকারের তথ্য দফতরে স্বল্পকালীন চুক্তিভিত্তিক জয়েন্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদাসম্পন্ন স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগাদান করেন। 'ইত্তেফাক' এর সম্পাদক মানিক মিয়া (তফাজ্জল হোসেন) খায়রুল কবীরকে প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কবীর সাহেব বলেন, তথ্য দফতরের কর্মকর্তা বলে তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। মানিক মিয়া বললেন, 'তাহলে কে প্রেসিডেন্ট হবেন?' কবীর সাহেব বললেন, 'আপনি প্রেসিডেন্ট হন।' মানিক মিয়া কিছুতেই রাজী হলেন না। কবীর সাহেব তখন 'আজাদ' এর উপ-সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ-র নাম প্রস্তাব করে বলেন, 'তিনি রাজী হলে তাঁর পত্রিকার সাংবাদিকরাও যোগ দেবেন। আমাদের সদস্য-সংখ্যা বাড়ানো দরকার।' মানিক মিয়া বললেন, 'তাহলে ক্লাবে ট্রেড ইউনিয়ন হবে।' কবীর সাহেব বললেন, 'তাঁকে প্রেসিডেন্ট করলে ট্রেড ইউনিয়ন হবে না।' মুজীবুর রহমান খাঁকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি মানিক মিয়ার মতোই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'এখানে ট্রেড ইউনিয়ন হবে।' কবীর

www.pathagar.com

সাহেব বললেন, 'আপনি প্রেসিডেন্ট হন এবং যাতে ট্রেড ইউনিয়ন না হয়ে পেশাগত ক্লাব হয়, তার ব্যবস্থা করুন।' অবশেষে মুজীবুর রহমান সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন। (মূল: ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে খায়রুল কবীরের নেয়া সাক্ষাৎকার)।

প্রেস ক্লাবের প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ছিলেন মুজীবুর রহমান খাঁ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। আমি (বর্তমান লেখক) ছিলাম যুগ্ম-সম্পাদক। পিটিআই এর প্রতিনিধি পিএম বালান্ ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। জহুর সাহেবের কর্মব্যস্ততার জন্যে প্রায় প্রথম থেকেই আমি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। ক্লাবের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে এপিপি'র এম এ আজীম সভাপতি, সৈয়দ নূরুদ্দিন সহ-সভাপতি এবং পি এম বালান্ কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। আমি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্লাবের লাউঞ্জ ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ১৯ জুন পাকিস্তানে নিয়োজিত ভারতীয় হাইকমিশনার সি সি দেশাইকে এক প্রীতি-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এন এম খান আশা করেছিলেন, প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির সদস্যরা এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকরা সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে সরকারী বাধা-নিষেধ নির্বিচারে মেনে নেবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সে আশা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আরোপিত নানা রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিধি-নিষেধের খবর প্রকাশ করা উচিত হবে না এবং সরকার-বিরোধী আন্দোলনের খবর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে প্রকাশ করা কেন জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন, সে সম্পর্কে চীফ সেক্রেটারির বক্তব্য ধৈর্য ধরে প্রেস কনসালটেটিভ কমিটির সদস্যদের শুনতে হয়েছে। তাঁর 'উপদেশ' অধিকাংশ সম্পাদক নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। দু'জন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন সম্পাদক সব সময় স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দেন। তাঁরা হলেন জহুর হোসেন চৌধুরী ও মানিক মিয়া। তাঁরা কোনও কোনও ব্যাপারে যুক্তি-তর্ক দিয়ে চীফ সেক্রেটারিকে তাঁর মত বদলাতে বাধ্য করেন। মানিক মিয়া কখনও কখনও সরকারী অনুরোধ উপেক্ষা করেছেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) অঘোষিত দ্বিতীয় স্ত্রী সম্পর্কিত খবর করাচীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর, ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশ না করার জন্যে 'অনুরোধ' জানানো হয়েছিল। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পরদিন প্রথম পৃষ্ঠায় সংবাদটি ছেপেছিল 'বক্স আইটেম' হিসেবে।

লণ্ডন, ১২ জুলাই ২০০৪

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ও দ্বিতীয় কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক

www.pathagar.com

আমার লাল দালানের প্রেস ক্লাব

শেহাবউদ্দিন আহমেদ (নাফা)

সময়টা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ১৯৬৮ সাল। কবি আল মাহমুদের ভাষায়, 'এ কেমন বঙ্গদেশ উত্থান রহিত/নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না!.....শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা/আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি/নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবে না/আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা ঠাকুর!' আইয়ুব আমলে ছিল এমনিতর বাংলাদেশ। তোপখানা রোডের লাল দালানটার প্রতি ছিল আমার দুর্নিবার আকর্ষণ, বাসে করে যাবার পথে দারুণ টানতো। তখন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ, পরবর্তীকালে ক্লাব সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী ভাইয়ের সঙ্গে সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ' থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুয়েকবার ক্লাবে যাওয়ার পরও কৌতূহল মেটেনি, ছায়াঘেরা এই লাল দালানটি সম্পর্কে।

দেশ স্বাধীন হলো। বাংলাদেশ আর উত্থান রহিত রইলো না। বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসে ফের হাতেখড়ি হলো সাংবাদিকতায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক মরহুম হাসান সাঈদ নিয়ে এলেন আমাকে, বর্তমানে নিউইয়র্ক প্রবাসী শাহাবুদ্দিন আহমেদ শাবুর মাধ্যমে বার্তা সংস্থা এনায়। একই বিভাগের ছাত্র আমরা দু'জনেই। কাজ পেতে অসুবিধে হলো না। এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে চাকরি আর পড়াশোনা দুটোই চালানোর পক্ষে কঠিন সময় তখন। রাতের পালায় ৮টা থেকে ১২টা অবধি কাজ করা খুব কষ্টকর ছিল। বিকেলের ক্লাস শেষে এক ঘন্টা লাইব্রেরিতে পড়া, নোট তৈরি করে ৭টায় বেরিয়ে, পায়ে হেঁটে বিজয় নগরে এনায় ৮টায় ডিউটি। সে এক কঠিন অভিজ্ঞতা! কখনও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখান দিয়ে অথবা বর্তমান শিক্ষা ভবনের অফিসের পাশ দিয়ে হেঁটে আসা-যাওয়ার পথে হাতছানি দিতো লাল দালানটি, একটু চা-নাস্তার জন্যে।

একদিন অনেক দেরি হয়ে গেল লাইব্রেরিতে। একরকম ছুটেই চলেছি অফিসে। বাংলা একাডেমী পার হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে এসে আর পারলাম না। চায়ের তেষ্টায় মাথা ভারী হয়ে আছে। শাদা কাঠের ফটক দিয়ে ঢুকে গেলাম ক্লাবে। এর আগে অবশ্য সহকর্মী গাজীউল হাসান খানের সঙ্গে চা-নাশতা খেয়ে গেছি। সে পরিচয়েই ঢুকে পড়লাম। বসার ঘরের পাশে খাবার ঘর, এরপর চা তৈরির ঘর। সেখানে নিঃশব্দে চা তৈরি করছিলেন ভারী চেহারার আবদুল হক সাহেব। ইনি এর আগেও চা পরিবেশন করেছিলেন আমাদের। তাই সাহস করে চাইলাম, 'এক কাপ লেবু চা দিন।' ব্যস্ত হক সাহেব তাকালেন আমার দিকে। আমার ঝাঁকড়া লম্বা চুল আর গোঁফের চেহারা দেখে এক মিনিট তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি মেম্বার?' 'না।'

www.pathagar.com

জবাবে বললেন, 'হবে না। মেম্বার ছাড়া খাবার, চা দেয়া নিষেধ।' থমকে দাঁড়ালাম দৃঢ় কণ্ঠের জবাবে। ফের বললাম, 'আমাকেও চা-নাশতা খাইয়েছেন ওইদিন সাঈদ সাহেব আর গাজীউল হাসান সাহেবের সঙ্গে।' জবাব এলো, 'হ্যাঁ, তবে মেম্বার ছাড়া হবে না।' প্রশ্ন করলাম, 'ঠিক আছে, চা দেবেন কিনা?' জবাব এলো, 'না।' আমি নিঃশব্দে পিছিয়ে এলাম দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সামনে থেকে। ঠিক করলাম, সদস্য হয়ে আসবোই। এরপর বন্ধু জাহাঙ্গীর হোসেন ও সহকর্মী আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে আরও কয়েকবার আসার পরও সদস্য হবার পথ পাইনি। কারণ তখনও আমার চাকরি স্থায়ী হয়নি। এরপর রেশমা, মেঘনা, গুলনার হোটেলের দুধ চা আর নাশতা খেয়ে কেটে গেল এক বছর। ১৯৭৩ সালে স্থায়ী হবার পর জাহাঙ্গীর বললো দরখাস্ত করার জন্যে। এপ্রিলে দরখাস্ত দেবার পর দেরি হলো না সদস্য পদ পেতে। আবদুল হক সাহেব হেসে দ্বিমত করেননি চা-নাশতা দিতে। শরীফ মিয়া, মধুর ক্যান্টিন ছেড়ে প্রেস ক্লাব হলো নতুন ঠিকানা। অবশ্য তখন পায়ে হাঁটা বাদ দিয়ে বাবার পুরনো সাইকেল চালাই। তা নিরাপদে বারান্দায় রাখার জায়গা ছিল। ক্লাবেই কাটতো বেশি সময়। এরপর জড়িয়ে গেলাম ইউনিয়নের কাজে।

অস্থির সময় সত্ত্বেও তখনকার ক্লাবের পরিবেশ বদল হয়নি। সদস্য ছাড়া কেউ আসতো না। শ্রদ্ধেয় মরহুম আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরীর মত প্রবীণ সদস্যরা এলে বসার ঘরের হুল্লোড় থেমে যেতো। থেমে যেতো খাবার ঘরের হুলুস্থুল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের বসার জায়গা করে দিতো। এতে শিখলাম পেশার অগ্রজদের সম্মান কতটুকু করতে হয়।

এরপর কেটে গেল অনেক সময়। আস্তে আস্তে পরিচয় হতে লাগলো অনেকের সঙ্গে। তখন আমাদের কাছে রূপকথার নায়ক ছিলেন এনায়েতুল্লাহ খান, তাঁর রচনা ছিল হলিডেতে অবশ্যপাঠ্য, প্রতি সপ্তাহে। তিনি এলে সবাই ভিড় করে দাঁড়াতাম কথা বলা ও শোনার জন্যে। আজ মনে পড়ছে অনুজপ্রতিম ফেরদৌস আলম দুলালের কথা। দুলাল ও দেলোয়ার হোসেন, দু'জনেই আজ আর নেই! ঘাতকের বুলেট নিয়ে গেছে দুলালের প্রাণ '৮১ সালের এক দিন। তখন আমরা নতুন দালানে চলে এসেছি। দুপুরে মুরগী কারি শাদা পোলাও পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে রাতের খাবার রেখে দেয়ার অর্ডার দিল। সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসার কথা বলে দুলাল হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। হাসপাতালে শিশুর মত দেলোয়ার আমাকে জড়িয়ে কেঁদেছিল। আর আমার চোখের অশ্রু কেউ থামাতে পারেনি।

আমিও থামাতে পারিনি বোনের মত সহকর্মী রাশেদা আমিনের চোখের জল। তাঁর স্বামী আমিন আহমদ চৌধুরী অকালে প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম। দেলোয়ারও চলে গেছে ক'দিন আগে ফাঁকি দিয়ে সবাইকে, হৃদরোগে। দুলাল আর লাল দালান রয়ে গেছে আমার স্মৃতিতে চির ভাস্বর। ১৯৭৫ সালে বাকশালে ভর্তি করানোর সময় এক সন্ধ্যায় ক্লাবে সিঁড়ির পাশে শিউলি গাছের তলায় সে বলেছিল,– নাফা ভাই, আপনি সর্বহারা পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। আপনি যোগ না দিলে রেহাই নেই! কথাটা ছিল নির্মম বাস্তবতা। কারণ এর আগে একদিন এনা অফিসে বাকশাল গঠনের আগে হঠাৎ প্রধান সম্পাদক গোলাম রসুল মল্লিক চিৎকার করে বললেন, আপনাদের আর রাখা যাবে না। আজ এনএসআই-এর লোক এসেছিল– আপনি, গাজীউল হাসান খান, হাসান সাঈদ ও টেলিপ্রিন্টার অপারেটর এমরান

www.pathagar.com

(অবাঙালী) সম্পর্কে খোঁজ নিতে। আপনারা 'এ্যান্টি ন্যাশনাল এলিমেন্ট' তাই। সব সংগ্রহ করা হচ্ছে'। দুলালও আঁচ করতে পেরেছিল। তাই সাবধান করে দিয়েছিল। পরের কাহিনী আর বলতে চাই না। বাকশালের সদস্য হওয়ার খাতায় আমি সই না করে বারান্দায় আর একজন সংগ্রাহককে বলেছিলাম, 'আপনি লিখে নিতে পারেন নাম। আর গণভবনে যাব না যোগদানে।' সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে অসহায় সহকর্মীদের নাম লিখে নেয়ার কাহিনীর পেছনের নির্মমতা রয়ে গেছে অব্যক্ত, না বলা কাহিনীর মতো। জানি, সেদিনকার নাম সংগ্রাহকরা অসন্তুষ্ট হবেন। যাদের নাম আপনারা সংগ্রহ করেছিলেন, তারা কি সত্যিই নিজেরা নাম দিয়েছিলেন স্ব-ইচ্ছায়? না কি প্রচ্ছন্ন চাপ ও ভীতির কারণে? দুলাল ছাড়া অন্য বন্ধুরাও ভয়ে কিছু বলতে পারেনি সেদিন। সহকর্মী খন্দকার মনিরুল আলমের (পরে ক্লাব সভাপতি) উপদেশে ছিঁড়ে ফেলিনি বাকশাল সদস্যপদ আবেদনের ফর্ম। কার ইচ্ছায় তা হচ্ছে এবং বাধা দেয়ার পরিণতি কি হবে, তা মনির বলে দিয়েছিল পরিষ্কার করে। মনির তখন কাজ করতেন বাংলাদেশ টাইমসে। তাই তার জানা ছিল কিভাবে বাকশালে যোগদানের পট তৈরি হয়েছিল টাইমসের বৈঠকে, কার নির্দেশে। তখন মরহুম শেখ মনি ছিলেন টাইমসের সম্পাদক ও যুবনেতা।

এনায়েতুল্লাহ খান তখন কারারুদ্ধ– হলিডেতে নিবন্ধ প্রকাশের দায়ে। তাঁর মুক্তির জন্যে তদানিন্তন রাষ্ট্রপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আবেদনের স্বাক্ষর অভিযানকে রূপান্তর করা হয়েছিল বাকশালে যোগদানের প্রার্থনায়। লাল দালানের ভাঙা স্তূপে হারিয়ে গেছে সেদিনের অব্যক্ত কাহিনী। নির্মম সত্যের সেই বাস্তবতায় চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্যে সেদিনের সেই নিষ্ঠুর যন্ত্রণা তারা কেউ ভুলতে পারবেন না। এমন স্তালিনীয় ঘটনা যেন আর না ঘটে! আমরা পারিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। তার জন্যে আমার দুঃখ রয়ে গেছে। থাকবেও চিরদিন।

স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে ১৯৭৩ সালের পয়লা জানুয়ারি ইউসিস ভবনের সামনে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলি বর্ষণের ঘটনা। লাল ভবনের বারান্দার গোল কাচের জানালা ভেদ করে আসা গুলিতে মাথা ছড়ে গিয়েছিল বন্ধু সহকর্মী আলোকচিত্র গ্রাহক সাংবাদিক রফিকুর রহমানের। সেই গোল জানালাটি শাল কাঠের সিঁড়ির পাশে ছিল। বহু স্মৃতি নিয়ে চলে গেছে সিঁড়িটা। দালান ভাঙার সময় বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল তা। তার সঙ্গে পুরোনো দেয়াল ঘড়ি। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে ওটি রেখে দেবার জন্যে অনেক মিনতি করেও সফল হতে পারিনি। সেই ব্যর্থতার দায় ভার বহনের দুঃখ নিয়েই চলতে হয় এখনও। ১৯৭৯ সালের সেই দিনগুলো আজও আমাকে তাড়া করে। শ্রমিকেরা গাঁইতি দিয়ে ভেঙে ফেলছে প্রিয় লাল দালানটি, যার গায়ে ছিল মর্টার শেলের ক্ষত, দোতলায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনীর আক্রমণের জ্বলজ্বলে চিহ্ন। যার ক্ষত এখনও বহন করছেন শ্রদ্ধেয় অগ্রজ ফয়েজ আহমদ। দালান ভাঙার সময় অনেক যুদ্ধ করে রেখে দিতে পেরেছিলাম বারান্দার সিঁড়ির সামনের শিউলি গাছটি। সেটিও আজ আর নেই। রেখে দিতে পেরেছিলাম গেটের কামিনী গাছ দুটো। শাদা লোহার স্তম্ভ দুটো মাঝখানের বাগানে। করাতের ছোবল থেকে বেঁচে গেছে ঋজু দেবদারু, আম এবং কড়ুইয়ের

www.pathagar.com

সারি। অতীত শ্যামলিমার সাক্ষী হিসেবে। হারিয়ে গেছে উলট কম্বল। মালি কেশবলাল যদিও চলে গেছে চিরতরে। তার যত্নে ছিল গাছটি, মালি রামদাসের সাহায্যে। আর বর্ষার আষাঢ়ের বার্তা বাহক কদম বৃক্ষটি। তার জন্যে নির্মাতাদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। পরে ১৯৮৪ সালে স্বল্প সময়ের জন্যে লণ্ডনে চলে যাওয়ার পরও ভুলতে পারিনি এসব বৃক্ষের স্মৃতি। এক সফরে লণ্ডনে আগত শ্রদ্ধেয় সভাপতি গিয়াস কামাল চৌধুরী, সম্পাদক ফাজলে রশীদ ও অনুজপ্রতিম আলমগীর হোসেনকে বলেছিলাম, দেবদারুর সারি যেন রক্ষা করা হয়, সময়মত ছেঁটে দিয়ে। এরপর, গড়ে উঠলো নতুন দালান। হারিয়ে ফেলেছি অকৃত্রিম সুহৃদ অগ্রজ, খ্যাতিমান কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহকে– যাঁর আগ্রহে বহু কাজ করতে পেরেছিলাম, ড্রাই লাঞ্চ চালুর ব্যাপারে। রন্ধন শিল্পী আবদুল হামিদ মিয়াও চলে গেছেন পরপারে। যে রন্ধন শিল্পীর হাতের নৈপুণ্যে আর সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ভাই এবং আতিকুল আলমের শক্ত সমর্থন নিয়ে একে একে ক্লাবের মেনুতে সংযোজন করতে পেরেছিলাম কবুতরের রোস্ট, ফ্রায়েড রাইস ও থাই স্যুপ, স্বল্প মূল্যে। আর সামুদ্রিক মাছ দিয়ে তৈরি ফিশ কেক, ফ্রাইসহ স্মোকড হিলশাসহ আরও অনেক খাবার। হামিদ মিয়ার স্মৃতি বেঁচে থাকবে স্যুপ আর আলুর চিপ্‌সের মাঝে। তার শিক্ষানবীশরা ধরে রেখেছেন তা।

চলে গেছেন চিজ টোস্ট উচ্চারণ করতে না পেরে সিস টোস্ট বলা ওয়াজিউল্লাহ মিয়া। স্মিতহাস্যে খাবার পরিবেশন করতেন। তাকে উত্তেজিত হতে দেখিনি কখনও। লাল দালান আর ওয়াজিউল্লাহ মিয়া এক ও অভিন্ন। হারিয়ে ফেলেছি অকৃত্রিম সুহৃদ রোউফুল হাসান ও মোজাফফর হোসেন মানিককে। চলে গেছেন সংবাদ চিত্রশিল্পী মোজাম্মিল হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন বুলু ভাই এবং মোকাদ্দেস আলী ওরফে মোকা ভাই। চিত্রশিল্পী আমানুল হক রঙিন ছবিতে ধরে রেখেছিলেন লাল দালান ভাঙার আগেকার স্মৃতি। জানি না সেসব ছবি আজ কোথায়! কেউ যদি রেখে থাকেন, দয়া করে আশা করি ক্লাবকে দিয়ে দেবেন। প্রেস ক্লাবের ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্মৃতি বেঁচে থাকবে সে ছবিগুলোর মাঝে। লাল দালানের স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, যদি আজ মনে না করি আমাদের প্রহরী কুকুরের কথা, যাকে বন্ধু বি ডি মুখার্জী ডাকতেন টমি বলে। লাল ভারী শরীর নিয়ে সে ঘুরে বেড়াত ক্লাবময়। দুর্বৃত্তদের দায়ের কোপে আহত হয়ে সে প্রাণ হারায়। চিকিৎসা করানোর পরও বাঁচানো যায়নি টমিকে। ওকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ডগ ট্যাগ এনে দেয়া হয়েছিল ডগ স্কোয়াডের হাত থেকে রক্ষার জন্যে। বন্ধুবর আহমেদ নূরে আলম এনে দিয়েছিল ছোট টমিকে। শাদা হাউণ্ড জাতীয় সেই কুকুরটিকে অনেকে পছন্দ না করলেও রাতে ক্লাব রক্ষায় তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আমি দেশের বাইরে ছিলাম তখন।

এই স্মৃতিচারণে অজান্তে, অজ্ঞাতে যদি কারও মনে আঘাত লেগে থাকে তাহলে ক্ষমা করবেন। অনুজপ্রতিম হাসান হাফিজের চাপে এ লেখা শেষ করতে পারছি আজ। আমার লাল দালানের প্রেস ক্লাব স্মৃতির পর্দায় বেঁচে থাক চিরকাল। সদস্যদের কাছেও চিরদিন সেসব মধুর স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকুক।

লেখক বাসসের বিশেষ সংবাদদাতা

www.pathagar.com

কিছু সময় কিছু অভিজ্ঞতা

শফিকুর রহমান

প্রেসক্লাব আর সেই প্রেস ক্লাব নেই! এ আক্ষেপ অনেকের। এর পেছনে যুক্তি যে একেবারেই নেই, তা নয়। জাতীয় রাজনীতির টানাপোড়েন প্রেস ক্লাবকেও এক অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। আগের সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ নেই, লাউঞ্জে আড্ডার টেবিলগুলো ভাগ হয়ে গেছে, আড্ডার মুখগুলো যার যার লাইন মতো বসছে, এ পরিস্থিতি কারও কাম্য নয়।

আজকাল আমরা ক্লাবে ঢুকে প্রথমে দেখি কোন টেবিলে বা কোন সোফায় কে বসেছে, তারপর মনের মানুষ যেখানে আছে, তার পাশে গিয়ে বসি। না পেলে একা এক কোণে বসে অপেক্ষায় থাকি, কখন আসবে মনের মানুষটি। মাঝে মাঝে এ পরিবেশ অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু একে এড়ানোও যাচ্ছে না। আমরা ক্লাবে যাই, যেতে হয়। এ ছাড়া যে যাবার আর জায়গা নেই। ব্যাচেলরদের জন্যে তো প্রেস ক্লাব এক আইডিয়াল জায়গা! যেখানে কেবল আড্ডা-গালগল্পই হয় না, লেখাপড়া-খেলাধুলা, সকালের চা-নাস্তা, দুপুর-রাতের খাবার, সোফায় সুখনিদ্রা সবই চলে। একটা কথা আছে যে কারণে অনেকের আর বিয়েই করা হলো না। তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়।

প্রেসক্লাবকে আমরা আমাদের সেকেণ্ড হোম বলে থাকি। কাজ শেষে বা কাজের ফাঁকে এখানে এসে দু'দণ্ড নিঃশ্বাস ফেলা, পেশা থেকে জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা, টিভিতে ক্রিকেট-ফুটবল-টেনিস নিয়ে উত্তেজনা, ক্লাব ও ইউনিয়নের নির্বাচন এলে তো কথাই নেই, রীতিমতো জমজমাট। যদিও ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত এবং একই মনের মানুষদের মধ্যেই একেক ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে, তারপরও এ নিয়ে উত্তেজনার কমতি নেই। ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়ে কখনও কখনও এমন অবস্থারও সৃষ্টি হচ্ছে যে, দীর্ঘদিনের মনের মানুষগুলোর মধ্যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। তবে স্বস্তির ব্যাপার হলো, ক্লাব এক আছে। এক সময় ছিল যখন আমরা ক্লাব সদস্যরা এক পরিবারের সদস্য ছিলাম। আজ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঢিলেঢালা ঐক্য আছে।

আমরা যে উত্তরাধিকার বহন করছি, তার সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির অনেক ফারাক। একটা গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তির ওপর ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকে মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সৈনিক। পাঁচ দশক ধরে সাংবাদিকতা ও তথা বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতার

www.pathagar.com

লড়াই, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল এই প্রেস ক্লাব। পেশার মর্যাদা, রুটি-রুজির আন্দোলনে সাংবাদিকদের ঐক্য ছিল সুদৃঢ়। প্রাচীনতম বাংলা দৈনিক আজাদ রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এবং সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯৬১ সালে সামরিক স্বৈরাচার আইয়ুবের প্রেস সেন্সরশীপের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথে জঙ্গী মিছিল বেরিয়েছিল এখান থেকেই। ১৯৬৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে মুক্ত সাংবাদিকতার তিন পথিকৃৎ- দৈনিক অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম, দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী এই প্রেস ক্লাবে বসেই আলোচনা করে 'পূর্ববাংলা রুখে দাঁড়াও' শিরোনামে ভাষায় বক্তব্যে অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিলেন। একই সঙ্গে এই শিরোনামের ব্যানার নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পুরনো ঢাকায় দাঙ্গা-বিরোধী মিছিল হয়েছিল। আজ সেই আজাদ পত্রিকাও লুপ্ত, সেই পথিকৃৎরাও কেউ বেঁচে নেই।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসন থেকে আমরা মুক্ত হলাম। দীর্ঘ আন্দোলন লড়াই শেষে একাত্তরের দুনিয়া কাঁপানো এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করলাম। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা। সাংবাদিকও রয়েছেন বেশ কয়েক জন। সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, খন্দকার আবু তালেবসহ শাহাদত বরণকারী সাংবাদিকদের নামের তালিকা ক্লাবের দেয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে।

আমরা স্বাধীনতা পেলাম, কিন্তু সামরিক স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেলাম না! ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর আবার সামরিক শাসন চেপে বসলো। পাকিস্তান আমলের মতো আবার লড়াই করতে হলো। ১৯৭৮ সালে প্রেস ক্লাব চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে মিছিল হলো। সেদিন সামরিক আইন ভাঙার দায়ে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক পুলিশের লাঠির আঘাতে আহতও হয়েছিলেন। সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের আমলে প্রেস ক্লাব রীতিমতো জাতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয়েছিল। তখন দুই জোটের দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া বারবার প্রেস ক্লাবে এসেছেন, মত বিনিময় করেছেন। যে কারণে এরশাদের পুলিশ একবার ক্লাবে ঢুকে সাংবাদিকদের পিটিয়েছিল। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে পরপর দু'বার ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার। তখন দেখেছি জাতীয় নেতৃবৃন্দ, লেখক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতি কর্মীরা প্রতিদিনই প্রেস ক্লাবে এসেছেন। একবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দল এবং ৫ বামদল-এই তিন জোটের যুগপৎ কর্মসূচি পালনকালে পুলিশ শেখ হাসিনার গতিরোধ করার জন্যে তোপখানা রোডের মাথায় কদম ফুল চত্বরে ক্রেন এনে তাঁর গাড়ি শূন্যে তোলার এক অভিনব জঘন্য কাজ করেছিল। শেখ হাসিনা বুঝতে পেরে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে যান এবং প্রেস ক্লাবে চলে আসেন। এক উত্তাল দিনে পল্টন মোড়ে পুলিশ বেগম খালেদা জিয়াকে আটক করার চেষ্টা করে। পরে তিনিও কর্তব্যরত সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেস ক্লাবে আসেন।

www.pathagar.com

আরেকবার পুলিশের হাত থেকে গ্রেফতার এড়াতে কাজী জাফর আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, রাশেদ খান মেননসহ তিন জোটের বেশ কয়েকজন নেতা বিকেল পর্যন্ত ক্লাবে অবস্থান করেন। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ উপজেলা নির্বাচন করার প্রস্তুতি নেন। তারিখও ঘোষণা করা হয়। এরই মধ্যে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হয়। অনেককে বলতে শুনেছি, যারা এ নির্বাচন হোক চায়নি, বসুনিয়া তাদেরই চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। ক্যাম্পাস রোষে জ্বলে উঠলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শত শত ছাত্র-ছাত্রী রাজপথে নেমে এলো। তারা ঘোষণা করলো বায়তুল মোকাররমে নামাজে জানাজা হবে। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই তাদের শোক মিছিল নিয়ে বায়তুল মোকাররমে যেতে দেবে না। পিক-আপ ভ্যানে বসুনিয়ার লাশ তোপখানা রোডে পুলিশের বাধা পেলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে প্রেস ক্লাবে ঢুকে পড়ে। ক্লাবের চারদিকে অসংখ্য পুলিশ, ভেতরে শতাধিক সাংবাদিক ও শত শত ছাত্র-ছাত্রী। বেলা ১১টার মতো। ছাত্রদের কেউ কেউ পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছে, পুলিশ বন্দুক তাক করে আছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো। এরই মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো সন্ধ্যার আগেই পুলিশ ক্লাব রেইড করে লাশ নিয়ে যাবে। ছাত্ররাও অটল, কিছুতেই লাশ নিতে দেবে না নিতে হলে তাদের রক্তের ওপর দিয়ে নিতে হবে।

সে এক ভয়ানক পরিস্থিতি! ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কিছু একটা করতে হবে। আমি আমার কক্ষ থেকে তখনকার স্বরাষ্ট্র সচিব কাজী আজহার আলীকে টেলিফোনে পুলিশ সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ করলাম। ইত্তেফাকের রিপোর্টার এবং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি আমাকে চিনতেন। এ সুযোগটি নিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি এমন এক প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, যা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বললেন, ছাত্ররা কেবল নামাজে জানাজা পড়তে লাশ নিয়ে যাবে, কোনও স্লোগান দেবে না এবং জানাজা শেষে আবার একইভাবে লাশ নিয়ে চলে যাবে- এই গ্যারান্টি দিলে পুলিশ কোনও এ্যাকশনে যাবে না। কিন্তু এ গ্যারান্টি কি দেয়া যায়? পুলিশ নিজেরাই উস্কানি দিতে পারে, কিংবা ছাত্রদের মধ্য থেকেও উস্কানি দেয়া হতে পারে। তখন তিনি বললেন, লাশ নেয়ার পথে রাস্তার দু'পাশে কেবল পুলিশের সিনিয়র অফিসাররা থাকবে। কোনও কনস্টেবল থাকবে না, এমনকি জুনিয়র অফিসারও না। তাহলে আর উস্কানির ভয় থাকবে না। মনে হলো, এটুকু ঝুঁকি নেয়া যায়। তখন আমি উপস্থিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আমার কক্ষে বৈঠকে বসলাম এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রস্তাব সম্পর্কে তাদের অবহিত করলাম। তারা একমত হলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ জাফর, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, এম শাজাহান মিয়া, আমানুল্লাহ কবীর, আলতাফ মাহমুদ।

পরে বসলাম ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। তাদের মধ্যে যে ৭/৮ জন নেতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবার নাম মনে নেই। তবে যে দু'জন উত্তেজিত হয়ে আমাকে 'স্বৈরাচারের দালাল' বলেছিল, তাদের একজন তৎকালীন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, নাম সম্ভবত জালাল (পুরো নাম মনে নেই) অপরজন জাসদ ছাত্রলীগের শিরিন আখতার। আমি পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাদের এই বেআদবি নীরবে হজম করলাম। পরে অবশ্য ছাত্রনেতারাও আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে ঝুঁকি নিতে রাজি হলো। সম্মতি পেয়ে

www.pathagar.com

কাজী আজহার আলীকে জানিয়ে দিলাম। কথামত সব ব্যবস্থা হলো এবং ছাত্ররা তাদের কর্মসূচি পালন করলো। যে দু'জন আমাকে 'স্বৈরাচারের দালাল' বলেছিল, তাদের একজন জালাল ঘটনার পরপরই এরশাদ সরকারের কূটনৈতিক চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায়। আমি অবাক হইনি। প্রেস ক্লাব জঘন্যভাবে আক্রান্ত হয় ১৯৯২ সালে। পল্টন মোড়ে সমন্বয় পরিষদের সমাবেশ চলছিল। প্রধান অতিথি আবদুর রাজ্জাকের বক্তৃতায় সময় পুবদিকে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হলো। আবদুর রাজ্জাক বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে মিছিল নিয়ে জিরো পয়েন্টের দিকে চলে যাচ্ছিলেন। মিছিলের শেষাংশ পল্টন মোড় ছাড়ার মুহূর্তে পুলিশ হঠাৎ করে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের পেটানো শুরু করলো। আমরা প্রাণ ভয়ে প্রেস ক্লাবের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। পুলিশ পেছনে পেছনে এসে ক্লাবে ঢুকে গুলি, রাবার বুলেট, লাঠি-বুট দিয়ে অর্ধশতাধিক সাংবাদিককে আহত করে। কি বীভৎস ছিল সেই মুহূর্তটি!

আজ ক্লাবের যে বিশাল ভবন, এর নির্মাণ ব্যয় বহন করেছেন সরকার। জিয়া এবং সাত্তার সরকারের আমলে ৪০ শতাংশের মতো কাজ হয়, বাকি কাজ সম্পন্ন হয় এরশাদ সরকারের আমলে। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ। তার ক'দিন পরই তিনি সামরিক পোশাক পরে জেনারেলের স্টিক হাতে ক্লাবে আসেন। নিজ থেকে এসেছিলেন, না কেউ দাওয়াত দিয়ে এনেছিল জানা নেই। তিনি এসে অসমাপ্ত ভবন দেখে বললেন, আর অসমাপ্ত থাকবে না। তবে একটা শর্ত, নির্মাণ সম্পন্ন করে তিনি উদ্বোধন করবেন। এক সৈনিক জিয়াউর রহমান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, আরেক সৈনিক তিনি উদ্বোধন করতে চান। সেদিন ক্লাব সদস্য সিনিয়র-জুনিয়র অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদ করেননি। বরং 'আমরা খুশি' এমন একটা ভাব লক্ষ্য করা গেছে। যারা সমর্থন করতে পারেননি, তারাও কোনও শব্দ করেননি। সম্ভবত 'পোশাক' আর 'স্টিক' দেখে। অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়েছেন, যার প্রকাশ ঘটেছে আরও পরে।

ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জেনারেল এরশাদকে দিয়েই উদ্বোধন করা হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বা আমার প্রেসিডেন্ট ফাজলে রশীদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্য পছন্দ করি, না করি ভিন্ন কথা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ কথা দিয়েছেন, রাখতে হবে। উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছিল। এমনি সময় ক্লাব সদস্য ইত্তেফাকের রিপোর্টার মোহাম্মদ শাহজাহান এরশাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযান শুরু করলেন। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ক্লাব সদস্য স্বাক্ষর দিয়ে বললেন, কিছুতেই কোনও সামরিক স্বৈরশাসককে দিয়ে উদ্বোধন করানো যাবে না। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। আমরা চাইলামও পূর্বসূরীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে, কিন্তু ক্লাবের সর্বোচ্চ পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারি না। আমি চিরকালই সামরিক স্বৈরাচারকে অপছন্দ করি। দেশের যতো ক্ষতি হয়েছে, তার কারণও সামরিক শাসন বলে মনে করি। কিন্তু কথা দিয়ে কথা না রাখাটা কি ভালো কাজ ছিল? যে কারণে এরশাদ সাহেব আমার নাম উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'আমি মক্কা-মদিনায় যেতে পারি, প্রেস ক্লাবে যেতে পারি না।'

তবে হ্যাঁ, এরশাদ সাহেবের কাছে আবারও যেতে হয়েছিল আমাদের। বাধ্য হয়ে। বিশাল

www.pathagar.com

ক্লাব ভবন তো হলো। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনায় খরচও রাতারাতি কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আয় বলতে তো সদস্যদের চাঁদা এবং হল ভাড়া। চাঁদার অংকটা উল্লেখ না করাই ভালো। এই দু'খাত থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে খরচের এক তৃতীয়াংশও মেটে না। বিশাল ভবন, হল, পাঠাগার, লাউঞ্জ, স্পোর্টস কক্ষ কোথাও কোনও আসবাবপত্র নেই। তখন এরশাদ সাহেবের উপদেষ্টা ছিলেন দেশের অন্যতম প্রধান কবি, সাবেক সচিব এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান। তিনি কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। 'সেন্টু ভাই' নামে বেশি পরিচিত এবং সাহিত্য-সাংবাদিকতা জগতের অকৃত্রিম বন্ধু। ক্লাবের সুহৃদ তো বটেই। আমার সঙ্গে প্রথম দু'বছর ক্লাব প্রেসিডেন্ট ছিলেন গিয়াস কামাল চৌধুরী। ক্লাব সদস্য মরহুম জহিরুল ইসলাম কিছুদিন সরকারের কৃষি বিভাগে জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন। আমরা তিন জন সেন্টু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে ক্লাবের ফার্নিচার করার কাঠ চাইলাম। সেন্টু ভাই কোনও বাক্য ব্যয় না করে আমাদেরকে এক ট্রাক (১২০০ সিএফটি) রফতানি মানের সিজন্‌ড্‌ কাঠ দিলেন, যা দিয়ে ক্লাব সদস্য দুই শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক ও সাধন বোসের ডিজাইন অনুযায়ী ক্লাব অফিস, মিলনায়তন, পাঠাগার, ক্যান্টিন, লাউঞ্জের ফার্নিচার করা হলো। ক্লাবের খরচ চালানোর জন্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম নিচ তলার পূর্বাংশ ভাড়া দেব। অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে কথাও হলো। কিন্তু যেহেতু এরশাদ সাহেবকে দিয়ে আমরা উদ্বোধন করাইনি, তাই আটকে রাখা হলো।

১৯৮৫-৮৬ এ দু'বছর ক্লাব প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফাজলে রশীদ। আমরা ম্যানেজিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিলাম, এরশাদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে অগ্রণী ব্যাংককে ভাড়া দেয়ার ব্যাপারটি সুরাহা করবো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরশাদ সাহেবের প্রেস সচিব ক্লাব সদস্য (সহযোগী) এম, তাজুল ইসলামের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাসভবনে তার সঙ্গে দেখা করলাম। ক্লাবের পক্ষে আমি এবং ফাজলে রশীদ এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষে যদ্দূর মনে পড়ে হাবিবুর রহমান মিলন, ইকবাল সোবহান চৌধুরী, এম শাজাহান মিয়া ছিলেন। এরশাদ সাহেব তাজুল ভাইকে বলে দিলেন, অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে ভাড়ার ব্যাপারটা সুরাহা করতে। তার ক'দিন আগে ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতাসহ ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সুযোগে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ৫ ভাগ বাড়িয়ে ৩৫ ভাগ মহার্ঘ ভাতা আদায় করে নিলেন।

২০ অক্টোবর প্রেস ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি-সুবর্ণ জয়ন্তি। পেছনে তাকালে দেখতে পাই এই ৫০ বছরের মধ্যে ৩০ বছরের মত সময় আমরা সামরিক শাসনে (সরাসরি এবং লেবাসে) ছিলাম। লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। পাকিস্তান আমলে যেমন, বাংলাদেশ আমলেও তেমনি। বিশেষ করে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন জারি হলে ক্লাবের পরিবেশও রাতারাতি বদলে যেতে থাকলো। নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু হলো। রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় রাজনীতিতে যে নতুন মেরুকরণ হলো এবং জাতীয়তাবাদের যে নতুন নামকরণ এবং থিওরী আবিষ্কার হলো, তার প্রভাব খুব দ্রুত ক্লাব চত্বরে এসে পড়লো। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার কারণে এতোদিন মুখ বন্ধ করে ছিল, রাতারাতি তারা জাতীয়তাবাদের নতুন ছাতার নিচে এসে দাঁড়ালো। তারা মনের মানুষ এবং নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে গেল। দুই বিপরীত মনের মানুষ তো এক টেবিলে বসতে পারে না। এভাবেই ক্লাবের টেবিলও ভাগ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এতো কিছুর পরও ক্লাবের যে বর্ণাঢ্য অভিযাত্রা ১৯৫৪ সালে শুরু হয়েছিল এবং পেশার স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং সিভিল সমাজ নির্মাণের লড়াইয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা যে সংগ্রামী ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা আজও হারিয়ে যায়নি। যাবেও না কোনওদিন। পূর্বসূরীরা অনেকে প্রয়াত হয়েছেন। যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, বয়সের ভারে তাঁরাও হয়তো আগের মতো ক্লাবে আসেন না, বা আসতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের পদচারণার ছাপ ক্লাবের প্রতিটি ইটে জড়িয়ে আছে। এর প্রভাব কোনওদিন মুছে ফেলা যাবে না। যে প্রজন্ম সামনে আসছে, তারা হয়তো রাজনীতির চলমান ধারাগুলোর কোনওটাই গ্রহণ করবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তাদের সামনে বাঙালি জাতির হাজার বছরের যে সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আছে, তারা তার পক্ষেই অবস্থান নেবে। ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে কেউ কেউ হয়তো সন্তানের কাছে মিথ্যে বলছেন। কিন্তু পিতা-মাতা সন্তানের কাছে মিথ্যে বলতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ মনের মানুষ হলেও না। এভাবেই নতুন প্রজন্ম সত্য আবিষ্কার করবে। নেহাত কেউ মিথ্যে বললেও সে সন্তানের কাছেই ধিকৃত হবে। একাত্তরের ধিকৃত নামকরণগুলো যখন ৩৪ বছরেও ধিক্কারমুক্ত হতে পারেনি, তখন ৩৪ শ' বছরেও পারবে না। সত্য অপ্রতিরোধ্য, আর জীবন গতিশীল। জীবন এগিয়ে যাবেই।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের ইতিহাস, আমার দেখা সংবাদপত্রের ডিজাইন

সৈয়দ লুৎফুল হক

রোম নগরীতে প্রচারিত রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘোষণার লিফলেট থেকে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের ধারণা লাভ করে মানব জাতি। ঐ সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘোষণা লিফলেটের মাধ্যমে প্রকাশ করে জনগণের কাছে তা পৌঁছে দেয়া হতো। যা থেকে আধুনিক সংবাদপত্রের সূচনা হয়। আজকে যাকে Actadiraua বা Daily Acts বলা হয়। অবশ্য মধ্যযুগেও বিভিন্ন বণিকদের মধ্যে লিফলেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানের প্রচলন ছিল।
সে যাই হোক, ইংল্যাণ্ডে পুস্তক আকারে ছাপানো বইয়ের আকারে সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। যুদ্ধ, দুর্যোগ, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনার খবর জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পুস্তিকা আকারে সংবাদপত্র ছাপা হতো স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডে। ১৫১৩ সালে ফোডেন নামক স্থানের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের খবর হকারের মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রচার করা হয়েছিল একই ভাবে।

প্রথম দুই দশকে কম্পোজ বা অক্ষরের ছাপার ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিটি পৃষ্ঠা বা কলাম একই সঙ্গে স্ক্রীপটের মাধ্যমে ছাপা হতো। ১৭ শতাব্দীতে জার্মানি, ইটালি ও নেদারল্যাণ্ডসে The dutch নামের Corantors (Currents of News) বা তাজা খবর প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়। এতে এতদঞ্চলে সংবাদ প্রচারের একটি শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে ওঠে। এ সময় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ছাপা ও জনমত সন্নিবেশিত হতে শুরু করে। এই পত্রিকাটি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় ছাপা হতো, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিতরণ করা হতো।

১৬২০ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডামে এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে সারা ইউরোপের দেশগুলোতে নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। ব্রডশিট সংবাদপত্র বা ফুলস্ক্যাপ সংবাদপত্র ১৭০২ থেকে ১৭৩৫ সালে সর্বপ্রথম জাপানের Tokugaura-এর সময়কালে প্রকাশিত হয়। সে সময় সংবাদপত্রকে Newsbook বলা হতো। ১৬৮০ সালের দিকে সংবাদপত্রকে সংবাদপত্র বলার প্রচলন শুরু হয়। সংবাদপত্র থেকে টাইটেল পত্র বাদ দেয়া হয়।

The Daily Courant প্রথম ইংরেজি সংবাদপত্রের নাম। ১৭০২ থেকে ১৭৩৫ সময়কালে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

John Walter ১৭৮৫ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠা করেন The Times। অতঃপর আধুনিক পত্রিকার মডেল হিসেবে ঐ পত্রিকার হেডিং, বডি টাইপ, যান্ত্রিক পদ্ধতির অনুকরণ শুরু করে ইউরোপীয় পত্রিকাগুলো। ১৭৯১ সালে The Observer নামে লণ্ডনে আরও একটি আধুনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধ প্রায় ৩০ বছর স্থায়ী থাকায় সংবাদপত্র শিল্পে জার্মানি পিছিয়ে পড়ে। এ ছাড়া ১৭৬৬ সালেও জার্মানি ও সুইডেনে সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে, যা ছিল তা অতি সামান্য। ১৭৭১ সালে ফ্রান্সে Jaurnal The Paria এবং ১৭৮৯ সালে Jaurnal des Debats প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের দৈনন্দিন রিপোর্টের বিষয়গুলো এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রচার করা হতো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্রে জনগণের কর্মকাণ্ড, আন্তর্জাতিক বিষয় বা জাতীয় কার্যক্রম প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ছিল। কারণ ১৬৯০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কলোনিয়াল শাসন জারি ছিল। ১৭০৪ সালে বোস্টন নিউজলেটার (Boston News Letter) নামে একটি কাগজ প্রকাশিত হয়, যাতে শুধু ডাক বিভাগের খবর ছাপা হতো। জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন ও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ভ্রাতৃদ্বয় Boston gazette নামের একটি স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এটি ছিল ইংরেজি ভাষায়। ফলে কলোনিয়াল সরকার পত্রিকাটিকে একটু সহযোগিতার চোখে দেখতে শুরু করে।

১৭২১ সালে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের এই উদ্যোগ ইংরেজি সংবাদপত্রের জগতে নতুন গতির সৃষ্টি করে। ১৭৩৫ সালে John Peter Zeger এর এক মামলার রায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে। এই মামলাটি হয়েছিল নিউইয়র্ক সিটির একজন প্রকাশকের বিরুদ্ধে, যিনি বাস্তব ও সত্য ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। ভদ্রলোক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে মামলাটি করেছিলেন। ১৭৭১ সালে সাংবিধানিকভাবে সাংবাদিকদের ও সংবাদপত্রের অধিকার গৃহীত হয় ইউরোপে। ১৭৯১ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃতি লাভ করে। বিল এ্যামেণ্ডমেন্ট-এর মাধ্যমে বিষয়টি সংবিধানে স্থান লাভ করলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সংবাদপত্রগুলো দলীয়ভাবে প্রভাবিত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করে ফেডারেল বা জেফারসন রিপাবলিকানদের পক্ষ হয়ে। যদিও তখন কাগজের প্রচার সংখ্যা ছিল হাজারের নিচে। ১৯ শতকের দিকে সার্কুলেশন বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ সময় যান্ত্রিক কম্পোজ, হাইস্পীড প্রিন্টিং, রোটারি প্রেস, টেলিফোন যোগাযোগ ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জনগণ এ সময় পত্রিকাগুলোর দাম কমানোর জন্যে আবেদন জানালে ১৮১৫ সালে The Times সাত পেন্স মূল্য নির্ধারণ করে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৫০০০ এ উন্নীত করে। ১৯ শতকের দিকে ৫০ হাজারে এ উন্নীত হলে মূল্য রাখা হয় পাঁচ পেন্স। যুক্তরাষ্ট্রের বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ১৮৩৩ সালে Sun পত্রিকাকে One Penny নিউজ পেপার হিসেবে নিউইয়র্ক সিটিতে প্রকাশ ও প্রচার করতে সমর্থ হন। তার দু' বছর পর James Gordon Bernett আধুনিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে New york Herald নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি আধুনিক সাংবাদিকতার নানা দিক দর্শনের সৃষ্টি করেন। এ সময় নীরস সংবাদ ছাড়া বিনোদন সাংবাদিকতার বিষয়টিও

www.pathagar.com

প্রাধান্য পায়। ১৮৪১ সালে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে পাওয়া যায় নারী দাসত্বের বিরুদ্ধে নারী স্বাধীনতার জন্যে Horace Greely নামে একজনকে জীবন দিতে হয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিষ্ঠার প্রায় দশ বছর পর ১৯ শতকের দিকে প্রায় ৪০০ দৈনিক, ৩০০০ সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৪৮ সালের দিকে নিউইয়র্কে কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে সংবাদ সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৫৮ সালে লণ্ডনে পলওয়েল জে রয়টার বৈদেশিক সংবাদ পরিবেশন সংস্থা 'রয়টার' গড়ে তোলেন। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবীর সংবাদ আদান প্রদানের একচ্ছত্র মিডিয়া হিসেবে বিশ্বকে দখল করে রেখেছিল। ১৮৮৩ সালে নিউইয়র্ক সিটির Joseph Pulitzer তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন William Randolph Hearsr এর আলোচিত ও বিতর্কিত সংবাদ পরিবেশন করে। এ সময় Pulitzer রয়টারের জয়ের কিছু অংশ দখল করে নেন। অবশ্য Pulitzer এর সাংবাদিকতাকে হলুদ সাংবাদিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১৮৯০ সালে রাজনৈতিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাগুলো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৮৯৬ সালে Alfred Harmsworth ও নর্থক্লিফোরফর্ড Daily Mail নামের একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি অত্যন্ত কম দামে বাজারে ছাড়া হয় সার্কুলেশন বেশি করার জন্যে। সংবাদপত্র বিক্রয় থেকে বেনিফিট না তুলে বিজ্ঞাপন থেকে বেনিফিট তোলার পরিকল্পনা করা হয়। তিনি Daily Mirror নামে আরেকটি কাগজ প্রকাশ করেন ট্যাবলয়েড সাইজে। নিউ ইয়র্কের প্রথম ট্যাবলয়েড সাইজ পত্রিকা New york Daily ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। Joseph Medill Patterson এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে যৌন উন্মত্ততাকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে সার্কুলেশন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিংশ শতাব্দীতে পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দুই হাজার ডেইলি এবং প্রায় ১৪০০০ সাপ্তাহিক। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে পত্রিকাগুলোতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সিণ্ডিকেটেড কলাম, ফিচার, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে সার্কুলেশন বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। পত্রিকায় এ সময় ফিচার, কমিকস, ক্রসওয়ার্ড, পাজল ইত্যাদির কদর বাড়তে থাকে। অন্যরকম এক ধরনের আনন্দের সূচনা হয়। যুবকদের কাছে সংবাদপত্র কোনও রকম আনন্দের সৃষ্টি করতে পারেনি। এশিয়ায় প্রায় ২৫০০ সংবাদপত্র একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, তখন ইউরোপে ২৬০০ সংবাদপত্র ছিল।

আমার দেখা সংবাদপত্রের ডিজাইন

১৯৬৬ সালের প্রথম দিকের কথা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার জন্যে আমি ময়মনসিংহ শহরের ব্রাহ্মপল্লী বকুলতলায় মেজো মামার বাসায় চলে এলাম। আমার গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। বারবার ময়মনসিংহ শহরে এসেছি, কিন্তু পড়াশুনার জন্যে নয়। পরীক্ষার সুবাদে ময়মনসিংহে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ময়মনসিংহের রেলস্টেশনের পাশে মহারাজা রোডে 'রূপম' নামের সাইনবোর্ড ও মূর্তি বানানোর দোকানে বসে আড্ডা দিই। দোকানের মালিক রশীদ সরকার আমার মামার বন্ধু। তিনি দুর্গার অত্যন্ত সুন্দর মূর্তি তৈরি করতেন, যা দেখে অবাক হতাম। বিস্মিত হয়ে ভাবতাম, এমন

www.pathagar.com

নিপুণভাবে কিভাবে তৈরি করেন এই দুর্গার মূর্তি। যেহেতু রশীদ সরকার আমার মামার বন্ধু, সে হিসেবে তাঁকে মামা ডাকতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন। সেখানে আড্ডা দেয়ার সুবাদে অনেক বড় বড় লেখক শিল্পী সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে কবি রওশন ইয়াজদানী অন্যতম।

এরই মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে রশীদ মামার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাই। আর মূর্তি বানানো, সাইন বোর্ড লেখা ইত্যাদি রপ্ত করতে থাকি। পরীক্ষা শেষে মোটামুটি সারাদিনই 'রূপম' স্টুডিওতে আড্ডা দিই। মাঝেমধ্যে রেলস্টেশনের হোয়াইট কেবিন, তাজমহল হোটেল, কেওয়াটখালী, বকুলতলা, গাঙিনার পার ইত্যাদি জায়গায় সময় কাটাই। এরই মধ্যে একদিন পরীক্ষার ফল প্রকাশের খবর বেরিয়েছে বলে শুনলাম। ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের দিকে পত্রিকা কেনার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। সামনে পড়ে যায় 'রূপম' স্টুডিও। রশীদ মামার সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আমাকে বললেন, ভাগ্নে তুমি পাশ করেছো। খবরটা বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ, লেখাপড়ার প্রস্তুতি তেমন ছিল না। পত্রিকা খুলে আমার রোল নম্বরটি দেখিয়ে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তবু আমি স্টেশনে গিয়ে আরও একটি পত্রিকা কিনে আবার দেখলাম। তারপর মনে হলো, সত্যিই পাশ করেছি। পত্রিকাটি নিয়ে সোজা মেজো মামার বাসায় ব্রাহ্মপল্লীতে চলে যাই। গিয়ে দেখি, মামা আগেই আমার রেজাল্ট জেনে গেছেন, তাঁর অফিসের স্টাফদের মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছেন।

রেজাল্টের পর স্থির করতে পারছিলাম না কি করবো! আমার এক খালু তখন ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারাল অফিসার। তিনিও আমার রেজাল্টে খুশি হলেন। আমাকে আরও পড়ার পরামর্শ দিলেন তিনি। এরই মধ্যে মামা বাসায় বললেন, ও ছবি-টবি আঁকে, ওকে পলিটেকনিকে ভর্তি করে দিন। রেজাল্ট জেনে আমার বাবা ময়মনসিংহে চলে আসেন। মামা ও খালুর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে পলিটেকনিকে ভর্তি করে দেন। সেখানে ভর্তি হয়ে কিছুদিন ক্লাস করার পর রশীদ মামার কাছে পরামর্শ চাইলাম। তিনি বললেন, আমার খুব সখ ছিল আর্ট কলেজে পড়ার, কিন্তু পারিনি ভাগ্নে। তুমি ভর্তি হলে খুব ভালো হবে, তুমি পড়লে আমার আশা অনেকটা পূর্ণ হবে। এরই মধ্যে রেজাউল করীম নামের একজন শিল্পী, যিনি আর্ট কলেজে পড়েন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় রশীদ মামার ওখানে। তিনি রশীদ মামার বন্ধু ছিলেন। আর্ট কলেজে পড়ার বিষয়ে উনার কাছ থেকে জেনে নিলাম। কিছু দিন পরে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করি। রশীদ মামার সঙ্গে দেখা করে স্টেশনে যাচ্ছি, এমন সময় কবি রওশন ইয়াজদানীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, নাতি কোথায় যাচ্ছিস? বললাম, আর্ট কলেজে ভর্তি হতে। তিনি বললেন, দাঁড়া তোকে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি জয়নুলের কাছে, ও আমার বন্ধু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা চিরকুট লিখে দিলেন। সেটাতে লেখা ছিল– 'আমার নাতিকে পাঠালাম, তুমি দেখো –রওশন'। আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল তখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। যথারীতি ঢাকা পৌঁছে আর্ট কলেজে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কাছে স্লিপ পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে তিনি বললেন, রওশন কাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম,„স্যার আমাকে পাঠিয়েছে। ভেতরে ডেকে নিয়ে বারবার শুধু

www.pathagar.com

রওশন ইয়াজদানীর কথাই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমার প্রসঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। বন্ধুর প্রতি এমন শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আমি আর কখনও দেখিনি। আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল, মফস্বল শহরের বন্ধুর প্রতি এমন শ্রদ্ধা কেবল বড় মাপের শিল্পীদের পক্ষেই সম্ভব। '৭১ সালে রশীদ সরকারকে নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানী আর্মি। মুসলমান হয়ে কেন মূর্তি বানায়, সে অপরাধে (!)। আজকে হয়তো কেউ তাঁকে স্মরণ করবে না। কৃতজ্ঞতাপাশে আমার সারাজীবনের কর্মকাণ্ডকে আবদ্ধ করে রেখে গেছেন তিনি। যদিও বিষয়টি আমার এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও এসে গেল। সংবাদপত্রে আমার কর্মময় জীবনের সঙ্গে বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১৯৬৮ সালে আমি দৈনিক ইত্তেফাকে যুক্ত হই। আজ অবধি সংবাদপত্রে কাজ করছি। ১৯৬৮ সালে দৈনিক ইত্তেফাক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পূর্বাণীর স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দিই। সংবাদপত্রের ডিজাইন সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। গল্পের ছবি, কার্টুন ও হেডিং ডিজাইন করে দিতে হতো। কাঠের ব্লক বা জিঙ্ক ব্লকে ওগুলো ছাপা হতো। পত্রিকায় এসব ছাড়া আর্টিস্টদের অন্য কোনও কাজ ছিল না। তৎকালীন কলকাতা বা ইউরোপীয় দেশগুলোতে একইভাবে ডিজাইনের কাজ করা হতো। অনেকটা ফিলআপ দ্য ব্লাঙ্ক ছাড়া শিল্পীদের কাজ করার কোনও সুযোগ ছিল না। সর্বপ্রথম চিত্রিত ম্যাগাজিন বের করেন হার্বার্ট ইনগ্রাম ১৮৪৭ সালে। ১৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনে ৩২টি উডকাট ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার করেছিলেন তিনি। ১৯১২ সালে প্রথম টেক্সটের সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার হয়। ১৯৬০ সালের ইউরোপে আধুনিক গ্রিড পদ্ধতি চালুর পর ডিজাইনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তদানিন্তন ভারত ও পাকিস্তানে এর প্রভাব পড়ে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শুধু পাতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি নিয়েই ডিজাইনারগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমরা তখন এক অন্ধকারের মধ্যে বাস করছি। পত্রিকার ডিজাইন বলে একেবারেই কিছু ছিল না। প্রত্যেকে যার যার ইচ্ছা মাফিক ডিজাইন ছাড়াই পত্রিকা প্রকাশ করতেন। যদিও আজ অবধি এর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে প্রযুক্তিগত কারণে। ব্লক ও হ্যাণ্ড কম্পোজের যুগের অবসান ঘটিয়ে এলো হটমেটাল (লাইনো)। বাকী সব রয়ে গেল আগের মতই। শুধু পরিবর্তন এলো ব্লকের বদলে পজিটিভ এবং সেলোফিনে, ছাপার মানে কিছুটা উন্নতি ঘটলো। ডিজাইন কিন্তু আগের মতই রয়ে গেল।

১৯৮০ সালের দিকে নতুন প্রযুক্তির আগমন ঘটলো, যার নাম ফটো টাইপ সেটার। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে চালু হলো। কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য আনা সম্ভব হলো না। অনেক প্রতিষ্ঠান অপারগ হয়ে পুরনো পদ্ধতিই বহাল রাখলো। ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আগমন ঘটলো কম্পিউটার প্রযুক্তির, যা বিপ্লব ঘটিয়ে দিল ডিজাইনে ও মুদ্রণ শিল্পে। কিন্তু আধুনিকতার কোনও ছাপ রাখতে পারলো না সংবাদপত্রের ডিজাইনের ক্ষেত্রে। সংবাদপত্র একটি যৌথ প্রয়াস। দৈনিক ইত্তেফাক থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৭২ সালে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা ও বিচিত্রার চীফ ডিজাইনার, পরে আর্ট ডিরেক্টর পদে আমি দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলাম। ১৯৮৬ সালে হল্যাণ্ড সরকারের বৃত্তি নিয়ে হেগ শহরে আন্তর্জাতিক ডিজাইনের উপর পড়ার সুযোগ পাই। এই প্রথম সংবাদপত্রের ডিজাইন সম্পর্কে বিশদ জানতে পারি। কিন্তু

www.pathagar.com

এসকল বিষয়ে কাজ করার সুযোগ এদেশে নেই। তদানিন্তন দৈনিক বাংলার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় আহমেদ হুমায়ূন ও বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শাহাদাত চৌধুরীকে (যিনি নিজেও আর্টিস্ট) এ সকল বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করি। আংশিকভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার চেষ্টাও চালাই । আসলে এটি একটি টিমওয়ার্ক। সংবাদপত্র প্রডাকশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়, সম্পাদকের তো বটেই। সেটা আমাদের দেশে একেবারেই অনুপস্থিত। আধুনিক সংবাদপত্র নানা রকম গ্রিড বা মডিউল ডিজাইনের ওপর নির্ভরশীল। গ্রিড বা মডিউল কাকে বলে, সে সম্পর্কে আমাদের দেশের সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট লোকজনের ন্যূনতম ধারণা নেই। এদেশে সংবাদপত্র শিল্প একটি অ্যামেচার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই এসকল করা হয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগেও এ বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ নেই। আলোকচিত্র নির্ভর সংবাদপত্রের আলোকচিত্র সম্পাদনার ব্যবস্থাও নেই। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রায় একই ধরনের আলোকচিত্র ছেপে থাকে। প্রতিটি সংবাদপত্রকে মনে হবে একই বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

ডিজাইন ছাড়া সংবাদপত্রের অঙ্গসৌষ্ঠবও সুন্দর করা সম্ভব নয়। যারা সংবাদপত্রের ডিজাইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন, তাঁরা কেউই ডিজাইনার নন। সাব-এডিটর, নিউজ এডিটর বা ফিচার এডিটররাই আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ডিজাইন করে থাকেন। অল্প কিছু সংখ্যক কাগজে সীমিত ক্ষেত্রে ডিজাইনারগণ ডিজাইন করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী কাগজের অনুকরণকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সম্পাদক, নিউজ এডিটর বা সাব-এডিটরদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৭৩ সালের দিকে ইউরোপীয় ডিজাইনে স্ট্যানলী মরিসন পুরনো ইংরেজি টাইপ পরিবর্তন করে পত্রিকার ডিজাইনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিলেন এবং নতুন গ্রিড তৈরি করেছিলেন। তিনি কঠোরভাবে ডিজাইনের নিয়ম মেনে টাইমস পত্রিকায় ব্যবহার করেছিলেন। সেটি কখনও এদেশে সম্ভব হয়নি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তো বটেই, বর্তমান বাংলাদেশেও এই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি আমাদের সংবাদপত্রের ডিজাইন। শুধু ইলাস্ট্রেশন নির্ভর ডিজাইনাররাই বেশিরভাগ কাজ করে থাকেন। সংবাদপত্রে সঠিক ডিজাইন পরিকল্পনা বা মডিউল তৈরি করার ক্ষমতা এদেশের শিল্পীদের নেই বললেই চলে। ডিজাইন সম্পর্কে কোনও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও হয়নি। পিআইবি নামের সরকারী প্রতিষ্ঠানে যেখানে সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের ট্রেনিং হয়ে থাকে, সেখানে অত্যন্ত অবহেলিত এই সকল বিষয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপোর্টিং, সাব-এডিটিং, প্রুফ রিডিং বা অন্যান্য বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হয়ে থাকে। ডিজাইনের বিষয়টি উন্নত বিশ্বের সংবাদপত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুকরণ নির্ভর সংবাদপত্রের ডিজাইনে কতটা অগ্রগতি আসবে আমার জানা নেই। আধুনিক বিশ্বে বলা হয়ে থাকে ডিজাইনার্স নিউজ পেপার। ডিজাইনাররা সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন।

সংবাদপত্রে সুন্দর ডিজাইন দেখেই পাঠক বুঝে নিতে পারেন কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ। বর্তমান বিশ্বে সংবাদপত্র একটি কমোডিটি। যা পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে। আর সেটি

www.pathagar.com

করতে পারেন কেবল ডিজাইনাররা। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ডিজাইনের বিষয়টি এতই উপেক্ষিত যে, তার বর্ণনা দেয়াও অত্যন্ত কষ্টকর। মহাসমুদ্রের সঙ্গে এক ফোঁটা পানির তুলনার শামিল। আমি দীর্ঘ ৩৩ বছর সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বড় ভূমিকা সহকারে সংবাদপত্রের ডিজাইন সম্পর্কে লিখলাম। এই আলোচনায় কিছুটা অসঙ্গতি হয়তো থাকতে পারে। অত্যন্ত শাদামাঠা ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। বিষয়টি সম্পর্কে এ উপমহাদেশে শিল্পীদের ধারণা এখনও পক্কতা লাভ করতে পারে নি। এ বিষয়ের উপর কোনও বই বাংলা ভাষা বা এতদঞ্চলের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। গত বছর আমার লেখা 'সংবাদপত্রের ডিজাইন' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। হয়তো এটিই এই উপমহাদেশে এ বিষয়ক প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। বইটিতে সার্বিক বিষয়ের ঘাটতি থাকতে পারে, তবুও এই বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তি গ্রন্থে বন্ধু ও দীর্ঘকালের সহকর্মী কবি হাসান হাফিজ এ বিষয়ে আমাকে লিখতে বলায় গৌরবান্বিত বোধ করছি।

লেখক দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের শিল্প সম্পাদক

www.pathagar.com

পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা, আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাব

কামরুল ইসলাম চৌধুরী

উন্নয়ন আর পরিবেশের চিরায়ত দ্বন্দ্ব প্রাগৈতিহাসিক। চুম্বকের উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর মতোই যেন ধ্রুব সত্য। উন্নয়নের মাশুল গুনতে হয় প্রকৃতিকে, প্রাণবৈচিত্র্যকে, ইকো সিস্টেমকে, সর্বোপরি মানুষকে। আবার মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্র হটাতে, প্রাচুর্যের যোগান দিতেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ষাটের দশকে এসে প্রাকৃতিক পরিাবেশ সংরক্ষণ চিন্তার জন্ম। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আর অর্থনীতিবিদরা ভাবতে শুরু করেন কী করে উন্নয়ন কৌশলে, পরিকল্পনায় পরিবেশ সংরক্ষণ চিন্তাকে একাকার করা যায়। বিশ্ব রাজনীতির পুতুল নাচের রূপক রাজারা বরাবরই সমৃদ্ধির যূপকাষ্ঠে প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়েছেন। গ্লোবাল ভিলেজ কনসেপ্টের বড় বাধাও হলেন তারা। তেমনি এক টালমাটাল স্নায়ুযুদ্ধকালে এলো পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা। আপন ঐতিহ্য সংরক্ষণ চিন্তা, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার এক নিরবধি প্রয়াস।

তাপদাহ উন্নয়নের অগ্নিস্রোতে আমার কৃষকের চিরচেনা বীজ যেন হারিয়ে না যায়, চিরসবুজ বৃক্ষরাজি যেন বিপণনী পণ্য গাছকাঠ লুপ্ত না হয়, চিরস্বাদের মিঠাপানির চেনা চেনা মাছগুলো যেন উন্নয়নের রাক্ষুসে প্রজাতি গিলে ফেলতে না পারে, নদ-নদী-খাল-বিলে দখলদারিত্ব যেন বন্ধ হয়- তেমন এক টেকসই উন্নয়ন মতবাদ থেকেই পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতার ভ্রূণ, জন্ম। ভবিষ্যত প্রজন্মের অধিকার হরণ না করে, প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে কিভাবে উন্নয়ন ঘটানো যায়, তেমন চিন্তাধারাজাত সাংবাদিকতাই হলো পরিবেশ সাংবাদিকতার মূল কথা। পরিবেশ সাংবাদিকেরা উন্নয়ন নিয়ে যেমনি ভাববেন, তাদের রিপোর্টে, ফিচারে, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় লেখার সময় এবং ফটোগ্রাফে ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণের বিষয়টিও মাথায় রাখবেন। পরিবেশ সাংবাদিকতা, পরিবেশ আন্দোলন যেন নতুন বিশ্বে শান্তিরই এক বাতাবরণ।

পরিবেশ ও উন্নয়নের সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ এলেই আমার চোখে ভেসে ওঠে শ্রীলঙ্কার প্রয়াত সাংবাদিক টাবজি ভিটাচি, ভারতের চঞ্চল সরকার, বাংলাদেশের এ বি এম মূসা, তোয়াব খান আর আহমেদ নূরে আলমের অতি আপন চেনা চঞ্চল মুখগুলো। মনে পড়ে এস এম আলী, শেহাবউদ্দিন আহমেদ নাফা, বদিউল আলম, মোস্তফা কামাল মজুমদারের কথা। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ড. কাজী ফরহাদ জালাল আর ড. রেজাউল করিমের উৎসাহী উদ্যমী যত সব আয়োজন। আমি বলছি আশির দশকের গোড়ার কথা। পরিবেশ ও উন্নয়ন

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা তখন আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলোতে পল্লবিত সবুজের আচ্ছাদন মেলেছে মাত্র। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পঞ্চাশ বছর ধরে যেমন ছিল আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাব, তেমনি পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতার ভ্রূণ, জন্ম আর বিকাশেও দ্বিতীয় গৃহ ছিল এর প্রাথমিক লালন কেন্দ্র। এই জাতীয় প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তা হিসেবেই আমার হাতেখড়ি পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতায়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের কর্মকর্তা হিসেবেই আমি গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের (এফইজেবি) ভুবন জোড়া কর্মকাণ্ডে। আজ আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম সদস্যদের যে খ্যাতি, তার একটা অংশের অন্তত দাবিদার জাতীয় প্রেস ক্লাব। এদেশের পরিবেশ আন্দোলন আর সাংবাদিকতার বিকাশে এই প্রেস ক্লাবের রয়েছে গৌরববোধ করার মতো অবদান।

'বাংলাদেশে আমি অবশ্যই যাবো। তোমার দেশ তো এনভায়রনমেন্টাল ক্ল্যাসিক কেস। তোমার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করছি। কারণ, বাংলাদেশকে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্ব পরিবেশ নীতি প্রণয়নের কাজে আমি স্বস্তি পাবো না। আর আজ বিকেলে তুমি যে আবেগময় ভাষণ দিলে! এশিয়া প্যাসিফিকের পরিবেশমন্ত্রীরা তো পিনপতন নীরবতায় শুনলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললেন জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচীর (ইউনেপ) নির্বাহী পরিচালক ক্লাউস ট্রপার। জাপানের কিতাকিয়োসু নগরীতে তখন রাত বারোটা। জগিং করতে করতে কথা হচ্ছিল সদা প্রাণবন্ত সাবেক জার্মান পরিবেশমন্ত্রী ক্লাউসের সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে ছিলেন তখন ইউনেপের আঞ্চলিক পরিচালক নির্মল এ্যান্ড্রুস। নির্মল সায় দিলেন ক্লাউসের কথায়। নির্মলও আমাদের নিমন্ত্রণে পরে ঢাকায় এসেছিলেন। লাগাতার ৭২ ঘন্টা হরতালে আটকাও পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

কেন ইউনেপ নির্বাহী পরিচালক পরিবেশগতভাবে ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশকে আনলেন? ক্লাউস কি একা? জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান কয়েক বছর আগে ঢাকায় এসে কি বললেন? কোফি আনানের হুঁশিয়ারি: বিজ্ঞানীরা একমত যে, বাংলাদেশ মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের কবলে। আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্মম শিকার হবে বাংলাদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র এক মিটার বাড়লেই বাংলাদেশের সাড়ে ১৭ ভাগ ভূমি সাগরতলে হারিয়ে যাবে চিরতরে। কয়েক কোটি লোক পরিবেশ শরণার্থী হবে। বিশ্বের সবচেয়ে যে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, তা সাগরকোলে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশের কৃষি, জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে। মোট কথা হলো, বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা আর সঙ্কট– এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক আলোচিত বিষয়। আমাদের আর্সেনিক সমস্যা, ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণের সঙ্কট বিশ্ব পরিবেশ নিয়ে যারা মাথা ঘামান, তাদের উৎকণ্ঠিত করে তোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এ দেশের পরিবেশ ভাগ্য বিধাতারা সে ব্যাপারে এখনও তেমন একটা উচ্চকণ্ঠ নন। যে সমস্যা নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের এত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সেটি তো আমাদের এক মন্ত্রী ধরতেই পারলেন না! সেও আরেক বেদনার কথা।

পরিবেশ খাতে বাংলাদেশের রয়েছে বেশ কিছু সাফল্য। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দানকারী বেশ কিছু পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবাদী রয়েছেন আমাদের। বিশ্ব জুড়ে গর্ব করে বলার

www.pathagar.com

মতো আমাদের রয়েছে প্রথম পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা। তবু পরিবেশের সব মাপকাঠিতেই বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া এক দেশ। পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের নির্মম শিকারও। বারো কোটি মানুষের জনবহুল এ দেশের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি। হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ আচ্ছাদন। অবাধে উজাড় হচ্ছে বনরাজি। সুন্দরবন, মধুপুরের শালবন, পার্বত্য বন-বনানী আজ হুমকির সম্মুখীন। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, কর্ণফুলীসহ নদ-নদীগুলোতে চলছে নির্লজ্জ দখলদারিত্ব। পানি দূষণ, বায়ু দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, মাটি দূষণ আমাদের পরিবেশ-প্রতিবেশ সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। নানা সরকারী-বেসরকারী কর্মসূচী সত্ত্বেও আমাদের পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে চলছে দ্রুতগতিতে। পরিবেশ বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধানের ফাঁকফোকর ও শিথিল প্রয়োগের সুযোগে চলছে নির্বিচার এ ধ্বংসযজ্ঞ এবং ক্রমাবনতি। বাংলাদেশ ব্যাপক জনসংখ্যার ছোট এক দেশ। ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৬৫ লাখ। ২০১০ সালের মধ্যে বেড়ে দাঁড়াবে ১৭ কোটিতে, অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে ১২০০ জন। শতাব্দী শেষে লোকসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হচ্ছে। আর এ জন্যে দেশটির প্রধান শঙ্কার কারণ হচ্ছে, টেকসই পরিবেশ বজায় রাখা যাবে কতটুকু? কার্যকর জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের জন্যে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা উপকূলীয় এলাকার আর্থ-সামাজিক জীবন, এর কৃষি ভিত্তি অথবা ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতা, বিশ্ব উষ্ণায়ন অথবা টর্নেডোর ভীতি যাই হোক না কেন, বাংলাদেশকে এর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যে একটি প্রতিরক্ষামূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তনের এক বড় শিকারে পরিণত হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। এ তো আর অমূলক আশঙ্কা নয়। জাতিসংঘের মহাসচিব আনান বাংলাদেশ সফরকালে এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত সম্ভাব্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আমাদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদফতর আর বন বিভাগের কর্মকর্তাদের তেমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। আশ্চর্য!

অথচ আমাদের এখানে পরিবেশবাদীদের দাবিতেই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি)সহ সংরক্ষণবাদীদের সেই শোরগোলের কারণেই কিন্তু পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৮৯ সালে। পরিবেশ অধিদফতরের জন্ম ১৯৭৭ সালে। পরিবেশ আন্দোলনের কারণেই জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা (নেমাপ) প্রণীত হয়েছে ১৯৯১-৯৫ সময়কালে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়, এনজিও আর পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অংশীদারিত্বমূলক এই পরিবেশ পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে। তৃণমূলের মানুষ তাদের পরিবেশ ভাবনা এই কর্মপরিকল্পনায় তুলে ধরেন, সমাধানও বাতলে দেন। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এডাব, এফইজেবি, সিইএনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজটি সম্পন্ন করে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ছাড়াই। প্রণীত হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫। তৈরি হয় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭। পরিবেশ আইন এবং বিধি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এডাব, সিইএন, বেলা, এফইজেবিসহ নাগরিক সমাজ। নবীন মন্ত্রণালয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়

www.pathagar.com

সহযোগিতা, বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও পরামর্শে পরিবেশ আইন ও বিধি প্রণয়নের মতো জটিল কাজ শুরু হয়। সূচিত হয় ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবেশ কর্মসূচী- টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী। নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মন্ত্রণালয় বেসরকারী প্রতিনিধিরা একযোগে কাজ করেন। পরিবেশকে ঘিরে রচিত হয় সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার এক অনন্য বন্ধন। নেমাপ অর্জন করে আন্তর্জাতিক প্রশংসা। সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার এই বন্ধন বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। ব্রাজিলে '৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কাজ করেন। ধরিত্রী সম্মেলন-উত্তরকালেও এ ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের সদস্য আর গণমাধ্যম কর্মীদের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে পরিবেশ বিষয়ক খবরাখবরের পরিমাণ এখন যথেষ্ট বেড়েছে। এদেশের সংবাদপত্রে, রেডিও-টেলিভিশনে ষাটের দশকে পরিবেশ বিষয়ক সংবাদ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। সত্তর ও আশির দশকে শূন্য থেকে ২০ কলাম ইঞ্চিতে তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এখন প্রতিদিন ৫০ থেকে ২০০ কলাম ইঞ্চি পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ফিচার, আলোকচিত্র দৈনিক কাগজে প্রতিদিন বেরুচ্ছে। নিয়মিত পরিবেশ বিষয়ক পাতাও প্রতি সপ্তাহে বেরুচ্ছে কয়েকটি কাগজে। টেলিভিশনে ষাট ও সত্তর দশকে নিয়মিত কোনও পরিবেশ বিষয়ক সংবাদ পাওয়া যেতো না। এখন বিটিভিতে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে পাঁচ মিনিট পরিবেশ বিষয়ক খবরাখবর ও অনুষ্ঠান থাকছে। অন্যান্য বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলো এবং রেডিওতেও একইভাবে পরিবেশ বিষয় থাকছে। মোট কথা, গুণগত মান যাই হোক না কেন, পরিমাণগত দিক থেকে পরিবেশ বিষয়ক লেখালেখি আর খবরাখবর গত কয়েক দশকে ধীরে ধীরে বেড়েছে। তবে গত কয়েক বছরে পরিবেশ সাংবাদিকদের কল্যাণে তা বেড়েছে অতি দ্রুত গতিতে। গণমাধ্যমের এই ইতিবাচক ও সক্রিয় ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ সামগ্রিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এমনকি ওসমানী উদ্যান পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে হঠকারী অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের খপ্পর থেকে। বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যা বিশ্ব পর্যায়ে উঠে এসেছে। সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায় ।

বার বার তাই ক্লাউসের কথাগুলো কানে ভেসে আসছে। এনভায়রনমেন্টাল ক্লাসিক কেস। সত্তর দশকে ক্লাউস্ ছিলেন জার্মান পরিবেশমন্ত্রী। রাইন নদী তখন মারাত্মকভাবে দূষিত। তিনি ঝাঁপ দিলেন রাইনে। সাঁতার কাটলেন। সেই রাইন নদী এখন দূষণমুক্ত। মার্গারেট থ্যাচার দূষিত টেমস্‌কে রক্ষার জন্যে তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে 'টেমস বাঁচাও' শিরোনামে কর্মসূচী রেখেছিলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি সত্যি সত্যি টেমস্ নদীকে বাঁচিয়েছিলেন। আজ টেমসের বুকে ঢেউ খেলে যায়। অথচ আমাদের বুড়িগঙ্গার জন্যে অনেকের মন গলে না। ঢাকার বায়ুতে সীসার পরিমাণ নিয়ে কারও টনক নড়ে না। আর্সেনিক দূষণে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ আক্রান্ত। নীতিনির্ধারকদের অনেকের সে ব্যাপারে নেই কোনও মাথাব্যথা। সত্যি এ যেন এক নির্লজ্জ ক্ষমাহীন ক্ল্যাসিক কেস। কোফি আনানের কথা বোঝার মতো লোকের বড় অভাব এ দেশে। যেমন অভাব কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর (প্রয়াত

www.pathagar.com

পরিবেশবাদী ওবায়দুল্লাহ্ খান) কবিতার সুরেলা ধ্বনির মরমী সুর উদ্ধারকারীর। অথচ এত বড় কবিকে কবিতামঞ্চ থেকে অপমান করে নামিয়ে দেয়ার ক্ষমাহীন স্পর্ধা দেখানোর মতো বেয়াদবের অভাব নেই এ দেশে! বাংলাদেশের মাটি, নিসর্গ, প্রকৃতি, শস্য-শ্যামল প্রান্তরের প্রতি অসীম মমত্ববোধ সম্পন্ন এমন উচ্চমানের পরিবেশবাদী কবির জন্ম এ দেশে আর হবে কিনা সন্দেহ! পাশের দেশ ভারতে পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগ হচ্ছে। ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমাদের সুপ্রীমকোর্ট সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ আমাদের আরেক ব্যর্থতা। দেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইনগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে জাতির টেকসই উন্নয়ন যাত্রা এগিয়ে যেত অনেকদূর। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ, সমন্বয় আর পারস্পরিক সহযোগিতা পরিবেশ সংরক্ষণে আজ অপরিহার্য।

আশার কথা, সরকার ঢাকা মহানগরী থেকে টু স্ট্রোক থ্রী হুইলার বেবী ট্যাক্সি আর দেশব্যাপী পলিথিন নিষিদ্ধ করায় দেশবাসী পরিবেশগত সুফল ভোগ করতে শুরু করেছেন। তবে, প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য। আমাদের নষ্ট রাজনীতির নকল পুতুল রাজাদের মনে রাখা উচিত, চীনের মতো ১২৫ কোটি মানুষের দেশও আজ দুনিয়া জোড়া পরিবেশ আন্দোলনের সম্মুখ কাতারে থাকতে আগ্রহী। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসে সবুজ জাতীয় আয় গণনার কৌশল অনুমোদন তারই প্রমাণ। সেটাই জোর গলায় গত ২৭ নবেম্বর ২০০৪ শেনজেন নগরীতে চীনা পরিবেশমন্ত্রী পেন ইউই এশিয়া-প্যাসিফিক পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের ১৬তম কংগ্রেসে জানালেন। আরও প্রমাণ চান? কেন, দেখতে পাননি এবার শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছেন? কেনিয়ার বিপ্লবী পরিবেশবাদী ওনানদা মাথাই। আসুন আজ আমাদের শ্লোগান হোক– 'হটাও দূষণ, বাঁচাও মানুষ'। ক্লাউস, মাথাই, কোফি আনানের মতো হাজারো পরিবেশবাদীর জন্ম হোক আমার দেশে। আমরা সেই সবুজ বাংলাদেশের সন্ধানে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তির আনন্দঘন বছরে সেই হোক সকল সদস্যের একান্ত কামনা। তাহলেই হয়তো ধরিত্রীর কাছে আমাদের অনেক ঋণের খানিকটা শোধ হবে। পাখ-পাখালির কলকাকলি মুখরিত সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের নদীর ঢেউ, কৃষকের ধানের শীষে ভোরের শিশির ফোঁটার অনিন্দ্যকান্তি, পল্লীবধূদের বীজ তুলে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন, চঞ্চল হরিণ শাবকের প্রকৃতির কোলে নিঃশঙ্ক ছুটে চলা, রাখালের বাঁশির সুরেলা সুমধুর ধ্বনিতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা আরও বিকশিত হোক।

লেখক বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের (এফইজেবি) চেয়ারম্যান এবং বাসসের চীফ রিপোর্টার ও বিশেষ সংবাদদাতা

www.pathagar.com

সুবর্ণ জয়ন্তির এই লগ্নে

নাসিমা হক

প্রেস ক্লাবের ৫০ বছর পূর্ণ হলো। ভাবতে অবাকই লাগছে। সত্যি কেমন করে সময় গড়িয়ে যায়। প্রেস ক্লাবের সঙ্গে আমার সংযোগ এর সদস্য হিসেবে। বহুবছরের সম্পর্ক। আমি অবশ্য কখনও এর কর্মকর্তা ছিলাম না। শুধুই সদস্য। তবু আমাকে সংকলনে লিখতে বলা হয়েছে, তাই এ-লেখা। আশির দশকে কোনও একসময় আমি প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছি। তবে আরও বহু বছর আগেই সদস্য হতে পারতাম, দেরির কারণ আলস্য। তা নইলে এই সম্পর্ক আরও দীর্ঘ বছরের হতে পারতো।

প্রেস ক্লাবের পুরনো দিনের কথা মনে করতেই এর ঐতিহাসিক লাল বাড়িটিই স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। ওই লাল বাড়িটিতে আমি প্রথম গিয়েছিলাম ষাটের দশকে সংবাদ সম্পাদক বজলুর রহমানের সঙ্গে শহীদ সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের কাছে। শহীদুল্লাহ ভাই প্রেস ক্লাবের সেই লাল ইটের বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে বসেছিলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে তাঁর গাড়িতে মতিঝিল গিয়েছিলাম আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের জন্যে চাঁদা তুলতে। সেই-ই আমার প্রথম সংযোগ। তারপরও বিভিন্ন উপলক্ষে সেখানে গিয়েছি। তখনও সদস্য হইনি। ঐতিহাসিক লাল বাড়ি বলছি এ কারণে যে, এ বাড়িতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু থাকতেন।

সদস্য হওয়ার পর সেখানে গেছি, কিন্তু তখনও খুব সঙ্কোচের সঙ্গে যেতাম। আমি যেতাম পুরনো সদস্যদের সঙ্গে। আমার সহকর্মী নাসিমুন্নাহার নিনি আগেই সদস্য হয়েছিল। ওর সঙ্গেও যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে পুরনো হলাম, নতুনের সংকোচ কেটে গেল। এখন তো প্রেস ক্লাব আমাদের নিজের ঠিকানারই মতো। আমাদের আড্ডারও জায়গা। মতবিনিময় আর নির্ভেজাল আড্ডার এমন চমৎকার জায়গা আর নেই।

প্রেস ক্লাবে নারী-সদস্যদের সংখ্যা তখন খুব কমই ছিল, এখনও কম। তখন আসতেন দৈনিক বাংলার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হাসিনা আশরাফ (বর্তমানে প্রয়াত), প্রায় রোজই আসতেন আনোয়ারা খালাম্মা (তিনিও প্রয়াত)। প্রেস ক্লাবেই তাঁর দিনমান কাটতো। নিনির কথা তো আগেই বলেছি। আরও কয়েকজন সদস্যসহ হাতে গোনা ক'জন মাত্র।এখনও অবস্থা প্রায় একই রকম। আরও কয়েকজন নারী-সাংবাদিক সদস্য হয়েছেন। তবে মোট সদস্য সংখ্যার তুলনায় নারী-সদস্যের সংখ্যা এখনও অতি নগণ্য।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র বা সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমে নারী-সাংবাদিকের সংখ্যাই এখনও কম। যারা আছেন, তাদের অনেকেই এখনও সদস্য হওয়ার জন্যে আবেদন করেননি বা আবেদন করেও সদস্যপদ পাননি। আমি মনে করি, এই সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। শুধু প্রেস ক্লাবেই নয়, সংবাদপত্র, টিভি-রেডিওসহ গণমাধ্যমে নারী-সাংবাদিকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কারণ নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া মিডিয়া সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। সমাজের সকল ক্ষেত্রের মতো মিডিয়ার মূল স্রোতোধারায় নারীদের অংশগ্রহণ জরুরি। সমাজের অবক্ষয় রোধে মিডিয়ার এই ভূমিকাকে আজ জোরালো করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনেই মিডিয়ায় নারী-সাংবাদিকদের আরও বিপুল ও কার্যকর অংশগ্রহণ জরুরি।

একটি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট সমাজকে নাড়া দিতে পারে। একটি জোরালো সম্পাদকীয় বা একটি আবেদনময় ফিচার সমাজে অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে কোনও কোনও বিষয় ও ক্ষেত্র রয়েছে, যে বিষয়ে একজন নারী সাংবাদিক ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। অন্য সহকর্মীর চাইতে তার পক্ষে বিষয়ের গভীরে পৌঁছানো তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

অনেক বিষয় আছে, যে-বিষয়গুলোতে নারীরা এমনিতেই যথেষ্ট সংবেদনশীল। অনেক সাংবাদিককে এখনও যথেষ্ট সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধির। যেমন নারী নির্যাতিত হলে, ধর্ষিত হলে বা খুন হলে তাকে 'খারাপ মেয়ে' প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না। আশা করি তাকে 'মক্ষীরাণী' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করবে না। চরম আইন-শৃঙ্খলাহীনতার এই ভয়ঙ্কর সময়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে। ঘটছে নৃশংস থেকে আরও নৃশংস উপায়ে।

আজ সারা পৃথিবীব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের আওয়াজ উঠেছে। নারীর প্রতি দয়ার কারণে নয়, সমাজের উন্নয়নের স্বার্থেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে জীবনের মূল স্রোতোধারায় নারীর অংশগ্রহণ আজ জরুরি। কারণ নারীকে পেছনে রেখে বিশ্বের অগ্রগতি আজ থমকে যাওয়ার পথে। তাই নারীকে চাই জীবনে চলার পথে সকল কর্মকাণ্ডে। নারীকে হতে হবে সমান অংশীদার।

সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। পঞ্চাশের দশকে অল্প কয়েকজন নারী সাহসিকতার সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশায় এগিয়ে এসেছিলেন। সেই পথ ধরে বহু নারী আজ সাংবাদিকতা পেশায় এসেছেন। তখন যে সংখ্যা ছিল দুই অথবা পাঁচ, তা আজ বেড়ে দেড় শ' তে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন বেগম সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম, পঞ্চাশের দশকে সংবাদের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে এসেছিলেন লায়লা সামাদ, দৈনিক অবজারভারে ষাটের দশকে রাজিয়া খান প্রমুখ।

সাহসিকা সেই নারীরা সেদিন ঢুকে পড়েছিলেন পুরুষের রাজ্যে। দুর্গম পথে তারা সেদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে যে, একদিন নারী এই অগম্য যাত্রায় যোগ দেবে।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যম মুখর হবে নারীর কর্মময় উপস্থিতিতে। সেদিনের তুলনায় নারীদের উপস্থিতি বেড়েছে। আরও বেড়েছে তাদের কর্মস্পৃহা, সাহস ও বলিষ্ঠতা। কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিয়োজিত মোট কর্মী সংখ্যার তুলনায় নারীর উপস্থিতি এখনও নগণ্য। বর্তমানে দেশে ৩০৬টি দৈনিক পত্রিকাসহ দু' হাজারেরও বেশি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এসব পত্রিকা ও সংবাদ-সংস্থায় সাড়ে ৭ হাজার সংবাদকর্মী কর্মরত। নিয়মিত সাংবাদিকের সংখ্যা আড়াই হাজার। এই আড়াই হাজারের মধ্যে নারী সাংবাদিকের সংখ্যা ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকসহ দেড় শ' জনের বেশি নয়। নীতিনির্ধারণী পদগুলোতে নারীরা এখনও অনুপস্থিত বললেই চলে। এ আমাদের সকলেরই উদ্বেগের কারণ। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এই নিবন্ধের লক্ষ্য। সে কি এই জন্যে যে, সাংবাদিকতা করার মতো নারী-রা যথেষ্ট মেধাবী নয়, নাকি সংবাদপত্রে উপযুক্ত স্থান করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট সুযোগ নারীরা পাচ্ছেন না? এই প্রশ্নগুলো আজ খতিয়ে দেখা জরুরি।

সমান শিক্ষা, সমান প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে মেয়েরা যে ভালো করতে পারে, তার প্রমাণ মেয়েরা সকল ক্ষেত্রেই রেখেছে। সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েরা অনেক ভালো ফল করে আসছে। মেধা তালিকায়ও তারা বহু স্থান দখল করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও সকল বিষয়ে মেরিট লিস্টে শীর্ষে থাকছে মেয়েরাই। বৈজ্ঞানিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, মেধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

মেয়েরা মেধার দিক থেকে কোনওভাবেই পুরুষের চাইতে পিছিয়ে নেই। সারা বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা তার প্রমাণ রেখেছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার বড় বড় কোম্পানির শীর্ষপদগুলো অধিকার করে রয়েছে মেয়েরাই। এতেই প্রমাণ হয় মেধার অভাব নয়, সুযোগের অভাবই সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ।

এই সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে নারীকে মস্তিষ্কহীন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। তাকে ঘরে বদ্ধ করে রেখেছে। চেষ্টা করেছে তাকে শিক্ষার আলোকবঞ্চিত জড়বস্তুতে পরিণত করতে। যখন তা পারেনি, তখনও চেষ্টা করেছে নারীদের নানাভাবে হেয় প্রমাণ করতে। গৃহ থেকে রাষ্ট্রে, সর্বত্র এই চেষ্টা এখনও অব্যাহত। যে কোনও পেশাতেই নারীরা এগিয়ে এলেও এখনও তাদের হেয় করার, অযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা এখনও রয়েছে। এমনকি তিনি যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীও হন, তাহলেও। কূপমণ্ডুক পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা সমাজে এখনও ক্রিয়াশীল। এ তারই ফল। পশ্চাৎপদ এই চিন্তা নারীকে এখনও পেছনে ঠেলে রাখতে চায়।

সমাজের মনোভঙ্গিও তৈরি করে এক ধরনের বাধা। যা নারীর কাজ ও পুরুষের কাজ– এই ধরনের অলীক চিন্তার জন্ম দেয়। এর ফলেই সকল পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর মনে এক মানসিক বাধা তৈরি করে। বিশেষ করে যে পরিবারগুলো থেকে এই নারীকর্মীরা কাজ করতে আসবেন, সেখানে সৃষ্টি হয় এক অনিচ্ছুক পরিবেশ এবং ক্রমে বাধার দেয়াল। তবে এসবের ব্যতিক্রমও রয়েছে। অনেক পরিবার এখন মেয়েদের কাজ করতে উৎসাহিত করছে। মেয়েরাও সব বাধা-নিষেধ ভেঙে কাজ করতে এগিয়ে আসছেন। তারা এগিয়ে আসছেন

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও। কিন্তু সমাজ-পরিস্থিতি, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এখনও নারীদের সাংবাদিকতার পথে বাধা। পত্রিকাগুলোর কর্তৃপক্ষও নারীদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সমস্যা দূর করার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। নারী সাংবাদিক যারা ডেস্কে রাত্রিকালীন দায়িত্ব পালন করেন, তাদের বাড়ি ফেরা ও নিরাপত্তার জন্যে কর্তৃপক্ষ কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে গভীর রাতে অটোরিকশায় করে নারী সাংবাদিকদের একা একা বাড়ি ফিরতে হয় মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে।

নিরাপদ ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা থাকলে ডেস্ক বা রিপোর্টিংয়ে সকল নারী-সাংবাদিকই নিশ্চিন্তে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এই বাধাগুলো দূর করার দিকে ও কাজের পরিবেশ সৃষ্টির দিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তেমনটি হলে আরও অনেক বেশিসংখ্যক নারী সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেবেন। কিন্তু যারা এসেছেন, তারাও যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন না কাজের যোগ্য পরিবেশ। প্রশিক্ষণের সুযোগ। কখনওবা তাদের কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে না। স্বীকৃতি পাচ্ছেন না যোগ্য কর্মীরা। তাই অনেকে আবার ঝরেও পড়ছেন এই পেশা থেকে।

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, কোনও প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ এলে পুরুষ সাংবাদিক পাঠানো হয়। নারী সাংবাদিকরা এ সুযোগ কমই পেয়ে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি নারী সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংবাদ-মাধ্যমই লাভবান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা লক্ষ্য করেছি, নারী সাংবাদিকরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি ও বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ফলে নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারী-সাংবাদিকরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশে বহু নতুন পত্রিকা ও তিনটি নতুন বেসরকারী টিভি চ্যানেল চালু হওয়ার ফলে মেয়েদের কাজ করবার সুযোগ বেড়েছে। প্রথম বেসরকারী একুশে টিভি চ্যানেল নারীদের জন্যে কাজের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রিপোর্টিংয়ে এগিয়ে আসেন অনেক নারী-সাংবাদিক। বর্তমানে একুশে টিভি বন্ধ হয়ে গেলেও এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, এনটিভি প্রভৃতি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহু নারী-সাংবাদিক যোগ্যতার প্রমাণ রাখছেন। নতুন কর্মক্ষেত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে নতুন কর্মস্পৃহা ও সাহস। কঠোর পরিশ্রম করে তারা তাদের যোগ্য স্থান করে নিচ্ছেন।

প্রিন্ট মিডিয়াতেও অনেক নারী-সাংবাদিক আজ শিফট-ইন-চার্জের দায়িত্বসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। অনেকেই রিপোর্টিংয়ে ভালো করছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিটে রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব পালন করছেন সাফল্যের সঙ্গে। এটাই প্রমাণ করে যে, দায়িত্ব পেলে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে, যোগ্য কাজ পেলে, সেই কাজের উপযুক্ত মূল্যায়ন করা হলে নারী-সাংবাদিকরা সাফল্যের ও যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারেন।

মিডিয়ায় নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে প্রশিক্ষণের সুযোগ। সাংবাদিক নারীদের যোগ্য দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিলে মিডিয়ার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। সমাজের অবক্ষয় রোধে মিডিয়া তার দায়িত্ব আরও জোরালোভাবে পালন

www.pathagar.com

করতে পারবে। তাই নারীর স্বার্থে নয়, মিডিয়ার স্বার্থে, সমাজেরই স্বার্থে সংবাদ-মাধ্যমে নারীর জন্যে আরও কাজের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করা এখন জরুরি। নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ যেমন এগুতে পারবে না, মিডিয়াও পারবে না কার্যকর জোরালো ভূমিকা রাখতে।

নারী-সদস্যদেরও প্রেস ক্লাবে যাতায়াত বাড়ানো দরকার। শুধু সদস্য হলেই তো হবে না, এর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তি বাড়ানো নারী-সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব। এই ক্লাব আমাদের সবার। এর ৫০ বছর পূর্তির আনন্দময় লগ্নে আমরা যে যুক্ত হতে পারছি, এ আমাদের সৌভাগ্য। প্রেস ক্লাব নানাসময়ে অনেক প্রখ্যাত শিল্পীদের ক্লাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাঁরা এখানে অনুষ্ঠান করেছেন। সুবর্ণজয়ন্তির এই লগ্নে মনে পড়ছে সেইসব স্মৃতি। বিশেষ করে মনে পড়ছে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা। প্রেস ক্লাবের সৌজন্যে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত আমার প্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে খুব কাছে থেকে দেখার ও তাঁর গান শোনার। এ আমার পরম সৌভাগ্য। প্রেস ক্লাবে আরও অনেক প্রখ্যাত শিল্পী, অভিনেতাকে নানাসময় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা, দিলীপ কুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। সুবর্ণজয়ন্তির এই লগ্নে সেইসব সুন্দর স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। আরও অনেক জয়ন্তি, সুবর্ণ-মুহূর্ত ফিরে ফিরে আসুক, আজকের এই লগ্নে সেই প্রার্থনাই করছি।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের সিনিয়র সাব এডিটর

www.pathagar.com

আমাদের সাংবাদিকতা

রোজী ফেরদৌস

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা বর্তমানে দু'ভাগে বিভক্ত। সেটি যেমন প্রিন্ট মিডিয়াতে, তেমনি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও। দেশের রাজনৈতিক ধারাকে ভিত্তি করে প্রধানতঃ সাংবাদিকতার এই ধারা প্রবহমান। মূলতঃ সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ। এখন সরকারী দল বলতে বোঝায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে। বিরোধী দল বলতে আওয়ামী লীগ। অন্যান্য দল যেমন জামায়াতে ইসলামী বা বাম দল থাকলেও তাদের শক্তি ও প্রচারের প্রাধান্য ততটা নয়। দেশের বর্তমান সাংবাদিকতাও এই প্রথম দু'টি ধারার সঙ্গেই চলমান। তাই এখানে বিএনপিমনস্ক সাংবাদিক এবং আওয়ামী লীগমনস্ক সাংবাদিকের দু'টি স্রোত দৃশ্যমান। বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর দিকে খেয়াল করলেই এ বক্তব্যের সত্যতা মিলবে।

দেশের পত্রিকাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত নামী পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক। এটি সেই অর্থে প্রাচীন না হলেও একেবারে তরুণও নয়। পাকিস্তান আমল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে বলে একে প্রবীণ বলা যায়। এখনও পত্রিকা জগতে দৈনিক ইত্তেফাকের মর্যাদা পবিত্র কোনও গ্রন্থের মত। এখানেও রয়েছেন দুই ঘরানার, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মনস্ক সাংবাদিকগণ। তবুও এর কর্ণধার দুই সহোদরের তীক্ষ্ম ও গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ পত্রিকাটিকে একক কোনও দলগত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেনি। যদিও তারাও দুই ঘরানার সাংবাদিক। তাই এর প্রধান সংবাদ শিরোনাম, সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস, পর্যালোচনা, উপস্থাপনা সব কিছুতেই এখনও নিরপেক্ষতার একটি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। এখানেই দৈনিক ইত্তেফাকের সার্থকতা।

দৈনিক আজাদ দেশের প্রাচীনতম পত্রিকা। তবে অধুনালুপ্ত। এটি নিয়ে তাই আলোচনা করলাম না। অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা এদেশের সাংবাদিকতায় নতুন বেশ কিছু ধারা প্রবর্তন ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটি স্বাধীনতা পূর্বকালের। রাজনীতি ও সময় পাল্টালে পত্রিকারও চরিত্র পাল্টায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নিরপেক্ষতার একটি পতাকা দৈনিক সংবাদও তুলে ধরতে চায়। তবে পরবর্তীকালে দৈনিক সংবাদ আওয়ামী লীগের কণ্ঠেই কথা বলতে শুরু করে। সংবাদের প্রায় প্রতি জন সাংবাদিকের পরিচিতি ঘটে আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিক হিসেবে।

www.pathagar.com

পত্রিকার মালিক, সম্পাদক থেকে প্রত্যেককেই দেখা যায় এক একজন আওয়ামী দলীয় সাংবাদিক হিসেবে। মাঝে মধ্যে দু'একজন জাতীয়তাবাদী সমর্থককে তারা গ্রহণ করলেও পরে তাদের অন্যত্র দেখা যায়। তবুও দৈনিক সংবাদের সুদৃঢ় একটি ভিত্তি আছে। সংবাদের প্রতিটি সংবাদ থাকতো সুলিখিত, সুসম্পাদিত। কোনও সংবাদকে অতিরঞ্জিত বা সর্বৈব মিথ্যা বলে মনে হতো না। সংবাদের এই কর্মকাঠিন্যই ছিল বেঁচে থাকবার মূল শক্তি। একই সঙ্গে এই শক্তিই সংবাদ পত্রিকার কর্মীদের আওয়ামী ঘরানার মনে করা সত্ত্বেও একটি গ্রাহ্য অবস্থান দিয়েছেন তাদের।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েরও কিছু পরে আত্মপ্রকাশ করে দৈনিক ইনকিলাব। এই নামটির মধ্যেই কোথায়ও যেন ছিল ইসলামী শক্তির পুনর্জাগরণের গন্ধ। তাই দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষদের মধ্যে পড়ে যায় মার-মার কাট-কাট ভাব। এক সময় মনে হতে থাকে, ইসলাম বিষয়ক যে কোনও ঘটনার সমাধানই হচ্ছে ইনকিলাব। ইসলাম ও পাকিস্তানকে যারা একার্থক মনে করেন, তাদের অনেকেই বলেন, ইনকিলাব নয়, ওটি পাকিস্তান। ওরা পাকিস্তানের সমর্থক, ওরা পাকিস্তানীদের দোসর। ওই পত্রিকায় যারা কাজ করেন, অর্থাৎ সাংবাদিক, তাদেরও চিহ্নিত করা হয় পাকিস্তানী রাজাকার বা আল্-বদরদের সমর্থক হিসেবে। এ পত্রিকার সাংবাদিকদের মধ্যেও এমন একটা ভাব আছে যে, তাদের দায়িত্ব ইসলাম রক্ষার। ভারত বিরোধিতা তাদের দায়িত্ব। তাই ভারতের বিপক্ষে কোনও রাজনৈতিক বিষয় এলে ইনকিলাবে সে সংবাদ প্রাধান্য পায় শিরোনাম হিসেবে স্থান পেয়ে। ইনকিলাব পত্রিকা ও তার সাংবাদিকরা দেশের প্রশ্নে, ইসলামের প্রশ্নে, ভারত প্রশ্নে সর্বদাই অতি উচ্চকণ্ঠ। তবে শেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ ভারত প্রশ্নেও থাকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্যে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ। এই বিষয়গুলোর দিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে গিয়ে তারা প্রচণ্ড ভারত বিরোধিতারও যোগান দেন। যা কখনও কখনও প্রত্যক্ষভাবে হয়ে পড়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচরণ। এর সব ক'টি কারণে ইনকিলাবের সংবাদ যা রচনা করা হয়, সে হোক রিপোর্ট বা সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়– তার প্রায় সব কিছুরই অব্যর্থ লক্ষ্য থাকে, আওয়ামী লীগ ও ভারত।

একই রকম ধারণা জন্মে দৈনিক জনকণ্ঠ সম্পর্কেও। দৈনিক জনকণ্ঠ আওয়ামী লীগ ও ভারতকে সমার্থক বলে মনে করে, এটা অনেক সচেতন পাঠকের ধারণা। অনেকে বলেন, দৈনিক ইনকিলাব যদি হয় পাকিস্তান, তাহলে দৈনিক জনকণ্ঠ হচ্ছে হিন্দুস্তান। এমনকি যেসব সাংবাদিক দৈনিক ইনকিলাবে কাজ করেন, তাদেরকেও তারা মনে করেন পাকিস্তানের দোসর হিসেবে। দোসর শব্দটি বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় ঘৃণ্য হন্তারকের সহযোগী হিসেবে। দৈনিক জনকণ্ঠ ও তার অধিকাংশ সাংবাদিক নিজেদের মনে করেন আওয়ামী লীগের এক একজন কর্মী হিসেবে। এটি তাদের আচরণ দেখে মনে হয়। তারা এও মনে করেন, ভারতকে রক্ষা করার মহান দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তেছে। তাদের সংবাদ পরিবেশনের ধরন, বিষয় নির্ধারণ, শ্রেণীবিন্যাস এসবের মধ্যে থেকেও তাদের পাকিস্তান বিরোধিতার বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জাতীয়তাবাদের নাম শুনলেও যেন তাদের পূর্বপুরুষের চিতা হয় বহ্নিমান।

www.pathagar.com

এরপর একে একে এলো দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক যুগান্তর। অবশ্য এরও আগে থেকে ছিল দৈনিক জনতা, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা। আরও ছিল দৈনিক ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, যাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও কম সার্কুলেশনের জন্যে আলোচনায় স্থান পেতে বেগ পেতে হয়। দৈনিক প্রথম আলো এসেই আলোড়ন সৃষ্টি করে। তবে প্রকাশের আগ থেকেই জানা যায়, যিনি এ পত্রিকার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবেন, তিনি মন ও মানসিকতায় আওয়ামী সমর্থক সাংবাদিক। বাংলাদেশে আসলে পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক যে রাজনৈতিক দল সমর্থন করেন, মূলত পত্রিকার সাংবাদিককেও সেই মত ও পথ অনুসরণ করেই সংবাদপ্রবাহ সৃষ্টি করতে হয়। মালিক বা সম্পাদকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে পত্রিকার সাংবাদিকদের ঘটনা অবলোকন করতে হয়।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাটির সম্পাদকসহ বেশিরভাগ সংবাদকর্মী কঠিনভাবে আওয়ামী মনস্ক। এদের সংবাদ শিরোনাম, সংবাদের শ্রেণী বিভাগ, কলাম লেখক ও মতামত প্রদানকারীদের প্রায় সবই আওয়ামী সমর্থক বুদ্ধিজীবী। এখানেও দু'চারজন জাতীয়তাবাদ সমর্থক সাংবাদিক আছেন। তাদের প্রায় সবাই সম্পাদকের মতামতে চলতে বাধ্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

ইংরেজি দৈনিকগুলোর মধ্যে দি নিউ নেশন, দি অবজারভার, দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট, ডেইলী স্টার, নিউ এজ, নিউজ টুডে অন্যতম। নিউ নেশন, নিউ এজ, নিউজ টুডে, ইণ্ডিপেনডেন্ট জাতীয়তাবাদী ঘরানার সাংবাদিকদের দিয়ে পরিবেষ্টিত। এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির সম্পাদক এক একজন কঠিন জাতীয়তাবাদীমনস্ক সাংবাদিক। প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসেবে এঁরা দেশ-বিদেশে সমাদৃত। এদের লেখনীতে তির্যক ভঙ্গিতে উঠে আসে আওয়ামী রাজনৈতিক ভুলের চুলচেরা বিশ্লেষণ। এদের নিউজ হেডলাইনও বেশিরভাগ সময় রাজনৈতিক বিবেচনাতেই স্থান পায়। তেমনি অবজারভার, ডেইলী স্টার পুরোপুরি আওয়ামী স্টাইলের, আওয়ামী হোমের সাংবাদিকতায় পূর্ণ। এ দু'টি কাগজের সম্পাদকগণ আওয়ামী রাজনীতির কঠিন সমর্থক। তাই তাদের সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের স্টাইলও থাকে সে রকম লক্ষ্যেই।

দৈনিক সংগ্রাম-এ ইসলামী চেতনা পুরোপুরি বিদ্যমান। এর মালিকানা, সম্পাদনা সর্বত্রই কঠিন ইসলাম মনস্কতার পরিচয় মেলে। এর সাংবাদিকগণও পূর্ণ ইসলামী ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত। এই পত্রিকাকে জামায়াত সমর্থক হিসেবে বলা হয়। এদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী দলের পার্থক্য শুধু কাঠিন্য-কোমলের। কারও বহিঃপ্রকাশ রূঢ়, কারও খানিকটা নমনীয়। তবে এদের সংবাদে প্রায় সব সময়ই যেমন ইসলামী বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়, তেমনি ভারত বিরোধিতাও করা হয় কঠিনভাবে। এ কারণে একে ইনকিলাব ঘরানার পত্রিকাও বলা হয়।

কখনও কখনও কঠিন বা উগ্র সমর্থক পত্রিকাতে দু'একজন অন্য রাজনৈতিক দলের সাংবাদিককেও নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। তার পেছনেও উদ্দেশ্য থাকে অর্থনৈতিক। যে দল ক্ষমতায় আসবে, সেই দলীয় দু'একজন সাংবাদিক থাকলে বিপদের সময়ে তারা সেই পত্রিকার হয়ে 'নেগোসিয়েশন' করেন। অনেক সময় চাকরির স্বার্থে অনেক সাংবাদিককে

www.pathagar.com

নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা নিয়ে বিরোধী পত্রিকাতে কাজ করতে দেখা যায়।

সংবাদ সংস্থা আছে দু'টি। একটি রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বা বাসস। অপরটি ইউনাইটেড নিউজ এজেন্সী বা ইউএনবি। বাসস সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে এর মেজাজটাও সরকারী সরকারী। তবে বাসস থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বিরোধী দলীয় সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ক্রীড করা হয়। এখানে যেমন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের সংবাদ ক্রীড করা হয়, একইভাবে বিরোধী সংসদ সদস্যদের সাক্ষাৎকার বা সংবাদও ক্রীড করা হয়। মিথ্যা বা বানোয়াট কিংবা প্রভাবিত করার মত সংবাদ এখান থেকে কোনওভাবেই ক্রীড করা হয় না। এখানে বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন সঙ্কটের ইতিবাচক সংবাদকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বাসস'এ কর্মরত প্রতিটি সাংবাদিককে অত্যন্ত কঠোর সচেতনতার মধ্য দিয়ে সংবাদ তৈরি ও সম্পাদনা করতে হয়। কোনও ধরনের জারিজুরি সেখানে অচল। এখানে দুই ঘরানার সাংবাদিকদেরই একত্রে বসবাস। বাসস'এর সংবাদ রেডিও, টেলিভিশনসহ প্রায় প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রতিদিন স্থান পায়। বাসস থেকে প্রতিদিন দেশী-বিদেশী মিলিয়ে এক শ'রও বেশি সংবাদ ক্রীড করা হয়। এসব বিবেচনায় বাসস'এর কার্যক্রম কষ্টিপাথরে যাচাই-এর সফলতায় উজ্জ্বল।

ইউএনবি একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা। এখানেও প্রতিটি সংবাদকে সত্যের নিক্তিতে মেপে প্রকাশ করা হয়। এখানেও আছেন দুই ঘরানার সাংবাদিকগণ। যদিও মালিকপক্ষ জাতীয়তাবাদী মানসিকতার। তবে এখানে ব্যবসায়িক দিক থেকে বিবেচনা করা হয় প্রতিটি সংবাদকে। কঠোর ও প্রখর ব্যক্তিমালিকানা বিরাজ করায় সাংবাদিকদের নিজেদের মতাদর্শ দেখাবার সুযোগ কম। আর এসব কারণেই ইউএনবি'র সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা দুটোরই ভাবমূর্তি সার্থকতায় ভাস্বর।

টিভি চ্যানেলগুলোর দিকে তাকালেও পত্রিকার বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকমভাবে এখানেও চোখে পড়বে। বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকার নিয়ন্ত্রিত। সে কারণে এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবার জানা। এরপর দেশের প্রথম বেসরকারী টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলা। তবে এরও আগে এটিভি বা আজিজ টিভি আওয়ামী সরকারের সময় সংবাদ ও কিছু অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছিল। ইরাকের পক্ষে অতিরিক্ত সংবাদ ও মতামত প্রচার হওয়ার পরে এটিভি'র মৃত্যু ঘটে। এটিএন বাংলা প্রথম চার-পাঁচ বছর শুধু হিন্দি ছায়াছবির গান ও পরে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এরই মধ্যে দেশে চলে আসে ইটিভি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ছিল সেটি। ইটিভি'র সংবাদ ও অন্য অনেক কিছুতেই তার প্রভাব পড়ে। সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার বা মতামত বিষয়ে আওয়ামী সাংবাদিক ও আওয়ামী ঘরানাই প্রাধান্য পেতো। পরবর্তীকালে ইটিভি'র লাইসেন্স বাতিল করে বিজ্ঞ আদালত।

এরপর চ্যানেল আই ও সর্বশেষে যাত্রা শুরু হয় এনটিভি বা ন্যাশনাল টেলিভিশনের। চ্যানেল আই'এর কর্ণধার বা অংশীদারবৃন্দ আওয়ামীমনস্ক। তাদের অনুষ্ঠান ও সংবাদে থাকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যক্রমের প্রাধান্য। সেখানে সংবাদ পর্যালোচনা যারা করেন, অথবা আজকের কাগজ স্পন্সরকৃত যে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, সেখানেও থাকেন দৈনিক

www.pathagar.com

সংবাদপত্রগুলোর আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিকগণ। উপস্থাপক থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রেও ৯৮ ভাগ থাকে আওয়ামী মনস্কদের প্রাধান্য। মাঝে মধ্যে দু'একজন অত্যন্ত নামী বা প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক যেমন প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদককে দেখা যায়।

এটিএন বাংলার আলোচনায় সংবাদ প্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটিএন বাংলার মালিক প্রধানতঃ আওয়ামী লীগ ঘরানার। তবে তিনি সংবাদে সেই বিষয়ে অতি উচ্চকণ্ঠ হওয়া পছন্দ করেন না। ওখানে যারা উপদেষ্টা বা সংবাদের সঙ্গে জড়িত আছেন, তাদের কেউ জাপা মনস্ক, কেউ জাতীয়তাবাদী, কেউ কঠিনভাবে আওয়ামী মনস্ক। সংবাদ কক্ষে প্রধানতঃ তারই ভূমিকা বেশি, যার পদবী নিউজ এডিটর। এটি যেমন সংবাদপত্রে, তেমনি টিভি চ্যানেলেও। প্রথম অবস্থায় সেখানে জাতীয়তাবাদী মনস্ক মালিকও ছিলেন। তবে তিনি ওই 'ত্রয়ীর' কাছে সব সময় টিকে থাকতে পারছিলেন না। এ কারণে তিনি পরে এনটিভি'র মত চ্যানেল গড়ে তোলার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এটিএন বাংলার সংবাদ অবশ্য খুব মেপে বুঝেই সম্প্রচার করা হচ্ছিল। এখনও সেই টান টান ভাবটি রয়ে গেছে। কখনও কখনও এটিএন বাংলাকে মনে হয় আওয়ামী ঘরানার, কখনওবা জাতীয়তাবাদী। এটিএন বাংলার বুঝে চলার ও সেভাবে সংবাদ পরিবেশনার এই চমৎকারিত্বই এটিএন বাংলার প্রাণ। তবে এর সংবাদ পর্যালোচনায় উপস্থাপক ও আলোচকদের সরব উপস্থিতি মাঝে মধ্যে আওয়ামী ঘরানার দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ে।

বাকি রইলো এনটিভি। মাঝে বলেছি, এটিএন বাংলার মালিকদের এক অংশ বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন এনটিভি। এনটিভিতে প্রায় সবাই জাতীয়তাবাদী ঘরানার সাংবাদিক। তাদের মনমানসিকতাও তাই অনেকটা সেই ধাঁচের। তাদের সংবাদ পর্যালোচনাতেও থাকে জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সাংবাদিকদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। তবে ব্যবসায়িক দিকটিও থাকে তাদের নখদর্পণে। সে কারণে বিরোধী দলীয় নেত্রী বা তাদের সংসদ সদস্যদের বক্তব্যও তারা ধারণ, সম্প্রচার করেন। ২১ আগস্টের (২০০৪) বর্বর ঘটনার সত্যিকার দর্পণ তারা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন জনসমক্ষে। তাদের এই ভূমিকা ছিল যথার্থ অর্থে সত্যিকার দেশসেব ও সৎ সাংবাদিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রায় প্রতিটি দেশেই দল-মত সমর্থনকারী পত্রিকা থাকে। থাকে টিভি চ্যানেল। তবে আমাদের দেশের মত এত তীব্র দর্শন ও তত্ত্ব এভাবে ফুটে ওঠে না। অনেক সময়েই সংবাদ শিরোনামে থাকে আক্রমণাত্মক শব্দ। কখনও তা প্রচ্ছন্ন, কখনও তা প্রকট।

দেশের রাজনৈতিক বিভাজনের মত সংবাদপত্রে ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এই বিভাজন রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ। রাজনৈতিক এই বিভাজন যেমন আমাদের গত ৩৩ বছরে এগিয়ে নিয়েছে ২০ বছর, তেমনি পিছিয়ে দিয়েছে ১৩ বছর। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে জোর কদমে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেলগুলো দুর্যোগকালীন স্বরূপে প্রকাশিত হয়। যেমন হয় বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের পীড়িত সময়ে। এবারের বন্যায় পত্রিকাগুলো, টিভি চ্যানেলগুলো দেখিয়েছে এক সুউচ্চ দৃষ্টান্ত। তারা দেশবাসীর সত্যিকার দৃশ্য উপস্থাপন করে হয়েছেন শ্রদ্ধাভাজন। সেখানে মাঝে মধ্যে সরকারের সমালোচনা হলেও সেসব ছিল যথার্থ।

www.pathagar.com

ঠিক একইভাবে ২১ আগস্টের বোমা হামলার জঘন্য ঘটনাটিকেও তারা তুলে ধরেছেন প্রায় একই মাত্রায়। আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুকে সবাই দেখেছেন একেবারে আপনজনের মত। মনে হয়নি আইভি রহমান আওয়ামী লীগের না জাতীয়তাবাদী। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে দেশবাসী কেঁদেছেন। সে সংবাদটিকেও সবাই গুরুত্বের সঙ্গে সম্প্রচার করেছে। আমাদের আসলে প্রয়োজন সকল দুঃখে সকল আনন্দে এমন এক সম্মিলিত সম্প্রচার ব্যবস্থা, যা দেখাতে পারেন সাংবাদিকগণ। আক্রমণের জন্যে আক্রমণ নয়। বিরোধিতার জন্যে নয় বিরোধিতা। সফলতা হলে সেটি বলতেও হোন উচ্চকণ্ঠ। ব্যর্থতা হলে সেটিও বলুন সহনশীলতায়। বঙ্গবন্ধু বড়, না শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া বড়, এই কঠিন ও তীব্র বিরোধপূর্ণ অনৈক্য যতদিন থাকবে, ততদিন সাংবাদিক, সংবাদপত্র, রাজনীতি ও দেশ সকলেই থাকবে একটি আবদ্ধ বলয়ে ঘূর্ণায়মান। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তাদের সফলতাটুকু গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে এগোতে হবে। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে, দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করতে এর কোনও বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, মূলত: এই তিন রাজনৈতিক অনুষঙ্গ বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমাদের সচেতন সাংবাদিকগণকে অসচেতন করে রাখছে। দেশের স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তখন ছিল না উগ্র ধর্মান্ধতা, ছিল না উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। ছিল শুধু দেশ স্বাধীন করার মহান তীব্র বাসনা। তাতে যদি 'উদগ্র' বা 'অতি' এসব শব্দ যুক্তও হয়, তবু তাতে কোনও নেতিবাচকতা প্রকাশ পায় না। স্বাধীনতা এমনই প্রিয়, এমনই আত্মীয়, এমনই বাসনা, তাতে যে কোনও তীব্রতা সংযুক্ত হতে পারে। সেই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ও কঠিন ইচ্ছার জোরেই আমরা পেরেছিলাম প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে। তখন আমরা ছিলাম না সরকারী-বেসরকারী, বিরোধীপক্ষ। ছিলাম শুধু দেশপ্রেমিক নির্ভীক এক জাতি। অথচ আজ স্বাধীনতার ৩২ বছর পরেও বলতে হয় বাংলাদেশের সাংবাদিকতাও দু'টি ঘরানার ছায়ায় ও কায়ায় লালিত। এক পত্রিকা বের করেন যশোরে বাংলা ভাই-এর সংবাদ। অন্য পত্রিকা প্রকাশ করেন ফরিদপুরে পুঁতে রাখা বোমার সংবাদ। যার পুরোটাই পরে প্রমাণিত হয় বানোয়াট সংবাদ হিসেবে। শুধু এসবই নয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দু'টি ঘরানায় রয়েছে কিছু নির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবী বা কলাম লেখক। পাঠক ওই লিখন থেকে যার যার মত আসল তথ্যটুকু জেনে নেন। বাড়তি মেদটুকু ফেলে দেন। এই বাড়তি মেদই হচ্ছে দুই ঘরানার সেবাপুষ্ট মানসিকতার স্থূলতা।

আমরা ভুলে যাই, আমাদের সামনে এখন নেই ব্রিটিশ, নেই পাকিস্তানী, নেই কোনও হিন্দুস্তানী। আমাদের মূল শত্রু হচ্ছে দারিদ্র। আমাদের লড়াই করতে হবে সেই কঠিন তীব্র ভয়ঙ্কর দানব দারিদ্রের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকের কলম সদা সত্য কথা বলবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। সকল দেশবাসী ও আমি ভাই ভাই, বোন বোন। তবে অবশ্যই ভাইয়ের ভুল ভাই শুধরে দেবো। নিজের ভুল শুধরে নেবো। অলসতা নয়, নয় কর্মবিমুখতা। শিক্ষা নেবো। শিক্ষা প্রচার করবো। নয় অপপ্রচার । নয় হিংসা-বিভেদ। আলোর পথে

www.pathagar.com

চলবো। অন্যের পথে জ্বালবো আলো। বাংলাদেশকে নিয়ে যাবো বিশ্বের আলোকিত সভায়।

আর এই আলোকিত সংবাদ প্রবাহ তখনই সৃষ্টি হবে, যখন মনের আঁধার দূর হবে। মনের আঁধার দূর করতে চাই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার সেই ঐক্যবদ্ধ মিলন। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের এটাই মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

লেখক বাসসের সিনিয়র সাব এডিটর

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাব- '... রাফ ড্রাফ্‌ট অব হিস্ট্রি'

শিহাব সরকার

জাতীয় প্রেস ক্লাব নিয়ে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়! বরং চাঁছাছোলা ভাষায় বলা যেতে পারে–রীতিমতো অপমানজনক। যে দিনটির কথা বলছি, তার আগে প্রেস ক্লাবে আমি কখনও যাইনি। তখন সত্তর দশকের শুরুর দিক। দ্বিধাজড়িত পায়ে লেখালেখির ভুবনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। পত্র-পত্রিকায় টুকটাক কবিতা ও গল্প বেরুচ্ছে। তারিফও জুটছে কম নয়। এ সময়টায় ঢাকার তরুণ লেখকরা দল বেঁধে ক্লাবে পত্রিকা পড়তে যেতো, প্রায় সবাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমিও যাবো-যাবো ভাবছিলাম। তখন কেন জানি মনে হয়েছিল, লেখালেখি করি বলে সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও প্রেস ক্লাবের মতে বুদ্ধিবৃত্তির অনুকূল একটি প্রতিষ্ঠানে যাবার অধিকার আমাদের আছে। যেমন আমরা সুযোগ পেলেই চলে যেতাম পত্রিকা অফিসে।

আসলে আমরা অনাহূত হয়েই ক্লাব ভবনে ঢুকতাম। আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে না যেতে বলে সম্মানিত সাংবাদিক সদস্যরা আমাদের অনুগ্রহই করতেন বোধহয়। অনেকের আবার স্নেহস্নাত প্রশ্রয়ও ছিল নতুন দেশের উঠতি লেখকদের প্রতি। কিন্তু সবাই তো এক রকম নন। কেউ কেউ নিয়ম-নীতি শৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত। এঁরা বহিরাগতদের উপস্থিতিকে ভালো নজরে দেখতেন না। যদিও ষাট দশকের শেষদিকে এ নিয়ম আর ধরে রাখা যায়নি।

এক দুপুরে বন্ধু-বান্ধব কাউকে ক্যাম্পাসে না পেয়ে আমি একা গিয়ে পড়ছি ক্লাবে। ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের আদলে তৈরি তখনকার পুরনো লাল ক্লাব ভবনের নিচতলার বারান্দায় থাকতো সারিবাঁধা দৈনিক পত্রিকার ফাইল। বারান্দার লাগোয়া দরজা দিয়ে ঢুকলেই 'লাউঞ্জ', যার ফার্নিচার বলতে ছিল কয়েকখানা অতি সেকেলে আরাম কেদারা, একটা গোল বিশাল কাঠের টেবিল, কিছু হাতলঅলা চেয়ার। জহুর হোসেন চৌধুরী, এ বি এম মূসা, আহমদুল কবিরের মতো সিনিয়র ক্লাব সদস্যরা ওসব চেয়ারে নিয়মিত বসতেন। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও নিয়মিত ওখানে বসে আড্ডা গুলজার করতেন বলে শুনেছি। তাঁকে আমি দেখিনি।

আমার সেই দুঃখের দিনটির কথা বলি। আমি একমনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্ট্যাণ্ডে রাখা ফাইলের পত্রিকা পড়ে চলেছি। হঠাৎ একটা কর্কশ, ধমকে ওঠা গলায় চমকে উঠি। কে যেন

www.pathagar.com

আমাকে পেছন থেকে বলে উঠলো, 'এই যে!' আমি ভীষণ চমকে উঠে বক্তার দিকে তাকাই। ভড়কে যাবার মতো কিছুই নেই তাঁর চেহারায়। একহারা গড়নের ছোটখাটো একজন মানুষ, কাঁধে ঝোলানো বড়সড় একটা ক্যামেরা– বুঝলাম কোনও পত্রিকার ফটোগ্রাফার। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'প্রেস ক্লাবে মেম্বার ছাড়া কারও ঢুকবার পারমিশান নেই।' তিনি আমার চেহারা এবং মলিন লেবাস দেখে ঠিকই ধরে নিয়েছেন, আমি ক্লাবের মেম্বার নই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নামকরা বিভাগের ছাত্র এবং অনেকের প্রশংসাধন্য একজন তরুণ কবি হিসেবে ফটোগ্রাফার সাহেবের কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষে হজম করা কঠিন হলো। কিন্তু আমি একটা মজার স্টোরি পড়ছিলাম। ওটা আজ পড়ে শেষ করতে না পারলে আর কোনওদিনই পড়া হবে না। আমি অসহায়ের মতো বললাম, 'ভাই আর দশটা মিনিট।' ফটোগ্রাফার সাহেবের মন টললো না। তিনি গলা আরও কর্কশ করে বললেন, 'আপনি এক্ষুণি বেরিয়ে যান। আপনাকে যেন আমি আর ক্লাবে না দেখি।' আমি তখন খেয়াল করলাম, ঐ তরুণ ফটোগ্রাফারের চেহারা আসলে অত সরল নয়, বরং তাতে ফুটে উঠেছে ক্রূর, বোধশক্তিহীন নানান ধরনের রেখা। ভাগ্যিস, তখন আশেপাশে কেউ ছিল না! আমি মাথা নিচু করে, দুঃখ-অপমানে জ্বরাক্রান্ত হতে হতে ক্লাবের বারান্দা থেকে বেরিয়ে এলাম।

সত্তর দশকেই সাংবাদিক হিসেবে ক্লাবের স্থায়ী সদস্য হওয়ার পর আমি এক দুপুরে লাউঞ্জের পাশের ঘরটায় দুপুরের খাবার খাচ্ছি। হঠাৎ মাথা তুলে দেখি, আমার সামনে দাঁড়ানো সেই তরুণ ফটোগ্রাফার। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাঁ হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'কিছু খাবেন? আমি ক্লাবের মেম্বার।' ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকের মুখটা কিঞ্চিৎ হাঁ হয়ে গেল। পরে আমি বহুদিন ক্লাবে যাইনি। যখন নিয়মিত যাওয়া শুরু করি, আমি সেই তরুণ ফটোগ্রাফারকে অনেক খুঁজেছি। প্রথম দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি তাঁর নাম জানারও আগ্রহ বোধ করিনি। ফলে অন্য সদস্যদের জিজ্ঞেস করে আমার পক্ষে তাঁর হদিস বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে আমি গত ছাব্বিশ বছরে ক্লাবে দেখিনি। আমার কাছে ব্যাপারটা এখনও রহস্যে ঢাকা।

যেদিন স্থায়ী সদস্য হিসেবে আমি প্রেস ক্লাবে ঢুকি, সেটা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতাগুলোর একটি। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা পর্যন্তই। আমার আড়ষ্টতা তখনও কাটছিল না। আমাকে ক্যান্টিনের টেবিলে বসে পুরি-চা খেতে দেখে অনেকে অবাক চোখে তাকালো। আমি বারবার ডাকলেও বেয়ারা আসে না, কারণ আমার চেহারা নতুন, আমার কণ্ঠ অনুচ্চ। আমার কেবলই মনে হতে থাকে, তরুণ-প্রবীণ সব সদস্য আমাকে লক্ষ্য করছেন। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আমার সমসাময়িক অনেক সাংবাদিক তখনও ক্লাবের সদস্য হননি। ঐ সময়, অর্থাৎ সদস্যপদ লাভের প্রথম দিকে, প্রেস ক্লাবে আমাকে স্বচ্ছন্দ হবার ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, শফিকুল আজিজ মুকুল, ফিউরি খোন্দকার, আশরাফ খান প্রমুখ। এঁদের প্রাথমিক উষ্ণ সাহচর্য না পেলে আমি হয়তো আজও শুধু খাতায় নাম থাকা এবং নিয়মিত চাঁদা দেয়া সদস্যই থেকে যেতাম। এই মহান ক্লাবের ক্রমশ বেড়ে ওঠা এবং ধীরে ধীরে বিস্তৃত এর নানামুখী কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষ সাক্ষী

www.pathagar.com

হতে পারতাম না।

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে সামান্য ক'জন সাংবাদিক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এটিকে কাজের অবসরে নানান ধরনের সাংবাদিকের হালকা আলাপ-আলোচনা এবং বিনোদনের একটি স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা দেখতে চেয়েছিলেন। এক অর্থে ক্লাবের মূল চরিত্র এখনও তাই। তবে গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতির সূচনা হয়েছে, সাংবাদিকদের ক্লাব কি তা থেকে দূরে থাকতে পারে? ষাট কি সত্তর দশকে প্রেস ক্লাবের পাঠাগারে ছিল হাতেগোনা কিছু বই, যার বিশাল অংশ জুড়ে ছিল গল্প-উপন্যাস। নতুন ভবনে ক্লাব স্থানান্তরিত হওয়ার পর, একে একে খোলা হয় এর অজস্র শাখা। এগুলোর মধ্যে রিডিংরুম বা পাঠাগার অন্যতম। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি 'ওভারহল', ক্লাবের পাঠাগারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কত ধরনের পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, রেফারেন্স বই এখন পাঠাগারে! সেই সঙ্গে সাহিত্য-নির্ভর বইও আছে। আজকাল যেদিন ক্লাবে যাই, আমার পুরোটা সময় এখানেই কাটে। চমৎকার কাটে।

আশি দশক থেকেই পর্যায়ক্রমে ক্লাবের রেনোভেশান চলছে। ফলে আদি সদস্যদের অনেকে ক্লাবে বহুদিন পর এসে ধন্দে পড়ে যান। সম্প্রতি ক্লাবের কাঠামোগত যে ঢালাও পরিবর্তন হয়েছে, তা রীতিমতো চোখ ধাঁধানো। এক তলায় সদস্যদের বিশাল লাউঞ্জ, রিসেপশান, লবি, সদস্যদের ক্যান্টিন, বিশাল অডিটোরিয়াম, দোতলায় ভিআইপি লাউঞ্জ, ছোট দুটি অডিটোরিয়াম, গেস্টরুম, কার্ডরুম, জিমনেশিয়াম, লাইব্রেরি, ইত্যাদি মিলিয়ে এলাহী ব্যাপার। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা এখন পাঁচ শ'র কাছাকাছি। সব সদস্য হয়তো নিয়মিত আসেন না, তবু যাঁরা হাজিরা দেন সকাল-বিকাল, তাঁদের বিরতিহীন আড্ডা এবং গল্প-গুজবে ক্লাব মুখর হয়ে থাকে। অবশ্য ক্লাবে এখন কেবল আড্ডাই হয় না। প্রফেশনাল ক্লাব বলে অনেক সাংবাদিক এখানে বসেই পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত অতিরিক্ত কাজ সেরে নেন। তথ্যপ্রযুক্তির সর্বশেষ সংযোজনে ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি সুবিধা ক্লাবের সদস্যদের জন্যে লাইব্রেরিতে খোলা হয়েছে অনেক দিন হলো। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবের মতো পরিপূর্ণ ক্লাব বোধ করি দ্বিতীয়টি নেই।

ষাট-সত্তর দশকের ছায়ানিবিড়, নিরিবিলি ক্লাবটি এখনও আমার চোখে ভাসে। ছোট ক্যান্টিনে স্থান সংকুলান হতো না বলে অনেক সদস্য বিকেলে ক্লাবের পেছনের আঙিনায় ভেতর থেকে চেয়ার টেনে এনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন। প্রতি বিশে ফেব্রুয়ারিতে এই খোলা চত্বরে সন্ধ্যা থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি রাত বারোটা এক মিনিট পর্যন্ত চলতো গণসঙ্গীতের আসর। তারপর ফুল নিয়ে ক্লাব সদস্যদের প্রভাতফেরি। এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল ওতে। এখনও বিশে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে শুরু হয় কবিতা পাঠের আসর, সঙ্গীতানুষ্ঠান, তারপর বারোটা এক মিনিটে প্রভাতফেরি। এদিনের অনুষ্ঠান ছাড়া প্রতি ২০ অক্টোবর জাঁকজমক করে উদযাপন করা হয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এসবের ফাঁকে ফাঁকে বসে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের গান বা যন্ত্রসঙ্গীতের আসর। কয়েক বছর আগে প্রবাদপ্রতিম সিনেমার নায়ক দিলীপ কুমারকে দেয়া হলো বিশাল সংবর্ধনা। মোট কথা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

প্রায় সারা বছর ক্লাব থাকে জমজমাট। ক্লাবের নিজস্ব উদ্যোগে সেমিনারও হয় নিয়মিত। এর পরেও না বলে পারি না, আমরা যেন একটু বেশি ফর্মাল হয়ে পড়েছি। ক্লাবের সার্বিক তৎপরতায় কিসের যেন একটা উত্তাপ অনুভব করি।- সেটা হয়তো নির্ভার অন্তরঙ্গতা বা প্রাণের উত্তাপ। অবশ্য, অন্ধ বিশ্বায়ন ও নির্লজ্জ কনজ্যুমেরিজমের এই যুগে প্রাণের স্পন্দন না খোঁজাই মঙ্গল। ওতে অন্তর্দহন তীব্র হয়।

এই সামান্য আক্ষেপ সত্ত্বেও সাংবাদিকতার সুস্থ বিকাশের জন্যে প্রেস ক্লাব জরুরি। বাংলাদেশে সাংবাদিকতার মান অনেক নিচে নেমে গেছে। এর মধ্যেও, এক বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী, শেষ পর্যন্ত 'জার্নালিজম ইজ দ্য ফার্স্ট রাফ ড্রাফ্‌ট অব হিস্ট্রি.....' ১৯৬৯-৭০ এর জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং বাংলাদেশের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য।

লেখক দৈনিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট এর এসোসিয়েট এডিটর

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামল: যেসব খবর ছাপা যায়নি

সৈয়দ আবদাল আহমদ

স্বাধীন সংবাদপত্র একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের দর্পণ। গণতান্ত্রিক সমাজ মানেই বহুদলীয় সমাজ। আর বহুদল মানে বহুমতের অস্তিত্ব। সংবাদপত্র বহুমতের অস্তিত্ব প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাস করে। তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক নিবিড়। যেখানে অবাধ গণতন্ত্র, সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও অবাধ। গণতান্ত্রিক সমাজেই সংবাদপত্র তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজে একটি স্বাধীন সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে দোভাষীর কাজ করে থাকে। এতে লাভ হয় দেশের, লাভ হয় জনগণের।

তবে একটি স্বাধীন সংবাদপত্র সব দেশে সব কালেই স্বৈরশাসকদের জন্যে ত্রাস। তাই স্বৈরশাসক এবং সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দখল করে প্রথমেই সংবাদপত্রের উপর খড়্গহস্ত হন। সংবাদপত্রকে বেড়ি পরিয়ে তারা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে শৃঙ্খলিত করেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংবাদপত্র যে সেতু বন্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করে, স্বৈরশাসকরা তা বানচাল করে দেয়। সাংবাদিকতা হয়ে পড়ে শৃঙ্খলিত।

অবরুদ্ধ সংবাদপত্র কোনও সময়ই স্বৈরশাসকদের গণবিরোধী কর্মকাণ্ড, জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতির খবর জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে না। সংবাদপত্র তখন 'ক্যাপটিভ প্রেস'-এ পরিণত হয়। স্বৈরশাসকরা এভাবেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে নিজেদের শাসনক্ষমতা স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পায়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সরকারগুলোই সংবাদপত্রকে দমন ও বশীভূত করার পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এই সরকারগুলো সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে নানা পন্থায়। গোপনে অর্থ দেয়া, প্রকাশ্যে আর্থিক মঞ্জুরি, সরকারী বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকদের পদক ও খেতাব বিতরণ, বড় বড় খবরের কাগজের মালিকদের মন্ত্রিসভায় কিংবা ভেতরের রাজনৈতিক পরিষদে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে চলে সরকারের 'মূলা ও লাঠি' পদ্ধতির প্রদর্শন কৌশল। লাঠি কৌশল হচ্ছে স্বাধীনতা খর্বকারী নিবর্তনমূলক আইনের কঠোর প্রয়োগ, সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে চাপ দেয়া। যেমন সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর মূলা কৌশল হচ্ছে নগদ 'কিছু' দিয়ে মুখ বন্ধ রাখা।

www.pathagar.com

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে আমাদের দেশ এ ধরনের নির্যাতনের শিকার বেশি। বারবার স্বৈরশাসনের ফলে এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মনের দুরন্ত আশা আকজ্ক্ষাকে কোনও সময়ই এদেশের সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে চিত্রিত করতে পারেনি। এদেশের সংবাদপত্র বারবার বেড়ি পরেছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার ইশ্তিয়াক আহমদের মতে: এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারত এবং পাকিস্তান এই দুই দেশের আইনগত ও সাংবিধানিক বিকাশ অধিকাংশ স্থলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে একেবারে পরস্পর বিরোধী পথে মোড় নেয়। স্বাধীনতার স্বল্পকাল পর ১৯৫০ সালে ভারতে সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ভারতে যে কোনও অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বলিষ্ঠ নিশ্চয়তা রয়েছে। এই স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিভি-ন্ন রায়ের ফলে সম্ভব হয়েছে এটি। পাকিস্তানে এই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে কয়েকবার ছিল। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সংবিধান বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয়বার ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'যুদ্ধে জরুরী অবস্থা' জারি ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করার সময় পর্যন্ত। এ সময়কাল বাদ দিলে ১৯৪৭ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রায় পুরো সময়টাতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাংবিধানিক গ্যারান্টির অনুপস্থিতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কঠোর ও নির্মম আইনসমূহ বিনা ঝুঁকিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৮ পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। মার্শাল ল' মারফত এই আইনগুলো আবার জোরদার করা হয় এবং পরবর্তীকালে সরকার পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স এ্যাণ্ড রুলস বলে সেন্সরশীপ আরোপ, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনার উপর বিধিনিষেধ এবং সংবাদপত্র বাজেয়াফত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলের সংবাদপত্রের জন্যে সেটা ছিল এক অন্ধকার যুগ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন এবং এই সংবিধানে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করায় আমরা আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সেই আশা-আকাজ্ক্ষাকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। বাক-ব্যক্তি, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগের সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পেছনে ফিরে তাকালে যে কেউ সহজেই দেখতে পাবেন যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন গণতন্ত্রীর হাতে এই আইনটি রচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যত স্বৈরশাসকদের জন্যে একটি স্বৈরাচারের সনদ রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে এদেশের মানুষ বারবার স্বৈরশাসনের কবলে পড়েছে। কখনও তথাকথিত গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরশাসন, কখনও সামরিক শাসন। বহু সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এদেশের সংগ্রামী মানুষের আশা ছিল, স্বাধীনতার পর তারা গণতান্ত্রিক মুক্ত সমাজের আস্বাদ পাবে। অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, নিরঙ্কুশ হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার ২০

www.pathagar.com

বছরেও বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র আসেনি।

১৯৭৪ সালে জারি করা হয় বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৩ সালে জারি হয় প্রিন্টিং প্রেসেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট। ১৯৭৫ সালে এদেশে প্রবর্তন করা হয় একদলীয় শাসন। একই বছর ১৬ জুন মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাতারাতি শত শত সাংবাদিক-কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হন। সাংবাদিকরা এখনও ১৬ জুনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করেন। এ অবস্থা থেকে জাতি কিছুদিনের জন্যে মুক্তি পেলেও ১৯৮২ সালে জাতির উপর আবারও স্বৈরশাসন চেপে বসে। স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের দুঃশাসন চলে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। সংবাদপত্রের জন্যে এই অধ্যায়টি ছিল আরেকটি অন্ধকার যুগ। বলা যায়, কলঙ্কজনক এক অধ্যায়। জেনারেল এরশাদ এ সময় 'মূলা ও লাঠি' নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করেন। এ নীতির সঠিক প্রয়োগ তার আমলেই ঘটে।

অতীতের মার্শাল ল' জারির কথা উল্লেখ করা যাক। সেসময় যখন সংবাদপত্রে সেন্সরশীপ আরোপ হতো, তখন দেখা যেতো একজন সরকারী অফিসার সংবাদপত্র অফিসে বসে সব কপি খুঁটিয়ে দেখে সরকারের মতে আপত্তিকর অংশগুলো কেটে বাদ দিয়ে ছাপানোর অনুমতি দিতেন। কিন্তু এরশাদ সাহেবের আমলে এভাবে আর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়নি। তার আমলে টেলিফোনে বলে দেয়াই ছিল যথেষ্ট। সরকারের পিআইডি দফতর থেকে করা হতো এই ফোন। এটা ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। এরশাদ সাহেব এ ধরনের খবর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে প্রেস সেন্সরশীপ নয়, 'প্রেস এ্যাডভাইস' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত এই প্রেস এ্যাডভাইস ছিল আগেকার প্রেস সেন্সরশীপের চেয়ে অনেক ভয়াবহ। এই প্রেস এ্যাডভাইস অমান্য করার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। সংবাদপত্রকে বেড়ি পরানোর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই সম্পন্ন হতো আড়াল থেকে। বাইরের জনগণ এই অবস্থাটি যে কি, তা জানে না। তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত, জেনারেল এরশাদ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করেছেন!

সরাসরি সেন্সরশীপ বরং একদিক থেকে ভালো। তাতে কি কি খবর ছাপতে পারবেন না, সেটুকুই শুধু নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু 'প্রেস এ্যাডভাইস' নামক তথাকথিত হিতোপদেশের আওতা অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এতে সংবাদপত্রে কি ছাপা যাবে না শুধু তাই নয়, কি ছাপতে হবে এবং কিভাবে ছাপতে হবে সেটাও বলে দেয়া হতো। সংবাদপত্র অফিসে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পিআইডির এই ফোন আসতো। প্রতিটি সংবাদপত্র অফিসে এই প্রেস এ্যাডভাইসের একটি করে খাতা 'মেইনটেন' করা হতো। পিআইডির ফোন এলেই ঐ খাতায় তা লেখা হতো এবং সেই অনুযায়ী সংবাদপত্রে খবর ছাপা হতো।

এরশাদ সরকার বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলতেন, তার আমলে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু রাতে সংবাদপত্র অফিসে আসতো পিআইডির এই ফোন। জেনারেল এরশাদের শাস-নামলে যেসব দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে, তাকে জড়িয়ে যেসব নারীঘটিত স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে এবং যেসব অনিয়ম, হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক নোংরামি হয়েছে, তার কিছুই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়নি। জনগণ রাজপথে যেসব আন্দোলন করেছেন, তার সামান্য বস্তুনিষ্ঠ বিবরণও পত্রিকায়

www.pathagar.com

তুলে ধরা যায়নি।

সংবাদপত্র অফিসে প্রতি রাতেই পিআইডি থেকে ফোন আসতো। পিআইডি'র এই 'প্রেস এ্যাডভাইস' লিখে রাখার জন্যে দৈনিক বাংলায় একটি রেকর্ড খাতা সযত্নে সংরক্ষণ করা হতো। দৈনিক বাংলার বার্তা সম্পাদক (পরে নির্বাহী সম্পাদক) ফওজুল করিম তারা ভাই এই খাতা সংরক্ষণের ব্যাপারে ছিলেন খুবই যত্নশীল। রেকর্ড খাতায় লেখা প্রেস এ্যাডভাইস-এর অধিকাংশই তারা ভাইয়ের নিজের হাতে লেখা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর পর দৈনিক বাংলার এই খাতাটি তারা ভাইয়ের কাছ থেকে অনুরোধ করে নিয়েছিলাম একটি নিবন্ধ তৈরির জন্যে। সেটি প্রথমে পিআইবি'র নিরীক্ষায় এবং পরে জাতীয় প্রেস ক্লাব স্মরণিকায় ছাপা হয়।

সেই তথাকথিত প্রেস এ্যাডভাইস-এর কিছু নমুনা দৈনিক বাংলার রেকর্ড খাতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ
১১-৫-৮২ তারিখে পিআইডি থেকে জনৈক তথ্য অফিসার জানান, সরকারী ছবিগুলো এভাবে ছাপতে হবেঃ (১) সি এম এল-এর জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় (২) উপদেষ্টা শাফিয়া খাতুনের ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় নিচের দিকে (৩) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের ছবি অষ্টম পৃষ্ঠায়। ১২-৬-৮৩ তারিখে ফোনে এ্যাডভাইস দেয়া হয়, সি এম এল-এর আজকের সব অনুষ্ঠানের খবরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাতের খবরটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই খবরের শিরোনাম হবেঃ 'প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং থাকবেন– এরশাদ',– এভাবে সরকারের পিআইডি দফতর থেকে প্রেস এ্যাডভাইজাররা যদি পত্রিকার খবর, শিরোনাম, ছবি এবং কোনটা কোন পৃষ্ঠায় কয় কলামে ছাপা হবে ঠিক করে দিতে পারেন, তাহলে সাংবাদিকদের কাজ কিছু আর অবশিষ্ট থাকে কি? সে সময় সব পত্রিকার চেহারা যে একই রকম ছিল, তার রহস্য এটাই।

সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তেন তখন, যখন সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা বিধিনিষেধ অমান্য করে রাজপথে সভা-সমাবেশ, হরতাল-মিছিল করতেন। সরকার এসব কর্মকাণ্ডে বাধা দিতো না। কিন্তু সংবাদপত্রে তার খবর ছাপতে ফোনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো। বলা হতো, মিটিং-মিছিল হরতাল বেআইনী। তার খবর ছাপানো সামরিক আইনে দণ্ডনীয়। সাংবাদিকরা তখন পড়তেন উভয় সংকটে। খবর ছাপলে সরকারী নির্যাতন, না ছাপলে জনতার রোষ। খবর না ছাপানোর জন্যে পত্রিকা অফিস এ সময় আক্রান্ত হতো। কিন্তু সাংবাদিকদের এসময় করার কিছুই ছিল না। ২৯-৫-৮৩ তারিখে পিআইডি থেকে বলা হয়, বিমান বন্দর শুল্ক কর্মকর্তার মারা যাওয়ার খবরটি ছাপা যাবে না। ৭-৭-৮৩ তারিখে বলা হয়, নিহত বৈমানিকের কুলখানি বা বীমার টাকা পাওয়া যায়নি এ সম্পর্কে কিছুই ছাপা যাবে না।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জেনারেল এরশাদের কবিতা ছাপার ঘটনা পাঠকরা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ ব্যাপারে পিআইডি থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেয়া হতো। বলা হতো, এরশাদ সাহেব নববর্ষ উপলক্ষে এই শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছেন, কবিতাটি পাঠানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

এটি প্রথম পাতায় ডাবল কলামে বক্স করে ছাপতে হবে। কবিতা ছাপানোর ব্যাপারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ সাহেবকে প্রশ্ন করায় বাসস'র সিনিয়র সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হোসেনের চাকরিও যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে বাসস'র বিশেষ সংবাদদাতা জাহাঙ্গীর হোসেন প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিশ্বের কোথায়ও বড় কবিদের কোনও কবিতা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশের বড় কবি শামসুর রাহমানের কবিতাও এদেশের কোনও সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয়নি। আপনার কবিতা প্রথম পাতায় ছাপা হয় কেন?' এর কিছুদিন পরই বাসস থেকে তার চাকরি চলে যায়। একইভাবে এরশাদের পত্রিকা দৈনিক জনতা রাজপথে পোড়ানোর জন্যে বাসস থেকে চাকরি যায় জনাব গোলাম মহিউদ্দিন খানের। এরশাদ সাহেব যখন ধীরে ধীরে রাজনীতিতে ঢোকার চেষ্টা চালালেন এবং রাজনৈতিক দলে ভাঙন ধরানোর উদ্যোগ নিলেন, তখনকার কিছু 'প্রেস এ্যাডভাইস'-এর নমুনার উদ্ধৃতি দেয়া যাক। ১৩-৮-৮৩ তারিখ: ধানমণ্ডি থানা যুব লীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির মিলনের নেতৃত্বে ২৫ জনের নতুন বাংলা যুবসংহতিতে যোগদানের খবরটি পুরোপুরি ছাপতে হবে। ১৭-৪-৮৩: নতুন বাংলা যুব সমাজ ও ছাত্র সমাজের বিবৃতিটি ভালো করে ছাপতে হবে। ৯-৮-৮৩: জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (মিলন) সাংবাদিক সম্মেলনের খবরটি ফলাও করে ছাপতে হবে। ২৮-৯-৮৩: ডাকসু'র জিএস শেখ হাসিনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনের নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেবে। সেটি প্রথম পৃষ্ঠায় ভালোভাবে ছাপতে হবে (উল্লেখ্য, ডাকসু'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলুকে সরকারী দলে ভাগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া এভাবে শুরু হয়।)

প্রেস এ্যাডভাইসের অধিকাংশই অবশ্য বিভিন্ন ঘটনার খবর, বক্তৃতা-বিবৃতি না ছাপার নির্দেশ। সব লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবুও রেকর্ড খাতা থেকে আরও কিছু উদাহরণ টানা যাক। ৩০-৫-৮২: জিয়ার মাজারে কোনও রাজনৈতিক নেতার ছবি তোলা যাবে না। ৮-৬-৮২: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির বিবৃতির কিছুই ছাপা যাবে না। ২-৯-৮২: সাংবাদিকদের ব্যাজ ধারণ, দাবি, প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও ধর্মঘট বা কর্মবিরতি সংক্রান্ত কোনও খবর যাবে না। ২৬-৪-৮২: কারফিউ লংঘনের দায়ে যেসব ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার কোনও খবর ছাপা যাবে না। ৬-৯-৮২ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন সম্পর্কে ৯টি ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি যাবে না। ১৬-৯-৮২: বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারিংয়ের দায়ে ছাত্রদের গ্রেফতার সম্পর্কে পুলিশ খবর দিলে যাবে, অন্যথায় যাবে না। ১৭-১০-৮২: সুপ্রীম কোর্টের বেশ কিছু আইনজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ৩-১১-৮২: ৩ নবেম্বর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে কিংবা বনানী গোরস্থানের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি ও গ্রেফতারের খবর যাবে না। ৮-১১-৮২: (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের ঘটনাবলীর কিছুই যাবে না, (খ) একটি সরকারী ভাষ্য দেয়া হবে, সেটি ছাপতে হবে। ২১-১১-৮২: ছাত্রদের সাংবাদিক সম্মেলন সংক্রান্ত কোনও কিছু ছাপা যাবে না। ২৪-১১-৮২: ডিইউজে'র 'প্রতীক কলম বিরতি' পালনের কোনও খবর যাবে না। ১-১-৮৩: বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভা, মিছিল ইত্যাদি খবর যাবে না। ৩-১-৮৩: রাজশাহী জেলে কয়েদীদের অনশন সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ২১-১-৮৩: জেনারেল

www.pathagar.com

এরশাদের ১৪ জানুয়ারির বক্তব্যের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিবৃতি যাবে না। ৭-২-৮৩: একুশে উদযাপন উপলক্ষে কোনও মহলেরই বিবৃতিতে রাজনৈতিক বক্তব্য, তথা সামরিক আইন তুলে নেয়া, গণতন্ত্র প্রদানের দাবি ইত্যাদি বক্তব্য যাবে না।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। সেই ঐতিহাসিক ১৪ ফেব্রুয়ারির (শিক্ষা দিবস) কোনও খবরই সেদিন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এ সম্পর্কে যেসব ব্রিফিং ছিল, অর্থাৎ পিআইডি থেকে সংবাদ ছাপার উপর যেভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, তার বিবরণঃ ১৪-২-৮৩: ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি পটভূমিতে আজ ঢাকা শহরে যা ঘটেছে, তার কোনও খবর, ছবি ছাপা যাবে না। ১৫-২-৮৩: আজকের ঘটনাবলীর প্রেসনোটসহ কিছুই যাবে না (সরকারই প্রেসনোট দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেই প্রেসনোটও ছাপতে দেয়নি)। ৪-৩-৮৩: শেখ হাসিনার বিবৃতিসহ কোনও রাজনৈতিক বিবৃতি যাবে না। ১৬-৫-৮৩: ১৪টি ছাত্র সংগঠন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা ডাকসু'র কোনও খবরই যাবে না। ১৯-৫-৮৩: খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষা মন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর খবর ছাপা যাবে না। ৭-৬-৮৩: আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্মঘট পালনের খবর যাবে না। ১৫-৬-৮৩: বিচার দিবস পালন সম্পর্কে কিছুই যাবে না। ৩০-১০-৮৩: ১ নবেম্বরের কর্মসূচীর সপক্ষে কিছুই যাবে না, তবে এ কর্মসূচীর নিন্দা করে ৫০০ আইনজীবীর একটি বিবৃতি আসবে, তা ভালোভাবে ছাপতে হবে। ২৮-১১-৮৩: ১৫ দল, ৭ দল, ১০ দল বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ছাপা যাবে না। ২১-১২-৮৩: রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ; তাই কোনও রাজনৈতিক খবর ছাপা যাবে না।

এরশাদ শাসনামলে সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত 'প্রেস এ্যাডভাইস' এর কিছু নমুনা দেয়া হলো। সামরিক শাসন তুলে নেয়ার পরও একইভাবেই 'প্রেস এ্যাডভাইস' দিয়ে খবর প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক। ২-১০-৮৪: গতকাল গলফ ক্লাব এলাকায় যে ডাকাতি হয়েছে, তার খবর যাবে না। ৭-১০-৮৪: ময়েজউদ্দিন হত্যার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জড়িত বলে ড. কামাল হোসেন যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা কোনওভাবেই ছাপা যাবে না। ৯-১০-৮৪ (আইএসপিআর): হোটেল সোনারগাঁয়ে টেলি কম্যুনিকেশন সম্পর্কে সেমিনার হচ্ছে। তাতে আর্মির কোনও নাম এলে ছাপা যাবে না। ১১-১০-৮৪: অলি আহাদের মামলার শুনানি সম্পর্কে কিছু যাবে না।

১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় মহাসমাবেশ করে। স্মরণকালের মধ্যে এটি ছিল বৃহত্তম মহাসমাবেশ। এদিনের কোনও খবর পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অবশ্য সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদে এক দিন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পিআইডি থেকে এদিন যে ব্রিফিং আসে, তাহলো: ১৪-১০-৮৪: ঢাকায় ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতের গণ সমাবেশের কোনও খবর যাবে না। সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে ১৫ দলের প্রস্তাব যাবে না, চীফ অব স্টাফ সম্পর্কে খালেদা জিয়ার বক্তব্য যাবে না। বিচারপতি সাত্তার ও মীর্জা গোলাম হাফিজের বক্তব্যের কিছুই যাবে না। খবরে কোনও আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেয়া যাবে না। ২০-১২-৮৪: ২২-২৩ ডিসেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতাল সম্পর্কে

www.pathagar.com

কোনও খবর যাবে না। ২১-১২-৮৪: রাজনীতি বন্ধ: রাজনৈতিক কোনও খবর যাবে না। ১-৩-৮৫: রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও তার কোনও অংশের সমালোচনা করা যাবে না, আস্থা ভোটের সমালোচনা যাবে না, সামরিক আইন, আদেশ ও সামরিক আদালতের সমালোচনা যাবে না। ধর্মঘট মিছিল, সভা-সমাবেশের খবর যাবে না। ১৫-৪-৮৫: পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানে মঞ্চ দখলের খবর যাবে না। ১১-৫-৮৫: চাঁপাই নবাবগঞ্জে জনসমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যুর খবর যাবে না। ২৯-৫-৮৫: লাশের ছবি ছাপা যাবে না। ৮-৬-৮৫: রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পদবী ছাপা যাবে না, শুধু নাম ছাপা যাবে। ১৬-৮-৮৫: ডিফেন্স সার্ভিসের কোনও সদস্য চোরাচালানের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে, এমন খবর যাবে না। জাতীয় ফ্রন্ট ঘোষণার খবর যাবে। তবে কোনও ব্যক্তি, সংবাদ সম্মেলন বা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তা যাবে না। ৯-৯-৮৫: বনানী এমপি পোস্টের কাছে এমপি ও জনতার মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে, এ খবর যাবে না। ২২-৯-৮৫: পাটের বিএসএস পরিবেশিত খবর বড় করে ছাপতে হবে। ২৩-৯-৮৫: শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনের এক লাইনও যাবে না। ২৫-৯-৮৫: প্রেসিডেন্টের চট্টগ্রামে ভাষণ; 'আমার জনদল' এই কথা যাবে না। ২১-১০-৮৫ আজ প্রেসিডেন্ট এরশাদ টিএসসি'র পাশ দিয়ে যাবার সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার একটি লাইনও যাবে না। ২৯-১০-৮৫: কাজী জাফরের চিনি সংক্রান্ত এনা'র খবর 'হাইলাইট' হবে। ১০-১১-৮৫: প্রেসিডেন্টকে হরতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই বিষয়গুলো যাবে না।

হরতাল শব্দটিই লেখা যাবে না। জেনারেল এরশাদের নারী কেলেঙ্কারি এদেশে বহুল আলোচিত। তবে এ সম্পর্কে এরশাদের পতনের আগে এদেশের পত্র- পত্রিকায় কোনও খবরই ছাপা যায়নি। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় এসব খবর ফলাও করে প্রচার হয়েছে। ঐ সময়ে সংবাদপত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তার কিছু বিবরণ: ৪-৮-৮৬: লণ্ডনের জনমত পত্রিকায় বেগম মেরীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যে খবর ও ছবি ছাপা হয়েছে, তার পুনর্মুদ্রণ কিছুই করা যাবে না। ৮-৯-৮৬: লণ্ডন অবজারভারে এ সম্পর্কে যে খবর ছাপা হয়েছে, তারও পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না। একইভাবে ওয়াশিংটনের পত্র-পত্রিকায় ও ভারতের পত্র-পত্রিকায় মেরী, জিনাত ও অন্যান্যের সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে, তা পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

২৪-১-৮৮: আজ চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহতদের সংখ্যা পুলিশের প্রেসরিলিজে যা আছে, সেটাই ছাপতে হবে, প্রকৃত সংখ্যা ছাপা যাবে না। ভায়োলেন্সের কোনও ছবি ছাপা যাবে না। ১১-১-৮৮: বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে নিহতদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে যান। তার ছবি ও খবর যাবে না। নিহতদের সম্পর্কে হৃদয়স্পর্শী কোনও বর্ণনাও যাবে না। ৪-২-৮৮: আজকের সংবাদে কামরুল হাসানের যে স্কেচ ছাপা হয়েছে, তার পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না। ১১-২-৮৮: ইউপি নির্বাচনে হাঙ্গামায় নিহতদের সংখ্যা সরকারী সংখ্যার চেয়ে বেশি দেয়া যাবে না।

২০-৬-৮৮: বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসনা মওদুদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার ছবি ছাপা যাবে না। তবে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণনা সরকারী প্রেসনোট থেকে ছাপতে হবে। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

ভিসিকে টেলিফোনে যে কড়া কথা বলেছেন, তা ছাপা যাবে না। ১-৯-৮৮: প্রেসিডেন্ট আজ ডিএ্যাণ্ডডি বাঁধ পরিদর্শনে গেলে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তা ছাপা যাবে না। ১১-১১-৮৮: রিগ্যান-এরশাদ বৈঠকে সময় হোয়াইট হাউসের সামনে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তা ছাপা যাবে না। ২৫-৯-৮৯: মীর শওকত আলী সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ৮-৩-৮৯ লণ্ডনে প্রকাশিত 'সৈনিক কথা' বই থেকে যে কোনও উদ্ধৃতির প্রচার প্রকাশ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, বইটি এরশাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে লেখা। ৩-২-৯০: এরশাদের ওয়াশিংটন সফর সম্পর্কে বিবিসি'র রেডিও মনিটরিং করা যাবে না। ৯-৮-৯০: রাজশাহীতে স্বাস্থ্য নীতির পক্ষে মিছিলের খবর ভালো করে ছাপতে হবে। ১৩-৯-৯০: সোভিয়েত কর্মকর্তার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত খবর ছাপা যাবে না। ১৯-১০-৯০: সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও খবর ছাপা যাবে না। এই সামান্য ক'টা উদাহরণ থেকেই ধারণা করা সম্ভব, এরশাদ শাসনামলে সংবাদপত্র কেন লিখতে পারে নি।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেহাদ' নামে একজন ছাত্র মারা যাওয়ার পর ছাত্রঐক্য গঠিত হয়। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করে এবং সমাবেশ, মিছিল হরতাল চলতে থাকে। এর ফলেই সরকার ২৭ নবেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সাংবাদিক সমাজ এর প্রতিবাদে সকল পত্র-পত্রিকায় ধর্মঘট শুরু করেন। এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে ৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্র চালু হয়। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় কোনও বাধা ছাড়াই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, অনিয়ম, স্ক্যাণ্ডাল ও রাজনৈতিক খবর।

এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। আবার এ সরকারের আমলে সর্বাধিক সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলো স্বাধীনভাবে লিখতে পেরেছে। কোনও বাধা আসেনি।

এরশাদ শাসনামলে সংবাদপত্রকে শৃঙ্খলিত করে রাখার ফলে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাধারণ মানুষ দেশের খবর জানার জন্যে বাধ্য হয়ে বিদেশী বেতারের উপর নির্ভর করতে শিখেছে। সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তারপর। মানুষ আবার দেশের গণমাধ্যমের দিকে ঝুঁকেছেন। পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে। পত্রিকাগুলোতে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। সরকার কিংবা বিরোধী দল, সবার দিকেই পত্র-পত্রিকার সজাগ দৃষ্টি ছিল। গণতান্ত্রিক সমাজের আস্বাদ এখানেই।

লেখক দৈনিক আমার দেশ -এর বিশেষ সংবাদদাতা

www.pathagar.com

শুদ্ধতম সাংবাদিকতার স্বার্থে.....

বেবী মওদুদ

সাঁইত্রিশ বছর আগে আমরা যখন সাংবাদিকতায় আসার ইচ্ছা পোষণ করি, তখন একটা মূল্যবোধ ছিল, অঙ্গীকার ছিল। সেই সঙ্গে একটা শুভ চিন্তা-ভাবনার অদম্য আকাঙ্ক্ষাও ছিল। একেবারে হৃদয়ের একান্ত থেকে উচ্চারণ করতে পারি, কোনও প্রকার লোভ, মোহ ও ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা আমাদের পাপবিদ্ধ করার সাহস পায়নি। শুদ্ধতম ভালোবাসা নিয়েই সাংবাদিকতা পেশায় এসেছি। এ পেশার প্রতি তখন সব মহলের একটা শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ ছিল।

আজ চারদিকে যখন তাকাই, তখন বড় অসহায় বোধ করি। বড় কষ্ট অনুভব করি, বড় বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করতে বাধ্য হই যে, এ পেশার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান, সুবিধাভোগী ও চিহ্নিত কল্যাণবিরোধী ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে যারা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, আজ তাদের অনেককেই এই অবস্থানে দেখতে পেয়ে দুঃখ বোধ হয়, লজ্জা বোধ করি। তথ্য বিকৃতি ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে তারা এখন এই পেশাকে কলুষিত করে তুলেছেন, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তারা যদি শক্ত থাকতেন, নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ থাকতেন, আমাদের পেশার অবক্ষয় হতো না। দুর্নীতিবাজ, নীতিহীন ও অপেশাদার লোকজন আসার সাহস পেত না এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও জাতির ভাগ্য বিড়ম্বিত হতো না। আজ ভাবতেই দুঃখ বোধ করি, আমরাই আমাদের এ পেশার মর্যাদা বিনষ্ট করেছি। এই পাপ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ক্ষমা করবে না।

সাঁইত্রিশ বছর আগে আমরা যারা সাংবাদিকতায় প্রবেশ করি, তখন দেখেছি সংবাদপত্রের নানা সমস্যা। সরকারের দমন নীতি। মালিকদের সংকোচন নীতি। বেতন শৃঙ্খলাহীন, দুঃসহ পরিবেশ, অনেক ঝুঁকি। তারপরও একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সাহস নিয়েই এ পেশায় ঢুকে পড়ি। এরমধ্যে মেয়ে হয়ে কাজ করার আরও সমস্যা ছিল। তারপরও সাংবাদিক বন্ধুদের সহযোগিতা না পেলে টিকে থাকা সম্ভব হতো না। আর একটা জেদও ছিল এ পেশায় থাকার জন্যে। ওই সময়ে অনেকেই বলত, তোমার মত মেয়ে এ পেশায় টেকা মুশকিল। অন্য পেশায় চলে যাও। কিন্তু আমারও জেদ ছিল, কেন যাব? এখানে বিশেষ করে আহমদ ছফা ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে। হাতে গোনা তিন চারজন ছিলাম, কিন্তু বেশ কঠিনভাবেই থেকে গেলাম আজও। এ জন্যে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই সময় পার হতে হয়েছে।

www.pathagar.com

আমার আজও মনে আছে, তখন একটা স্বাধীনতা ছিল। নিজেই সংবাদ তৈরির পরিকল্পনা করা, সংবাদ খোঁজা, সোর্সের কাছে যাতায়াত,তথ্যের জন্যে ঘোরাঘুরি সবকিছুতে একটা আবিষ্কারের নেশা ছিল। আমার পরিকল্পনার কোনও সংবাদ বার্তা সম্পাদক ফেলে দিতে পারেননি। কোনও কোনও সংবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, খোঁজ-খবরও নেয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে আমিই সঠিক। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ত্রাণ সামগ্রীতে পোকা এবং খাদ্য নষ্ট হবার সংবাদ। আমার স্মৃতি থেকে একটি সংবাদের কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

১৯৭২ সালের জুন মাস। আমি দৈনিক সংবাদে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছি। স্বাধীনতার পর সে সময় সরকার নতুন বেতন কমিশন গঠন করেছেন। স্বাধীনতার পর প্রথম বেতন স্কেল তৈরি হবে- এ নিয়ে সরকারী-বেসরকারী সব মহলেই বেশ কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য আমার সোর্স ছিলেন। তিনি আমার বাবার বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। আমি তার অফিসে মাঝে মাঝে গিয়ে কিছু খবর আনতাম। তিনি একদিন বললেন, 'রিপোর্ট প্রায় শেষ, তোমাকে দেব কিছু তথ্য।' এরপর ১৯৭৩ সালে এপ্রিল মাসে আমি শ্বশুরবাড়ি গ্রামে বেড়াতে গিয়ে রেডিওতে খবর শুনলাম, বঙ্গবন্ধুর কাছে বেতন কমিশন রিপোর্ট পেশ করেছে। শুনে তো আমার হায় হায় অবস্থা! আমি বোধহয় পারলামই না এটার উপর বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করতে। দু'দিন পরই ঢাকায় চলে আসি। সোর্সের সঙ্গে দেখা করে প্রায় হতাশ কণ্ঠে বললাম, 'ভাই আমাকে কিছু দেন। আমি একটা বিশেষ রিপোর্ট তৈরি করতে চাই।' তিনি বললেন, ঠিক আছে কাল ১০টায় আমার অফিসে এসো, তোমাকে আমি স্কেলগুলো দিয়ে দেব। এটা দেখবে লীড স্পেশাল হয়ে যাবে।

পরদিন সকাল ১০টায় যথারীতি সচিবালয়ে পৌঁছলাম। রুমে ঢুকে দেখি, সোর্স ফাইলপত্র নিয়ে তৈরি, বের হয়ে যাবেন। ঢুকতেই বললেন, 'আমি তো একটা জরুরি মিটিংয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার রুমে কতক্ষণ বসে থাকবে?' আমি এবার নাছোড়বান্দা কণ্ঠে বললাম, 'আমাকে আজ কিছু দিতেই হবে।' তিনি তখন আলমারি খুলে একটা মোটা ফাইল বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও। এর মধ্যে সব খুঁজলেই পেয়ে যাবে। তবে একটাও কাগজ হারাবে না। রাতেই আমাকে পৌঁছে দেবে।'

তিনি চলে গেলেন জরুরি সভায়। আমি ফাইল নিয়ে প্রেস ক্লাবে গিয়ে তারপর ছুটলাম অফিসে। বার্তা সম্পাদক সন্তোষদা সন্ধ্যায় আসবেন। চীফ রিপোর্টার হাসান আলী ঢাকার বাইরে কাজে গেছেন। টেবিলে বসে ফাইল খুলে পুরোটা চোখ বুলিয়ে ঠিক করে নিলাম কিভাবে তৈরি করব। সরকারী, সামরিক বাহিনী, সবার স্কেল দিতে হবে প্রথমদিন। তারপর ভাতা, অবসরভোগীদের সুবিধা ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন ধারাবাহিক করা যাবে। রিপোর্টিং সেকশনে তখনও কেউ আসেননি। ডেস্কে শিফট ইন চার্জ শহীদুল ইসলাম ও কয়েকজন নীরবে কাজ করছে। আমি শহীদ ভাইকে ডেকে এনে ফাইলটা দেখিয়ে একটু সাহায্য করতে বললাম। শহীদ ভাই তো প্রথমেই চিৎকার করে উঠলেন, 'এই ডেস্ক আস্তে চলো। ভেতরে বড় জাম্প থাকবে।' আমাকে বললেন বজলু ভাইকে ফোন করে একবার জানাতে। বজলু ভাইকে জানালাম। তারপর রিপোর্ট তৈরি করে তাকে দিলাম। তিনি সম্পাদনা করে কম্পোজে পাঠালেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা কাজ শেষ করতেই সন্তোষদা এলেন। সব শুনে

www.pathagar.com

আমার জন্যে সন্দেশ ও চায়ের অর্ডার দিলেন। সন্ধ্যার বেশ পরে বজলু ভাই এলেন। আমাকে তার রুমে ডেকে নিয়ে কিভাবে পেলাম সব শুনলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু সোর্সের নাম বলিনি।

সেদিন কাজ শেষ করে বাসায় চলে যাই। ফাইলটা নিজের কাছেই রাখলাম, সোর্সের কাছে পৌঁছাতে দেরি করতে হবে। কেননা আরও কয়েকটা তথ্যসহ সংবাদ, বিভিন্ন সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণ ধারাবাহিক ছাপা হবে। পরদিন সকালে সংবাদ বাসায় আসতেই দেখলাম আমার সংবাদই লীড। সঙ্গে পে-স্কেল ও কয়েকটি ছোট খবর। বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে সচিবালয়ে ঢুকলাম। সবার হাতে হাতে সংবাদ। পরিচিতজনরা বলল, তোমাদের কাগজ আজ সচিবালয়ে হট। এখনকার মত তখন অবশ্য নাম ছাপা হতো না, তাই সংবাদটা যে আমার লেখা, কেউ জানতে পারল না। প্রেস ক্লাবে গেলাম। যারা আমার সহকর্মীদের কাছে শুনেছেন, তারাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন। অফিসে গেলাম বিকালে। সম্পাদকীয় বিভাগে রণেশদা আমাকে ডেকে অভিনন্দন জানালেন, অনেকদিন পর সংবাদ একটা সাড়া জাগানো এক্সক্লুসিভ করেছে। তুমি তো মাত করেছ। অফিসে আরও গল্প শুনলাম, রেলস্টেশনে, গুলিস্তানে, সচিবালয়ে সর্বত্র হকাররা বেতন বেড়েছে, বেতন বেড়েছে বলে আজ সংবাদ বিক্রি করছে। সংবাদ আজ সকালেই শেষ। সন্ধ্যার পর আবার অনেকে ফোন করে খবর নিল যে, অফিসে সংবাদ পাওয়া যাবে কি-না। অনেকেই অনুরোধ করলেন, এই খবরটা আবার যেন আগামীকাল ছাপা হয়। কেননা অনেকেই সংবাদ খুঁজে পাননি। তখনই আমরা বুঝতে পারি, সংবাদের সার্কুলেশন কত নিচে।

একদিন পরে প্রথমদিনের সংবাদটা আবার ছাপা হয় এবং পত্রিকার সংখ্যা বাড়াতে হয়। পরে সরকার এক তথ্য বিবরণীতে জানাল যে, এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করা ঠিক নয়। তবে তারা কোনও প্রতিবাদ জানাননি। এক সপ্তাহ পর আমার সোর্সকে ফাইল ফেরত দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'কিভাবে সাংবাদিকরা পেল, এ নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। ভালোই তো হয়েছে কি বল?' আমার সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তখন এর গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। তবে এখন উপলব্ধি করতে পারি যে, আসলেই আমি একটা সাড়া জাগানো সংবাদ তৈরি করেছিলাম। এরপর অনেক এক্সক্লুসিভ সংবাদ আমি তৈরি করেছি, তার মধ্যে ইত্তেফাকে 'পাকিস্তানে বাংলাদেশের নারী পাচার' ছাপার পর অনেকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তথ্য দিতেন। এ সময়ও এক বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

২০০৪ সালে এসে আমরা সাংবাদিকতার বিপুল সুযোগ সুবিধা দেখি। বিশেষ করে বেতন ভাতাও ভালো, অফিসের পরিবেশ ভালো, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সবই আছে- মালিক-সম্পাদক পদে সাংবাদিকরাও আছেন, যদিও তাদের কারও কারও পেছনে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলের নেতা থাকেন। অনেক মেধাবী ও পরিশ্রমী সাংবাদিকও এসেছেন এ পেশায়। টিভি চ্যানেলের সংবাদও এখন সমান জনপ্রিয়। তারপরও মনে হয়, কি যেন একটা স্বাদ নেই। সরকারী দল-বিরোধী দল, বিচারক, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বুদ্ধিজীবী,প্রশাসক- যে কোনও একটা ঘটনা ঘটিয়ে সংবাদ হলেই পত্রিকায় আসছেন। এখন অনেক সচেতনতা বেড়েছে। মানবাধিকার লংঘন, অনৈতিকতা, অবিচার, মানুষের দুঃখ-কষ্টের ঘটনা হলেই

www.pathagar.com

পত্রিকায় আসছে। পচা গম বিক্রি, বিচারপতির দুর্নীতি ও ভুয়া সার্টিফিকেটে নিয়োগ প্রাপ্তি, ইতিহাস বিকৃতি, ক্রসফায়ার ও রিমাণ্ডে নিয়ে মৃত্যুর খবর, অনাহারে মারা গেলে হার্টফেলে মৃত্যু বলে চালিয়ে দেয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খবর, খুন-ধর্ষণের খবর প্রতিদিন পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে সাহসের সঙ্গে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির খবর ছাপাতে গিয়ে সাংবাদিকরা বোমা খেয়ে নিহত হচ্ছেন, আহত হয়ে পঙ্গু জীবন-যাপন করছেন।

পত্রিকায় পত্রিকায় প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নামে, স্বাধীন মত প্রকাশের নামে? সত্য মিথ্যা সবই ছাপা হচ্ছে। আমার মনে হয়, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু সত্যটাই প্রকাশ করতাম, তাহলে আজ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতো না। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার মত সাহসটা আমরা হারিয়ে ফেলে সবার মতামত ছাপাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এই সুযোগে যে মিথ্যাচারই অধিক প্রচার পেয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছে, সেটা আমরা ভেবে দেখছি না। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এমনভাবে মিথ্যা প্রচার পায় কি-না আমার জানা নেই। তবে রাষ্ট্রের পঞ্চম অঙ্গ হিসেবে যখন সংবাদপত্রকে ধরা হয়, তখন নিশ্চয়ই তার একটা দায়-দায়িত্ব থাকে। রাজনীতিবিদরা ভুল করুক,ক্ষমতাসীনরা যত দমনপীড়নই চালাক- অন্তত সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা যদি নীতিবান হতেন, তাহলে আজ সমাজে এত হতাশা ও নৈরাজ্য দেখা যেত না। আমরা সাংবাদিকরা ব্যক্তিগতভাবে পছন্দসই মতাদর্শের অনুসারী হতে পারি, কিন্তু পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময়ে দ্বন্দ্ব, হিংসা, ব্যক্তিস্বার্থকে নিশ্চয় ভুলে যাওয়া উচিত। আমাদের ঐক্য ও স্বার্থ সমাজ এবং মানুষের কল্যাণে হলে সার্বিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। যারা পত্রিকাকে তুড়ি মেরে শুধুমাত্র দুর্নীতিবাজ ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠেন, তারা মাথা নত করতে বাধ্য হবেন। সাংবাদিকের কলম ধারালো অস্ত্রের সমান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, যা কি-না সকল অন্যায় অবিচার অনৈতিকতাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলতে পারে। মানুষকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শুদ্ধতম সাংবাদিকতার স্বার্থে আমরা কি তবে মানবিক হবো না?

লেখক সাপ্তাহিক বিচিত্রার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় বিড়ম্বনা

সুনীল ব্যানার্জি

সাংবাদিকতায় বিড়ম্বনা! এ বিড়ম্বনা প্রায় প্রতি পদে পদে। কথাটা শুনে হয়তো কেউ কেউ অবাক হবেন। অবাক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, এ পেশায় বিড়ম্বনা অনেক বেশি। বলা চলে, চলতে ফিরতে কাজে কর্মে প্রায় সর্বত্রই এ বিড়ম্বনা। অনেক সময় বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় খবর লিখতে গিয়ে। খবর প্রকাশের পর সেই খবরে কেউ অখুশি হলে বিড়ম্বনা। এর উপর সংশ্লিষ্ট পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সে খবর মনপূতঃ না হলে তো কথাই নেই। ধরে নেয়া যাক, কোনও একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে খবর লেখা হলো। সমস্যাটির কথা লেখার জন্যে হয়তো সমস্যা সৃষ্টিকারী কর্তৃপক্ষ আপনার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। পারলে তিনি একচোট দেখে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। এর উপর প্রকাশিত খবরটা যদি সংশ্লিষ্ট পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী না হয় তাহলে আপনার অবস্থা ত্রাহি মধুসূদন! এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আপনিই সমস্যায় পড়লেন। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। আপনি যদি সরকার সমর্থিত পত্রিকার সাংবাদিক হন, তাহলে পত্রিকার পলিসি রক্ষা করতে গিয়ে এমন একটা রিপোর্ট লিখলেন তাতে সরকার বিরোধীরা আপনার উপর ক্ষুব্ধ হলেন। আপনি নিজে যে দলের সমর্থক বা নিরপেক্ষ হোন না কেন, তারা আপনাকে ভালো চোখে দেখবেন না। তেমনি, সরকার বিরোধী কোনও কাগজে সাংবাদিকতা করলে অনেক ক্ষেত্রে তার উল্টো ঘটনা ঘটে। বরং সরকার বিরোধী কোনও কোনও রিপোর্ট লেখার জন্যে শুধু সরকারের বিরাগভাজন হওয়া নয়, অনেক ক্ষেত্রে নানা ভোগান্তিও পোহাতে হয়।

তবু এতো ভোগান্তি, বিড়ম্বনা ঝক্কি-ঝামেলা জানা সত্ত্বেও অনেকে সাংবাদিকতা পেশাকে মহান পেশা হিসাবে বরণ করে নিয়েছেন। কেউ দেশ ও দশের সেবার জন্যে এ পেশায় এসেছেন। কেউ এসেছেন সমাজের প্রতি কমিটমেন্টের জন্যে। কেউ বা এসেছেন শখের বশে। কেউ বা বিকল্প ব্যবস্থা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে সাংবাদিকতা পেশা অবলম্বন করে নিয়েছেন। তবে শেষোক্ত ধরনের লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। যারা দেশ ও দশের সেবার জন্যে এবং সমাজের প্রতি কমিটমেন্টের জন্যে সাংবাদিকতায় এসেছেন, এদের সংখ্যা সর্বাধিক। আর এরাই প্রতি পদে পদে ভুগছেন। কষ্ট পাচ্ছেন। পোহাচ্ছেন দুর্ভোগ আর বিড়ম্বনা। সময় নেই, অসময় নেই খেটেই যাচ্ছেন। অনেক কাগজে ঠিকমত বেতনই হয় না। বেতন হলেও ছুটি নেই। এমনকি অসুস্থতার জন্যেও ছুটি দেয়া হয় না। ছুটি মঞ্জুর করার পর চাকরিচ্যুতির ঘটনাও রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কাগজ হলে তো কথাই নেই। টাকা হলে

www.pathagar.com

মালিকই সম্পাদক হতে পারেন। কাজেই কর্তার ইচ্ছার উপর চাকরি থাকা না থাকা নির্ভর করে। এর উপর রয়েছে কর্তা বা তার আশীর্বাদপুষ্ট কারও কারও মন যুগিয়ে চলা। তা না হলে পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। আর এ কারণে অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি অযোগ্যতার অভিযোগে চাকরি হারায়। এ দোষ সাংবাদিকতা পেশার নয়। পেশা যাদের হাতে বন্দী, তাদের জন্যেই ঘটছে এ সব অনিয়ম। এভাবে সাংবাদিকদের চাকরির গ্যারান্টি হারিয়ে যাচ্ছে। বিপর্যস্ত সাংবাদিকদের জন্যে কেউ সহজে এগিয়ে আসে না। এলেও তেমন লাভ হয় না। সাংবাদিক ইউনিয়ন বর্তমানে শতধাবিভক্ত। এখন আর সাংবাদিক ইউনিয়ন আগের মত সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষা, নিরাপত্তা ও অধিকার আদায়ের কথা বলে না। বহুধা বিভক্তির কারণে ইউনিয়নের কথা কেউ তেমন শুনতে চায় না। এ জন্যে সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হলে ইউনিয়ন ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় কিছু করে না। সে চাকরিচ্যুতি কারণে বা অকারণে যেভাবেই ঘটুক না কেন।

জ্ঞান রাজ্যের এতো অশ্রু, এতো বেদনা, বঞ্চনার খবর কে রাখে? এতো দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সাংবাদিকরা খেটে যাচ্ছেন। সেই শ্রমের ফসলে নিজে খুশি হতে পারছেন না। করতে পারছেন না অন্যকে সন্তুষ্ট। এ ধরনের দ্বৈত অবস্থার মধ্যে সাংবাদিকদের অনেকে দিন কাটাচ্ছেন। অথচ সাংবাদিকতা পেশাকে বাইরে থেকে মনে হয় কত না জানি ভালো পেশা! এর মত স্বাধীন ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের পেশা নাকি আর হয় না। অনেকে আবার সাংবাদিকরা মহা আরামে আছেন বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু বাস্তবতা এই, এ পেশায় আরাম একেবারেই হারাম। নেই তেমন কোনও ভবিষ্যত। প্রতি মুহূর্তে বিড়ম্বনা, ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। এ বিড়ম্বনা পেশাগত দায়িত্ব পালন থেকে চাকরি যাওয়াও হতে পারে। এ সব সত্ত্বেও অনেকে জীবনকে বাজি রেখে সাংবাদিকতার মহান পেশাকে জীবন মরণের সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। চোখ রাঙানো ও ভয়ভীতি দেখানোসহ নানা অত্যাচারকে উপেক্ষা করে নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশায় রয়েছেন। সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে ইতোমধ্যেই এ পেশার অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। গোলাম মাজেদ, আর এম সাইফুল মুকুল, আ, স, ম আলাউদ্দিন, শামছুর রহমান, মানিক সাহা, ও হুমায়ুন কবীর বালুর মত নির্ভীক সাংবাদিক তাদের মধ্যে অন্যতম। অনেকে পঙ্গুত্বের অভিশাপকে বরণ করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীর শিকদার ও টিপু সুলতানের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে।

আমার সাংবাদিকতা জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৭২ সাল থেকে আমি পুরোপুরি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক জনকণ্ঠে সাংবাদিকতা করতে গিয়ে অসংখ্যবার নানা বিপদ-বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইতোমধ্যে বিসিএস পাস করে গেজেটেড অফিসারের চাকরি পেলেও সাংবাদিকতার মহান পেশার মোহে অন্য পেশায় যোগ দিইনি। এই সেদিনও '৬ কর্মকর্তার বদলির জন্যে দাম উঠেছে ২ কোটি টাকা' এ ধরনের খবর লিখে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য ঘুষ নেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনেকে ইতোমধ্যেই চাকরি হারিয়েছেন। কিন্তু চাকরি হারানোর আগে তাদের অপকর্মের খবর লেখার জন্যে এই ভোগান্তি। গত সাধারণ নির্বাচনে তালেবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ

www.pathagar.com

খবর লেখার জন্যে এখনও হুমকি ধামকি লেগে আছে। সংশ্লিষ্টরা নির্বাচিত হবার পর আমিসহ পুরো পরিবারকে মেরে ফেলার জন্যে অসংখ্য চিঠি দিয়েছে। আমার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করে আমাকে শিক্ষা দেয়ারও হুমকি দেয়া হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ, এম এরশাদের আমলে দৈনিক বাংলায় একটি খবর লিখে তৎকালীন সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তার কোপানলে পড়তে হয়েছিল আমাকে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তিন ডাক্তার ও এক নার্সকে আকস্মিকভাবে এক রাতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অপরাধ, অপারেশন থিয়েটারে এক সেনা কর্মকর্তাকে জুতো পরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। আর এ জন্যে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সকে হাসপাতাল থেকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয় অজ্ঞাতস্থানে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র হাসপাতালে ধর্মঘট হয়। এমনকি ইমারজেন্সিও বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য রোগী চিকিৎসার অভাবে কাতরাচ্ছেন। এ খবরটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নিয়ে ছাপা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তা এবং তার সহকর্মীরা ক্ষেপে আগুন। তখন কবি শামসুর রাহমান ও ফওজুল করিম (তারা ভাই) দৈনিক বাংলার যথাক্রমে সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক। তাঁরা দৃঢ় মনোবল নিয়ে কঠোরভাবে বিষয়টা মোকাবেলা করায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম। সাংবাদিকতা পেশায় এ রকম অসংখ্যবার বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সব কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা সম্ভব নয়।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধ থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহর সাতক্ষীরা থেকে ঢাকার একাধিক পত্রিকা এবং একটি সংবাদ সংস্থায় লেখালেখি করে আসছিলাম। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এই সামান্য লেখালেখি করতে গিয়ে নানা ঝক্কি ঝামেলায় পড়তে হয়েছে বারবার। তবুও সাংবাদিকতা থেকে সরে আসিনি। তখন র‌্যাঙ্কিন স্ট্রীট থেকে ভবেশ নন্দীর সম্পাদনায় অর্ধ সাপ্তাহিক আমার দেশ, পুরনো পল্টন থেকে গণি সাহেব পরিচালিত সংবাদ সংস্থা ইউপিপি (ইউনাইটেড প্রেস অব পাকিস্তান) এবং মতিঝিল থেকে মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পূর্বদেশ বের হতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি এলাকার বিভিন্ন সমস্যাবলীর খবর এসব সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় পাঠাতাম। এর জন্যে আমাকে তেমন পারিশ্রমিক দেয়া হতো না। পারিশ্রমিকের পরিবর্তে কাগজে আমার নামে খবর প্রকাশিত হলেই যেন খুশি হতাম। তখন আমি ছাত্র। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এসব করতে মজাও পাওয়া যেত বেশ। অবশ্য পারিশ্রমিক না দিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঠিকমত বা তাদের মনের মত খবর না পাঠালে বিভিন্নভাবে ধমক দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক সময় কৈফিয়তও তলব করা হতো।

১৯৬২ সালের কথা। অর্ধ সাপ্তাহিক আমার দেশে বাঁধ ভেঙে সাতক্ষীরার কয়েকটি গ্রাম সয়লাব হওয়ার একটি খবর পাঠালাম। এর কয়েকদিন পর কয়েকটি সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতনের মর্মন্তুদ একটি খবরও পাঠিয়েছিলাম। খবর দুটো পত্রিকায় বেশ বড়সড় করে ছাপা হলো। প্রকাশিত খবর দুটো দেখে বেশ পুলক অনুভব করলাম। কিন্তু সে পুলক কয়েকদিনের মধ্যে কর্পূরের মত উবে গেল। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ থেকে আমাকে কৈফিয়ত তলব করা হলো। বলা হলো, কেন ঐ সব খবরের ছবি পাঠাইনি? পাঠাইনি কেন আরও বিস্তারিত ফলোআপ। সে সময় সাতক্ষীরার মত মহকুমা শহর থেকে ছবি তুলে এবং তা ডেভেলপ করে

www.pathagar.com

পাঠানো ছিল রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। তবু অনেক কষ্টে ছবি এবং সংশ্লিষ্ট খবরের ফলোআপ পাঠিয়েছিলাম। তাও সাতক্ষীরা থেকে ৪৬ মাইল রাস্তা পেরিয়ে যশোর গিয়ে বিমানের প্যাকেটে পাঠাতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। ইউপিপিতে একটা খবর পরিবেশন করে পড়েছিলাম মহাফাঁপরে। সাতক্ষীরায় অবাধে পচা বাসি খাদ্য বিক্রি হচ্ছে এবং একজন মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে পচা বাসি খাবার বিক্রির অভিযোগে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও অবস্থার তেমন উন্নতি হচ্ছে না। এই ছিল পাঠানো খবরের সারমর্ম।

খবরটি প্রকাশের পর এক ম্যাজিস্ট্রেট বাসায় পেয়াদা পাঠিয়ে আমাকে আদালতে তলব করলেন। বললাম, আমার কি অপরাধ? পেয়াদা বললেন, ওসব কথা জানি না। ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে খবর লিখেছেন। তাতে তিনি চটে গিয়েছেন। আপনাকে হয়তো জেল জরিমানা করা হতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তেও সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আমার প্রতি নাখোশ হবার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। তবুও যে সব খবর বিভিন্ন সময়ে পাঠিয়েছি, তার কার্বনকপি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির হলাম। ম্যাজিস্ট্রেট বেশ বয়স্ক। শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং গম্ভীর। তখনকার সময় ম্যাজিস্ট্রেট মানে বিরাট কিছু। তিনি অত্যন্ত কড়াসুরে জিগ্যেস করলেন, আপনি পচা বাসি খাবার সম্পর্কে কি খবর পাঠিয়েছেন? আমি বিনীতভাবে আমার পাঠানো খবরের কপি তাঁকে দেখালাম। খবরটা দেখে তিনি বললেন, আসলে ছাপার ভুল। আপনি এখুনি ভুল সংশোধন করে পাঠান। সাত দিনের মধ্যে সংশোধিত খবরটা দেখাবেন। কিন্তু যে ভুল খবর নিয়ে এতো তোলপাড়, তখনও সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত খবরটা আমার দেখা হয়নি। পরে জানলাম, একটি ইংরেজি দৈনিকে খবরটা ভুল করে ছাপা হয়েছে। ওই দৈনিকটা সাতক্ষীরায় খুব কম চলে। সর্বসাকুল্যে ৫/৬ কপি। অনেক কষ্টে দৈনিকটি খুঁজে বের করে প্রকাশিত খবরটি দেখলাম। তাতে ভুলে পচা বাসি খাবার বিক্রির জন্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ২০০ টাকা জরিমানার স্থলে ২০০০ টাকা জরিমানার কথা ছাপা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ২০০ টাকার উপর জরিমানা করার এখতিয়ার ছিল না। এ জন্যে সেই ম্যাজিস্ট্রেট বেশ বিব্রতবোধ করেছিলেন। উপর থেকে তাঁকে নাকি কৈফিয়তও তলব করা হয়। অবশ্য পরে প্রকাশিত ওই খবরের ভুল সংশোধন করা হয় অনেকে চেষ্টা তদ্বিরের মাধ্যমে।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পর সাপ্তাহিক পূর্বদেশে 'সাতক্ষীরায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি, অনেকে কচু ঘেচু খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে' - এই শিরোনামে খবর লিখে মহা ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। মফস্বলের পাতায় আট কলাম ব্যানারে প্রধান শিরোনামের খবরটি পড়ে প্রশাসন আমার উপর ক্ষেপে আগুন। তৎকালীন মহকুমা পুলিশ অফিসার একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নিয়ে আমার বাসায় হাজির। তাদের এক জনের হাতে পূর্বদেশের ঐ সংখ্যাটা। এসে খবরটা দেখিয়ে বললেন, কোথায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি দেখেছেন? এর কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি বললাম, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি কোথায় তা তো খবরেই ছাপা হয়েছে। কৈফিয়ত দিলে আপনাদের দেবো কেন? যদি প্রকাশিত খবর মিথ্যা হয়, প্রতিবাদ পাঠান। এর জন্যে বাড়ি পর্যন্ত আসার কোনও যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। সর্বোপরি সরেজমিনে না দেখে পাকা

www.pathagar.com

ঘরের পাখার তলায় বসে কিভাবে আপনারা দুর্ভিক্ষের খবর পাবেন? দয়া করে অকুস্থলে যান। আমার কথায় ওদের মুখে যেন চুনকালি পড়লো। শুকনো মুখে ফিরে গেলেন। তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট খবরের প্রতিবাদ করতে আর সাহস পাননি তারা।

এরা প্রতিবাদ করতে সাহস না পেলেও সাতক্ষীরা কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের দুর্নীতির এক খবর লিখে আমাকে বেশ বড় ধরনের বিপাকে পড়তে হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের কথা। তখন আমি সাতক্ষীরা কলেজে এইচএসসির ছাত্র। আলোচ্য কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ১৮ হাজার টাকা আত্মসাতের এক খবর ছাপা হয় পূর্বদেশে। তাও আবার আমার নামে। খবরটা পড়ে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে তাঁর রুমে ডেকে বেশ চোটপাট করলেন। বললেন, একে হিন্দু তার উপর তাঁর কলেজের ছাত্র। কাজেই তিনি দেখে দেবেন কত ধানে কত চাল! এক পর্যায়ে আমাকে রাসটিকেট করারও হুমকি দিলেন। খবরটার তথ্য নিয়েছিলাম কলেজের ম্যানেজিং কমিটির কাছ থেকে। সে সময় মহকুমার প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মহকুমা প্রশাসক। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সদস্য সফিউর রহমান সম্ভবত সেই সময় সাতক্ষীরায় মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের এই আচরণের কথা মহকুমা প্রশাসককে জানানোর পর অধ্যক্ষ মহোদয় শেষ পর্যন্ত সদয় হন। কিন্তু তার আগেই তিনি আমার এইচএসসির টেস্টের রেজাল্ট উইথহেল্ড করে রেখেছিলেন। সহকর্মীদের বলেছিলেন, হিন্দু ছেলেটার ভবিষ্যত নষ্ট করে ছাড়বেন। কিন্তু কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী এমনকি কর্মকর্তা কর্মচারীরাও ছিল আমার পক্ষে। তারা আলোচ্য অধ্যক্ষের দুর্নীতি ছাড়াও আচার আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই অধ্যক্ষ মহোদয়ের অভিপ্রায় শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

ইতোমধ্যে দৈনিক পাকিস্তানের (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা) সাতক্ষীরার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে আমি নিয়োগ পাই। সে সময় দৈনিক পাকিস্তান বেরুতো ঢাকার ৫০, টিপু সুলতান রোডের একটি নড়বড়ে বাড়ি থেকে। তখনকার সময়ে মফস্বল সংবাদদাতাদের তেমন কোনও সম্মানী দেয়া হতো না। যদ্দূর মনে পড়ে, তখন প্রকাশিত প্রতি লাইন খবরের জন্যে ০৬ পয়সা অথবা ১০ পয়সা করে দেয়া হতো। এ ছাড়া সামান্য কিছু টাকা দেয়া হতো প্রকাশিত ছবির জন্যে। যাই দেয়া হোক না কেন, এই সামান্য পয়সার পরিবর্তে সমাজের প্রতি কমিটমেন্ট সর্বাগ্রে। আর এ জন্যে প্রায় প্রতিদিন নানা ঝুঁকি নিয়ে খবর পরিবেশন করতে হতো। একবার সাতক্ষীরার তালা থানার পাটকেলঘাটায় তৎকালীন ইপিআরের গুলি বর্ষণের খবর ছাপাকে কেন্দ্র করে হুলুস্থূল পড়ে যায়। কপোতাক্ষ নদে ব্রিজ তৈরি করতে গেলে স্থানীয় লোকজন তাতে বাধা দেয়। এই বাধা প্রতিহত করতে গিয়ে ইপিআর তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে সাত জন নিরীহ লোক অকালে প্রাণ হারায়। নিহতদের মধ্যে স্থানীয় এ্যাডভোকেট ও সাংবাদিক হাসান আওরঙ্গীর ছেলে খলিলুর রহমান শেলিও ছিল। আহত হন অনেকে। মর্মান্তিক খবরটা দৈনিক পাকিস্তানে টেলিগ্রাফ করে পাঠাই। তখনকার সময় জরুরি কোনও খবর টেলিগ্রাফে পাঠানো ছাড়া তেমন কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু রাতে টেলিগ্রাম মাস্টার গোপনে জানালেন, ওই খবরের ওপরে মহকুমা প্রশাসক সেন্সরশীপ আরোপ করেছেন। টেলিগ্রাফ তো বটেই, কোনও টেলিফোনের লাইন পর্যন্ত

www.pathagar.com

ঢাকায় দেয়া নিষেধ পিসিও থেকে। তখন পিসিওর মাধ্যমে ঢাকায় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কাজেই খবর ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাবে না। কিন্তু সরকারের ইচ্ছাই তো সব ইচ্ছা নয়। এটা বোধ করি অবাঙালী ওই মহকুমা প্রশাসকের জানা ছিল না। আর জানা ছিল না বলেই খুলনায় দৈনিক পাকিস্তানের প্রতিনিধি মনিরুল হুদাকে গোপনে টেলিফোন করে খবরটা আমার নামে প্রকাশের জন্যে অনুরোধ জানালাম। খবরটা পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান শিরোনামে দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়। আট কলাম হেডিং ছিল– সাতক্ষীরায় ইপিআরের গুলিতে ৭ জন নিহত ॥ খবরের ওপর স্থানীয় প্রশাসনের সেন্সরশীপ আরোপ।

তখন দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক ছিলেন তোয়াব ভাই, এখন জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক। খবরটা প্রকাশের কথা শুনে মহকুমা প্রশাসক আমার উপর মহাক্ষ্যাপা। সাত সকালে ছুটে এলেন আমার বাসায়। সঙ্গে পাইক বরকন্দাজও। প্রথমে তিনি আমাকে রাগতস্বরে জিগ্যেস করলেন, কিভাবে আমি খবরটি ঢাকায় পাঠিয়েছি? প্রতুত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, কিভাবে খবর পাঠাবো তা আমি কাউকে বলতে রাজি নই। সর্বোপরি নির্বিচারে এতোগুলো লোককে হত্যার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হবেই বা না কেন? দেশটা শুধু আপনার একার নয়, আমাদেরও। আর খবরের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করলেই খবর ছাপা হবে না, একথা জানলেন কিভাবে? আমার এ ধরনের কড়া উত্তরের জন্যে মহকুমা প্রশাসক সম্ভবত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিনীতভাবে বললেন, জানেন এতে আমার বিরাট ক্ষতি হয়েছে। আমি বললাম, এসডিও সাহেব আপনার চাকরি রাখা আর না রাখার দায়িত্ব সাংবাদিকদের নয়। এসব কথা আমার বাসায় বসে আলাপ হচ্ছিল যখন, তখনই হঠাৎ খবর এলো গর্ভনর মোনায়েম খান ঢাকা থেকে সাতক্ষীরায় রওয়ানা দিয়েছেন। খবরটা পড়েই নিজে সাতক্ষীরায় আসছেন। তিনি সি প্লেনে করে ব্যঙ্গদহায় নেমে গাড়িতে সরাসরি গিয়েছিলেন ঘটনাস্থল পাটকেলঘাটায়। সেখানে প্রকাশ্য জনসভায় হতাহতের ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়াও গুলির জন্যে মহকুমা প্রশাসককে দোষারোপ করেছিলেন। পরের দিনই গভর্নর মহকুমা প্রশাসককে সাতক্ষীরা থেকে প্রত্যাহার করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন। হতাহতদের ক্ষতিপূরণও দেয়া হয়। কিন্তু যেসব নিরীহ ব্যক্তির জীবন গেল, তাদের জীবন তো আর ফিরে আসেনি!

লেখক অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার সাবেক সিনিয়র রিপোর্টার

www.pathagar.com

সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হোক সমাজ-দর্পণের ব্রত

মমতাজ বিলকিস

একটি আদর্শ দায়িত্বশীল সংবাদপত্র সমাজের দর্পণই মাত্র নয়; ব্যাপক অর্থে অভিভাবকের ভূমিকাও পালন করে। আর সাংবাদিক হলো জাতির বিবেক। বস্তুনিষ্ঠতা ও সত্যানুসন্ধানই সাংবাদিকতার মূল নীতি।

এদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে মানুষ সত্য, ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার উৎকর্ষ দেখেছে অতীতে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন দিতে গিয়ে সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আইন সভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে জনতার কাতারে শামিল হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে 'সুপ্রিম টেস্ট' সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে (?) সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক আবদুস সালামকে মুজিব সরকার চাকুরিচ্যুত করেছিল। অথচ জনাব সালাম ছিলেন কঠোরভাবে আইয়ুব বিরোধী এবং দেশপ্রেমিক। এই সেই মহান সম্পাদক, যিনি ৫০ এর দশকে 'ক্রিপ্টো ফ্যাসিস্ট' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে পাকিস্তানী শাসকদের কোপানলে পড়ে কারাবরণ করেছিলেন। একদা বিশিষ্ট কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বাঘছাল পরিহিত মূষিক' বলে বর্ণনা করেছিলেন পূর্বদেশ পত্রিকায়। তৃতীয় মত কলামে বাসস-এর প্রধান সম্পাদক ফয়েজ আহমদ ছাত্রলীগ নেতা রেজা হাইজ্যাকের অপরাধে রমনা থানার হাজতে আটক হবার সংবাদ সরবরাহের অপরাধে (?) বাসস অফিসে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ১৯৭২ সালে। তিনি 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী'-তে আরও লিখেছেন, সে বছরই রমনা পার্কের কাছে অবজারভারের প্রবীণ সাংবাদিক ও পরে টাইম্‌স ও ইণ্ডিপেণ্ডেন্টের সম্পাদক সৈয়দ মাহবুব আলম চৌধুরী বেবীকে তৎকালীন মাস্তানরা গেঞ্জি-প্যান্ট পরা অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল।

নির্ভীক সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী লেখনী জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছিল সে সময়। মওলানা ভাসানীর 'হক কথা' এবং জাসদের মুখপত্র কবি আল মাহমুদ সম্পাদিত 'গণকণ্ঠ' যথার্থ সমাজ দর্পণ ও গণবিবেকের ভূমিকা পালনে ছিল অকুতোভয়। সত্য, সুন্দর ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে এক সময় সাংবাদিকরা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করেছেন। তারা নীতি ও আদর্শের সঙ্গে কোনও আপোস করেননি। শ্রদ্ধেয় হয়েছেন সকলের কাছে।

শতাব্দী-প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন ছায়া বিস্তার করে গেছেন বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্য ও বাঙালী সমাজ জীবনে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর, যা সওগাত যুগ নামে পরিচিত। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিল তখন বাংলার মুসলিম সমাজ। ১৯১৮ সালে লেখকদের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া, সমাজের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা, নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণমূলক প্রবন্ধাদি ও চিত্রে মহিলা জগত প্রকাশ করা, মহিলাদের সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করা এবং নির্ভীক নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় নীতি গ্রহণ করে পত্রিকা বার করা ছিল সে যুগে রীতিমত বিপ্লব সাধন করার মত দুরূহ কাজ। সে আমলে ছিল না মুসলমানদের কোনও সচিত্র সাময়িকী। তিনি সে দুঃসাধ্য কর্মটি করে গেছেন।

জনাব নাসির উদ্দীনের দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে– এমন এক সংকটময় সময়ে যখন বিদ্রোহী কবি যুগপৎ মৌলবাদী হিন্দুদের পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'র শ্লেষবাণে এবং ধর্মান্ধ মুসলমানদের আক্রমণে ক্রমাগত জর্জরিত হচ্ছিলেন। নজরুলের রচনা মানেই যৌবনের বাণী। সর্বপ্রকার কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মুক্তবুদ্ধির প্রবল প্রবাহ। আর সওগাত ছিল কবির এই মহতী চিন্তার বাহন। সে আমলে মেয়েদের লেখা ছাপার চেয়েও আরও বিপজ্জনক ছিল মুসলিম মহিলাদের ছবি ছাপা। কিন্তু মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন তা শুধু উপেক্ষাই করেননি, সাহসিকতার সঙ্গে সওগাত পাঠকদের উপহার দিয়েছিলেন বহুবর্ণের রঞ্জিত ছবি। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে প্রতিকূল স্রোতে যাত্রা করে পরম ঝুঁকিপূর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন।

বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কবি নজরুল। সম্পাদক নজরুল 'নবযুগ', 'ধূমকেতু' এবং 'লাঙল' পত্রিকায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। ডক্টর শিশির কর 'নিষিদ্ধ নজরুল' গ্রন্থে বিদ্রোহী কবির অন্যূন আটটি গ্রন্থ ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াফ্ত এবং প্রায় আঠারো মাস কারারুদ্ধ থাকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সংবাদপত্র নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। জনগণের মূল সমস্যাগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার সঠিক চিত্র সংবাদপত্রে তুলে ধরা সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এ সমাজের প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেন কাঙাল হরিনাথ। ১৮৬৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পূর্ব বাঙলার দ্বিতীয় পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। কয়েক পর্যায়ে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পত্রিকাটি চলেছিল। ১৮৯০ সালে 'হিতকর' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশ করেন, যা মানুষের হিত সাধন করতে সমর্থ হয়েছিল।

যুগে যুগে সাংবাদিকরা এসেছেন এদেশে নির্ভীক ও সততার প্রতীক হয়ে। বীরের মত জীবন দিয়েছেন সত্য সন্ধানে। কুচক্রী দেশ ও জাতির শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন করতে জীবন দিয়েছেন যশোরের 'রানার' পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল ও গোলাম মাজেদ; দক্ষিণাঞ্চলের শামছুর রহমান এবং মানিক সাহাসহ আরও অনেক সাংবাদিক। চির পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন ফেনীর টিপু সুলতান।

www.pathagar.com

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন, এক হাজার বন্দুকের চেয়ে একজন সাংবাদিকের শক্তি অনেক বেশি। জেফারসনের মতে, সংবাদপত্রবিহীন সরকার নয় বরং প্রয়োজনবোধে সরকার বাদ দেয়া যায়, কিন্তু সংবাদপত্র অপরিহার্য। সংবাদপত্রের সেই মর্যাদা আর সাংবাদিকদের প্রতি মানুষের সেই আস্থা, ভালোবাসা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন।

বিভিন্ন পেশায় ও প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ছিল, আছেও। কিন্তু এখন কোনও কোনও সংবাদপত্র নীতি অনুসরণ করে না। সাংবাদিকতার নামে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থবিত্ত বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রকে এক শ্রেণীর অসৎ লোক নিজেদের স্বার্থের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনেতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলসহ সকল ক্ষেত্রে সৎ লোকের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সংবাদপত্র জগতেও। আজকাল শুরু হয়েছে তথ্য বিকৃতি ও তথ্য সন্ত্রাস। তথ্য সন্ত্রাস শুরু হয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। বিংশ শতাব্দীতে হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস লাগাতার মিথ্যা বলার মাধ্যমে মিথ্যাটাকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, তা আজ নতুন করে এক শ্রেণীর সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী গ্রহণ করেছেন। এই সকল বুদ্ধিজীবী তাদের মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ, জাতি, ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই চালাচ্ছে মিথ্যা বানোয়াট প্রচার। বর্তমান সময় হলো তথ্য বিপ্লবের যুগ। আর এ সময় তথ্য বা মিডিয়া সন্ত্রাসই হলো সবচেয়ে প্রবল ও কার্যকর সন্ত্রাস। তাই এই সকল জ্ঞান পাপীরা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে জাতির জন্যে ক্ষতিকর প্রচার। আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে এক তরফাভাবে প্রত্যাহার করে অববাহিকা বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করে ভারত বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার নীলনকশা প্রণয়ন করেছে, যার ফলে বাংলাদেশ প্রতি বছর দেড় হাজার কোটি টাকার সম্পদ হারাচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের চার কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ভারত আরও অনেকগুলো অভিন্ন নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে শুকনো মৌসুমে পানি আটকে রেখে এবং বর্ষায় বেশি পানি ছেড়ে দিয়ে এদেশের মানুষকে ক্রমাগত পর্যুদস্ত করে মেরে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশের এই জীবন-মরণ সমস্যার কথা বলতে অনেক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক কিন্তু ভীষণ লজ্জা পান।

শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেআইনী শান্তিবাহিনীর সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে নানাবিধ নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত রেখে এ দেশের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করার কাজও চলছে। গুজরাটে শত শত মুসলমানকে হত্যা করে, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় প্রতিটি মায়ের কোল শূন্য করে, কিশোর তরুণ ও যুবকদের হত্যা করে ভারত যখন বীরত্ব দেখায়, তখন আমাদের কিছু সংখ্যক সাংবাদিক নিশ্চুপ থাকেন।

ভারতের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলতে যখন বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র অজানা আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত, তখন ভারতের কিছু কিছু কাগজ সত্য উচ্চারণে সচেষ্ট। বাংলাদেশসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুসুলভ নয় বিধায় আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পাক্ষিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৭ জুন ২০০৩ সংখ্যায় 'পড়শিদের ওপর ভারতের দাদাগিরি' শীর্ষক দীর্ঘ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অভিন্ন বহু নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি আটকে রেখে শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশকে চরম সংকটে ফেলার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ

www.pathagar.com

বছর মুম্বাইতে ভারতীয় এক চিন্তাবিদ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যদিও অধিকাংশ বাংলাদেশী পত্রিকা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে কোনও রহস্যময় কারণে।

এদেশের এক শ্রেণীর লেখক-সাংবাদিক বড়ই বিচিত্র। হিটলারের দোসর ইতালির ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করলেও তাদের কাছে রবি ঠাকুরের কোনও দোষ হয় না। আবার শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সহকারী ড. হাসান মাহমুদ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনে যখন পত্র পাঠালেন, তাতে লেখা ছিল– 'বাংলাদেশে র‍্যাডিক্যাল ইসলামী মৌলবাদী গ্রুপগুলো সক্রিয়', তখন তারা অজ্ঞাত কারণে প্রতিবাদ করতে পারেন না।

সত্য, ন্যায় ও ন্যায্য কথা বলে নিজেদের বিবেকের কাছে স্বচ্ছ থাকাটাই সাংবাদিকের ধর্ম। সত্য, সুন্দর ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধন করাই তাদের কাজ। সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী লেখনীই কেবলমাত্র পারে সকল প্রকার অপপ্রচার ও দুর্নীতির বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলে এ পেশার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে।

লেখক বাসসের সিনিয়র সাব এডিটর

www.pathagar.com

সোনার খাঁচার দিনগুলি

পারভীন সুলতানা মূসা ঝুমা

ধুপধাপ আওয়াজ তুলে দৌড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার কোণার লাইব্রেরি রুমে ঢুকে পড়লাম। দ্রুত লুকাতে গিয়ে বইয়ের আলমারির সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। লাইব্রেরিয়ান চাচা তড়িঘড়ি করে এসে সেটি ধরে ফেলায় সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। কিন্তু ততক্ষণে মনি লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়লো। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে পাশে কার্ডরুমের ভেতর দিয়ে পেছনের সরু আঁকাবাঁকা সুইপারদের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলে গেলাম পেছনে পুকুর পাড়ে।

মনি আমার পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল। হাত-পা ভেঙে একাকার। দিলো ভ্যাঁ কান্না। বেয়ারা উমিদ খান চাচা কান্না শুনে ছুটে এলেন, 'ঝুমা বেশি দুষ্টামি করো।' আমাকে মৃদু ধমক দিয়ে মনিকে নিয়ে গেলেন ক্যান্টিনের পাশে কিচেনে। মনির হাত-পা পরিষ্কার করে এ্যান্টি-সেপটিক লাগিয়ে দিলেন। নিজেকে কেমন অপরাধী লাগছে। চলে গেলাম পশ্চিমের মাঠে। সেখানে দোলনায় দুলতে দুলতে দেখছি লাল ইটের বাড়িটি একবার কাছে, আরেকবার দূরে সরে যাচ্ছে।

কত বছর আগের ঘটনা? পঁয়ত্রিশ? হবে হয়তো! শৈশবের স্মৃতি সততই মধুর। জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্মৃতি মধুরতর। আমার শৈশবের প্রেস ক্লাব মানে তো ইচ্ছেমতো ছুটে বেড়ানো, লাল ইটের দালান, কাঠের সিঁড়ি, দোতলায় কাঠের মেঝে আর সেখানে ইচ্ছে করে ধুপধাপ আওয়াজ করে ঘুরে বেড়ানো। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, খালা হলেও বয়সে ছোট মনির (বাংলাদেশ অবজারভারের সাবেক সম্পাদক প্রয়াত আবদুস সালামের ছোট মেয়ে) সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

বৈকালিক আড্ডা জমে উঠতো আউয়াল মামা (সংবাদের প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক পরবর্তীতে দৈনিক খবরের নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন, বড় হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন তাঁকে হাওয়াল মামা ডাকতাম), মিন্টু মামা (বর্তমান নিউ এজ এর সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান), ব্রজেন দাশ মামা (প্রয়াত সাঁতারু ব্রজেন দাশ, কেন যে তাকে পুরো নামে ডাকতাম জানি না, এ প্রশ্নটি তিনি প্রায়ই করতেন), মোর্শেদ মামা (বাংলাদেশ টাইমসের প্রয়াত সম্পাদক শহীদুল হক), মহিউদ্দিন মামা (সে সময় পাকিস্তানের বিমান সংস্থা পিআইএ'র জনসংযোগ কর্মকর্তা, বর্তমানে ম্যানচেস্টার প্রবাসী), ইসলাম চাচা (দীর্ঘদিন ইউসিসে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন) এবং খোকন মামার (প্রখ্যাত সাংবাদিক আতাউস

www.pathagar.com

সামাদ) সস্ত্রীক উপস্থিতিতে। দারুণ সরব হয়ে উঠতো ক্লাব প্রাঙ্গণ। কখন যে সূর্য ডুবে যেতো, গল্পে মশগুল তাঁরা টেরই পেতেন না। আর আমরা ছোটরা পাশের দোলনায় দুলতে দুলতে বা স্লিপারে ওঠানামা করতে করতে দেখতে পেতাম সন্ধ্যার আবীর রঙে আমাদের ছায়া কিভাবে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রেস ক্লাব ছিল আমাদের দ্বিতীয় আবাস। এখনও তাই। প্রেস ক্লাবের নেশা এক অন্তহীন নেশা। মৃত্যু ছাড়া এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই। শৈশবের আকর্ষণের রঙ পাল্টেছে, কিন্তু ফিকে হয়নি। মুশকিল আসানের এক পরম নির্ভরতার জায়গা ছিল প্রেস ক্লাব। বাড়িতে পানি নেই, তোয়ালে ঝুলিয়ে চলে যাও প্রেস ক্লাবে। সেসব অবশ্য ছোটবেলার কথা। আর এখন, সাংবাদিকতা পেশায় ঢোকার পর কর্মস্থলের কোনও জটিলতায় মন বিষাদিত হয়ে আছে, চলে যাও প্রেস ক্লাবে। ক্যান্টিনে বারোয়ারি আড্ডায় মনটা কখন যে প্রশান্ত হয়ে ওঠে, টের পাই না। স্কুলের নিয়মিত টিফিন ছিল ক্লাবের কাটলেট। ক্লাসের বন্ধুরা তা খেয়ে মাতোয়ারা। এ এক অদ্ভুত পরম্পরা। একই টিফিন আজ আমার মেয়ে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তার বন্ধুরাই নয়, শিক্ষয়িত্রীদেরও সে টিফিন খেয়ে পাগল হওয়ার দশা। মেয়েকে তারা তাগাদা দেন, 'কই তোমার প্রেস ক্লাবের কাটলেট?'

বাবার বন্ধুদের, যাঁদের কি এক অজ্ঞাত কারণে চাচা না বলে মামা ডাকে সম্বোধন করতাম তাদের অপত্য স্নেহ আজও পেশায় এবং ব্যক্তিজীবনে আমাকে আবেগে আপ্লুত করে তোলে। পরবর্তীতে প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে তা অনুভব করতে পেরেছি অন্তরের অন্তস্থল থেকে। ক্লাবের নির্বাচনে দুই ফোরামের অস্তিত্ব যতই নিষ্ঠুর হোক, তা অতীব সত্য এবং সকলের জানা। কিন্তু পিতৃবন্ধুদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালোবাসার জন্যে দুই ফোরামের ভোট আমাকে অনায়াসে নির্বাচনের তরী পার করিয়ে দেয়। মনে পড়ে এপি'র প্রয়াত ব্যুরো চীফ হাসান সাঈদ চাচাকে। দেখা হলেই বলতেন, 'গুণ্ডা'। নাদুস নুদুস ছোট্ট মেয়েটার জন্যে আর কোনও বিকল্প ডাক তিনি বোধহয় খুঁজে পেতেন না। বাবার কাছে নালিশ করায় সাঈদ চাচাকে ডেকে বাবা মৃদু ধমক দিতেন। বাবার সেই কপট তিরস্কারে ছোট্ট মেয়েটি আশ্বস্ত হলেও সাঈদ চাচার গুণ্ডা ডাক থামেনি।

ছোট একটা রুম, সারি সারি পাতা আলমারিতে রাশি রাশি বই। তখনকার প্রেস ক্লাবের লাইব্রেরি। সেসময় কিশোরী আর তরুণী খালাদের দেখতাম এই লাইব্রেরি থেকেই প্রথম উপন্যাস পড়ার আস্বাদন গ্রহণ করতে। তারাশংকর, শংকর, আশুতোষ, বিমল মিত্র, নীহার-রঞ্জন এবং বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমগ্রের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল ক্লাব লাইব্রেরি। আজ প্রেস ক্লাবের লাইব্রেরি অনেক বিস্তৃত হয়েছে, আধুনিক হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে মিডিয়া সেন্টার, যা আমাদের জন্যে অত্যন্ত বিরাট এক অহঙ্কার। তবে জানি না, আমার শৈশবকালের মতো এ লাইব্রেরি সদস্যদের ছেলেমেয়েদের আজকাল ততটা আকর্ষণ করে কিনা! অবশ্য এখন তো আমাদের জীবন থেকে লাইব্রেরির পাট উঠে যাচ্ছে। ক্লাবের লাইব্রেরিকে দোষ দিয়ে লাভ কি? একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা আর বড় বোন রুমাসহ যেতাম শহীদ মিনারে। সেখানে যাওয়ার আগে যেতাম প্রেস ক্লাবে। বাগানের মালি চাচা দু'বোনের জন্যে চমৎকার দু'টি ফুলের তোড়া বানিয়ে রাখতেন। সেসময় বাগানে ফুটতো কত ধরনের,

www.pathagar.com

কত রঙের ফুল। শহীদ মিনার থেকে ফিরে এসে আবার ক্লাবে ঢুঁ মারা। সকালের নাশতা সেখানেই হয়ে যেতো। আজও তাই একই ধারায় চলছে। একুশে ফেব্রুয়ারি, পয়লা বৈশাখ, বিজয় দিবসে যেখানেই যাই, যতদূরে যাই, আগে পিছে প্রেস ক্লাবে ঢুকতেই হয়। নাহলে মনে হয় দিনটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যাত্রা দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হয় এই প্রেস ক্লাবেই। অমলেন্দু বিশ্বাস ও জ্যোৎস্না বিশ্বাসের যাত্রা দেখে এসে সে রাত ঘুমাতে পারিনি। যাত্রা যে এত উপভোগের, এত সুন্দর হয়, তা আগে বুঝিনি। এখন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কত জাঁকজমক, কত ঝলমলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। অবশ্যই এ সকল খুবই উপবোগ্য। কিন্তু তখন প্রেস ক্লাব মাঠে সাধারণ শাদা কাপড়ে ঘেরা যে অনুষ্ঠানগুলো হতো– তার ছিল না কোনও আড়ম্বর, ছিল না কোনও জৌলুস। এরপরও কেমন আগ্রহ ও কৌতূহলভরে উপভোগ করতাম তা বোধহয় শৈশবের সরলতা ও অপরিমিত আকাঙ্ক্ষার কারণেই।

লাল ইটের দালান ভাঙার সংবাদ প্রথম যখন শুনি, বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম। একবার ভেবেছিলাম ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ জানাই 'প্লিজ, এ দালানটি ভাঙবেন না। এটি সামনে রেখে পাশে নতুন দালান করুন।' আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন। পরে অনুভব করলাম পরিবর্তন সময়ের দাবি। এ চরম সত্য মেনে নিতে হয়। আধুনিক স্থাপত্য শিল্প আর বিলাসবহুল আসবাব দিয়ে সাজানো বর্তমান প্রেস ক্লাব ভবন দেখে গর্ব হয় বটে, কিন্তু ছোটবেলার লাল ইটের প্রেস ক্লাব হৃদয়ের গভীরে এমনভাবে গেঁথে আছে, যখনই ক্লাব নিয়ে চিন্তা করি বা স্বপ্ন দেখি, তখন সে ভবনের ছবি মুহূর্তেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু পেশার নয়, শুধু বিনোদনের নয়। এ সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, আমৃত্যু সম্পর্ক।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদকীয় সহকারী

www.pathagar.com

আমাদের সেকেণ্ড হোম

রিয়াজউদ্দিন আহমেদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবকে বলা হয় সাংবাদিকদের দ্বিতীয় নিবাস, সেকেণ্ড হোম। আক্ষরিক অর্থেও কথাটা প্রায় সত্যি। অনেকের সকাল থেকে সারাদিন কাটে ক্লাবে। কারও বা দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত। মোটের উপর দিন-রাতের বেশি সময়টাই কাটে জাতীয় প্রেস ক্লাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এখানে এতটা সময় কি করেন সাংবাদিকরা?

সদস্যরা অনেকেই সকালের কাগজ পড়া সহযোগে নাস্তা করেন এখানে। তখন বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত নানা লেখা নিয়ে আলোচনা হয়। কোন্ লেখাটা ভালো বা ভালো নয়, বলা হয় সে সব কথা। কেন তা ভালো বা ভালো নয়, সে কথাও হয়। পেশাগত জীবনে এই বিষয়টা খুবই কাজে লাগে। কেউ কেউ প্রশংসা পান। কেউ নির্দেশ পান ত্রুটির। কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্যে দুটোরই খুব প্রয়োজন।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নতুন খবরের সন্ধানও মেলে অনেক সময়। একজন সাংবাদিক যে সব খবর জানতে পেরেছেন, তা অন্যকে জানান। ক্লাবের গ্রন্থাগারটিও কাজে লাগে অনেকের। সেখানে পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকী। গ্রন্থাগারেই রয়েছে ইন্টারনেট ব্রাউজ করার ব্যবস্থা। ই-মেইল আদান প্রদান করা যায় সেখান থেকে। সদস্যরা এসব সেবা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে খান চা-নাস্তা ও দিন বা রাতের খাবার।

অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে প্রেস ক্লাবের বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত ক্লাবের সদস্যরা নানা পেশার হন। প্রেস ক্লাবের তা নয়। প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্যরা সবাই অপরিহার্যভাবে সাংবাদিক। অবশ্য সাংবাদিকদের সকলেই ক্লাবের সদস্য নন। কিন্তু সদস্যরা সকলেই সাংবাদিক। তবু তাদের চালচলন ও চিন্তা-ভাবনায় বৈচিত্র্যের অভাব নেই। সাংবাদিকদের মধ্যে মেধা, দক্ষতা ও পদাধিকারের ভিন্নতা থাকেই। তা নিয়ে ভেদাভেদও থাকে। কিন্তু সে ভেদাভেদ একেবারেই ক্লাবের বাইরে। ক্লাবে প্রায় সবাই সকলের ভাই। পরস্পরের প্রতি সৌজন্যের অভাব নেই; নেই পদাধিকারের দাপটও।

দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে জাতীয় প্রেস ক্লাব সব সময়ই শরীক থেকেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্লাবের অনেক সদস্য নানাভাবে অংশ নেন। শহীদ হয়েছেন কয়েকজন। একই ঘটনা ঘটে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনেও। এসব ক্ষেত্রে ক্লাব বা ক্লাবের সদস্যরা আপোস করেননি।

www.pathagar.com

ক্রীড়া ও বিনোদনের নানা আয়োজনও রয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে। বছরভর নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্যোগ আয়োজন থাকে। এই কারণে নিজেকে ধন্য মনে করছি যে, আমি এই বিশাল ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি একটি বিশেষ সময়ে। ক্লাব এবার তার সুবর্ণ জয়ন্তি উদযাপন করছে। ১৯৫৪ সাল থেকে এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যেতে পারে। পত্রপত্রিকার সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে সাংবাদিক এবং ক্লাবের সদস্যদের সংখ্যাও। সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক কলাকৌশল। বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এবং প্রচার সংখ্যাও বেড়েছে।

বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং চাকরির পরিবেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পেশায় ক্রমশ যুক্ত হচ্ছেন বেশি সংখ্যক শিক্ষিত মেধাবী তরুণ-তরুণী। জাতীয় প্রেস ক্লাব সংবাদপত্রের এই সাফল্যের শুধু সাক্ষী নয়, ফলভোগীও।

কিন্তু সাংবাদিকতা বা প্রেস ক্লাবের এই উন্নয়ন এক দিনে হয়নি। এর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এর জন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। শাসকরা তাদের ক্ষমতা রক্ষার জন্যে বারবার সত্যকে হত্যা করেছে। হরতাল হলে সংবাদপত্রকে বলতে বাধ্য করা হয়েছে জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। জলজ্যান্ত হত্যাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। দেশপ্রেমিককে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করতে বাধ্য করা হয়েছে। সাংবাদিক সমাজকে এভাবেই শাসকরা সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পেরেছে কালাকানুনের বলে। সাংবাদিকরা কিন্তু এধরনের জবরদস্তি কখনও মেনে নেয়নি। তাই বারবার আন্দোলন হয়েছে কালাকানুনের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের সহ্য করতে হয়েছে অত্যাচার, হারাতে হয়েছে চাকরি। দৈহিক লাঞ্ছনা এবং দুঃসহ কারাযন্ত্রণা পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে অনেককে। জীবননাশের হুমকিসহ নানারকম ভয় দেখিয়ে সাংবাদিকের বিবেক ও সত্যকণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রলোভনে বশীভূত করার অপচেষ্টাও চলেছে বিভিন্ন সময়ে। প্রেস ক্লাব এসব সত্য বিনাশী অপশক্তি প্রতিরোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছিল অগ্রণী।

তবে শুরুতে প্রেস ক্লাব আজকের ক্লাবের মত ছিল না। সবুজের মধ্যে ছোট্ট একটি দোতালা লাল দালান ছিল। ঢাকার রাস্তা ছিল তখন ছোট ছোট, সংখ্যায়ও কম। যানবাহন, মানুষ সবই কম ছিল। সাংবাদিকের সংখ্যাও আজকের মত ছিল না। শহরের প্রাণকেন্দ্র, অথচ কোলাহলবিহীন। এক মনোরম পরিবেশে আমাদের পূর্বসূরীরা প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৪ সালে। নামকরা সব সম্পাদক আর সাংবাদিকদের পদচারণায় ক্লাব ছিল তখন মুখরিত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল পুরোনো ক্লাবঘরের মধ্যের রুমটি। মাঝখানে একটি গোল টেবিল। চারদিকে কয়েকটি চেয়ার। এর মধ্যে এসে বসতেন পথিকৃৎ সাংবাদিক আবদুস সালাম, মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী। গল্পে, তর্কে মাতিয়ে তুলতেন ক্লাব। সবাই উপভোগ করতেন সে জমজমাট আড্ডা।

ক্লাব ক্যান্টিনে বসে আলোচনা হতো দেশ দুনিয়ার। রাজনীতিই ছিল মূল আলোচ্য। আলোচনায় উত্তাপ ছিল, মতভেদ ছিল, কিন্তু ছিল না কোনও রাজনৈতিক বিভাজন।

www.pathagar.com

সাংবাদিকরা সাংবাদিকই ছিলেন। এর বেশি কিছু নয়। ক্লাব ঘরের পেছনে আম গাছ তলায় তখন আমরা তরুণ সাংবাদিকরা বসে গল্প করতাম। বড়দের মধ্যে আসতে সংকোচ ছিল। কিন্তু অনেক সময় তাঁরাই চলে আসতেন আমাদের মধ্যে। কেটে যেত জড়তা। আজকে ক্লাব বড় হয়েছে। অনেক বড়, অনেক আধুনিক। অনেক সুযোগ-সুবিধা। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা। কিন্তু সবাই ব্যস্ত। আগের মত আয়েশী সময় যেন এখন নেই। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সোনালী দিনগুলি।

আমরা যারা সেকালের সাংবাদিক এটা তাদের কথা, তাদের কষ্ট। আজ যারা তরুণ, নতুন, তারা নিশ্চয়ই নতুন পরিবেশে আনন্দিত। কারণ এত বড় প্রেস ক্লাব, এত সুযোগ-সুবিধা, এত বড় চত্বর বিশ্বের খুব কম প্রেস ক্লাবেরই আছে। সেদিক থেকে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান। প্রেস ক্লাবকে নিয়ে অহঙ্কার করার মত অনেক কারণ আছে। এটা শুধু ইট কাঠের দালান নয়, এটা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আজকের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় নেতা সবার পদচারণায় এ ক্লাব ধন্য। আজ সুবর্ণ জয়ন্তিতে আমরা তাই আনন্দিত। আমাদের আশা, সামনের দিনগুলোতে প্রেস ক্লাব আরও সুন্দর, আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

একথা স্বীকার করতেই হবে ইদানিং সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের প্রসার ঘটেছে অনেক। টেকনোলজি আর ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের সংবাদপত্রে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, মডেম এসব সংবাদপত্রে আজ পরিচিত নাম। ইদানিং টাইপ রাইটার, হটমেটাল, লাইনো টাইপ এসব ভোকেবুলারী সীমিত। সংবাদপত্র দেখতে এখন অনেক সুন্দর। বিদেশী গ্লোসি নিউজপ্রিন্টে রঙ ছড়ানো কাগজ বের হচ্ছে। কাগজের বৈচিত্র্য বেড়েছে, কাগজের সংখ্যা বেড়েছে। যা বাড়েনি, তাহলো পেশার মান। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, টেকনোলজির এত প্রসারের পরও আমি যেন স্বর্ণযুগের সেই সন্ধান পাচ্ছি না।

নব প্রজন্মের সাংবাদিকরা আমার এ মতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। আমি তেমন একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে চাই। কারণ আমি নিশ্চিত হতে চাই, আমাদের সেই স্বর্ণ যুগটি হারিয়ে যায়নি। একথা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আজকের পেশা সেই স্বর্ণযুগ পেরিয়ে গেছে, তাহলে আমি সবচেয়ে সুখী হবো। কিন্তু এ ধরনের চ্যালেঞ্জ নবপ্রজন্ম দিতে পারবে কি? আগেই বলেছি যদি আজকের পেশা স্বর্ণযুগ পেরিয়ে যেতে পারে তবে আমি সবচেয়ে খুশি হবো। কিন্তু আমার সংশয় আছে, আমাদের অভিযাত্রায় বোধহয় আমরা পিছিয়ে গেছি। অথবা সামনে এগুতে পারিনি।

তাইতো আজ প্রেস ক্লাবে পেশা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় না। রাজনীতির আলোচনা হয় না আগের মত। এখন আমরা রাজনীতিতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলি। সোজা কথা পেশা আজ পলিটিসাইজড। আজকাল অনেকেই বলেন, কাগজের নাম শুনেই বলতে পারি– তিনি কোন্ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির। কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা? এ প্রশ্নের মুখোমুখি আজ সাংবাদিকতা পেশা। এর প্রকাশ অনেক সময় প্রেস ক্লাবেও দেখা যায়। রাজনীতির মেরুকরণের শিকার হয়েছে প্রেস ক্লাবের টেবিল।

www.pathagar.com

এ মেরুকরণ নিচ্ছে বেশি, দিচ্ছে কম। আমরা হারাচ্ছি বেশি, পাচ্ছি কম। আমাদের সেই ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা-সবই আজ মেরুকরণের নিষ্ঠুর শিকার। মেধায়, মননে পেশাগত মর্যাদায় আমরা সেই স্বর্ণযুগ থেকে দূরে বহুদূরে। স্বর্ণযুগের সন্ধানে আত্মোপলব্ধির আজ বড় প্রয়োজন। আমি আশাবাদী, আমাদের পেশা আরও সমৃদ্ধ হবে। আবার আমরা ফিরে যাব নতুন এক স্বর্ণ যুগে।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির (২০০৩-০৪) সভাপতি, দৈনিক নিউজ টুডে'র সম্পাদক

www.pathagar.com

আরও আলোকিত প্রেস ক্লাব গড়ার স্বপ্নে

শওকত মাহমুদ

সময় ও কাল চির বহমান। অতীত দূরের, আবার কাছেরও। ভাষা ও গণতন্ত্রের অধিকারের সঙ্গে স্বাধীনতার সুপ্ত অঙ্গীকারের মন্থনে জাতি যখন উদ্বেলিত, তখন সৃজনের এক অনিবার্য প্রকাশ ধর্ম নিয়ে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই জাতীয় প্রেস ক্লাব। সুদীর্ঘ ৫০ বছরের অভিযাত্রায় এই প্রেস ক্লাব রচনা করেছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়পুঞ্জ, রুখে দাঁড়িয়েছে স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।

জাতির গণতান্ত্রিক আর্তিকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপ্নকে অকুতোভয়ে লালন করেছে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান। পঞ্চাশ বছরের তটস্থ দূরত্বকে আমরা অতিক্রম করেছি জাগৃতি ও দীপায়নের প্রলয় উল্লাসে। তাই আজকের এই ক্ষণটি আমাদের বড়ো গৌরবের, অফুরান অহঙ্কারের।

নীলক্ষেত থেকে পল্টন ময়দান– বাংলাদেশে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির নির্ণয়ক্ষেত্র হলে তোপখানা রোডে, জাতীয় প্রেস ক্লাব তার হৃৎপিণ্ড। এই বেষ্টনীতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আপনাপন উপলব্ধিতে ধারণ করে আছে অসামান্য গৌরব। কিন্তু শ্লাঘনীয় এই জাতীয় প্রেস ক্লাব। দাঙ্গার প্রতিবাদে, নিষেধের নিগড় ভাঙতে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে প্রথম গর্জন উঠেছে এই চত্বর থেকে। বড়ো নিরাপোস এই প্রত্যয়। কাউকে স্বমতে দীক্ষিত বা মতান্তরিত করার প্রচারব্রত ছাড়াই। নইলে '৭১-র ২৫ মার্চ এ ভবনে হানাদারের গোলা পড়বে কেন? স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯টি বছর প্রেস ক্লাব জ্বালিয়ে রেখেছে চেতনার অনির্বাণ মশাল। ক্ষমতাবানের প্রতাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে দাঁড় করানোর মধ্য দিয়ে প্রেস ক্লাব জাগিয়ে তুলেছে এক প্রসারিত ভূ-খণ্ড, যার পরতে পরতে রয়েছে বীজবান বিশ্লেষণ, রুদ্ধ বিবরণ নয়।

বহিরঙ্গে রাষ্ট্রবোধ, গণতন্ত্রবোধ আর অন্তরঙ্গে শত শত সাংবাদিকের পেশাগত উৎকণ্ঠা এবং কুয়াশা ঘোচাতে মননের রৌদ্রসম্পাতের আয়োজন– এই চমৎকার ঐক্যময় অবস্থানে এগিয়ে চলেছে প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকদের ঘরের বাইরে ঘর– দ্বিতীয় গৃহ। একজন সাংবাদিকের সামাজিকতা, পেশা নিয়ে ভাবনা, উৎকর্ষ অর্জনের অন্তহীন প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রকে চিন্তার শীর্ষে ধরে রাখা, মস্তিষ্কের স্বেদমোচন, চিত্তে নব নব প্রেরণার পুনর্ভরণ, পরিবার নিয়ে নির্মল বিনোদন– সবই প্রেস ক্লাবকে ঘিরে। ৫০টি বছরে কত কিছুই না হয়েছে। বদলেছে রাষ্ট্র, রাজনীতির

www.pathagar.com

ঢং, ঘটেছে প্রলয়াবেগে নানান প্রযুক্তির উল্লম্ফন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা মহান পুরুষেরা যে সংকল্প রচনা করে দিয়ে গেছেন এর গঠনতন্ত্রের পুরোভাগে, তা থেকে কখনওই বিচ্যুত হননি এর সদস্যরা। বরং নানাক্ষণেই সেই বর্ণবিরল স্থাপত্য থেকে খুঁজে নিয়েছেন প্রেরণার সম্পাদ্য। এগিয়ে চলার শক্তি। পুরনো লাল ভবনের স্মৃতিটুকু আছে নতুন ভবনের সামনে লাল দেয়ালে। মাঝে ভিত্তিপ্রস্তর নতুন ভবনের, যাতে নাম লেখা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের, যিনি প্রেস ক্লাবের জন্যে জমি ও ভবন নির্মাণে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গেট দিয়ে ঢুকতে শহীদ সাংবাদিকদের নামের তালিকা সংবলিত প্রস্তর খণ্ড। পুরনো লাল ভবনের সেই দুরন্ত আড্ডা হয়তো নেই, কিন্তু আছে প্রবীণ-নবীনদের জমজমাট সমাবেশ।

প্রেস ক্লাব ভবনে এখন আধুনিকতার গাঢ় প্রলেপ পড়ছে। নির্মিত হতে যাচ্ছে বহুতল মিডিয়া কমপ্লেক্স। গত ২৭ নবেম্বর ২০০৪ সুবর্ণ জয়ন্তির অনুষ্ঠানে এর ভিত্তিফলক বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে প্রেস ক্লাবের তাবৎ জমির চিরস্থায়ী ইজারার ঘোষণা দিয়ে তিনি সদস্যদের দুশ্চিন্তা দূর করেছেন। একুশ শতকে আরও আলোকিত এক প্রেস ক্লাব গড়ার স্বপ্নে আমরা সবাই বিভোর।

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির (২০০৩-২০০৪) সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার একাল সেকাল: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের চোখে

হাসান হাফিজ

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এদেশের মুসলমানদের সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য ইতিহাস। তিনি নিজেই একটি ইনস্টিটিউট। এদেশের সাহিত্য-সাংবাদিকতার একাল-সেকাল প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলার পক্ষ থেকে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

এতে তিনি পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমান সমাজের নানা কথা বলেছেন। সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা, অদম্য আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নচারিতার সাফল্য ও অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি একালের সাংবাদিকতার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য ভালো মন্দ দিক মূল্যায়নেরও প্রয়াস পেয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত এই প্রতিবেদন। তাঁর জবানীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকে এ পর্যন্ত সাহিত্য-সাংবাদিকতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের সারাৎসার:

চাঁদপুরে ১৮৮৮ সালে আমার জন্ম। পত্রপত্রিকার প্রতি আকর্ষণ কিভাবে জন্মালো? ছোটবেলা থেকেই ছবির বই দেখতে ভালোবাসতাম। কলকাতা থেকে কোনও পত্রিকা এসেছে জানলে সেটা দেখার জন্যে অনেক দূরেও চলে যেতাম। তখন আমি হাইস্কুলের ছাত্র। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, এত যে পত্রপত্রিকা– তার মধ্যে মুসলমানদের কোনওটা নেই কেন? একবার আমার এক হিন্দু ক্লাসমেট স্কুলে একটা ছোটদের ম্যাগাজিন নিয়ে এলো। তাকে বললাম, ম্যাগাজিনটা আমাকে দাও, রাতে দেখে আগামীকাল ফেরত দিয়ে দেব। বন্ধু আমার হাত থেকে পত্রিকাটি কেড়ে নিয়ে বললো, তোদের মুসলমানদের কি আছে? আমাদেরটা নিয়ে টানাটানি করিস কেন? ওর ব্যবহারে খুব দুঃখ পেলাম। লাইব্রেরিতে গিয়ে খোঁজ নিলাম মুসলমানদের কোনও পত্রপত্রিকা আছে কি না? উত্তর পেলাম, নেই। এমনকি, মুসলমানদের লেখা কোনও পাঠ্যবইও নেই। সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। বারবার ভাবতে থাকলাম দেশে কোটি কোটি মুসলমান, তাদের নিজস্ব কোনও পত্রপত্রিকা নেই কেন? এই হলো গোড়ার কথা।

তখন আমার মাথায় ঢুকে যায় ব্যাপারটি। রাতে অজস্র পত্রপত্রিকার স্বপ্ন দেখি। বাবা মারা যাওয়ার ফলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়া হলো না। কিছুদিন স্টীমার অফিসে সহকারীর কাজ করার পর বোম্বের একটি বীমা কোম্পানীর এজেন্টের কাজ নিলাম। তখনকার দিনে

www.pathagar.com

মুসলমানরা বীমা করতে চাইতো না। এমনকি, ব্যাংকেও টাকা রাখতো না। তাদের চোখে এগুলো ছিল গোনাহ্র কাজ। যা হোক, শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা হাতে এলে ঠিক করলাম, কলকাতা যাবো। পত্রিকার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই কলকাতা যাত্রা। সেকালে বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। শিক্ষিত লোকও বিরল। দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হলো। তারা বললেন, খবরদার! হিন্দুদের মতো ছবি দিয়ে পত্রিকা বার করবেন না। বার করতে হয় ইসলামী পত্রিকা বার করুন। ব্যারিস্টার এ রসুল বিখ্যাত ব্যক্তি। কুমিল্লার লোক। তাঁকে পত্রিকার পরিকল্পনা জানাতে উৎসাহিত হয়ে বললেন, ৫০ বছর আগেই পত্রিকা বার হওয়া দরকার ছিল।

পত্রিকা তো বের করবো। মন মতো নাম পাই না। শেষ পর্যন্ত নিজেই নাম খুঁজে পেলাম, 'সওগাত'। অভিধানে এর অর্থ দেয়া আছে উপহার। এটা ১৯১৭-১৮ সালের কথা।

এখন সমস্যা লেখার। মুসলমানদের মধ্যে লেখক-সাংবাদিক বলতে গেলে নেই। মুষ্টিমেয় দু'চার জন যারা আছেন, তাদের লেখার বিষয়ও গতানুগতিক, ধর্মীয়। হযরত ওমর (রাঃ), তাপসী রাবেয়া (রাঃ) শুধুমাত্র এঁদের সম্পর্কেই মুসলমানদের লেখালেখি। ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেনের কাছে লেখা চাইতে গেলাম। বললাম, আমি একটা পত্রিকা বার করবো। হুঁকো টানতে টানতে উনি প্রশ্ন করেন, 'আরবী, ফার্সী না বাংলা'? আমি বললাম, 'আরবী-ফার্সী নয়, আপনার ভারতবর্ষ পত্রিকার মতো'। জলধর সেন বললেন, শালার ব্যাটা শালারা দেশ স্বাধীন করবি মুসলমানদের বাদ দিয়ে? এক পায়ে হাঁটতে পারবি? আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমাকে গালাগাল করছেন না তো? উনি বললেন, ভয় করো না। আমি তো ভ্রমণকাহিনী লিখি। ঠিক আছে তোমাকে একটা গল্প দেব। তিন-চার দিন পর সেটা পাঠিয়েও দিলেন। সত্যেন দত্তও লেখা দিয়েছেন– শাহজাদী জেবুন্নেসার একটি ফার্সী কবিতার অনুবাদ। লেখাটির নাম সৌন্দর্য সূর্যের প্রতীক।

এবারের সমস্যা প্রবন্ধ নিয়ে। ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যেতে উনি খুব উৎসাহিত হলেন। তাঁর কিছু লেখা আছে মুসলমানদের সম্পর্কে। বললেন, এসব লেখা তো হিন্দুরা ছাপে না। আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিক লিখব। পয়সা দিতে হবে না।

পত্রিকার প্রচ্ছদ নিয়েও বিপত্তি হলো। মুসলমান শিল্পী নেই। গণেশ ব্যানার্জী একটা প্রচ্ছদ করে দিলেন। প্রেস পেলাম না। তখন সারা বাংলাদেশে মুসলমানদের ভালো প্রেস ছিল না। অল্প কয়েকটা কপির বেশি ছাপা সম্ভব নয়। প্রেস যা ছিল, তা ছিল হাতে চালানো মেশিন। ঘন্টায় পাঁচ শ'। এসব প্রেসে সাধারণত পুঁথি ছাপা হতো।

পার্ক সার্কাস এলাকায় ইসলামিয়া আর্ট প্রেস নামে একটি প্রেসের খোঁজ পাওয়া গেল। ওদের বললাম, 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মত ছবিও ছাপবো। ওরা বলে, আমরা জীবনেও ছবি ছাপিনি। মহাভারত ও ধর্মীয় পুস্তকাদি ছাপানোর জন্যে উত্তর কলকাতায় জমিদার রায় কালীপ্রসন্ন সিংহ বাহাদুরের প্রেসের শরণাপন্ন হলাম। ওরা জানাল, আমরা মুসলমানদের কিছু ছাপি না। আরবী টাইপ নেই। আমি বললাম, পত্রিকা বাংলায় ছাপা হবে। কত ফর্মা নেবেন? তখন ছাপার ফর্মা ছিল পাঁচ থেকে আট টাকা। কাগজের দাম ছিল দু' টাকা আট আনা রীম।

www.pathagar.com

নরওয়ের নিউজপ্রিন্ট। সওগাত-এর প্রচ্ছদ শিল্পীকে সম্মানী দেয়া হয়েছিল পাঁচ টাকা।

পত্রিকা ছাপা হলো পাঁচ শ' কপি। দাম চার আনা। শিল্পীর আঁকা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্যের ছবি, কার্টুনও ছাপা হলো প্রথম সংখ্যা সওগাতে। তখন কার্টুনের চল ছিল খুব কম। কাগজ বার করার পর গোঁড়া মুসলমানরা চিৎকার শুরু করে দিল। বললো, এ মুসলমান নয়, এ কাফের। মেয়েলোকের ছবি ছেপেছে এই লোক। গোনাহ্‌র কাজ করেছে। আমি এসবে ভ্রূক্ষেপ করিনি।

সওগাত-এর সাজসজ্জা ছিল হিন্দুদের প্রথম শ্রেণীর কাগজের মত। ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যাব। জোড়াসাঁকোতে গেলাম একদিন। গেটের কাছে একটা মালী কাজ করছিল। বলল, যান। সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম দ্বিধায়। ফিরে আসছিলাম। মালী বললো, বাবু বৈঠকখানায়, যান। গেলাম। রবীন্দ্রনাথ খুব আস্তে কথা বলতেন। ভালো বোঝা যেত না। গলাটা ছিল মেয়েলি। পত্রিকা পেয়ে খুশি হলেন। বারবার উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, মুসলমান সমাজ থেকে এমন সুন্দর কাগজ বার হতে পারে, এটা ভাবতেও পারিনি। পত্রিকার নামটি কে রেখেছে বলো তো? উত্তরে বললাম, আমিই রেখেছি। যদি একটা লেখা দেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার লেখা তো সব বিশ্বভারতীকে দান করে দিয়েছি। যা–ই লিখি, ওদের দিয়ে দিই। লেখা ওদের কাছ থেকে নিতে হবে। আমি বললাম, নতুন পত্রিকা বার করেছি। টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না। চার-পাঁচ দিন পর একটি মোটা খাম এলো বিশ্বভারতী থেকে। তাতে রবীন্দ্রনাথের চিঠিসহ একটি কবিতা। নাম 'পথের সাথী'। পংকজ মল্লিক যেটা গান করেছেন, অকারণে অকালেতে পড়ল যখন ডাক। এটি সওগাতের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা পেয়ে আমি খুবই উৎসাহিত হই। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ অনেকবার সওগাত, শিশু সওগাত পত্রিকায় লিখেছেন।

সওগাত পত্রিকা কিন্তু প্রথমদিকে লোকজনকে প্রেজেন্টই করেছি বেশি। মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিল আধুনিক শিক্ষিত, তারা কিনেছে। সওগাত প্রকাশনায় আমার সহযোগী ছিল শাহাদাৎ হোসেন, সিরাজুদ্দিন। তৎকালে মুসলমানদের উদ্যোগে যেসব পত্রিকা বেরুতো, তা ছিল ধর্মীয় কোন্দলে পরিপূর্ণ। এসব পত্রিকায় কোনও ইলাসট্রেশন থাকতো না।

নিজস্ব সাহিত্যিক-সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলাম। ক্রমাগতভাবে সওগাত-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, এস ওয়াজেদ আলী, হাবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখ। গঠিত হলো সওগাত সাহিত্য মজলিশ। সন্ধ্যার পর রোজ আড্ডা হতো একটি হলরুমে, শতরঞ্জি বিছিয়ে। চা নাস্তা, পান জর্দার ব্যবস্থা থাকত।

বেশ বুঝতে পারলাম, সকল গোঁড়ামি, কুসংস্কার দূর করতে না পারলে সমাজ এগোবে না। সওগাতে নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন। গড়ে উঠল একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। সবার অভিমতঃ সাহিত্য পত্রিকায় রাজনীতি বেশি দেয়ার সুযোগ নেই। সাপ্তাহিক বার করতে হবে। ইতোমধ্যে আমার নিজস্ব আর্ট প্রেস হয়েছে। বেরুলো সচিত্র সাপ্তাহিক সওগাত। কাজী নজরুল ইসলাম স্টাফ হিসেবে যোগ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। তখন বাংলা ১৩৩৪ সাল। নজরুল এ সময়ে অনেক জাগরণী কবিতা লিখেছেন। গোড়ার দিকে আকরম খাঁ ও অন্যান্য মওলানা-মৌলবী নজরুলকে কাফের, আযাযিল বলে গালমন্দ করেছে। পরে আবার নজরুল ইসলামের লেখা ইসলামী গান শুনে তারা গালাগাল বন্ধ করেছে।

সচিত্র সাপ্তাহিক সওগাতে নজরুল 'চানাচুর' নামে ব্যঙ্গ রচনা লিখতেন। পত্রিকার স্টাফ ছিল চার-পাঁচ জন। সওগাত প্রেসে কালার, হাফটোন এসব কাজও হতে শুরু করলো। বিলিতি কাগজের মতো বার করলাম বার্ষিক সওগাত। মাসিক সওগাতের প্রচার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬ হাজার পর্যন্ত, যা প্রবাসীর চেয়েও বেশি।

আমার লক্ষ্য ছিল যেসব সাহিত্যিকের মধ্যে ক্ষীণ সম্ভাবনাও আছে, তাদের লেখা শুধরে তাদের সুযোগ দেয়া। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সাহিত্যিক-সাংবাদিক সৃষ্টি করা। বাংলাদেশে এ কাজটি আমিই করেছি, অন্য কেউ করেনি। কারণ, অন্যরা মনে করতো কেউ যদি আবার তাদের ডিঙিয়ে বেশি বিখ্যাত হয়ে যায়!

সেকালে কম্পোজিটরদের বেতন ছিল ১৫/২০ টাকা। মুসলমানদের কোনও টাইপ ফাউন্ড্রী ছিল না। বিলিতি টাইপ ছিল সস্তা। বাংলা টাইপের মণ ছিল ১৫/২০ টাকা। তখনকার দিনে একটা টাইপ এক বছর যেত অনায়াসে। এখন এক মাস বাদেই কাহিল হয়ে যায় টাইপের অবস্থা। তখনকার দিনে এ্যান্টিমনি মেটেরিয়ালস দেয়া হতো টাইপের ভেতরে। ফলে টাইপ শক্ত হতো। স্কোয়ার ইঞ্চি ব্লকের খরচা পড়ত তিন আনা। তখনকার দিনে ব্লক তৈরি হত নিখুঁতভাবে। ব্লক তৈরি করে প্রুফ দেয়া হতো। ব্লকে ভুলচুক হলে কারিগররা নিজেরা তা চেক করে দিত।

তখনকার দিনগুলোতে সাংবাদিকদের খুব সহযোগিতা পেয়েছি। তারা টাকার দিকে চায়নি। সবার লক্ষ্য ছিল কিভাবে সমাজ থেকে গোঁড়ামি, কুসংস্কার দূর করা যায়। সেকালে সাংবাদিকরা কষ্ট করে, না খেয়ে কাজ করতেন। তাদের আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও সাধনা ছিল প্রশংসনীয়। খুব বেশি শিক্ষিতও তারা ছিলেন না। বইপত্রের সংখ্যাও ছিল কম। আজও যখন এসব কথা ভাবি, তখন আনন্দিত হই।

খবরের কাগজের দাম ছিল চার পয়সা। পত্রিকার সার্কুলেশন সবগুলোরই কম ছিল। সচিত্র সাপ্তাহিক সওগাত অনেকে কিনতো নিছক ছবি দেখার জন্যে। সে সময় একটি পত্রিকা শাজাহান নাটকের বিজ্ঞাপন ছেপেছিল। মোল্লারা সেই পত্রিকা অফিসে হামলা করলো। শেষ পর্যন্ত সম্পাদককে মুচলেকা লিখে দিতে হলো বিজ্ঞাপন ছাপাটা অন্যায় হয়ে গেছে। আর ছাপবো না। এ ঘটনার কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলাম সওগাতে মঞ্চ ও ছায়াছবির বিভাগ চালু করবো।

তখনকার দিনে পীর সাহেবরা ফতোয়া দিয়েছিলেন, গান গাওয়া ও গান শোনা হারাম। ফুটবল খেলা শয়তানি। কোলকাতায় মোহামেডান স্পোর্টিং গঠিত হলো। ফুটবলারদের মিলিটারি কায়দায় ট্রেনিং দিলেন এক বিলিতি সাহেব। জুম্মা খান, আবদুর রশীদ, হাফেজ

www.pathagar.com

রশীদ এঁরা নাম করলেন খুব। ১৩৩৪-৩৫ সালের দিককার ঘটনা। ফুটবল দলটি পাবলিসিটি পাচ্ছে না। মুসলমানদের ছবি ছাপতে হিন্দুরা আগ্রহী নয়। স্টেটসম্যান কদাচিৎ ছবি ছাপত। মোহামেডান স্পোর্টিং-এর সদস্য হয়ে গেলাম। স্টুডিওতে ২/৩ জন করে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলালাম। বার হলো মোহামেডান এ্যালবাম। প্রচুর বিক্রি হলো। ছেপে কুলোতে পারি না। তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল ছিল মোহামেডান।

সেকালে প্রকৃত সাংবাদিক বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না। প্রতিটি পত্রিকার মালিকই ছিলেন গোঁড়া। পত্রপত্রিকার উপজীব্য ছিল ধর্মীয় ঠোকাঠুকি। প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা থেকে তারা ছিলেন অনেক দূরে। ব্রিটিশ আমলে অন্যায় করলে শাস্তি হতো। সেজন্যে প্রগতি বিরোধীরা আমার ক্ষতি করতে পারেনি।

পাকিস্তান হলো। আমরা ভাবলাম বেঁচে গেছি। অবশ্য আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে পাকিস্তানের দরকার ছিল। তখন সাংবাদিকতার কি হাল দাঁড়ালো? ভাষার ওপর আঘাত হলো। সাহিত্যিক-সাংবাদিক যারা ছিলেন, সবাই পাকিস্তানের জয়গান করলেন। বিরুদ্ধবাদীদের কোনও দাম নেই। তখন স্বাধীন চিন্তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আদমজী-দাউদ– যাদের ভাষা বাংলা নয়, তারাও সাহিত্যের পুরস্কার দিয়েছে। সাহিত্যিকদের হাত করেছে। আমাকে উপাধি, টাকা অফার করেছে। আমি নিইনি। নিলে তো সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে পারব না।

এখনকার সাংবাদিক, সাংবাদিকতা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইছেন? সাংবাদিকদের দায়িত্ব স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটানো। তারা নির্ভীক হবে। কিন্তু আজকাল সাংবাদিকরা লিখতে পারেন না। তাদের জীবিকা নির্বাহ, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। এখন সাংবাদিকদের চিন্তার সুযোগ দেয়া হলে জাতি জাগতে পারে। আমি লিখতে পেরেছি। আপনারা কেন পারছেন না? জবাব দিন। আপনারা ভয় করছেন কেন?

এখনকার খবরের কাগজ পড়ে নিরাশ হই। মন খারাপ হয়ে যায়। যে খবর জাতির জন্যে মঙ্গলজনক, সেটা ছোট টাইপ দিয়ে এক কোণে ফেলে রাখেন কেন? এখনও যদি নির্ভীকভাবে লিখতে পারেন, জাতি জাগতে পারে, অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকবেন না। মন তুষ্টি করে লাভ নেই। ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক যতো কুসংস্কার আছে, সবগুলোর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের রুখে দাঁড়াতে হবে। যেখানে স্বাধীনতা নেই, লেখা ও চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সেখানে সমাজ ও জাতির যে ক্ষতি হয়, তা অপূরণীয়। এখন মুক্তবুদ্ধির দ্বার রুদ্ধ। কারণ আমরা নিয়ন্ত্রিত।

কাগজ ঠিকই বেরুচ্ছে। কিন্তু আমরা বিলেত-আমেরিকা থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছি। জাতীয় উন্নতির প্রথম স্তম্ভ সংবাদপত্র। সাংবাদিকরা কখনও নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে না।

সাক্ষাৎকারটি ১৯৮৬ সালের ৬ নবেম্বর দৈনিক বাংলার বর্ষপূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক দৈনিক জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার

www.pathagar.com

MY CAREER IN NEWS AGENCY JOURNALISM: ENTRY & EXIT

Golam Tahaboor

It was early February 1972, nearly two months after our independence, that I got a phone call from the then BSS chief reporter Karim Bhai (Jawadul Karim, who left us only a few moths ago). I was in (now defunct) Morning News at 1, DIT Avenue which ceased to appear in uncertain post-liberation situation and was siting almost idle without knowing what to do next. This was the paper where I began my career as a reporter in late 1967. There were often indications that the government might appoint an administrator to rerun MN, but nothing substantive.

"Tahaboor, what are you doing?" Karim Bhai asked me and I replied "nothing as such." Then he asked me whether I would like to work for BSS news agency. It was a pleasant and welcome surprise for me at that time, but I admitted to Karim Bhai that I have no experience in news agency journalism. And next he asked me to come to BSS office immediately. On arrival, Karim Bhai took me to Faiz Bhai's corner room, where I also met Baby Bhai (late Syed Mahbub Alam Chowdhury) and also Hasan Bhai (Hasanuzzaman Khan who also left MN at that time and joined BSS). I was received very affectionately and was asked to join as a senior staff reporter in BSS. I formally joined BSS on 16th of February 1972. That was a great day and definitely turning point in my 36-year career as a professional journalist.

Time passed quickly in BSS where I worked in various positions, mainly in reporting side. I tried to dedicate myself and felt very homely with every body in BSS. I was given the responsibility of Chief Reporter, Diplomatic Correspondent and Special Correspondent and covered for BSS many major national and international events at home and abroad. I was also posted as BSS Correspondent in New Delhi in January 1984, which again for me was a turning point of my career. I will come back to it later.

In January 1977, I was working in my room at BSS when the then Chief Editor and Managing Director Aman Bhai (Mr. Amanullah) called me in his room and introduced to a foreign journalist, Micheal Garin, AFP's regional director in New Delhi who was on a visit to Dhaka at that time. After pleasentaries, Garin said that Mr. Amanullah had already mentioned to him my name as a hardworking

www.pathagar.com

agency reporter and he asked me straightway if I could work part-time for AFP as its Dhaka Stringer. Again it was a pleasant surprise for me, but I wanted to know what is going to happen to Mr. AZM Haider who was working for AFP in Dhaka. He said AFP had reached a settlement with him and now looking for someone with news agency background to work for AFP in Dhaka. He said if I don't accept the offer, they will look for someone else. He said Mr. Haider's term will end on 31st January and therefore if I agree I will have to work as AFP stringer from 1st February, 1977. This is how I got involved for the first time with an international news agency as a part-time correspondent (stringer).

Later, I met Mr. Haider who confirmed that he will cease to work for AFP from February. As per Garin's advice I began to send sample news reports and features to him every week and he used to send back feedbacks. I was told how to focus a copy for international wire service incorporating needed background for AFP's varied clients worldwide, many of whom may not have much or clear idea about Bangladesh. Lastly, everything went fine until I started formally transmitting reports, mostly through public telex.

Things moved smoothly for years until late 1984 when I was posted by BSS in New Delhi. I immediately informed AFP in Delhi that since I will be away from Dhaka on BSS assignment for a few years, they should find a new AFP stringer for Bangladesh. What happened next was beyond my comprehension. One day I got a phone call from AFP director in Delhi who wanted to know the tenure of my BSS posting out of Dhaka. I told him normally, it would be three to four years. And he told me that since I will be away from Dhaka for few years only, AFP would like to retain my position in Dhaka until I return from Delhi. As such he asked me to find someone who would agree to work for AFP in Dhaka during my absence and would be ready to step aside on my return. He did not explain to me but I could imagine the confidence and trust they in AFP had on me and in my performance. I was appalled at their gesture. Anyway, I talked to my young colleague in BSS at that time-Md. Roushanuzzaman-who readily agreed to string for AFP in my absence.

While my posting in Delhi was under process and taking a bit long time, news came on assassination of Indian PM Indira Gandhi. There was none from BSS in Delhi since my colleague Zaglul Ahmed Chowdhury returned long ago at the end of his successful and well-exposed tenure in New Delhi. Files moved very fast and I arrived in New Delhi in the first week of January 1985.

But a new problem arose within first few months of my stay in Delhi where I used to operate from PTI office. AFP bureau was also located in same building. One day, AFP Bureau chief, at that time J. F. Leven, phoned me to inform that AFP has decided to open its first office/bureau in Dhaka before end of 1985 and the management had asked him to contact me whether I will be able to return to Dhaka immediately to work for AFP as Bureau Chief. I told him instantly that I

www.pathagar.com

thought it was a very good offer for me, I am not in a position to join AFP leaving BSS at that stage. I explained that my national news agency had invested lot of money for my posting in Delhi and it will not be proper for me to resign from BSS and return to Dhaka so soon. I told him to look for some one else in Dhaka if they were in hurry. The matter ended there and he seemed a bit unhappy with the outcome of our talks.

I almost forgot the matter when a week after I got a call again. He informed that after he discussed my difficulties, AFP head office decided to postpone the Dhaka plan for a year and asked him to contact me again. He explained that a lot of developments are taking place in Bangladesh and AFP was serious about early implementation of its Dhaka office plan. Without consulting anyone I told him that I can consider their offer, but not before completing at least two years as BSS correspondent in Delhi. And on condition that BSS agrees to accept my resignation. The pressure continued until middle of 1986 when AFP became more serious about its plan in view of floods, cyclones and other unfolding news events, including prospect of holding SAARC summit in Bangladesh. Leven said AFP is not in a position to defer the plan indefinitely and requested me to consider it more seriously.

I was under serious mental pressure what to do. One day I decided to talk to then BSS chief Musa Bhai (ABM Musa) for his advice. I was grateful to him for his understanding of my problem. He told me that if I decide to accept AFP offer, he will not hold me back in BSS. Things moved smoothly since then and I sent my resignation letter to BSS and returned to Dhaka in October 1986, exactly after 20 months.

Next day on my arrival I resumed my new responsibility in AFP and within almost a month able to find a space at BSB building for planned AFP Bureau office.

Nearly 18 years passed since my taking over as AFP's first Bureau Chief in Dhaka. During this period there were ups and down, but at the end of the day, AFP came out as the most fast expanding international news agency in Dhaka, both in terms of news/photo coverage on Bangladesh and on commercial operation.

In late 2002, I planned to retire from active journalism and conveyed my decision to AFP next year. The idea was to try something else lighter, if needed for survival. After a few months AFP agreed to accept my early retirement and asked me when would I like to retire. I told them that my next birth day falls on 23rd January 2004 and I wish that should be my last day in AFP. So on that day curtain fell on my 32-year career in news agency journalism, representing both national and international.

লেখক দৈনিক নিউ নেশন -এর সম্পাদক

www.pathagar.com

Law and Journalism

Humayun Kabir Chowdhury

A civil society has to be based on law. The dignity of a society is determined by the liberty enjoyed by its people. Laws are designed to ensure optimum liberty to people in a society. Journalism also deals with the society. It depicts the state of the society. Here in Bangladesh it records the happenings of this under-developed, overpopulated, poverty-stricken and most mismanaged human slum of hunger and disease.

That is why we get the stories of dacoities, burglaries, hijackings, killings, destructions, illegalities, want, unemployment, frustration et al in almost all our newspapers every day.

But in many other countries (say-Australia, Canada and so on) we find little of those ever happening. We find there a calm society where everything is running in order and the citizens are happy. Everything is running smooth and nothing untoward happening.

As such one sure objective of journalism in our country will have to be, to propagate and champion laws to change our society for the better. It will bring what is good for the society urging upon the people to avoid anything anti-legal or anti-social.

The duty of the press, of course, is also to serve the readers with the facts (news) as to the happenings within and without the country.

Volumes can be written on the subject and its different branches but I will concentrate here on a very important branch and that is - law reporting.

Study of Law

Not all people, not even the educated ones study law by going to the colleges or the universities. That is not possible either. But every citizen must have some knowledge of law as the society he lives in, more or less, is to be based on law. So, how to educate the citizenry in law.

I think, the task can be performed by law reports. Reporting crimes that take place in the society, specially the proceedings of the courts, citizens can be given some basic ideas on law.

www.pathagar.com

Civil cases are not generally reported as those are between two private parties only. Crime is an action against the society and against the state. So criminal occurrences are reported in the press for the edification of all.

Civil cases do have limitations too. No case can be filed after three years from the date of the cause of action but as a crime is against the state, that has no limitation. As we have seen that the killers of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members (1975) were tried and punished almost after two decades. Now the jail killings case (also of 1975) is being tried.

Be that as it may, whenever a reader finds an item on crime in any newspaper, he sees how it took place and how the accused was rounded up and detained. In the trial when the accused is punished with imprisonment or even with the sentence of death, everybody gets something of law as to how a person is tried, punished and for what crime.

So law reporting gives the law, the prosecution and the punishment. And....by reading a law report one gets some idea as to crime and punishment to be careful in the future. That, at times, makes a person become conscious so as to avoid any untoward incident in life.

Some Ethics

In general reporting one can write anything. One may write that in the Paltan Maidan "almost one hundred thousand people attended the meeting yesterday". Another may write "only ten thousand attended the meeting". These do not at all matter. But one has to be very specific while writing law reports.

Reporting court cases, one has to be very precise. The report must be (i) correct, (ii) to the point, (iii) as short as possible, (iv) unambiguous, (v) unemotional, (vi) factual, (vii) non-partisan, (viii) non-investigative, (ix) non-suggestive and (x) speculative.

The report must not carry any view that may influence the judge while deciding the case which might lead to miscarriage of justice. On the other hand, that may also call for contempt proceedings.

Two Examples

i) While awarding capital punishment to Munir for killing his wife, the judge awarded the same sentence to Khuku, (girl friend of Munir) too who was nowhere near the scene at Mijmiji, Kanchpur, Dhaka where the murder took place.

ii) A young doctor Iqbal could at best be awarded transportation for life for killing his wife for dowry. But the judge gave him the death penalty. Those happened due to aggressive reporting that influenced the judge.

Another most important part of court reporting is responsibility. The reporter will not write, "he committed the crime" unless there was the judgment to that effect.

www.pathagar.com

He will write, "........was charged with murder, allegedly committed murder, etc........".

In case of rape, the victim girl's name and the other particulars including her photo must be withheld so that she is not defamed with her family in this conservative society of traditional beliefs where one lives with "pride and prejudice".

That is why, it is said, one cannot fare as a good reporter unless, anytime in life, he did court reporting.

Law Reporting and Social Transformation

For our society law reporting has a great and special significance. Law reporting contributed greatly in the development of the reading habits of the people. The so-called Agartala Conspiracy Case is in point.

In 1962 when I joined erstwhile Pakistan Observer, the News Editor Mr. ABM Musa assigned me to law reporting. I started reporting on law for the first time in this country.

In 1960s there were only two English newspapers here: Pakistan Observer (now Bangladesh Observer) and the Morning News (now defunct). Observer represented the interests of the Bengalis-the people of East Pakistan (now Bangladesh) and the Morning News spoke for the Urdu speaking Biharis and West Pakistan (Pakistan).

The Pakistani leadership initiated the conspiracy case alleging the leader of the Bengalis Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 29 others had crossed the border and went over to the neighbouring Agartala (India) secretly and hatched a "plan" in 1968 with the Indian intelligence to secede East Pakistan (now Bangladesh) from Pakistan. This is known as the Agartala Conspiracy Case. The trial took place in the Dhaka Cantonment at Kurmitola.

Detailed Accounts

We three journalists started reporting detailed accounts of the proceedings of the case: Faiz Ahmed, myself and Ataus Samad (lately of the BBC).

Every evening, after the case, we would meet in the National Press Club (the old red-bricked building) and prepare reports for all the newspapers on the day's proceedings. Faiz Ahmed was to write the Bengali version and I was to write the English version.

An Insult

Politically conscious people of Bangladesh took the case as an insult to them and their land. They started reading newspapers. Bengalis are not great newspaper readers, averaging not more than two per cent of the population. But at the time of the trial (1969) readership shot up to an all-time high of 20 per cent.

www.pathagar.com

Newspapers made the people form their own opinion in favour of freedom from under the Pakistani yoke. Movement against Pakistani colonial rule started building up like a crescendo.

As a result, the Pakistani leadership had to abandon the case. The Chief Justice of Pakistan SA Rahman who presided over the court fled and all the people charged for treason in the case were released. With the withdrawal of the case, rejection of Pakistan in the minds of Bengalis was almost complete.

"We the Bengali speaking people living in South Asia have nothing to do with Urdu speaking Pakistanis of Central Asia. We cannot live with them. We must have our own country--a land of Bengalis" was the credo driven home by the general election held on December 7, 1970 in Pakistan in which the Awami League led by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman won 173 seats out of 300 seats in the National Assembly from both the wings while 97 seats were won by Zulfiqur Ali Bhutto's Peoples Party only in West Pakistan.

As the leader of the majority party, the Bangabandhu was to become the Prime Minister of Pakistan but was stopped by Bhutto. "Sheikh Mujib is the leader in East Pakistan and I am the leader in West Pakistan", said Bhutto clearly cleaving Pakistan into two.

Just to become Prime Minister by stopping the leader of the majority party (with 173 seats in the National Assembly), it was foolish on Bhutto's part to say so which, in the end, turned out to be a blessing in disguise for East Pakistan because-he himself divided Pakistan at a time when that was the only issue.

However, based on the transformation made by law reporting in the so-called Agartala Conspiracy case and reflected (a) in the withdrawal of the case and (b) in the general election in December 1970, struggle of the Bangalis had set in and the liberation war began for creation of a new country "Bangladesh" with the historic declaration by Bangbandhu in the Raman Race Course (now Suhrawardy Uddyan) on March 7, 1971, "This is the struggle for our emancipation, this is the struggle for our independence". That was the signal for an all-out war to drive the Pakistani colonialists out.

Law reporting thus made an enviable and singular contribution in the establishment of Bangladesh. It can also contribute immensely in building a society based on law.

লেখক দৈনিক নিউ নেশনের বিশেষ প্রতিনিধি ও কূটনৈতিক সংবাদদাতা

www.pathagar.com

Of politics, parties and politicians

Sayed Kamaluddin

In many ways, Bangladesh is unique. Perhaps it is the only country in the world where no political consensus on any national issue exists. The only consensus one could possibly reach is: you are either with me, or against me. Bipartisanship is a word that ceased to exist in the political dictionary of Bangladesh. Partisan politics has thoroughly divided the country -- both vertically as well as horizontally. Political violence and the confrontational nature of politics; frequent and unnecessary hartals; deterioration of law and order situation and a nexus between the politicians, police and the criminals are the norm.

It doesn't seem to bother anyone involved in politics - including the ones running the government or the ones active in the opposition running it down. Neither does it bother anyone that this state of affairs is scaring foreign direct investment away from the country, hurting the nation and adversely affecting the economy. Any sensible person would like to think that this state of affairs simply cannot continue any more and has to stop. Perhaps, the only political party that agrees with this view is the one that happens to be in power and has to face the music. However, the ruling party being at the helm has the special burden of actively initiating moves to break the ice, which successive ruling parties have clearly failed. The rest, including the mainstream opposition party calling the shots, couldn't care less. As a result, the country's polity has become a vicious circle of hatred-driven politics that is feeding on itself.

Since 1991, following the restoration of democracy in the country, three governments were elected through parliamentary polls and two mainstream political parties replaced each other peacefully - BNP won the first and the third elections in 1991 and 2001 respectively while the Awami League won the second in 1996. All the three elections were, by and large, acceptably free and large number of foreign and local independent election observers agreed that. Only the party that lost the elections did not.

Contrary to democratic practice and norms, the two mainstream political parties cannot tolerate each other and one hates to see the other running the government. As both of them cannot remain in power at the same time, the one in the opposition tries to make governance extremely difficult for its opponent. They routinely

www.pathagar.com

boycott the parliament to make it dysfunctional and call for frequent hartals and work stoppages to make the government look stupid and sulky. The political leaders disregard the fact that the people have elected MPs, belonging to both the ruling and the opposition parties, in the hope that they would discuss their (peoples') problems in the parliament, and would like both the government and the opposition to deliver. Instead, for no fault of theirs the people become the main sufferers of this partisan politics.

This intensity of mutual hatred between the two parties first became public in 1991 when the Awami League boycotted the oath taking ceremony of the newly elected BNP government. They seemed to have felt cheated that the people have chosen BNP and not the Awami League, the party that spearheaded the war of liberation in 1971; to form the first elected government in the post-Ershad era. It was the beginning of a new political culture and instead of establishing an exemplary polity, a bad precedence was set. Subsequently it became the norm and both the BNP and AL had boycotted the oath taking ceremonies of AL and BNP governments in 1996 and 2001respectively. Stalwarts within the two parties failed to convince their two top leaders that occasional boycott of parliamentary session and the boycott of the oath taking ceremony were totally different ball games. It is bad politics and it should not happen in a functioning parliamentary democracy. None of the leaders dared to pronounce this openly; though some of them grumble in private. They are all like the run of the mill politicians and lack the materials to be transformed into statesmen.

This is probably happening because the political leaders of the two mainstream parties appeared to have developed a peculiar mindset: they firmly believe that whatever they do, they do it for the people since they are the natural leaders of the people. They represent them and therefore they have the right to do anything on their behalf. This goes to prove that statesmanship cannot be imposed or thrust from above; they are to born with certain qualities to graduate into statesmen.

Meanwhile, the ghastly grenade attacks on the Awami League rally in Dhaka on 21 August, 2004, killing about 20 including the front ranking AL leader, Mrs. Ivy Rahman, and injuring over 200, and the fallout from this shocking incident, failed to influence the country's nature of politics. One would have expected that such a shocking event, in fact a national calamity of sort, would galvanise the political leadership into seeking a national unity and consensus to face the situation. Instead, the ugly partisan politics got an upper hand and each side accused the other of engineering the incident. What a waste!

The mutuality of hatred amongst these two parties is so deep that the one that gets defeated in the election and thereby has to sit in the opposition refuses to accept the legitimacy of the election itself. Their leaders say that the people did not vote them to power; they managed it through rigging. So as far as these two

www.pathagar.com

parties are concerned, the party in power does not have the legitimacy. Therefore, they feel that they are at liberty to try and topple the government of the time at will through means fair or foul. This rigmarole goes on all the time, as if nobody has anything better to do. The truth is uncomfortable. It cannot be hidden or compromised. At times it could be ugly and difficult to be accepted by all. It is perhaps impossible for some people to make necessary adjustment and face the reality; the politicians of this country belong to this category.

The transparency question: The opposition party leaders always demand transparency from the government but seem to forget all about it when it forms the government after winning the elections. Why? Because in their own make-believe world they believe that they are the people's chosen representatives and therefore they cannot do anything wrong and public fund is always safe with them. It is this mindset that matters and the political leaders, regardless of their party affiliations, never talk about ensuring transparency in the way the political parties fund themselves.

With the exception of those few who are either lawyers or businessmen, political leaders never reveal their own sources of income or how do they maintain their families. They also do not want to talk about how much assets they do possess either. But when they contest elections, most of them spend a fortune. Where does the money come from? No answer is available. Since there has to be a source of funding and dedicated old timers in politics hardly have access to legitimate sources of finance, politics has increasingly become a commercialized commodity, opening doors to the captains of commerce into politics. Party nominations at the election times generally go to the highest bidders. Nobody can tell how much one pays to get the nomination from either of the two major parties or for that matter, what happens to the money that changes hands in the name of the party.

Our political leaders did not learn any lesson in humility while in power and seemingly refuse to learn or acquire the same from others. In the next door India, for example, the rightwing BJP-led coalition government lost to the Congress-led coalition in the parliamentary polls earlier in May this year and the outgoing Prime Minister Atal Behari Vajpayee immediately conceded defeat. When the President of India became convinced that Congress enjoys the majority support in the house, he asked Dr Manmohan Singh, nominated by Congress President Sonia Gandhi, to form the government. Soon after that, Vajpayee formally and genially handed over the reign to the new Congress-led Prime Minister.

The BJP, not known to be politically a very tolerant party, however, learnt the art of democratic norms and geniality while in power and demonstrated it when the time came and thereby earning the accolades from all and sundry. They may have suffered an electoral defeat but won some legitimate points politically.

Analysts feel that the country's politicians are mostly emotion-driven and not the

www.pathagar.com

thinking type and are incapable of seizing the opportunity when it shows up. They seem to suffer from broad indecision while in the government but appear surprisingly decisive when in the opposition in single-mindedly pursuing the goal of ousting the government, without considering the possible adverse consequences that may follow. They also lack the patience to wait for their turn to return to power as the very thought of returning to power drive them crazy. The result? While one political party tries relentlessly to remove the other from power, the country's problems keep mounting; opportunities are slipping, and rest of the world surges forward leaving them behind.

লেখক জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক অবৈতনিক সম্পাদক

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতা থেকে

www.pathagar.com

শেষ দু'টি সম্পাদকীয়

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

আজকালকার রাজনীতি

সোমবার, ৭ই ফাল্‌গুন ১৩৭৩

ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া মহাদেশসমূহে এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সর্বত্রই দেশের শাসন পরিচালনার জন্য কোন না কোন প্রকারের আইন-কানুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে গুরুশ্রাব্য শব্দ ও সমাজের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের মঙ্গল ও মুক্তিসাধনের সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, বাস্তব ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যগুলির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

দেশ বলিতে দেশের অধিবাসী সমস্ত মানুষকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু আজ দেশ বলিতে দেশের কতিপয় ধনিক-বণিককে মাত্র বুঝাইয়া থাকে। ইহার ফলে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে নানা উপদ্রব ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে। আমাদের সর্বনিকটবর্তী ভারতের দিকে তাকাইয়া দেখ, কাগজে কলমে আইনের শাসন দৃঢ়তার সহিত চালু হইয়া আছে, কিন্তু শান্তি কোথায় সুশৃঙ্খলা কোথায়? ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আইনের শাসন প্রচলিত করিতে পালন পর্যবেক্ষণ বলিয়া যেসব আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা তামাদি দোষে বারিত হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর উৎপাত ও অনাচারের প্রধান কারণ এই যে, মানুষ সমাজ সাধারণভাবে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব ও আধিপত্যের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

পাপপুণ্য বলিয়া কর্তব্য অপরিহার্য বলিয়া সর্ব বিষয় কর্মে নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে শেষ কথা ও একমাত্র কথা বলিয়া ধরিয়াছে। তাই তাহারা আইন রচনা করা ও লঙ্ঘন করিবার সময় ন্যায়-অন্যায়, সততার বা অসাধুতার বিচার তাহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। মোটের উপর কথা এই যে, রাজনৈতিক ব্যাপার গুলিতেও স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। অথচ বস্তুতঃ আইন-কানুনের সর্ব প্রধান উৎস হইতেছে ধর্ম! যেখানে দ্বীন-ধর্মের কোন সংস্রব নাই; সেখানে সুষ্ঠু রাজনীতির স্থান নাই।

www.pathagar.com

ভারতের মোসলেম প্রতিষ্ঠান

৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৩

পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জ্ঞান গবেষণায় ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিভিন্ন দিক হইতে যেসব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, শুদ্ধি ও সংগঠন নামে একটি উদ্ভট ও উৎকট ব্যাপক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মোসলেম জাতি ও এছলাম ধর্মের সব কিছুই যে অনন্য, এই ধরনের প্রচার চালাইয়া মুছলমান জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলাই ছিল এই অনাচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই অসাধু প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য প্রথমে হিন্দু সুধীসজ্জনগণ কর্মক্ষেত্ররূপে অবলম্বন করিলেন বাংলা ভাষাকে এবং প্রদেশের ইতিহাসকে।

বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণ ও বিজয় সমস্ত মিথ্যা, মীর নেসার আলীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাহারা ঠাট্টা-তামাসার রূপ দিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং এইসব বড় বড় ব্যাপার ছাড়াও তাহারা বাংলাদেশের মোসলেম কীর্তিগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। এই অপচেষ্টার ফলে বাংলার সরফরাজপুর স্বর্গরাজপুর হইয়া গেল। মোমেনশাহী পরগণা ময়মন-সিংহ, বশীরহাট বসুরহাটে, দুর্গাপুর দুর্গাপুরে, মাদানীপুর মেদিনীপুরে এবং সদাসর্বদা মুষলধারণ করিয়া বেড়ানোর জন্য মুছলমান মুসলমানে পরিণত হইয়া গেল। এবং এই ব্যাকরণের সাহায্যে শতশত আরবী ফার্সি শব্দ নিখুঁত সংস্কৃত শব্দে পরিণত হইয়া গেল।

দুঃখের বিষয় আজ এই অনাচার নিবৃত্তি হইতে পারে নাই। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ভারতের জনৈক ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া মুসলমান বাদশাহর প্রতিষ্ঠিত কুতুব মিনারকে কোন একজন অমুসলমানের কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন! তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাজমহল শাহজাহানের প্রতিষ্ঠিত নহে। ব্যাকরণের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া দুইটি হিন্দু নামের সন্ধান করা হইতেছে কি-না, তাহা এখনো জানা যায় নাই। এই আশঙ্কা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা বলা যায় না। কারণ, হিন্দু পণ্ডিতগণের অঘটন সংঘটন প্রতিভার এইরূপ নজীর বিদ্যমান আছে। ইহার একটা উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃতি করিয়া দিতেছি:-

মুসলিম জাতির ইতিহাসে বাগদাদ শহরের মর্যাদা যে কত তাহা সকলের জানা আছে। জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত বাগদাদ শহরকে হিন্দু প্রতিষ্ঠানরূপে প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বাগদাদ নামটাই সংস্কৃত যথা: বঃ ইতি বলঃ গদাঃ ইতি দমু গরঃ দঃ ইতি দদাতিষঃ অর্থাৎ বলপূর্বক গদা। দ-দাদা তিষস বাগদাদ।*

* আবু জাফর সংকলিত ও সম্পাদিত 'মাওলানা আকরম খাঁ' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

লেখক ছিলেন বাঙালী মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃৎ, দৈনিক আজাদের (প্রকাশনা শুরু ১৯৩৬) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

www.pathagar.com

পাকিস্তানের অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)

ক্ষমতার উচ্চাসন হইতে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে দেশ-বিদেশে পাকিস্তানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ইহা লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা দেখা দিয়াছে। ইহাকে মূলধন করিয়া যত্রতত্র ব্যবহার করা হইতেছে। এই প্রচারণায় জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হইতেছে এবং পাকিস্তানের দুশমন ছাড়া কেহ লাভবান হইতেছে কি-না জানি না। তবে পশ্চিম পাকিস্তানে যথেষ্ট ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতেছে, ৬-দফার বিষয়বস্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই, অথচ ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে বিদ্বেষ-বিষ ছড়ান হইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী মহলের অভিযোগ সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। কেননা অতীতেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে কোনও দাবি করা হইলে স্বার্থান্বেষী মহল ইহাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস বলিয়া যুক্ত বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অলীক অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানীদের অভিযুক্ত করিয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় নেতাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'ভারতীয় এজেন্ট', 'কম্যুনিষ্ট এজেন্ট', ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছে। গত বিশ বৎসরে অব্যাহত অপবাদ, নির্যাতন ও বৈষম্য আজ এই অঞ্চলের মানুষকে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে; যুব সমাবেশে বর্তমান বেপরোয়া মনোভাব তাহাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। একদিকে শাসকবর্গের অনমনীয় মনোভাব, দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ, আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টি, সর্ব ক্ষমতা পশ্চিমাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়াস, আর অন্যদিকে বিরোধী দলের মধ্যে অনৈক্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের সরকারী শাসনযন্ত্রের কুক্ষিগত করা হইয়াছে। কি সব দুর্নীতিমূলক উপায়ে তাহাদের ভোট আদায় করা হইয়াছে, দেশবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বাঁধা নৌকায় দাঁড় টানিবার মত মৌলিক গণতন্ত্রকে সংশোধন করিবার প্রচেষ্টা যে পণ্ডশ্রমমাত্র, দেশবাসী তাহা উপলব্ধি করিয়াছে। বর্তমানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংগঠনের ক্ষেত্রে যেমন একটি কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি মৌলিক গণতন্ত্র প্রথাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। বলাবাহুল্য কায়েমী স্বার্থীদের দ্বারা কায়েমী স্বার্থকে উচ্ছেদ করিয়া জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে, এই চিন্তাধারা আজ পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানের বিবেকী দেশপ্রেমিক জনগণের মানসলোকেই আলোড়ন

www.pathagar.com

তুলিতেছে।

এই নব চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁহারা মনে করেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে গণতান্ত্রিক উপায়ে জনমত সৃষ্টি করিয়া গণদাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তাহারা উত্তরাঞ্চলের কতিপয় প্রবীণ জননেতা অধুনা জাতীয় ভিত্তিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (Pakistan Democratic Movement) বা পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন নামক একটি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। এই সংস্থায় সেই প্রবীণেরাই আছেন, যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন মহল যাহাই মনে করুন না কেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশবাসীর অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করিতে প্রয়াসী। এই সংস্থার উপরও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মত, ক্ষমতাসীন মহল ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থীমহল এবং যুব সমাজের তরফ হইতে যুগপৎ আক্রমণ চলিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থীমহল পি,ডি, এম-এর ৮-দফা কর্মসূচীকে পূর্ব পাকিস্তানের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ বিক্রয়ের সনদ বলিয়া অভিহিত করিতেছে, আর যুবসমাজ এই সংস্থাকে 'নরমপন্থী' আন্দোলনবিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আড্ডা বলিয়া উপহাস করিতেছে। অথচ এই সংস্থার ৮-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ বা অধিকার হরণের কোনও দফা নাই।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু ভাবাবেগে তাড়িত তরুণ সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থন তাঁহারা এখনও অর্জন করিতে পারিতেছেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থীমহল কোনওকালেই এই সংস্থাকে সমর্থন করিবে বলিয়া মনে হয় না। তাই আশঙ্কা হয়, শেষ পর্যন্ত এই সংস্থারও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মত স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। তাহাছাড়া এই সংস্থার যাঁহারা নেতৃত্ব দিতেছেন, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে, তাঁহারা বয়সে প্রবীণ, আর পাঁচ বছরের বেশি তাঁহারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, এমন নেতার সংখ্যা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে দশ জনের বেশি নাই। তাঁহাদের সহিতই কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ চেনাজানা ও ওঠা-বসা আছে। তাঁহাদের নেতৃত্বের অবসানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি চরম শূন্যতার সৃষ্টি হইবে; দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিবার মত আর কেহ থাকিবে না।

মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরলোকগমনের পর আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনিই ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র; উভয়াঞ্চলের জনগণের সহিত তিনি ছিলেন পরিচিত। তাঁহার তিরোধানে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। এক্ষণে নিখিল পাকিস্তানের ভিত্তিতে নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হইল, তাহাতে প্রাদেশিকতা প্রবল রূপ ধারণ করিবে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পর প্রবীণ নেতা বলিতে আর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহারও পক্ষে এককভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্থলাভিষিক্ত হওয়া সম্ভব না হইলেও তাঁহারা যৌথ নেতৃত্ব (Collective Leadership) দিতে সক্ষম বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহাদের পরে পাকিস্তানের নেতৃত্বে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইবে, তাহাই হইবে জাতীয় সংহতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সংহতি ও সমৃদ্ধি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক রাজনীতির পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থে দেশের উভয়াঞ্চলের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। প্রবীণদের সহিত নবীনদের যোগাযোগ এবং নবীন-প্রবীণের মিলনে এমনি এক পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে একদিকে দেশের শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয় এবং অপরদিকে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সমঅধিকার ভোগে সক্ষম হয়। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে হইবে। দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার সুযোগ তিরোহিত হইবে। পাকিস্তানের পক্ষে ইহাই হইবে সত্যিকারের মহাপ্রলয়ের যুগ।

সর্ব ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার পূর্বসূরীদের নীতিতে কোনও পরিবর্তন আনয়ন করেন নাই, বরং একনায়কসুলভ মানসিকতা নিয়া সেই নীতিগুলিই অনুসরণ করিতেছেন। রাজনৈতিক আমলে পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের শাসন আমলে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে কেন্দ্রের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বোধগম্য কারণেই নিরাপদ নহে। প্রাদেশিক প্রশাসন যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহারই বশংবদ ও কৃপাপ্রার্থী। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানেও কায়েমী স্বার্থী গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের স্থান তাঁহার দরবারে নাই।

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকারের দাবি যাঁহারা করেন, জনস্বার্থের কথা যাঁহারা তোলেন, তাঁহারা রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায় আখ্যায়িত হন, তাঁহাদের উপর জেলজুলুম চলে। কোনও বিরোধীদলীয় নেতা প্রেসিডেন্টের কোপানল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। জনগণ শ্রদ্ধেয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারই অভিরুচিতে কারা জীবনযাপন করিতে হইয়াছে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারেই চলিতেছে। তাহার সঙ্গে আমাদের বহুবার দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহাকে জাগান যায় না।

তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চনার অস্তিত্বের কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যাবলী সমাধানের বা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অতি সহজেই এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেন। তাহাতে তাঁহার আন্তরিকতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার জন্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বৈষম্যজনিত সমস্যাবলী উত্তরোত্তর জটিলতর ও তীব্রতর হইয়া বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে যে, এগুলির সমাধান দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। গত

www.pathagar.com

দশ বৎসর যাবৎ সামরিক শাসন, অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও দমন নীতির দ্বারা জনমত বাহ্যতঃ স্তিমিত করা গেলেও জনগণের বিক্ষোভ যে পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্ষমতাসীন মহল জনগণের চোখে ধূলা দিয়া এইসব সমস্যাবলী চাপা দিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিতেছেন যে, বর্তমান শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৬১ সালে প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান জনাব সাইদ হাসান ঢাকায় এক বেতার বক্তৃতায় এমনও দাবি করিয়াছিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোন অর্থনৈতিক বৈষম্য নাই বরং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইতেছে। তাঁহার এই উক্তির প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই অঞ্চলের পত্র-পত্রিকা, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং রাজনীতিকবর্গ তথ্যের মাধ্যমে তাঁহার উক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়া দেন। তৎপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমপর্যায়ে আনিতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময় লাগিবে।

বৈষম্য সম্পর্কিত সরকারী মহলের এই বিপরীতমুখী উক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের গণমনে ক্ষোভ ও অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এমনও দাবি করা হইতেছে যে, উন্নয়নমূলক খাতে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের সমমাত্রায়, এমনকি কোনও কোনও বৎসর পূর্ব পাকিস্তানকে অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইতেছে। এই বরাদ্দের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি রহিয়াছে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় উন্নয়ন তহবিল হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইলেও কেন্দ্রীয় নিজস্ব তহবিল হইতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় করা হয়। তদপুরি, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণে এবং সিন্ধু অববাহিকা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণে সর্বমোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা বাজেট বরাদ্দের বাহিরে রাখা হইয়াছে; অথচ পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা-নিরোধের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান অবশ্য রাজনৈতিক আমল অপেক্ষা বর্তমানে অধিক অর্থ লাভ করিতেছে। কারণ রাজনৈতিক আমলে বিদেশী ঋণ ও রাজস্বের পরিমাণ বর্তমান আমল হইতে অনেক কম ছিল। রাজনৈতিক আমলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৯৯ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে হাতে পাওয়া গিয়াছিল মাত্র ৪৯ কোটি টাকা। বর্তমান শাসন আমলে ১৯৬৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২০৫ কোটি টাকা। আর এখন ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সেই পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০০০ কোটি টাকার উপর। পূর্বের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান অধিক পরিমাণ বরাদ্দ লাভ করিলেও মোট অর্থের পরিমাণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত মোট অর্থের এক-চতুর্থাংশও পূর্ব পাকিস্তান পায় নাই। অথচ এই ঋণের সিংহভাগই পরিশোধ করিতে হইবে পূর্ব পাকিস্তানকে । পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ অর্জন করে।

ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে।

www.pathagar.com

এই নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত কন্ট্রাক্টর, শ্রমিক-মজদুর সকলে একই অঞ্চলের অধিবাসী। এই ব্যয়বাহুল্যের সান্ত্বনা হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে 'দ্বিতীয় রাজধানী' নির্মাণে মাত্র ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এবং দেশরক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৮৫ ভাগ ব্যয়িত হয়। ইহাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও মূলধন গঠনের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যার পরিমাণ আজ আর কাহারও অজানা নাই। সময় ও সুযোগ মিলিলে পাকিস্তানের গোটা বিধি-ব্যবস্থার ওপর একটি পৃথক পুস্তক রচনার ইচ্ছা আমি পোষণ করি। সময় ও সুযোগ পাইব কি-না জানি না।

তিক্ততা ও হতাশা

আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বিগত দশ বৎসরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। এখন গণমানসে যে পরিমাণ তিক্ততা ও হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে, রাজনৈতিক আমলের চরম পর্যায়েও এমনটি লক্ষ্য করি নাই। এজন্য গত দশ বৎসরের অনুসৃত নীতিকেই দায়ী করিতে হয়। দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতে এই পর্যন্ত যাহা-কিছু ঘটিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান দেশ শাসনের ব্যাপারে প্রকৃত অংশীদার হইতে পারে নাই বা স্বাধীনতার পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে নাই। এই অকাট্য সত্য উপলব্ধি করিতেই হইবে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ইচ্ছাকৃতভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন, না যে ধরনের শাসনব্যবস্থা তিনি কায়েম করিয়াছেন সেইটাই এজন্য দায়ী, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। আমার মনে হয়, তিনি ক্ষমতা-মদে মত্ত হইয়া দেশের কল্যাণে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতে পারিতেছেন না। যে কোনও একনায়কের মত After me the deluge-আমার পরে কেয়ামত হইয়া যাউক-এই যেন তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শন।

তবে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং আলাপ-আলোচনায় যতটুকু বুঝিয়াছি, তিনি সহিষ্ণু, অমায়িক ও জনকল্যাণবিমুখ নন। তিনি সমরবিদ, রাজনীতিবিদ নহেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই। তাই এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার পরামর্শদাতাদের মুখাপেক্ষী। তাঁহার পরামর্শদাতারা হয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারী, নয়ত জনগণ প্রত্যাখ্যাত রাজনীতিবিদ। রাজনীতি সম্বন্ধে সরকারী কর্মচারীদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি অস্বচ্ছ আর জনগণ প্রত্যাখ্যাত রাজনীতিক ব্যক্তিরা স্বার্থান্বেষী। তাঁহারা তাঁহাকে দেশের অবস্থা বা গণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সুপরামর্শ দেন নাই বা দিতে পারেন নাই। কখনওবা ভুল পরামর্শ দিয়াছেন। তাই দেশ শাসনে বা দেশ শাসনের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নে তিনি তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা বাস্তবায়নের সুযোগ পাইয়াছেন।

যে-কোনও ব্যবস্থাধীনে জনগণকে দূরে রাখিয়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করিতে গেলে জনমনে যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, বুরোক্রেসী তাহাও সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না বা করিতে চাহে না। তাঁহারা পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীকে প্রশাসনের ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করেন আর অনুগ্রহজীবী রাজনীতিকবৃন্দ এই সমস্যা উপলব্ধি করিলেও নিজেদের স্বার্থে অজ্ঞতার ভান করেন। একজন সৈনিক হিসাবে গণজীবন, দেশবাসীর

www.pathagar.com

রাজনৈতিক চিন্তাধারা, এমনকি বেসামরিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞতা বা জ্ঞানের অস্পষ্টতা জাতীয় জীবনে বিপর্যয় আনিতে এবং জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করিতে পারে। পাকিস্তানের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তি-বিশেষের অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা বা অদূরদর্শিতা সংশোধনের উপায় থাকে, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে। কোনও মানুষই দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নহে, কিন্তু তাহার ক্রিয়াকলাপ জনমতের কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার ব্যবস্থা থাকিলে সেই দোষ সংশোধনের একটি পথ উন্মুক্ত থাকে। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানে এই ব্যবস্থা নাই।

দেশের অভ্যন্তরে যে চরম সঙ্কট বিরাজ করিতেছে, সেই দিকে মনোনিবেশ না করিয়া পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে মাতামাতি শুরু করিয়া দিয়াছি তাহা কেবল নিরর্থকই নহে, মারাত্মকও বটে। সব নীতির সেরা নীতি নিজের ঘর ঠিক রাখা। তাহারপর আশেপাশে দৃষ্টি দেওয়া। বর্তমানে আমরা ভারতকে একমাত্র শত্রু এবং কাশ্মীরকে একমাত্র সমস্যা বলিয়া মনে করিতেছি; কিন্তু সে ব্যাপারেও কোনও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছি না। পশ্চিম পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং সামরিক সদর দফতর হইতে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব সম্পর্কে শাসকবর্গের মৌলিক যুক্তিতর্ক ও লম্বা বুলি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনও বাস্তব পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমান সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যে কত অরক্ষিত, গত ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ঐ জন্য পূর্ব পাকিস্তানীরা কম বিক্ষুব্ধ নহে। তাহারা স্বভাবতঃই আর অরক্ষিত থাকিতে চাহে না।*

*এই নিবন্ধ 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

লেখক ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

www.pathagar.com

The supreme test

Abdus Salam

The Awami League Government is today in a peculiar position. Although the party was elected overwhelmingly by the people. The Government we have today is not an elected representative and constitutional Government, because of the fact that there is no constitution yet and there is, therefore, no democratic legal basis for its existence. It holds office by virtue of coming out victorious in a revolutionary war and is therefore a revolutionary, provisional government.

At one stage Prof. Muzaffar Ahmed, chief of the only splinter group of NAP had suggested that there should be a national government composed of various political elements which participated in the revolutionary war. Later on however, he and others such as Maulana Bhashani agreed to give their support to the Government especially for bringing about normalisation in the country. The Awami League had the right to claim that they were the chosen representative of the people and therefore politically they had the right to form the government and since a constitution cannot be had overnight and conditions in the country were far from normal, it was imperative to form a government, take steps to create normal conditions and then to call the Constituent Assembly and make the basic law of the State. It has to be admitted that conditions are not yet absolutely normal and extra legal actions have to be taken to meet the day-to-day situation. But one hopes no avoidable time will be lost in giving a legal and constitutional shape to the basic structure of our State. The people voted for the Bangabandhu, and he has said that Bangladesh will be a democracy with socialism and secularism as its guiding lights. Both he and the Awai League have been pledged to democracy for long. In fact, their fight against the then regime of Pakistan was for the restoration of democracy and fundamental human rights. Therefore, they cannot ignore these two basic requirements of a modern state. And these can be guaranteed only by a constitution and a government machinery which will contain within itself the checks and balances of a democracy.

We believe it is possible to reconcile democracy in the true sense with a socialistic pattern of our economy. The problem is to preserve individual human rights within a framework of social obligations and an economic system that shall eliminate exploitation.

www.pathagar.com

There can be no state within a state. In other words, all foci of real power must be within the constitutional framework and subject to discipline of the law. The government must assume the ultimate responsibility for law and order and cannot for any reason whatsoever abdicate it for any purpose to any particular group outside the governmental framework. Whilst therefore the principle of individual freedom requires that there have to be checks and balances, there has also to be the supremacy of the law with guaranteed judicial impartiality. The principle of socialism means that individual rights and privileges are subject to the overriding interests of society as a whole and it also involves the necessity to eliminate exploitation of man by man, under whatever name it may seek to exist. In making the constitution this aspect of the problem with which we are faced today must be kept in mind.

The public services today are in a demoralised state. Many factors are responsible for this, not the least of which was the ten months of sadistic brutality and lawlessness encouraged by the then regime itself. The Awami League in power cannot do itself what it condemned in the previous regimes. The permanent services should as far as possible, be left alone. Mr. Monem Khan used to issue directives straight to the village daroga. If we replace on Monem Khan by thousands of them that will be no improvement.

Sheikh Mujib loves his people and the people love him in return. It is for him now to take on the leadership of the whole nation and put it on the road to orderly progress. He probably does not know how strong he is. His strength comes form the people and not from any particular group, clique or vested interest. In a way he is now facing the supreme test of his greatness.

The Bangladesh Observer
March 15, 1972

লেখক ছিলেন বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক। এই সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে (!) '৭২ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে চাকরিচ্যুত করেছিল

www.pathagar.com

অর্থ সংকটের দুর্দিনে

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা থেকেই দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের, বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যাদির দাম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪২ সালে যখন জাপানী হামলা ভারতের দিক এগিয়ে আসতে থাকে, সেসময়ে জাপানী হামলার প্রতিরোধকল্পে ব্রিটিশ সরকার বিদেশী সৈন্য ভারতে আমদানি করেন। তাদের খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের যে অভিযান চালানো হয়, তার ফলে ধান-চাউল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দেশের নাগরিকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তার পরের বৎসর জাপান যখন বর্মা দখল করে একেবারে ভারতের উপকণ্ঠে এসে হামলার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে বাঙলা দেশের ধান-চাউল নষ্ট করে ফেলেন। এতে দেশ দারুণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এটাই পঞ্চাশ সালের (১৩৫০ বাঙলা সন) মন্বন্তর নামে খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোককে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সে-সময়ে আমরা যে-বেতন পেতাম, তাতে আমাদের খাবার চাউল কিনতেই সব সাবাড় হয়ে যেত। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অন্যান্য কাগজের মালিকগণ নিজেরাই তাঁদের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দেন। কিন্তু আমাদের কর্তৃপক্ষের টনক তখনো এ ব্যাপারে নড়ে নাই। বেতন বাড়ানোর আবেদন-নিবেদনের অভ্যাস আমার কখনও ছিল না। মুজীবুর রহমান খাঁর অভ্যাসও দেখলাম আমারই মত। আমি তখন মাত্র শ' খানেকের মতো মাইনে পেতাম, আর মুজীবুর রহমান পেতেন মাত্র আশি টাকার মতো। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এতটা চরমে উঠেছিল যে, আমরা কিছুতেই সংসার চালিয়ে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে উভয়ে যুক্তি করে ঠিক করলাম, কর্তৃপক্ষের এদিকে যখন নজর নাই, তখন এখানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে অক্কা পেয়ে লাভ কি– চলুন, চাকুরী ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া যাক। এই যুক্তি অনুসারে উভয়ে একটি যুক্ত চিঠি লিখলাম ম্যানেজার খায়রুল আনাম খাঁর কাছে। তাতে আমাদের সাংসারিক, আইটেম বাই আইটেম, খরচের হিসাব দিয়ে দেখানো হলো যে, যে-বেতন আমাদের দেয়া হয়, তাতে আমাদের এক বেলা অনাহারে কাটানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই বিনীতভাবে আরজ করা হল যে, আগামী ১লা জানুয়ারি তারিখে আমরা ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছি– ইতিমধ্যে যেন 'আজাদ' এর কাজের জন্যে আমাদের স্থলে অন্য লোক নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এ চিঠি পেয়েই খায়রুল আনাম খাঁ সাহেব আমাদের কাছে দৌড়ে এলেন। বললেন: 'একি কথা? আপনাদের এত অভাব, আর তা আমার কাছে বলেন নাই কেন?' এই বলে তিনি আমাদের উভয়ের পকেটেই পঞ্চাশ টাকা করে গুঁজে দিলেন।

আমরা বললাম: 'দেখুন তেমন বলার অভ্যাস আমাদের নাই। পরিস্থিতি দেখে সব কাগজের মালিকরাই নিজেদের কর্মচারীদের বেতন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম, আপনিও তা-ই করবেন। কিন্তু তার কোনো উদ্যোগ না দেখে আমরা মনে করলাম, আপনি তেমন ব্যবস্থা গ্রহণে নারাজ। তা-ই অগত্যা এই চিঠি লিখতে আমরা বাধ্য হয়েছি।'

খায়রু মিয়া বললেন: 'আমিও বেতন বাড়াবো বই কি! তবে এক্ষুণি সামগ্রিকভাবে সকলের বেতনবৃদ্ধির ব্যবস্থা কার্যকরীকরণে অসুবিধা আছে। পরে এ ব্যবস্থা হবে।'

আমরা বললাম: 'আমাদের অবস্থা যে এখনি অচল হয়ে পড়েছে! 'পরের' জন্য অপেক্ষা করাও যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব!'

খায়রু মিয়া বললেন: 'আপনাদিগকে প্রতি মাসেই আমি পঞ্চাশ টাকা করে অতিরিক্ত দিয়ে যাব। সেজন্য ভাববেন না।' এই বলে তিনি আমাদের চিঠিখানি ফেরত দিয়ে বললেন: 'এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলুন।'

ছিঁড়ে ফেলতেই হল চিঠি।

এরপর থেকে মাসে দেড় শত টাকা করে পেতে লাগলাম বটে, তবে তাতে সব অভাব মিটত, একথা বলতে পারি না। তবে কোনো রকমে চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সার্কুলেশন ভোজবাজী

সম্ভবত এর বৎসরখানেক পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। তখন বাঙ্লা সরকারের প্রচার-ডিরেক্টর ছিলেন জনাব আলতাফ হোসেন (পরবর্তীকালে শিল্পমন্ত্রী)। তিনি একদিন আমাদের অফিসে টেলিফোন করলেন আমাকে : বর্তমানে 'আজাদ' এর সার্কুলেশন কত বলতে পারেন?

আমি বললাম: 'ঠিক বলতে পারি না– তবে পনেরো-ষোল হাজারের কম হবে না নিশ্চয়ই।'

আলতাফ হোসেন সা'ব বললেন: 'মোটেই না। মাত্র পনেরো শ' কি ষোল শ'।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম: 'অসম্ভব! এ হতেই পারে না। সার্কুলেশন কমে যাবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

আলতাফ সা'ব বললেন: 'আমরা খুবই বিশ্বস্তসূত্রে এই খবর পেয়েছি। অবিশ্বাসযোগ্য খবর নয় এটা। আপনি একটু খবর নিয়ে দেখুন।' বলে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ-কথা কি করে সত্য হতে পারে? মুজীবুর রহমান সা'বকে বললাম। তিনিও বললেন, 'না, কিছুতেই একথা সত্য হতে পারে না। সম্ভবত 'আজাদ' এর শত্রুতাকামী কোনো দুষ্ট লোক আলতাফ হোসেন সা'বকে এ মিথ্যা খবর যুগিয়েছে সরকারী মহলে 'আজাদ' এর প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে।'

যাক, অবশেষে আমরা স্থির করলাম, 'দারোগা সা'বের কাছে খবর নিলে সম্ভবত এ সম্পর্কে সত্য খবর জানা যেতে পারে। 'দারোগা' সাহেব ছিলেন 'আজাদ' এর বিজ্ঞাপন বিভাগের ক্লার্ক। তিনি রসুলপুরের খাঁ পরিবারেরই লোক। তাঁর নাম ছিল অজিয়ার রহমান খাঁ।

www.pathagar.com

শুনেছিলাম, প্রথম জীবনে তিনি নাকি কিছুদিনের জন্য মিউনিসিপ্যাল 'দারোগা' ছিলেন। তাঁর সে চাকুরী স্থায়ী না হলেও তাঁর সে চাকুরীজীবনের নামটাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে তাঁর আসল নামটাকে এক রকম নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। শিশুর মতো সরল ছিল তাঁর স্বভাব। কিন্তু একবার রেগে গেলে তাঁকে সামলানো ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাঁর পরিচিত বন্ধুগণ ও আত্মীয়-স্বজন তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করতেন এবং তিনিও একটুতেই ক্ষেপে উঠতেন। অফিসের অনেকেই তাঁকে নিয়ে একটু কৌতুক করার লোভ সংবরণ করতে না পেরে তাঁকে প্রায়ই খোঁচা দিতেন এবং তিনিও এই কারণে অধিকাংশ সময় ক্ষেপেই থাকতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশোর্ধ। এর কয়েক বৎসর পরেই তিনি এন্তেকাল করেন। এই স্বভাব-সরল মানুষটির মৃত্যুতে সত্যই ব্যথা পেয়েছিলাম। আমাদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল খুবই অমায়িক। আমরা কখনো এই শিশুর মতো সরল লোকটিকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করি নাই।

আমি ও মুজীবুর রহমান খাঁ যখন 'দারোগা' সা'বের কাছে হাজির হলাম, তখন তিনি শান্ত, খোশ মেজাজেই রয়েছেন দেখলাম। বললাম: 'দেখুন তো দারোগা সাব, কি অন্যায়! 'আজাদ' এর সার্কুলেশন নাকি একেবারে ষোল শ'য়ে নেমেছে। এমন মিথ্যা প্রচারণায় যে বাজার ছেয়ে গেল! সে খবর রাখেন?'
দারোগা সাব এ সংবাদে মোটেই উত্তেজিত হলেন না। বললেন: 'বাজারে যা রটেছে তা ঠিক-ই তো! কাগজ তো এখন ষোলো শ'ই ছাপা হয়।'
আমরা বললাম: 'বলেন কি? আমাদের কাগজের সার্কুলেশন মাত্র ষোল শ'? এই না শুনে আসছি– ষোল হাজার? এমন ভোজবাজী কি করে সম্ভব হল?'
দারোগা সাব বললেন: 'তা আমি কি জানি? কর্তাদের জিজ্ঞেস করুন না। আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে হ্যাঁ, এটুকু জানি যে, কাগজ বর্তমানে ষোলো শ'য়ে নেমেছে।'
আমরা বললাম: 'কিন্তু কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হল? বলুন না, শুনতে আমাদের ভারী কৌতূহল হচ্ছে।'
দারোগা সাব বললেন: 'না, না, আমি কিছু জানি না– আমি বলতে পারব না। কেন, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না?
বুঝলাম, দারোগা সা'ব জানেন, কিন্তু বলবেন না-কিছুতেই বলবেন না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে রেগে যাবেন। কাজেই হতাশ হয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম।

পরিচালনা পরিবর্তন

কিছুদিন পরে মওলানা সাহেব হঠাৎ মধুপুর থেকে কলকাতায় এলেন। সঙ্গে এলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সদ্‌রুল আনাম খাঁ (খলিল মিয়া)। অফিসে এসে দেখলাম, মওলানা সা'বের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। আমরা মনে করেছিলাম কাগজের সার্কুলেশন কমে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে সাহস আমাদের হল না। পরে প্রকাশ পেল কাগজের পরিচালনা সম্পর্কে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসন্ন।

বস্তুত গুরুতর পরিবর্তনই হল। মওলানা সা'ব হেবানামা করে তাঁর কলকাতার সব সম্পত্তি তাঁর চার পুত্রকে দান করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র খায়রুল আনাম খাঁকে 'আজাদ' থেকে সরিয়ে দেয়া

www.pathagar.com

হল। তাঁকে দেয়া হল একটা বড় প্রেস ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার স্বত্বাধিকার। বাকী তিন ছেলেকে দেয়া হল 'আজাদ'সহ বাকী প্রেসগুলির ও পার্ক সার্কাসের বাড়ীর স্বত্বাধিকার। তাছাড়া সদরুল আনাম খাঁ হলেন 'আজাদ' এর জেনারেল ম্যানেজার।

খলিল মিয়া (সদরুল আনাম খাঁ) ইতিপূর্বে প্রেসের সংশ্রবে কোনো দিন ছিলেন না, কাজেই এত বড় দায়িত্ব পালনে তিনি সফল হতে পারবেন কিনা, সে সম্পর্কে প্রথম দিকে আমরা বেশ সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু অল্প দিনেই দেখা গেল, সে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। তিনি প্রথম থেকেই কাগজ সম্পর্কে যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলেন, তাতে আমাদের ধারণা পাল্টে গেল। এ যাবৎ যে সব অব্যবস্থা স্তূপীকৃত হয়েছিল, তিনি একে একে সব দূর করে সেখানে একটা শৃঙ্খলা আনলেন। কি প্রেসের ব্যাপারে, কি সাংবাদিক দফতরে সর্বত্র তিনি সুষ্ঠু সুবিবেচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কাগজের চেহারায় শ্রী ফিরিয়ে আনলেন। কাগজের সার্কুলেশন আবার যা ছিল তা-ই হল। ক্রমে বুঝা গেল, কাগজের সার্কুলেশন কমে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই একটা কৃত্রিম অভাব-সৃষ্টির হেরফের মাত্র।

আরো একটা কাজ তিনি করলেন, যাতে তাঁর সহৃদয়তার ও সুবিবেচনার পরিচয় পেয়ে আমরা সকলে খুশি হলাম। তিনি সকলের বেতন বাড়িয়ে দিলেন। বেতন বাড়ানোর কোনো আবেদনের তোয়াক্কা না করেই তিনি এ কাজ করলেন। শুনলাম, তিনি নাকি এমন কথাও কারো কারো কাছে বলেছিলেন: 'আমার অফিসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অন্য অফিসের কর্মচারীদের চাইতে বেতন কম পাবেন, এ হতে পারে না, এ আমার পক্ষে লজ্জার কথা। আমার এডিটরদের গুরুত্ব অন্য কাগজের এডিটরদের চাইতে অল্প, এ আমি মেনে নিতে পারি না।'

তিনি আমাকে ও মুজীবুর রহমানকে ডেকে বললেন: 'আমি যদি আমার এডিটরদের গুরুত্ব না দেই, তো আমার কাগজের পাঠকরা আমার কাগজকে, আর এ সংস্থাকে গুরুত্ব দেবে কেন? আপনাদের যা দেয়া হয়, অন্যান্য কাগজের সম্পাদকদের তুলনায় তা সত্যই লজ্জাজনক। আপনি এরপরে মাসে আড়াই শ' এবং মুজীবুর রহমান দু'শ' করে পাবেন। আগামীবার আরো বাড়িয়ে দেব।'

সত্যই এরপর বৎসর বৎসর তিনি আমাদের বেতন এক শ' করে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।*

*লেখাটি 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে সংকলিত

লেখক ছিলেন দৈনিক আজাদ ও দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক

www.pathagar.com

দরবার-ই-জহুর

জহুর হোসেন চৌধুরী

'আজাদ' আবার বের হওয়াতে আমি খুশি হয়েছি একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এ পত্রিকাটির সঙ্গে আমার জীবনের বহু স্মৃতি, অনেক তুমুল বিতর্কের কাহিনী বিজড়িত। 'নীতি' হিসেবেই স্থানীয় কোনও পত্রিকা আমি কিনি না। 'সৌজন্য কপি' হিসেবে পেলে পড়ি, নতুবা পড়ি না। এবার 'আজাদ' বের হওয়ার ক'দিন পর এর অফিসে টেলিফোন করে মুজিবুর রহমান ভাইকে চাইলাম। ওপার থেকে শুনলাম, "উনি দোতলায় আছেন, ডাকতে হবে। আপনি কে বলছেন?" নাম বলায় জবাব পেলাম, "আমি জয়নুল বলছি চাচা, খলিল সাহেবের ছেলে। আপনি কেমন আছেন?" খলিল ভাইয়ের কন্দর্পকান্তি চেহারাটা (হিন্দু দেবতার চেহারার সঙ্গে তুলনা করায় মুজিবুর রহমান ভাই মাফ করবেন। খলিল ভাই বেঁচে থাকতে একথা তাঁকে অনেকবার বলেছি। তিনি আপত্তি করেননি। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা সত্যি নিবিড় ছিল।) চোখের সামনে ভেসে উঠল। জয়নুলকে বললাম, "চিনতে যখন পেরেছ, তখন কথাটা তোমাকে বললেও চলবে। ঢাকা থেকে 'আজাদ' যেদিন প্রথম বের হয়, সেদিন থেকে এক কপি করে কাগজ পেতাম"। কথাটা শেষ করার আগেই শুনলাম "এখনও নিশ্চয়ই পাবেন। কাল থেকেই কাগজ যাবে। আপনার বাসার ঠিকানাটা বলুন।" খুব ভাল লাগল। সাধারণ সৌজন্য, যেটাকে আমরা আদব-তমিজ বলি, সেটা এ জেনারেশনে একটু অসাধারণ অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার হয়ে গেছে বলেই শুনি। সৌজন্যবোধটা কি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই একটা মূল্যবোধ? অবশ্য আমি এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারি না। আশা করা যায় না এমন সব মহল থেকেই সহৃদয় ব্যবহার পাওয়ার অভিজ্ঞতাই আমার বেশি। আবার আশা করা যায়, এমন সব মহল থেকেও কোনও কোনও সময়ে রূঢ় আঘাতও পেয়েছি। তবে জমার ঘরই আমার ভারী। সুতরাং কোনও খেদ নেই। সাদাকালো দু'টি রঙ মিলিয়েই জীবন। তত্ত্ব কথা থাকুক, পরদিন থেকেই 'আজাদ' নিয়মিত পেতে থাকলাম।

দু'একদিন অবশ্য হকার ফাঁকি দেয়। সেদিন দিনটা একটুখানি শূন্য মনে হয়। কারণ, ৬টা দৈনিকের মধ্যে দিনের ডামাডোলে সময় না পেলেও রাতে শোয়ার আগে আদ্যোপান্ত পড়ি এবং উপভোগ করি। আমার মন চলে যায় তিন-চার যুগ আগে, মনে হয় কাল যেন স্থির হয়ে রয়েছে। আমার কিছু বন্ধু 'আজাদ' নিয়মিত পড়েন এবং বলেন, "আজাদই এদেশের মুসলিম মানসের প্রতিনিধিত্বের সত্যিকার দাবিদার, বাকী সব কাগজই আস্ত ভেজাল।" আমি এ তর্কের মধ্যে এখন যেতে নারাজ। এমন এক যুগ ছিল যখন 'আজাদ'-এর শীর্ষেই লেখা

www.pathagar.com

থাকত "মোহ্লেম বাংলার একমাত্র দৈনিক" এবং তখন এ দাবি বাস্তব সত্য ছিল। ১৯৪৬ সালে শহীদ সাহেব আবুল মনসুর সাহেবকে সম্পাদক করে দৈনিক "ইত্তেহাদ" বের করার পরও কিছুদিন যাবৎ উপরিউক্ত দাবি বহাল ছিল। 'আজাদ'-এর পুনরুজ্জীবনের পর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে জনাব মুজিবুর রহমান খাঁর নাম দেখে আমি সত্যি আনন্দিত হয়েছি। আমার মনে পড়ে গেল, প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার চিকন শ্যামল সুদর্শন এক যুবকের কথা, যিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার "অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন নামিলা স্নানের তরে" থেকে শুরু করে "নিরস্ত্র মদনপানে চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে" পর্যন্ত প্রায় এক নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করে আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কাব্যে তাঁর আসক্তি ছিল সত্যি প্রচণ্ড। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা তিনি যেভাবে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন, তাতে আমার সত্যি ঈর্ষা হতো। গত কয়েকদিন ধরে 'আজাদ'-এ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল্য ক' পয়সা এবং কিরূপ নিপুণভাবে তিনি ইংরেজের দালালি ও মুসলমানের দুশমনি করেছেন সে সম্বন্ধে 'কাল পুরুষ'- এর মূল্যবান গবেষণামূলক লেখা বের হচ্ছে। বিভাগ-পূর্ব যুগে পাকিস্তান আন্দোলন যখন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখনও এবং পাকিস্তান আমলের চব্বিশ বছরেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এমন জোরালো কোনও লেখা 'আজাদ' বা অন্য কোনও পত্রিকায় পড়েছি বলে মনে পড়ে না। মুজিবুর রহমান ভাইয়ের সঙ্গে চার যুগের সম্পর্কের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতান্তর একদিনের জন্যেও মনান্তরে পরিণত হয়নি। বহুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। ভাবছি একদিন 'আজাদ'-এ যেয়ে আবার নতুন করে তর্কে প্রবৃত্ত হব ও কিছু চা-নাশতা-সিগারেট ধ্বংস করে আসব। সম্ভব হলে তাঁর কাছে আবার রবীন্দ্রনাথ, ম্যাথু আর্নল্ড এবং নজরুলের কবিতা শুনতে চাইব। ইংরেজির ছাত্র ছিলেন তিনি।

'আজাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা আজ আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আজ একটি গুরুতর ত্রুটি স্বীকারের পালা। আজকের 'আজাদ'-এর পৃষ্ঠা উল্টাতে জনাব শাহীন রেজার 'মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের জন্মবার্ষিকী প্রসঙ্গে-"আমরা তাঁকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছি কি?" শীর্ষক প্রবন্ধ নজরে পড়ল। লেখক মন্তব্য করেছেন "রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, একথা কি বিস্মৃত হওয়া উচিত যে, মওলানা আকরম খাঁ একজন জ্ঞানী সাধক ও নির্ভীক সেনানী ছিলেন, উপরন্তু তিনি এদেশের সাংবাদিকতার জনক ছিলেন।....তাঁর আবির্ভাব না হলে আমরা যারা আজ নিজেদেরকে 'সাংবাদিক' বলে দাবি করি ও 'সদর্পে মেদিনী কাঁপিয়ে ফিরি' তাদের এ দর্প চূর্ণ হয়ে যেত বহু আগেই। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যখন দেখি দেশের কোনও দৈনিক পত্রিকায় মরহুম আকরম খাঁর জন্মদিনের ছোট খবরটি ছাপার সামান্যতম তাগিদ বোধ করেন না কেউ।" সাংবাদিকদের ব্যাপারে লেখকের মন্তব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নেই। নিজেকে আমি সাংবাদিক মনে না করার চেষ্টাই ক্রমাগত করে এসেছি। তবে আমি বিনাদ্বিধায় স্বীকার করব যে, মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের কাগজেই আমার সাংবাদিকতার হাতেখড়ি এবং 'আজাদ' অফিসে আমার যৌবনের বহু সন্ধ্যা কেটেছে। এ অফিসে বসেই মুসলিম বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের বাঁকা-সোজা নানা গতি-প্রকৃতি কাছে থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ ঘটেছে এবং এ অভিজ্ঞতার মূল্যের

www.pathagar.com

সীমা নেই। এজন্যে আমি মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও তাঁর কাগজের কাছে কৃতজ্ঞ; যদিও মওলানা সাহেবের ও তাঁর কাগজের রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে আমি একমত ছিলাম না। তাঁর জন্মদিনটা আমারও অলক্ষ্যে চলে যাওয়ার জন্যে সত্যি আমি লজ্জিত।

মওলানা সাহেবকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর যৌবনকাল থেকেই তাঁর ধর্মীয়, রাজনৈতিক মতামত ও বক্তব্য নিয়ে প্রবল ও তিক্ত তর্ক চলেছে প্রায় তাঁর জীবনের শেষকাল পর্যন্ত। তিনি বহু লোককে 'কুফরী' ফতোয়া দিয়েছেন। আর নিষ্ঠাবান সুন্নীরাও তাঁকে এই খেতাবে আখ্যায়িত করেছে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আবির্ভাব হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরক্ত ভক্ত হিসেবে, আগাগোড়া খদ্দরে ভূষিত কংগ্রেসী মওলানারূপে, ইংরেজভক্ত আলেমদের ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের মৌলিক সংস্কারের প্রয়োজনের অকুতোভয় তেজস্বী প্রবক্তা হিসেবে। বোধহয় কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মওলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বদেশপ্রেমের ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, তা আমার বালকমনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

অন্য অনেক কংগ্রেসপন্থী মুসলমানের ন্যায় মওলানা সাহেবও পরে উগ্র মুসলিম লীগপন্থী হয়ে পড়েন। ১৯৩৮-৩৯ সালেও কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউটে এম, এন রায়ের এক সংবর্ধনা সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে আমি নিজেই শুনেছি, "যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু না হতো, তবে হয়তো আমরা কংগ্রেস ছাড়তাম না।" এসব এখন ইতিহাসের অন্তর্গত; তবে একটি কথা অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি যে, যদি মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের 'আজাদ' পত্রিকা না থাকত, তবে পাকিস্তানের উদ্ভব হত কি-না সন্দেহ। মওলানা সাহেব ও 'আজাদ' উগ্র মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানপন্থী হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার 'আজাদ' অফিসে কমিউনিস্ট, রায়পন্থী ও অন্যান্য প্রগতিপন্থী অমুসলমান বুদ্ধিজীবীদেরও যে ভিড় ছিল, একথা আমি এ কলামে আগেও একবার লিখেছি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব, মুজিবুর রহমান সাহেব ও আরও অনেকে, যাঁরা মওলানা সাহেবের মতামতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁরাও পরে 'আজাদ' অফিসে নির্বিঘ্নে আসন করে নিয়েছেন।

মওলানা সাহেব সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করলে একটা বিরাট আকারের বই-ই লিখে ফেলতে হয়। আমাদের আরও অন্য অনেক নেতার ন্যায়ই মওলানা সাহেবের একটা প্রামাণ্য কেন, কোনও ধরনের জীবনীই কেউ লিখলাম না, এটা সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা। প্রায় সত্তুর বছর ধরে এদেশের জীবনকে যিনি প্রভাবান্বিত করে গেছেন, তাঁর জীবন-কথা যদি হারিয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতে যাঁরা আমাদের একটা বাস্তবভিত্তিক নিরুত্তাপ ইতিহাস লিখতে যাবেন, তাঁরা সে ইতিহাসের অনেকগুলো অমূল্য মালমসলা পাবেন না।

মওলানা সাহেবের জন্মদিবস একরূপ অলক্ষ্যে চলে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে দুঃখের বিষয়। তবে এ সম্বন্ধে খেদের বিশেষ কোনও কারণ নেই। রাজনৈতিক নেতা মওলানা আকরম খাঁর চাইতেও 'মোস্তফা চরিতের' লেখক, কোরান শরীফের অনুবাদক, অনুপম বাংলা গদ্য লেখক হিসেবে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলা সাহিত্যে চিরদিন বেঁচে থাকবেন। এবং তাঁর

www.pathagar.com

বাংলা তথাকথিত 'এছলামী বাংলা' ছিল না। বর্তমানে আমি 'মোস্তফা চরিত' পড়ছি। তবে কাজটা সহজ হচ্ছে না। এর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। 'মোস্তফা চরিতের' 'প্রাথমিক কথার' একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি অসামান্য শক্তিধর পুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি:

"মানুষের দেহের ন্যায় তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলিও খুব বাবু। এই বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা অসত্যের পুঞ্জীভূত ন্যক্কারজনক আবর্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধারসাধন করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করিতে বড় একটা চাহে না। এই সহজিয়া মানসিকতা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ী-পাল্কিগুলিতে চড়িয়া পরম আনন্দে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্বলতার মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা-এসব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে গেলে, তাঁহার জীবনকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয়কুল রক্ষার জন্য কতকগুলি আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্পগুজব এবং কতকগুলি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিষ্কার করেন এবং সেগুলির মধ্যে দিয়া তাঁহার জয়-জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল।---কালক্রমে তাহাই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কোনও কথা বলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোনও কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া এমনকি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও; কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এককথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন, প্রাচীন মুনি-ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ, 'ছালফে ছালেহীন ও বোজোর্গানে-দীন' কি এ সকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা কি বাপু তাঁহাদের অপেক্ষাও বিদ্বান হইয়াছ? বাপ-পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যাহা বুঝিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ---ইহাই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।"

কি বাংলা, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন চিন্তার কি জবরদস্ত নিশানবরদারী। ধর্মের ক্ষেত্রে মওলানা সাহেব আটত্রিশ বছর আগে যা বলেছেন, আজ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়েই এ ধরনের কোনও কথা বললে নানা কথা কোনও কোনও মহলে ওঠে।
২৯ জুন ১৯৭৬।

প্রয়াত জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক (১৯৫৪-৫৬) এবং আজীবন সদস্য (মরণোত্তর)

www.pathagar.com

সেই লাল বাড়িটা

এম আর আখতার মুকুল

আমার তখন সাংবাদিকতায় সবেমাত্র হাতে খড়ি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান পোস্ট' ও মাসিক 'পাকিস্তান টুডে' আর মাহমুদ আলী সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক নও বেলাল' পত্রিকায় কাজ করার পর, 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে যখন চাকরি নিলাম, তখনও ভাষা আন্দোলনের জের চলছে। 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মহিউদ্দীন আহাম্মদ। ইনিই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম দৈনিক 'জিন্দেগী'র সম্পাদক। (কারও কারও মতে, দৈনিক ইনসাফ হচ্ছে প্রথম দৈনিক পত্রিকা)। ঢাকার ২৬৩ নং বংশাল রোড থেকে চার পৃষ্ঠার এই দৈনিক জিন্দেগী প্রকাশিত হতো। দাম মাত্র এক আনা। পত্রিকার মাথায় লেখা থাকতো, 'কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের একমাত্র সংবাদ পরিবেশক।' কাশ্মীরে প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এই পত্রিকায় একদিন ব্যানার হেডলাইনে ছাপা হয়েছিল, "ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভূতপূর্ব কৃতিত্ব: তিন ঘন্টাব্যাপী বোমা বর্ষণে তিনটি খচ্চর ও একটি গাধা নিহত।" কিন্তু পত্রিকাটি বেশি দিন টিকে থাকতে পারলো না।

কুমিল্লার জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ পত্রিকাটির স্বত্ব ক্রয় করে নূতন আঙ্গিকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। সম্পাদক ও জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করলেন যথাক্রমে জনাব খায়রুল কবীর ও জনাব নাসির উদ্দীন আহমদকে। কবীরভাই এই পত্রিকার নূতন নামকরণ করলেন 'দৈনিক সংবাদ'। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই পত্রিকা আবার আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হলো।

এবার জনাব খায়রুল কবীরের মধ্যস্থতায় এক লাখ টাকার বিনিময়ে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ দৈনিক সংবাদের মালিকানা ক্রয় করলো। কথা ছিল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পার্টির সহ-সভাপতি দিনাজপুরের মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীকে চেয়ারম্যান করে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হবে। এই ট্রাস্টি বোর্ড ঢাকায় বিরাট প্রিন্টিং হাউস স্থাপন ছাড়াও আরও একটি ইংরেজি দৈনিক ও একটি সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করবে।

কিন্তু ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে প্রস্তাবিত ট্রাস্টি বোর্ড আর গঠিত হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে এই সংবাদ অফিসে কার্যরত সাংবাদিকদের এক বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলাম। সংবাদ অফিসেই তখন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের আখড়া। তখন পর্যন্তও দৈনিক আজাদে সাংবাদিক ইউনিয়নের ইউনিট গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ সময়ে সংবাদে যাঁরা চাকরি করতেন, তাঁরা হচ্ছেন মরহুম কাজী মুহাম্মদ ইদরিস, মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী, মরহুম ফজলুল হক সেলবর্ষী, মরহুম আবদুল গনি হাজারী, মরহুম সৈয়দ নূরুদ্দীন, মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, তোসাদ্দুক আহম্মদ (লণ্ডন প্রবাসী), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী, আবদুল মতিন (লণ্ডন প্রবাসী), ফয়েজ আহমদ, কে.জি. মুস্তাফা, আনিস চৌধুরী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আবুল হাসনাত, মরহুম সৈয়দ রেদোয়ানুর রহমান, সরদার জয়েন উদ্‌দীন প্রমুখ। সংবাদ অফিসের এই বৈঠকে স্থির হলো শীঘ্রই সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে কার্জন হলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক অভিনীত হবে। নায়কের ভূমিকায় বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও নায়িকা মিনা চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় মরহুম নূরুল আলম খান (দাদু), মুজিবর রহমান (পাঠক), আমিনুল ইসলাম, রোকেয়া কবীর, লায়লা সামাদ, নূর হোসেন, ফয়েজ আহমদ, মরহুম এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, এম.আর আখতার প্রমুখ। (নাম উল্লেখে ভুল থাকলে ক্ষমা প্রার্থী)। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী।

প্রথমে কিছুদিন ওয়ারীর সাত নম্বর হেয়ার স্ট্রীটে রিহার্সেল হলো। এরপর রিহার্সেলের স্থান পরিবর্তিত হলো আগামসিহ লেনে সৈয়দ নূরুদ্দীনের বাসায়। নূরুদ্দীন ভাই তখন ছিলেন দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক। যা হোক, যথা সময়ে কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন। রাতে কার্জন হলেই নৈশ ভোজ। এখনও মনে আছে, সেই নৈশ ভোজে খাবার কম পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত খায়রুল কবীরের প্রচেষ্টায় হোটেল থেকে খাবার এনে ইজ্জত রক্ষা করা হয়েছিল।

পরদিন রাতে নাটক অভিনয়ের সময় আর এক বিপত্তি। একটা দৃশ্যে জেলখানায় নায়কের পিতার ভূমিকায় নূর হোসেনের ফাঁসিতে লটকানোর কথা। দৃশ্যটা খুবই নিখুঁত হয়েছিল এবং দর্শকরা কয়েক মিনিট পর্যন্ত মঞ্চের এক কোণায় লাশের ঝুলন্ত পা দুটো দেখেছেন। কিন্তু গোলমালে কর্তৃপক্ষের কেউ বুঝতে পারেননি যে, দুই বগলের নিচ দিয়ে দড়ি লাগানো সত্ত্বেও অনেকটা আসল ফাঁসির ব্যাপার হয়ে গেছে। ভাগ্যিস মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিব ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হাবীবুল হকের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে। এর মধ্যে দৃশ্যটা শেষ হলে নাটক চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। আর অত্যন্ত সন্তর্পণে যখন নূর হোসেনকে দড়ি থেকে নামানো হলো, তখন বেচারার মুখ দিয়ে ফেনা ও গোল্লা বেরুচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলো। পরদিন দুপুর নাগাদ নূর হোসেন সুস্থ হলো।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের এই সম্মেলনে শুধুমাত্র পেশাদার সাংবাদিকদের জন্যে ঢাকায় একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করা হলো। তখনকার দিনে সাংবাদিকদের সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা এবং

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের মধ্যে একাত্মতাবোধ, সুকুমারবৃত্তি প্রকাশের সুযোগ, প্রতিভার বিকাশ ও সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যদের ওঠা-বসার একটা নির্দিষ্ট স্থানের জন্যে এরকম একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জনাকয়েক সাংবাদিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু সম্মেলনে যোগদানকারী অনেক সদস্যই এ ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করলেন। আবার কেউ কেউ একে বিলাসিতা হিসেবে গণ্য করে আগ্রহ দেখালেন না। ফলে প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটা আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচিত হলো না।

এরপর আরও প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমি ১৯৫৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে (প্রথম প্রকাশ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩) সাব-এডিটর হিসেবে যোগদানের পর সবেমাত্র রিপোর্টারের দায়িত্ব নিয়েছি। চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের মাত্র দু'মাস সময়ের মধ্যে শেরে বাংলার মন্ত্রিসভা ক্ষমতাচ্যুত হলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন ৯২ (ক) ধারার গভর্নরের শাসন। নিয়াজ মোহাম্মদ খান (এন.এম.খান) চীফ সেক্রেটারি।

আগে তবুও বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসগুলোতে বিশেষ করে দৈনিক সংবাদ ও অবজারভারে বেশ কিছু সংখ্যক কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতাদের আগমনে চুটিয়ে আড্ডা হতো। পুলিশের ভয়ে এখন তাও বন্ধ। অনেকে হয় পলাতক, না হয় কারাগারে। এদিকে জনাব খায়রুল কবীর সাংবাদিকতা ছেড়ে সরকারের প্রচার বিভাগে চাকরি নিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের নয়া গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জার দাপটে চারদিকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

আজকের বঙ্গভবনের দক্ষিণ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা দৈনিক ইত্তেফাক অফিসের দিকে চলে গেছে, এই রাস্তাটার ডান পাশটায় একই ধরনের দুটো হলুদ দোতালা বাড়ি রয়েছে। এই বাড়ি দুটোর আদি মালিক ছিলেন 'নাহা' পরিবার। তখন এরই একটা বাড়িতে থাকতেন জনাব খায়রুল কবীর। এই বাড়িতেই এ সময় সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত নেতৃস্থানীয় জনাকয়েকের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। অন্যান্যের মধ্যে এই বৈঠকে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (দৈনিক ইত্তেফাক), আবদুস সালাম (অবজারভার), সৈয়দ নূরুদ্দীন (সংবাদ), জহুর হোসেন চৌধুরী (সংবাদ) পি.টি.আই-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি বালান্ সাহেব, এ.এম.এ আজিম (এ পি পি), এস.জি.এম. বদরুদ্দিন (মর্নিং নিউজ), আবদুল মতিন (ইউ.পি.পি ও আজাদ), জনাব এম.এ.ওহাব (ক্যালকাটা স্টেটসম্যানের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকেই পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাব স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং কয়েক শ' টাকা চাঁদা পর্যন্ত সংগৃহীত হয়। অর্ধ সাপ্তাহিক পাকিস্তান পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রথম বার্তা সম্পাদক ও সাপ্তাহিক নতুন খবর-এর সম্পাদক এ. কে. এম. আবদুল কাদের, দৈনিক আজাদ পত্রিকার তৎকালীন রিপোর্টার সৈয়দ জাফর আলী ও দৈনিক ইত্তেফাক-এর রিপোর্টার এম আর আখতার মুকুল প্রেস ক্লাব স্থাপনের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন।

এই সব সাংবাদিকদের কয়েক দফা বৈঠকের পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, বর্তমান মুহূর্তে গভর্নরের শাসন চালু থাকায় মন্ত্রীদের জন্যে বরাদ্দকৃত সব লাল বাড়িগুলো খালি পড়ে

www.pathagar.com

আছে। সরকার রাজী থাকলে এ ধরনের একটা লাল বাড়িতে প্রেস ক্লাব স্থাপন করা সম্ভব।

১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে জনাব খায়রুল কবীরের প্রচেষ্টায় জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জনাব আবদুস সালাম, জনাব এ. এম.এ আজিম, জনাব এস.জি.এম. বদরুদ্দীন ও জনাব আবদুল মতিনের সমন্বয়ে গঠিত সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল ১৮ নম্বর তোপখানা রোডের চমৎকার লাল দালানটাতে প্রেস ক্লাব স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে চীফ সেক্রেটারি এন.এম.খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। এই বাড়িটাতেই এক সময় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বোস-আইনস্টাইন তত্ত্বের আবিষ্কারক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বসবাস করতেন। পাকিস্তান হবার পর বাড়িটা মন্ত্রীদের জন্যে বরাদ্দের ব্যবস্থা হলে পূর্ব বাংলার প্রথম শিক্ষা ও সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার জনাব আবু হোসেন সরকার কিছুদিন এই বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৯২ (ক) ধারার শাসনে তো কোনও মন্ত্রী নেই। এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। সেই সাক্ষাৎকারের পর পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারি সাবেক আই.সি.এস. নিয়াজ মোহাম্মদ খান নিজেই উদ্যোগী হয়ে ১৮ নম্বর তোপখানা রোডের লাল বাড়িটা প্রেস ক্লাবের জন্যে বরাদ্দ করলেন। এই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের জন্মের কথা এবং এটাই হচ্ছে উপমহাদেশের প্রথম প্রেস ক্লাব। পরবর্তীকালে জনাব এন.এম.খান ও জনাব খায়রুল কবীরকে ক্লাবের আজীবন সদস্য করা হয়েছে।

দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ ও দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী যথাক্রমে প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলেন। তৎকালীন ইউ.পি.পির ঢাকাস্থ প্রতিনিধি ও আবাসিক সম্পাদক জনাব আবদুল মতিন (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী) হচ্ছেন প্রথম যুগ্ম সম্পাদক আর পি,টি আই-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি পরলোকগত বালান সাহেব ছিলেন প্রথম কোষাধ্যক্ষ। বছরটা ছিল ১৯৫৪ সাল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্লাবের কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে বাজার, রান্না ও ডাইনিং রুমে খাবার পরিবেশনের পুরো দায়িত্বটাই প্রাথমিক পর্যায়ে বালান-দম্পতি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেন। আর যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল মতিন বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে বীমা কোম্পানীর এজেন্টের মতো নিয়মিত যাতায়াত করে ক্লাবের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়েছেন। এ ছাড়া সদস্যের কাছ থেকে মাসিক তিন টাকা চাঁদা আদায়ের দায়িত্বটা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন।

সে আমলে প্রেস ক্লাবকে সদস্যরা তাঁদের দ্বিতীয় বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করতেন। অনেক সদস্যই যখন পেশাগত কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন অন্তত: দিনের কিছুটা সময় তাঁদের সহধর্মিনীরা ক্লাবে সময় কাটাতেন। রবিবারে কিংবা ছুটির দিন সপরিবারে ক্লাবে আসাটা অনেক সদস্যের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বৎসরান্তে ক্লাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সদস্যদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা সানন্দে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি ক্লাবের পক্ষ থেকে পিকনিক-এর পর্যন্ত আয়োজন করা হতো। তবে তখনকার দিনে প্রেস ক্লাবে সদস্যদের সীমিত সংখ্যক

www.pathagar.com

অতিথি ছাড়া অন্যদের যাতায়াতের ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি ছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের নামকরণ হয় জাতীয় প্রেস ক্লাব। যাঁরা এ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন তৎকালীন ক্যালকাটা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ঢাকা প্রতিনিধি জনাব এম.এ.ওহাব, জনাব খায়রুল কবীর (কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর), জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ, এ. কে. এম. আবদুল কাদের, সৈয়দ জাফর আলী, জনাব এম. আর আখতার মুকুল (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'চরমপত্র' খ্যাত) এবং আবদুল মতিন (লণ্ডন প্রবাসী)।

প্রখ্যাত সাংবাদিক কবি ও ছড়াকার ফয়েজ আহমদ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এবং ৯২ (ক) ধারার গভর্নর শাসনের সময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বিদেশে ছিলেন। আর একজন প্রবীণ সাংবাদিক জনাব কে.জি.মুস্তাফা (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত) সে সময় রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রেস ক্লাবের জন্মের সময় যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আবদুল হক ও ফরমান আলী (দু'জনই অবসরপ্রাপ্ত) এখন জান্নাতবাসী।

সুদীর্ঘ তিন যুগ পর প্রৌঢ়ত্বের দ্বার-প্রান্তে এসে এখনও যখন প্রেস ক্লাবে যাই, তখন মনটা ধক্‌ করে উঠে। বহু স্মৃতি-বিজড়িত ক্লাবের সেই লাল বাড়িটা আর নেই। সামনের ছোট বাগানটা, পিছনের সেই সাদা ফুলের গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে অতীতটা যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। সব কিছুই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। কই, এখন তো আমার জীবন সঙ্গিনী আমাকে খুঁজতে আর ক্লাবে আসে না? কই আমাদের সদস্যদের মধ্যে সেই একাত্মতা বোধকে আর খুঁজে পাই না? আঠারো নম্বর তোপখানা রোডের সেই লাল বাড়িটা শাবল খন্তা দিয়ে ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের প্রাণোচ্ছল দিনগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অতীতের স্মৃতি মন্থন করলেই দেখতে পাই এই ক্লাবে কত জ্ঞানী, গুণী আর মনীষীর আগমন হয়েছে। গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর স্বাধিকারের দাবিতে মুখরিত হয়েছে এর প্রাঙ্গণ। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, ষাট দশকের প্রথমার্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে কবি সাহিত্যিক আর সাংবাদিকরা এই প্রেস ক্লাবে জমায়েত হয়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। আর ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল একই আহ্বান-'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'।

মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। আয়ুব শাসনে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা হলে, প্রেস ক্লাবের লাল বাড়িটার সামনে ফেস্টুন হাতে সাংবাদিকদের মিছিলের প্রস্তুতি। সামনে দাঁড়িয়ে উপমহাদেশের প্রবীণতম সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আর আবদুস সালাম। তৎকালীন পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগতের চার দিকপাল।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে পঁচিশে মার্চ সেই ভয়াল রাতে পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবও হামলার হাত থেকে রক্ষা পেল না। ট্যাংকের গোলায় লাল বাড়িটার একাংশ উড়ে গেল।

www.pathagar.com

আবার মেরামতের পর সেই লাল বাড়িটা প্রায় বারো বছর তার অস্তিত্ব বজায় রাখলো। কিন্তু তার পর? আমরা নিজেরাই সেই লাল বাড়িটা ধূলিস্যাৎ করলাম। তৈরি করলাম নতুন ভবন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিরাট ও বিশাল অট্টালিকা। সদস্যদের চোখে-মুখে তারুণ্যের ছাপ আর কর্মে বিপুল উদ্দীপনা।

শুধু অনুরোধ, অতীতের মহান ঐতিহ্য, নীতিবোধ, শ্রদ্ধাশীল আর সহনশীলতার আদর্শকে হারিয়ে যেতে যেন দেয়া না হয়। মনে রাখতে হবে, প্রেস ক্লাবের গঠনতন্ত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন বেশ কিছু উদ্দেশ্য এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। সেই দায়িত্ব পালন করা নিতান্ত অপরিহার্য।

নব পর্যায়ে সকলের যাত্রা হোক শুভ; কর্ম হোক উদ্দীপনামণ্ডিত; গড়ে উঠুক একাত্মবোধ। আজকের দিনে শুধু এটুকুই কামনা।

বি:দ্র: ১৯৭৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রেস ক্লাবের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দি জাতীয় প্রেস ক্লাব নামকরণ করা হয়। পাকিস্তান আমলে যাদের প্রচেষ্টায় এই ক্লাব সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালের ২১ নং সোসাইটি এ্যাক্ট মোতাবেক সমিতি হিসেবে রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো। এঁরা সবাই তৎকালীন প্রেস ক্লাবের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

১. এম এ আজিম (মরহুম)	সভাপতি
২. সৈয়দ নূরুদ্দীন (মরহুম)	সহ-সভাপতি
৩. আবদুল মতিন	সাধারণ সম্পাদক
৪. হাসানউজ্জামান খান	যুগ্ম সম্পাদক
৫. মোঃ মোদাব্বের (মরহুম)	কোষাধ্যক্ষ
৬. এস জি এম বদরুদ্দীন	সদস্য
৭. এ কে এম আবদুল কাদের	সদস্য
৮. এম আর আখতার মুকুল	সদস্য
৯. এস এস আখতার	সদস্য
১০. সালাউদ্দীন মোহাম্মদ	সদস্য
১১. এম আরশাদ হোসেন	সদস্য

*** ১৯৮৪ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের 'একুশে স্মরণে' সংকলনে প্রকাশিত হয় এই লেখাটি। পরে এটি মুদ্রিত হয়েছে লেখকের গ্রন্থ 'চল্লিশ থেকে একাত্তর' এ (সাগর পাবলিশার্স,প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৫)**

লেখক ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র-খ্যাত, জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম কমিটির সদস্য

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সম্পাদকের ভূমিকা

মুজীবুর রহমান খাঁ

'স্বাধীনতা' একটা বিমূর্ত ধারণা বা কনসেপ্ট। বিমূর্ত ধারণার একটা মস্ত গুণ হলো একে যে যেমনভাবে ব্যবহার করতে চায়, তিনি তেমনিভাবে ব্যবহার করা যায়। ধরা-ছোঁয়ার বাস্তব কোনও বস্তু বা ঘটনার সংস্পর্শে এসে এই বিমূর্ত ধারণা মানুষের বোধগম্য বাস্তবের রূপ লাভ করে। যেমন বলা হয় পানির কোনও আকার নেই। এটা যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকার ধারণ করে। সংবাদপত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দু'দশটা ব্যবহার্য বস্তুর মত। তবে এর কারবার পাঠকের মন নিয়ে। অন্নবস্ত্র যেমন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্থূল প্রয়োজন মেটায়, তেমনি সংবাদপত্র যোগায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মনের বা চিন্তার খোরাক। সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় পাঠকের মনের বা চিন্তার স্বাধীনতা, বলার স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকারের দ্যোতক। যে সমাজে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকার যত অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত, সে সমাজ তত সুস্থ ও স্থিতিশীল।

সংবাদপত্র যেহেতু কয়েক ধরনের লোকের মিলিত প্রয়াস, কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও একক সত্তা আছে। এখানে মালিক ও সম্পাদকসহ সাংবাদিকগণ নিজ নিজ গ্রুপের বা ব্যক্তির স্বার্থ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক বিসর্জন দিয়ে একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন।

এই উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অ্যালট্রুইস্টিক' বা উপচিকীর্ষা ধরনের, অর্থাৎ পাঠক নামধারী একধরনের লোক– যাদের কোনও সুনির্দিষ্ট সুসংগঠিত সত্তা নেই– তাদের উপকার করার ইচ্ছা। ব্যাপক অর্থে সমাজ সেবা করা। সর্বোপরি রয়েছে সরকার, আছে তার আইনকানুন, বিধি-বিধান, আজ্ঞা ও প্রজ্ঞা। সংবাদপত্রের মহান কর্তব্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, এই পাঠক সমাজকে পারিপার্শ্বিক বিশ্বে কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করা এবং তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু সে শিক্ষার অর্থ অ-আ-ক-খ শেখানোর মত অক্ষরজ্ঞান দান করা নয়। পাঠক সে শিক্ষালাভ করে ইমিডিয়েট বা আশু অভিজ্ঞতার সীমা পার হয়ে যাতে আরও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন, তার প্রচেষ্টা করা। অর্থাৎ পাঠকের মননশীলতায় ক্রিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যেন তিনি আনক্রিটিক্যালি বা যাচাই না করে কোনও তথ্য বা বক্তব্য গ্রহণ না করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সম্পাদকের ভূমিকা এ থেকে আলাদা করে ভাবা

www.pathagar.com

যায় না।

পাঠকের স্বার্থ রক্ষা করতে আমরা এমন ব্যস্ত, অবশেষে দেখা গেল পাঠক আমাদের কাছে আর কেউ নন। নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থই যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। এমনকি কোনও কোনও দেশে অবলুপ্তি ঘটতেও দেখা গেছে। সাম্প্রতিককালে স্পেন দেশে সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির তরফ থেকে পাঠকের চাহিদা সম্পর্কে এক জরিপ চালানো হয়। তাতে দেখা গেছে, স্পেনের খবরের কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের স্বার্থ এমনভাবে দেখেছেন যে, পাঠক আর কাগজ পড়তে চায় না। ফলে সরকারের মালিকানাধীন ২২টি দৈনিক কাগজ পাঠকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট একটি জরিপ করে দেখেছে, তাতে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। স্থবিরতা আমাদের সংবাদপত্র শিল্পকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথাও অর্থহীন হয়ে পড়ছে, যদি না এই স্থবিরতা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

মালিক যিনি, তিনি মূলধন সংগ্রহ করে একটা কাগজ বের করেন। কাগজ বের করার পেছনে হয়তো তাঁর নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মূলধন খাটিয়েছেন, কাজেই মুনাফা তিনি চান। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। যেমন নয় আর দু'দশটা ব্যবসার ক্ষেত্রে। হতে পারেন তিনি রাজনীতিবিদ। কাজেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি কাগজ বের করছেন। মুনাফা করার কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে মুনাফা যেভাবে আসে কিংবা বেশি করে যেভাবে আসতে পারে, কাগজের নীতি সেভাবেই নির্ধারিত হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মালিক যে ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ করেন, সে ধরনের মতাদর্শের প্রাধান্য যেভাবে বজায় রাখা যায়, সেভাবেই কাগজের নীতি নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক।

এর পর আসে সম্পাদক ও সাংবাদিকের কথা। আগেই বলেছি, সাংবাদিকতা যৌথভাবে কাজ করার একটা চমৎকার ক্ষেত্র। এখানে রিপোর্টার, সহ-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, ফিচার রাইটার এবং পরিশেষে সম্পাদক সকলেই একই উদ্দেশ্যে লেখার কাজ করে থাকেন। কেউ খবর সংগ্রহ করেন, কেউ খবর সম্পাদনা করেন, কেউ দৈনন্দিন ঘটনার উপর সরস-নীরস, ঋজু-তির্যক মন্তব্য লিখে পাঠকের কাছে আলোচ্য ঘটনা বোধগম্য করে তুলে ধরেন। সম্পাদক যিনি, তিনি এর যে কোনও কাজে পারদর্শী। পাঠকের কাছে আধুনিক কাগজের সম্পাদক একজন ভার্সেটাইল জিনিয়াস। সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতির যে কোনও বিষয়ে তাঁর দখল তর্কাতীত।

সম্পাদকের ভূমিকা হচ্ছে খিলানযুক্ত দালানের Key-stone -এর মত। স্থিতি বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী Key-stone যেমন সমগ্র খিলানের ভার বহন করে দালানের স্থিতি বজায় রাখে, সম্পাদকও তেমনি Key-role এর ভূমিকা পালন করে সমগ্র কাগজের স্থিতি বজায় রাখেন। অন্যদিকে তাঁর ভূমিকা Pivot এর মতও বটে। এটা তাঁর গতিশীলতার প্রতীক। নতুন নতুন আইডিয়া বা ভাবধারা গ্রহণ করে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে এগিয়ে যাওয়া হলো তাঁর গতিশীলতা বা ডাইনামিজমের লক্ষণ। সম্পাদকের এই দ্বৈত ভূমিকা কাগজটিকে সচল রাখার

www.pathagar.com

পক্ষে অপরিহার্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেউ যেচে দিয়ে যায় না। এটা অর্জন করতে হয়। সম্পাদকের Pivotal role-এই স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক। সুতরাং কাজের চাপ বা পরিধি অনুসারে তাঁর দায়িত্বও অপরিসীম। এক কথায় সম্পাদক হলেন একজন ইনটেলেকচ্যুয়াল লিডার। তিনি তাঁর সাথী কর্মীদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজের 'ঐহিক' ও 'পারত্রিক' উন্নতি সাধনে ব্যস্ত থাকেন। যে কাগজে তিনি কাজ করেন, কেবল সে কাগজের স্বল্প সংখ্যক কয়েকজন সাংবাদিকেরই যে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, তা নয়। বরং গোটা সমাজের বা দেশের আপামর জনসাধারণের নেতৃত্ব দেন তিনি। আজকে অনেক কাগজেরই মালিক নিজেই সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে এ এক অভিনব ঘটনা। এর আগেও যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি, তা নয়। বরং বিশ্বের আর কোনও দেশে যে এমন ঘটনা নেই তাও বলা যায় না। তবে আগে দেখা গেছে যিনি মালিক সম্পাদক হয়েছিলেন, তিনি মালিক বলেই সম্পাদক হননি বরং সম্পাদক বলেই মালিক হয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা অনেকটা ক্লাসিক্যাল পর্যায়ে ফেলা যায়। সচরাচর ঘটে না। দু'এক ক্ষেত্রে ঘটলেও তা বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ অনেক ব্যাপক এবং বিষয়টি সারা দুনিয়াব্যাপী বিতর্কিত। এই আলোচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পাদকের ভূমিকার কথাটা সম্পর্কিত করে ব্যাপকতা অনেকখানি হ্রাস করা হয়েছে। তবে তাও নয়। আসলে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। সমসাময়িক বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। অর্থাৎ সম্পাদক বা সাংবাদিকের স্বাধীনতা, না মালিকের স্বাধীনতা এ নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধের অন্ত নেই।

অতি সাম্প্রতিককালে বিলাতের লণ্ডন টাইমসের সম্পাদক হ্যারল্ড ইভান্স চাকুরিচ্যুত হলেন, কারণ তিনি মালিক যা চাইলেন তা করতে রাজি হননি। এশিয়ার কোনও কোনও দেশে এ ধরনের ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা বিরল বলেই কি সম্পাদক আর ইনটেলেকচ্যুয়াল লিডার নন? শুধু কি তিনি একজন কলম-পেষা চাকুরে মাত্র?

আমাদের দেশে মরহুম আবদুস সালাম ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন ইনটেলেকচ্যুয়াল লিডার। সম্পাদক যে একজন কলম-পেষা চাকুরে নন, একথা তিনি বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ করে গেছেন। যেখানে অন্যায় অবিচার দেখেছেন, সেখানে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। বিপদ-আপদে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ছিল অদ্ভুত সচেতনতা। দেশ ও সমাজের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজে তিনি ছিলেন আপোসহীন সংগ্রামী।

তাঁর সংগ্রামী চেতনা মুহূর্তের জন্যেও স্তিমিত হয়নি। ১৯৫২ সালে মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে লীগ সরকারের গণবিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয় এবং তাঁর পত্রিকা পাকিস্তান অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ষাট দশকের গোড়ার দিকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে তৎকালীন সরকার প্রেস এ্যাক্ট চালু করলে সারা দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এ সময়ে সম্পাদকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, তা তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, প্রতিবাদ মিছিলে শরীক হয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

স্পষ্টভাষণের মূল্য যে কতখানি দিতে হয়, মরহুম সালাম শেষ বয়সে চাকুরিচ্যুত হয়ে অবর্ণনীয় আর্থিক দুঃখদুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করে ভাবীকালের সাংবাদিকদের কাছে তা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে রেখে গেছেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকারকে সাংবিধানিক প্রশ্নে কিছু জটিলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াসেই 'সুপ্রিম টেস্ট' শিরোনামের লেখাটি তাঁর সম্পাদকীয় জীবনের চূড়ান্ত টেস্ট বলে প্রমাণিত হলো।*

* ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রথম মহাপরিচালক আবদুস সালামের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রবীণ সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ পঠিত মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ।

লেখক ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম কমিটির (১৯৫৪-৫৮) সভাপতি, অধুনালুপ্ত দৈনিক আজাদের সাবেক সম্পাদক

www.pathagar.com

সংবাদপত্র ও সাংবাদিক

সিরাজুদ্দীন হোসেন

কোনও সংবাদপত্রই সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ হইতে পারে না। জনমতের সংগঠক ও জনমতের বাহন হিসাবে পত্রিকাকে যে দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক পত্রিকারই একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকে। এই দৃষ্টিকোণকে কেহ পক্ষপাতিত্বের দোষদুষ্ট বলিয়া মনে করিলে তিনি ভুল করিবেন। ব্যক্তিগত জীবনে কথায়-বার্তায় আলাপে-আলোচনায় সত্যই কি কেহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার দাবি করিতে পারেন? যে কোনও দেশের পত্র-পত্রিকার তুলনামূলক বিচারে দেখা যাইবে একই দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিকোণের মধ্যে কত ব্যবধান।

সংবাদপত্রের একটিই পক্ষ হওয়া উচিত। আর তাহা হইল জনগণের পক্ষ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন, সংকট-সমস্যা আশা-আকাঙ্ক্ষাই সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের পাতায় মূর্ত করিয়া তুলিবেন ইহাই স্বাভাবিক। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাহা কিছু কুৎসিৎ, ক্লেদাক্ত এবং জনস্বার্থ বিরোধী, উহার মূলোৎপাটনে সাংবাদিকরাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবেন, ইহাই তাহাদের নিকট জনগণের প্রত্যাশা। সাংবাদিকরা কখনই হীন স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবেন না এবং ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্ভট মানসিকতা হইতে সদা সর্বদা অত্যন্ত সচেতনভাবে নিজেদেরকে দূরে রাখিবেন, ইহাই সকলের কাম্য। এইসব কারণেই সাংবাদিকতা পেশার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও তাৎপর্যময়। দেশ ও দেশের অবহেলিত, নির্যাতিত এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে সর্বক্ষণ প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় থাকিতে হয় সাংবাদিককে। ভুলিলে চলিবে না, সাংবাদিকের রহিয়াছে দেশ ও জাতির প্রতি অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে তাহাকে যেমন পরিশ্রমী ও নির্ভীক হইতে হয়, তেমনি তাহার থাকিতে হয় দেশের প্রকৃত মালিক যে জনগণ তাহাদের জন্য এক সাগর মমত্ব। পরহিতব্রতী সাংবাদিকতা সাংবাদিককে করে মহান, আর সাংবাদিকের ব্যক্তি স্বার্থমগ্নতা তাহার জন্য বহিয়া আনে জগৎজোড়া ধিক্কার।

অস্বীকার করিবার জো নাই যে, সংবাদপত্রও একটি পণ্য। কিন্তু বাজারের আর দশটি পণ্যের সহিত সংবাদপত্রের রহিয়াছে যোজন যোজন পার্থক্য। সেই কারণে দেশ রাষ্ট্র জনগণ মায় সকলের প্রতিই সংবাদপত্রের থাকিতে হয় এক বিশেষ ধরনের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার সর্বদাই জনকল্যাণকে ঘিরিয়া আবর্তিত হয়। জনগণকে কল্যাণাভিসারী করিয়া তুলিতে এবং তাহাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং উচিত-অনুচিত বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিবার মধ্যেই

www.pathagar.com

সাংবাদিকের সে অঙ্গীকার স্ফূর্তি লাভ করে। ইহার বিপরীত কিছু করিবার অর্থ দাঁড়ায় সংবাদপত্রের বা সাংবাদিকের অপমৃত্যু। মূলতঃ জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে এবং তাহাদের সংগ্রামী চেতনাকে সমুন্নত রাখিতে সহায়তা করিবার মধ্যেই সাংবাদিকতা পেশার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব নিহিত। তাই সময়ের পরোয়া না করিয়া সকল অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে লেখনী চালাইয়া যাওয়াই সাংবাদিকের মহান দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। এইক্ষেত্রে সংবাদপত্র মালিকের নিছক ব্যবসা বুদ্ধি চরিতার্থ করিবার হীন মানসিকতা অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। অন্যথায় সে সংবাদপত্র জনসেবার বাহন না হইয়া সুযোগ সন্ধানী এবং প্রকারান্তরে গণবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য।

পত্রিকার লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের আপামর জনসাধারণ। জনসাধারণের স্বার্থ জনসাধারণই ভাল বুঝে। এই অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষ হইতে যখন কোনও অভিযোগ উঠে, সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সরকারী মহলের দ্বারস্থ হইয়া এইদেশের কোনও সাংবাদিক সমর্থনসূচক কোনও জবাব পাইয়াছেন এমন নজির নাই। তাই আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বা অভাব-অভিযোগের তদন্ত করিয়া সরকারী প্রেসনোটে কোনও কালে তাহার সত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে এমন নজির কেহ দিতে পারেন কি?

আমাদের দেশে সংবাদপত্রগুলি ঠিকই নীতিমালা মানিয়া চলে। কিন্তু প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ সরকার নিজেই তাহার ইজ্জত দেন না। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর কর্তৃক দৈনিক আজাদ এর কৈফিয়ৎ তলবের বিষয়টির দিকে তাকাইলেই এর সত্যতার প্রমাণ মিলিবে। এইক্ষেত্রে নীতিমালার বিধান অনুযায়ী 'কোর্ট অব অনারে'র দ্বারস্থ না হইয়া সরকার সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হইলেন কি করিয়া, এই প্রশ্নের জবাব দিবে কে? কথায় কথায় সংবাদপত্র বিশেষের প্রকাশনা বন্ধ করিতে এবং এই সংবাদও যাহাতে দেশবাসীর গোচরীভূত না হয়, তজ্জন্য সরকার নানা নির্দেশ জারি করিয়া থাকেন। সংবাদপত্র জগতে এই ধরনের কণ্ঠরোধী ব্যবস্থার দ্বিতীয় নজির কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই। সংবাদপত্রের যেই ভূমিকা হইলে পাঠকবর্গ খুশী হইতেন, সেই ভূমিকা কেবল সেই দেশেই সম্ভব, যেই দেশের সমাজ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমাদের সমাজব্যবস্থা যতদিন না সেই পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে, ততদিন পাঠকমহলের পুরা-পুরি মনস্তুষ্টি সাধন সম্ভবপর নহে। বিরোধী মতাবলম্বী কোনও পত্রিকার কোনও সমালোচনাকে গঠনমূলক বলিয়া স্বীকার করিবার মত মানসিকতা এইদেশের ক্ষমতাসীনদের আছে বলিয়া দাবি করা চলে কি? গঠনমূলক সমালোচনার বিপরীতটি হইল ধ্বংসাত্মক সমালোচনা। শেষোক্ত পর্যায়ের সমালোচনা নিঃসন্দেহে আইনের আওতায় পড়ে। এতদসত্ত্বেও কোনও কিছু প্রকাশনার ব্যাপারে আইনের আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পর্যায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই নহে যে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের যাহা মনঃপূত নহে, আইনের দৃষ্টিতে তাহা আপত্তিকর না হইলেও ক্ষমতাসীনদের মতে তাহাই 'আপত্তিকর' বা 'ধ্বংসাত্মক' বলিয়া গণ্য করা হয়? এমত পরিবেশে এই দেশের পত্রিকা জগতকে বাধামুক্ত বলিয়া দাবি করা চলে কিভাবে?

কোনও কোনও সরকারী আমলা এমনও অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, পত্রিকা-প্রতিনিধিদের লেখার মারপ্যাঁচে এক মোকামের সরকারী অফিসারকে রাতারাতি অন্য মোকামে বদলি হইতে

www.pathagar.com

হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তাহাই যদি সত্য হইবে, তবে যশোহর জেলার জনৈক সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বারংবার গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও শহরে একাধিক অট্টালিকা ও ডজনখানেক দোকান-পাটের মালিক বনিবার তথ্য প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দীর্ঘ আট বৎসর যাবৎ তিনি ঐ জেলার স্কন্ধে চাপিয়া বহাল তবিয়তে সরকারী চাকরি ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত রহিয়াছেন। কিন্তু কিভাবে?
অতএব, নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য বেচারা সাংবাদিকদের উপর দোষ চাপাইয়া লাভ কী!

জনগণের সত্যিকারের খেদমত করিতে হইলে সরকারী-বেসরকারী আমলাদের উচিত নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা অর্জন করা। অন্যদিকে চারিত্রিক সততাই হইল সাংবাদিকদের একমাত্র অবলম্বন। এই অবলম্বন হাতছাড়া করিবার অর্থ সাংবাদিকের মৃত্যু। ব্যক্তিগত স্বার্থে বা আক্রোশে কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা আর 'ব্ল্যাকমেইলিং'-এ হাত পাকানো একই কথা। এই ধরনের মানসিকতা হইতে সাংবাদিকদের সর্বক্ষণ দূরে থাকিতে হইবে। কোনও পত্রিকা প্রতিনিধির মাঝে এই ধরনের মানসিকতার সন্ধান পাইলে সরকারী ও বেসরকারী মহলকে অবশ্যই তাহার ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে এবং প্রয়োজনে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

লেখক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। তিনি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক বার্তা ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সিনিয়র সভাপতি।

www.pathagar.com

প্রেস ক্লাবের গোড়ার কথা

খায়রুল কবীর

কেউ একা কিংবা অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে যখনি কোনও প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন গড়ে তুলবার কাজে হাত লাগিয়েছেন তখন জাঁকজমকপূর্ণ কোনও কিছু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। বাহ্যত তাই দেখা যায়। কিন্তু এর ভেতরের দিকটায় তাকালে দেখা যাবে বাইরের এই দীনহীন অবস্থার সঙ্গে ভেতরের অবস্থার কোনও মিল নেই। ভেতরের অবস্থাটা নানা বর্ণিল ও জাঁকজমকপূর্ণ স্বপ্নপুরী। বাইরের অবস্থা এবং ভেতরের অবস্থার মধ্যে যতো অমিলই থাকুক না কেন, আসলে দুই ভিন্ন অবস্থাকে একই নামে ডাকা যায়। বাইরের দীনতাটাও বাস্তব, আবার ভেতরের স্বপ্নসমৃদ্ধ স্বপ্নগুলোও বাস্তব।

আজকালের বিশাল, বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী জাতীয় প্রেস ক্লাব নামক প্রতিষ্ঠানটির একেবারে অনিশ্চয়তাপূর্ণ শুরু থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও কয়েকজনের মত আমিও জড়িত ছিলাম।

অতীত মাত্রই কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন ব্যাপার। যে কারণে বর্তমানের অনেক মানুষই তাকে পরিষ্কারভাবে দেখার সুযোগ পান না। কিন্তু গরজ বড়ো বালাই। আমরা জানি যে, অতীত সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বর্তমানের ভিত্তিটাও হয় নড়বড়ে। প্রেস ক্লাবের অতীত বা পুরনো দিনের কথা বলতে আমি আমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবো। যাতে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন, তারা যেন এই প্রতিষ্ঠানের অতীত সম্পর্কেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা ধারণা পেতে পারেন। আমার এই ব্যক্তিগত চেষ্টার সাফল্য অসাফল্য কি হবে, সে সে সম্পর্কে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনও কারণ দেখিনে। এখনকার মানুষ বুদ্ধিতে তিরিশ কি চল্লিশ বছর আগেকার মানুষদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমার কথা যতোই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, তা থেকে নিজেদের মেধা বলে এখনকার মানুষ প্রেস ক্লাবের গোড়ার কথাগুলো ঠিকই বুঝে নেবেন। এ ভরসা আমার আছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হয়। আমার মতো সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বিভাগোত্তরকালে যে সব বাঙালি মুসলমান বেছে নিয়েছিলেন, তখনকার দিনে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সুযোগও তেমন ছিল না। এদের অনেকেই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। কেউ সাংবাদিকতায়, কেউ অন্যত্র চাকরি নেন। এই সময়ে যতদূর মনে আছে ঢাকায় ভারতীয়

www.pathagar.com

সাংবাদিক বালান, এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া নামক নিউজ এজেন্সির হয়ে ঢাকায় আসেন। বিলেতি দৈনিক ডেইলি মেইল-এর একজন প্রতিনিধিও ছিলেন। আমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এবং অল্প সময়ে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। নানা আড্ডায় এই পেশার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথাবার্তা হতো। এমনি কোনও এক আড্ডাতে এখানকার সাংবাদিকতার উন্নতির জন্যে একটি প্রেস ক্লাব দরকার, একথা বলেছিলেন ডেইলি মেইলের প্রতিনিধি ওই ইংরেজ সাংবাদিক। তার নাম আজ আর মনে নেই। প্রেস ক্লাব সংক্রান্ত কথাটা ওঠে ১৯৪৮ সনের প্রথম দিকে। তখন থেকেই যে ক'জন সাংবাদিক প্রেস ক্লাবের ধারণাটিকে বাস্তবে রূপদানের জন্যে ভাবতে থাকেন, তারা হচ্ছেন মি. বালান, ডেইলি মেইলের প্রতিনিধি এবং সৈয়দ নূরুদ্দিন। আমি তো ছিলামই। বছর দুই পরে আরও কিছু সাংবাদিক প্রেস ক্লাব সম্পর্কিত আলাপ আলোচনায় যোগ দেন। তাদের মধ্যে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টার অব ইনফরমেশন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন এং অল্প কিছুদিন পরে বোধহয়, ১৯৫০ সালে অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রেস ক্লাব সম্পর্কিত ধারণাটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্রমশ পরিষ্কার হতে থাকে। এসব আলোচনা অধিকাংশ সময় আমার বাসায় হতো। আমি তখন টিকাটুলির কাছে নাহা ম্যানসন নামক একটি ভাড়াটে বাড়িতে থাকতাম। আমাদের মধ্যে নানা কিছু আলাপ-আলোচনার সময় অনিবার্যভাবে প্রেস ক্লাব স্থাপনের কথাও এসে যেতো। কোনও কোনও আলোচনার সভায় কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আবদুল ওয়াহাবও যোগ দিতেন। পেশার বাইরের অনেক লোক এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তারা সরকারী চাকরি করতেন কিংবা কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী হিসেবে সমাজে প্রভাবশালী ছিলেন। ভাসা ভাসা স্বপ্নের মতো ধারণাটিকে এভাবে লালন পালন করার পর ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টিকে তোলা হয়েছিল। ওই সম্মেলন হয়েছিল কার্জন হলে। প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার ধারণা সাংবাদিক সম্মেলনে সকলেরই সমর্থন পেয়েছিল, ঠিক তা নয়। অল্প বিস্তর উদাসীনতা ও বিরোধিতাও ছিল কোনও কোনও মহল থেকে। যেমন দৈনিক আজাদ কর্তৃপক্ষ এবং তখনকার চীফ সেক্রেটারী আজিজ মোহাম্মদ প্রেস ক্লাব সংক্রান্ত কথাবার্তা পছন্দ করতেন না।

১৯৫৪ সালে আমি তথ্য মন্ত্রণালয়ে স্পেশাল অফিসার হিসেবে যোগদান করলেও প্রেস ক্লাবের ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল আগের মতোই। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারার অধীনে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রায় সামরিক শাসন। সব সামরিক শাসন বা গোত্রছাড়া কঠোর শাসন যখন প্রবর্তিত হয়, তার শুরুর দিকটাতে দুই রকম আধিক্য দেখা যায়– কঠোরতার আধিক্য এবং উদারতার আধিক্য। প্রেস ক্লাবের জন্যে শহরের কেন্দ্রস্থলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি মনোরম বাড়ি বরাদ্দ করা হয় সম্ভবত শেষোক্ত কারণে। কারণ যাই হোক, ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম প্রেস ক্লাব আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়ে গেল ঢাকাতে। এ কাজে তখনকার চীফ সেক্রেটারী এন এম খান সাহায্য সহযোগিতা করেন। ওই সাহায্য সহযোগিতাটুকু দরকার ছিল, যা আগের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। বাড়ি হয়ে গেল। আসবাবপত্র ছিল না। কিছু আমার বাড়ি থেকে, কিছু

www.pathagar.com

নাজির আহমদের বাড়ি থেকে এবং কিছু সরকারি গুদাম থেকে সংগ্রহ করা হলো। প্রথম থেকেই প্রেস ক্লাব সম্পর্কিত উদ্যোগের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের পাঁচ ছয়জনের কাছ থেকে এক হাজার টাকার ব্যক্তিগত দান দিয়ে প্রেস ক্লাবের অতি নগণ্য মূলধন গড়া হয়।

যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেস ক্লাব করা হয় সেগুলো হচ্ছে:
১. ছোট বড়ো দেশী বিদেশী কর্মরত সাংবাদিকদের জন্যে একটি মেলামেশার জায়গা করা, যাতে পেশাগত নানা চিন্তার আদান প্রদানের মাধ্যমে সাংবাদিকতার মান উন্নত করা যায়।
২. ওই সময়কার সাংবাদিকদের সামাজিক প্রভাব তো দূরের কথা, এই পেশায় নিয়োজিত একজন ধর্তব্য কিনা তা নিয়ে সমাজে, পারিবারিক পর্যায়ে ও সরকারী মহলে সংশয় সন্দেহ ছিল। একটি প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অসুবিধাগুলো দূর করা সম্ভব, এ ধারণাও উদ্যোক্তা ও সদস্যদের মনে ছিল।
৩. ভাব ও চিন্তার আদান প্রদান কেবলমাত্র সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে আমাদের কোনও গোঁড়ামি ছিল না। যে কারণে সাংবাদিকতার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত পেশার লোকজন, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট লোকজনদের জন্যেও প্রেস ক্লাবের দরোজা খোলা রাখা হয়।
৪. প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবার পর বিদেশী পত্র-পত্রিকা এবং পেশা সংক্রান্ত ও অন্যান্য ধরনের বই পুস্তক পাওয়া সহজ হবে এবং সামগ্রিকভাবে তা থেকে পেশায় নিয়োজিত লোকজন উপকৃত হবে। তাছাড়া এই ধরনের একটি জায়গা হয়ে গেলে অনেকে প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি করতে পারবেন। যার ফলে সংবাদের উৎস সাধারণভাবে সকলের জন্যে এবং প্রায় ঘরে বসেই নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। এমন চিন্তাও প্রতিষ্ঠালগ্নে আমাদের মনে ছিল।

সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করাও আমাদের চিন্তায় ছিল, যার প্রতিফলন প্রেস ক্লাব স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেছে। আত্মরক্ষা, জ্ঞানলাভ, বিনোদন, সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি এসব কিছু আমাদের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের মনে ছিল। ছোটখাটো একটা ক্যান্টিন না হলে এতো সব আয়োজন যে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, সে ধারণাটাও একই সঙ্গে কাজ করে এবং ক্যান্টিনের নানা কিছু– থালা, চায়ের কাপ, পেয়ালা ইত্যাদি প্রথম দিকে ধার করেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে এ পি আই এর মি. বালান খুবই খেটেছিলেন, মনে আছে। প্রথম দিকে বালান দম্পতি ক্যান্টিন চালিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হিসেবে আমি গর্ব বোধ করি, যখন দেখি প্রেস ক্লাব বিকশিত হতে হতে এখন দেশের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং এই বিকাশের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো সাংবাদিকগণও দেশের গণ্যমান্য লোক হিসেবে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। লেখা স্মৃতিনির্ভর বলে ভুলত্রুটি অমার্জনীয় বিবেচিত হবে না আশা করি।

** খায়রুল কবীর ছিলেন দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও ক্লাবের আজীবন সদস্য*

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ও প্রতিবাদের কেন্দ্র প্রেস ক্লাব

আহমেদ হুমায়ূন

পয়লা কবে প্রেস ক্লাবে গিয়েছিলাম? সে অনেক বছর আগেকার কথা। সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেবারও আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকতে দুয়েকবার ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে প্রেস ক্লাবে গেছি। কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে প্রেস ক্লাবের প্রাঙ্গণে এবং প্রেস ক্লাবের ভবনে পা রাখার সে এক ভিন্ন আনন্দ, ভিন্ন শিহরন, ভিন্ন উল্লাসের ব্যাপার। প্রেস ক্লাবকে সমীহ করে চলতাম। জনময়তা থেকে চিরকাল আমি দূরেই থেকেছি, আমার মনও ক্লাবমুখী নয়। কিন্তু সাংবাদিকতায় যোগ দেবার পর একটা সময় আমি নিয়মিত প্রেস ক্লাবে যেতাম। যদিও পেশার যে শাখায় আমার জীবনের দীর্ঘতম সময় কেটেছে, সে বিভাগের একজন সাংবাদিকের পক্ষে রোজ প্রেস ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ অনিবার্য বা অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু বিদেশী সংবাদপত্র পড়ার লোভে, দূর থেকে মহীরুহ সাংবাদিকদের সান্নিধ্যের আশায়, কখনও বা তাজা খবর পাওয়ার জন্যে, দিকপালদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শোনার জন্যে এক সময় নিয়মিতই প্রেস ক্লাবে যেতাম। সে সময়টাতে কখনও কখনও, আবার বিশেষ উপলক্ষে প্রেস ক্লাবে আসতেন শ্রদ্ধেয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম সাহেব, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। আমার সমসাময়িক সাংবাদিক বন্ধুরা তো ছিলেনই। প্রেস ক্লাবে না গেলে যেন পেশাগত পরিচয়ই সম্পূর্ণতা পেত না। এক সময় সাংবাদিক ইউনিয়নের কাজে প্রেস ক্লাবে যেতেই হতো। কারণ, সাংবাদিক ইউনিয়নের অফিস প্রেস ক্লাবেই অধিষ্ঠিত ছিল।

আমি কবে প্রথম প্রেস ক্লাবে গিয়েছিলাম, সে তথ্য অবশ্যই এখানে অবান্তর। তবে একজন তরুণ সাংবাদিকের কাছে প্রেস ক্লাবে যাওয়া রীতিমত একটা ঘটনা ছিল। আজও সম্ভবত তাই। দীর্ঘদিন প্রেস ক্লাবে যাই না। তাই এখনকার কথা বলতে পারি না। তবে পেশাগত দাবিতেই রিপোর্টার,ফটো-সাংবাদিকদের প্রেস ক্লাবে যেতে হয়, অন্যান্য শাখার সাংবাদিকরাও প্রেস ক্লাবে গেলে ঘটনার তরঙ্গ ও প্রবাহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিবিড় থাকে।

আগেকার প্রেস ক্লাবের সেই লাল দালান আর নেই, সামনে বাঁশের বেড়া দেয়া বাগানটিও সম্ভবত আরও সাজানো রূপে অবস্থান করছে, বাগানের কামিনী ফুল গাছগুলো আছে কিনা খেয়াল করিনি। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সেই লাল ইটের দালানটি না থাকলেও এখন প্রেস ক্লাব এক বিশাল ভবনে অবস্থিত। সেখানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সুযোগ গত তিন দশকের তুলনায় অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। যথারীতি প্রেস ক্লাবেও কম্পিউটার যুগের তরঙ্গ এসে

www.pathagar.com

পৌঁছেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা চমৎকারভাবে বিকশিত হচ্ছে।

প্রেস ক্লাবের কোনও লাগসই বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পেলাম না। সত্যি বলতে কি, প্রেস ক্লাবই সাংবাদিকদের সম্মিলন স্থান, প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের স্থান। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাব তার চাইতেও বেশি কিছু। বলা যায়, শাদামাঠা পেশাগত পরিচয়ের বাইরেও এর একটা চতুর্থ মাত্রা আছে -ফোর্থ ডায়মেনশান। অভিধানে দেখলাম, ক্লাব শব্দের একটি অর্থ দেয়া আছে 'এ গ্রুপ অব পিপল এসোসিয়েটেড ফর কমন পারপাস।' এই 'কমন পারপাস' বা অভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবকে আর সব ক্লাব বা সংগঠন থেকে ভিন্নতা দিয়েছে, ব্যাপ্তি দিয়েছে, একটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। জাতীয় জীবনের এবং সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে প্রেস ক্লাবের ভূমিকা ঐতিহাসিক।

পেশার বাইরের মানুষের কাছে সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ইউনিয়ন বলতে গেলে সমার্থক শব্দ। এতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। সাংবাদিকদের সম্মিলন আর কর্মক্ষেত্র হিসেবে মানুষ প্রেস ক্লাবকেই চেনে। আমার দৃষ্টিতে ও বিচারে জাতীয় প্রেস ক্লাব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। সাংবাদিকদের এই অভিন্ন লক্ষ্য বা কমন পারপাসই প্রেস ক্লাবকে একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। প্রেস ক্লাব নিছক গল্পগুজব বা আড্ডার জায়গা নয়।

আমি এক সময় সাংবাদিক ইউনিয়নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিলাম। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি হিসেবে বলতে পারি, সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সাংবাদিক ইউনিয়ন ঐতিহাসিক এবং গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। সে অহঙ্কার সাংবাদিক ইউনিয়ন অবশ্যই করতে পারে। পেশার মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সাংবাদিক ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তবে জনগণ চেনে 'প্রেস ক্লাব' –প্রেস ক্লাব যেন প্রতিবাদের কেন্দ্র, নালিশের কেন্দ্র, ক্ষোভ প্রকাশের ঠাঁই, হতাশ মানুষের কাছে আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে প্রেস ক্লাবে কত যে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিক ও অন্যান্য সংবাদপত্রসেবীর কত যে মিছিল রাস্তায় বেরিয়েছে, তার হিসেব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অবশ্যই আছে, কিন্তু কোনও গবেষকের কাছে সম্ভবত নেই। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জনে প্রেস ক্লাবের ভূমিকা অম্লান হয়ে থাকবে, যদিও আক্ষরিক অর্থে প্রেস ক্লাবের সে ভূমিকা পালন করার কথা নয়। তবে জাতীয় প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের ভূমিকা পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। সাংবাদিকতা পেশার গুরুত্ব, মর্যাদা এবং সামাজিক অভিঘাতই সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান প্রেস ক্লাবকে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

আজকাল প্রেস ক্লাবের সামনে নিত্য সভা এবং প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষুব্ধ মানুষ অনশন করে, বিক্ষুব্ধ মানুষ মিছিল নিয়ে প্রেস ক্লাবে আসে-ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের সময় দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সাংবাদিক ইউনিয়নের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্যে প্রেস ক্লাবে এসেছে। শুধু সংবাদপত্রে ছবি ও সংবাদ পাঠানোর জন্যে

www.pathagar.com

নয়, সত্যভাবে, সুন্দরভাবে প্রতিটি সংবাদপত্র যাতে বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সংবাদ ছাপাতে পারে, সে জন্যেও প্রেস ক্লাবের সামনে সভা-মিছিল, সমাবেশ, অনশন হয়। দেশের মানুষ সাংবাদিক সমাজকে সুগভীর মর্যাদার চোখে দেখেন। তারা মনে করেন, বেদনা প্রকাশের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেলেও, বঞ্চিত মানুষের হয়ে কথা বলার জন্যে সাংবাদিকরা আছে। এই সম্মানের মর্যাদা রক্ষায় সাংবাদিক সমাজ সচেতন এবং তাদের সংগ্রামের সর্ব পর্যায়ে কাজ করে এসেছে।

ভাবতে ভালো লাগে, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে সাংবাদিক সমাজ উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করেছেন এবং এ বিজয়কে ব্যাপ্ত এবং স্থায়ী করার দায়িত্ব তাদের সামনে।

অনেকে বলেন এবং বিশ্বাসও করেন যে, সাংবাদিকতা নামক পেশার গ্ল্যামার বা চটক অনেককেই এ পেশার দিকে টেনে আনে। আমি নিজে তা মনে করি না। একথা ঠিক যে, সাংবাদিকতা একটি ভিন্ন ধর্মী পেশা। সমাজ পরিবর্তন এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিকার করার ক্ষমতা সাংবাদিকতার পেশাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা দিয়েছে! আমার ভাবতে আরও ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা পুরুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'বালক', 'সাধনা', 'ভারতী', 'হিতবাদী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন এবং সমাজ পরিবর্তনের সপক্ষে তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্পণ' কাগজটির সম্পাদনাও করেছিলেন। তাঁর 'নষ্টনীড়' গল্পে একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত বেদনা যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা মর্মস্পর্শী। নজরুল ধূমকেতু, নবযুগ, লাঙল, গণবাণী, নওরোজ, সেবক, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন- কোনও কোনওটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' প্রকাশের 'অপরাধে' নজরুল ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সাহসী সাংবাদিকতার দায়ে সে যুগে নজরুলই সম্ভবত প্রথম লেখার জন্যে কারাবরণ করেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। আমার মূল বক্তব্য, জাতীয় প্রেস ক্লাব একটি ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, স্বাধীনতা হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রাণ, সংবাদপত্রের জীয়নকাঠি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে আমার বারংবার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যকাহিনীতে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি ঃ "নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন/ নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে/গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে/ নিত্য বিষাক্ত করি রাখে চিত্রতল/ রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল/নিন্দাশ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে/ নিঃশব্দে আপনশক্তি বৃদ্ধি করিবারে/ গোপন হৃদয় দুর্গে।" দুর্যোধন যখন বলেছিলেন, "নিন্দা! আর নাহি ডরি।/ নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি/নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী/স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ় বলে চাপি/ মোর পদপীঠ তলে।" তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র চক্ষুষ্মান দুর্যোধনকে উল্লিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি-ই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে সার কথা। এখানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রই চক্ষুষ্মান, আর চক্ষুষ্মান

www.pathagar.com

দুর্যোধনই অন্ধ।

যত দিন গেছে, গণতন্ত্র এবং সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরতর বিশ্লেষণের অবকাশ আছে, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিতর্কের সুযোগ নেই। স্বাধীনতা, সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের প্রাণ এবং স্বাধীন সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা জাতীয় প্রেস ক্লাবের জীয়নকাঠি, গৌরবের পতাকা।*

*জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংকলনে এ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক ছিলেন দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও বিএফইউজে'র সভাপতি

www.pathagar.com

মনে মনে

সৈয়দ নূরুদ্দিন

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, লিখবো না। ভেবেছিলাম, কথাটা শুনে 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদকের মুখখানা ঠিক আনন্দে উদ্ভাসিত না হলেও তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ বা ছাপ কোথাও না দেখে একটু ভাবিত হতে হলো। মনে হলো, আমার কাছে লেখা চাওয়ার পিছনে ঠিক পাতা ভরাবার আগ্রহই ছিল না। আমাকে এই ছেলেটি সম্পর্কে মনে হয় আরও ভাবতে হবে। নিজ বয়ঃগোষ্ঠীর সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্যটা শুধু চুল-গোঁফ-দাড়িতেই নয়, বোধহয় সেটা আরও গভীরে, মনোজগতে। হয়তো। এক নজরেই নাড়ি নক্ষত্র টেনে বের করবো তেমন অসাধ্য সাধনে পটু ব্যক্তি আমি নই। যাই হোক, আমার সিদ্ধান্তটা আর টিকলো না। এতে সাহিত্য-সম্পাদক হয়তো অবাক হলেন, আমি হইনি। স্থিতধী, স্থিরসংকল্প ইত্যাদি গালভরা ভীতি উদ্রেককারী সব শব্দ আমার কাছে হাঁসের পিঠে জলের ফোঁটার বেশি কিছু নয়। এগুলোকে অহরহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে এখন রীতিমত সিদ্ধি অর্জন করেছি।

লক্ষ্য করছি মওকা-বেমওকা, এমনকি আটপৌরে আলাপের মধ্যেও, অনীহা শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। শুনে বহুবার শিহরিত হয়েছি, পুলকে নয়, বিতৃষ্ণায়। কাজেই লাগসই কোথাও শব্দটির ব্যবহার আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারিনি। আধুনিক হতে কে না চায়? তাই মনে একটা খত সর্বদাই রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে স্মৃতি রোমন্থনে আমার যে অনিচ্ছা, সেটা অনীহা বৈ আর কিছু নয়। স্মৃতি রোমন্থনে আমার যে আপত্তি সেটা গোরুর সঙ্গে সম্বন্ধপাতের আশঙ্কার দরুন, এটা অশ্রদ্ধেয়। স্মৃতির মধ্যে যে একটা ভ্যাপসা, স্যাঁতসেঁতে ভাব, চোখে-জল আনা জাতীয় বস্তু রয়েছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে। যদিও আলো-হাওয়া প্রবেশ করতে পারে, মনটা যদিও তখন শুকনো খটখটে হয়, সচল হয়, তাহলে লোকে উপন্যাস, দর্শনে ছোট গল্প, অন্ততঃ কবিতা লিখবে, স্মৃতির জাবর কাটবে কেন? তাছাড়া কোন শ্যামা কবে হেসেছিল আর কোন শ্যামা কবে কেশেছিল এগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যে যে সুড়সুড়ি থাকলেও সুরুচি নেই, এটা স্বীকার করে নিতে দোষ কোথায়? ব্লুমসবেরী জোড়াসাঁকোর ধারে তো আর পথে-ঘাটে পড়ে নেই। লেনাড ও ভার্জিনিয়া উলফ, খেল, লর্ড কেইনস, ষ্ট্রাচি এরা সবাই এতো বড় মাপের স্বনির্ভর মানুষ যে, খড়-বাঁখারি-মাটি দিয়ে এঁদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় না।

নিজেদের পায়েই এদের যথেষ্ট বল, স্মৃতিচারীর কল্পনার রথে আরোহণ করার এঁদের কোনও

www.pathagar.com

আবশ্যকতা নেই। আর জোড়াসাঁকো? সেই গন্ধর্বলোকের যাঁরা অধিবাসী ছিলেন, তাঁদের স্বরূপ শুধু নিজেদের কাছেই প্রকাশ পেতো। কারণ, সেকালে ঐ পরিবারের বাইরে দৃষ্টির তেমন ব্যাপ্তি কিংবা গভীরতা কোথায় ছিল? তাই স্মৃতিচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং এঁরা না লিখলে আর কে জীবন স্মৃতি বা জোড়াসাঁকোর ধারে লিখতে পারতো? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল যুগের যে ফানুসটি আকাশে উড়িয়েছেন, তাতে গ্যাসের আধিক্য এতো যে, পড়তে পড়তে ভয় হয় কখন ফাটবে!

সংবাদ তিরিশ বছরে পা দিচ্ছে। কথাটা কানে যেতেই একটা আশীর্বাদ ঠোঁটের গোড়ায় এসে গিয়েছিল, আহা বেঁচে বর্তে থাক। পরক্ষণেই মনে হলো, এ আশীর্বাদ সংবাদ-এর জন্যে নিতান্ত আবশ্যক। এর পরিচালক ও কর্মীগণ এ আশীর্বাদই বোধহয় তাঁদের শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কামনা করবেন। জন্মাবধি 'সংসার' ছিল রোগাপটকা, বাঁচে-কি-বাঁচে না এমন একটা উদ্বেগ নিয়ে এর শৈশব-কৈশোর কেটেছে। সে কালে কতবার যে পুলিশের হামলায় 'সংবাদ' তছনছ হয়ে গেছে, এর কত কর্মী যে জেল আর সংবাদ, সংবাদ আর জেল করেছেন সে কথা আজ আর ক'জনের মনে আছে? সেকালে দেখেছি বহুদিন পর জেল থেকে বেরিয়ে যাদের যাওয়ার জায়গা কোথাও থাকতো না, তারা জেলগেট থেকে সোজা সংবাদেই চলে আসতেন। এতগুলো অতিথি আকস্মিক এসে পড়লে সংবাদের স্বাভাবিক কাজের অসুবিধা হতো নিশ্চয়। কিন্তু সে কথা না গৃহকর্তা না অতিথি, কারও মনে আসেনি। কারণ, এই সাময়িক আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। দেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সংবাদ এতটাই একাত্ম হতে পেরেছিল। বারবার পুলিশের পদধূলিতে 'সংবাদ' বহু গুণ অর্জন করেছে।

আদর্শের জন্যে চরম মূল্য তাকে দিতে হলো ১৯৭১-এর মার্চে। সংবাদের মেশিনপত্র, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হলো। সে আগুনে আত্মাহুতি দিলেন সংবাদের দীর্ঘদিনের কর্মী শহীদ সাবের। কবি-গাল্পিক-সাংবাদিক। জেল-যন্ত্রণা ভুগে তাঁর মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটেছিল। সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু রাত হলে চলে আসতেন সংবাদে, পাখি যেমন দূর-দূরান্তর থেকে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে। সব স্মৃতি লুপ্ত হলেও কোনও দিন তিনি বিস্মৃত হননি কোথায় তাঁর আশ্রয়স্থান। সংবাদ এবং শহীদ সাবের আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক একটি প্রতীক। শত্রু কবলিত দেশে সংবাদ আর বেরোয়নি। কোনও প্রলোভন বা ভীতিতে সে টলেনি। এই যে মৌনতা, এর চাইতে সোচ্চার প্রতিবাদ আর কি হতে পারে? আমরা অনেকেই তখন সংবাদে নেই। কিন্তু পোড়া বাড়িটার পাশ দিয়ে যদি কখনও গিয়েছি, মনটা হাহাকার করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবাদ আবার বেরুলো আগুনে পুড়ে, শুচিশুভ্র হয়ে, ছাইয়ের গাদা থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো। কিন্তু তখন আর শহীদুল্লা কায়সার বেঁচে নেই, তাকে পাকিস্তানী চরেরা হত্যা করেছে। শহীদুল্লা কায়সার সংবাদের জন্যে কি ছিলেন সে কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে আমি হারালাম আমার এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সে শোক আমার ব্যক্তিগত। নতুন অবস্থায় সংবাদ আবার হলো একটা নতুন প্রতীক। কিন্তু স্বাধীন দেশেও সংবাদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে নিরলস দেশসেবার চরম পুরস্কার সে পেল। সরকারী আদেশে সংবাদের কণ্ঠ চিরদিনের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু

www.pathagar.com

অশেষ সৌভাগ্য আমাদের, এদেশে কোনও কিছুই চিরদিনের জন্যে হয় না।

'সংবাদ' পরিচালনার একটা প্যাটার্ন গড়ে গিয়েছিলেন খায়রুল কবীর। তিনি ছিলেন সংবাদের প্রথম সম্পাদক। সাংবাদিকতা ছেড়ে নানা চড়াই-উৎরাই ঘুরে তিনি এখন ব্যাংকের বড় কর্তা। আজ তিনি ভিন্ন গোষ্ঠী। অতএব, তাঁর সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ অন্যায় বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার মনে পড়ছে সংবাদ-এর প্রতিষ্ঠা দিনে তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, মত বা দৃষ্টিকোণ নির্বিশেষে খবর ছাপাই সংবাদের লক্ষ্য। পত্রিকাটির একটা নিজস্ব মত থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা তার সংবাদ পরিবেশন কোনওক্রমেই প্রভাবান্বিত করবে না। খায়রুল কবীরের বয়স তখন কম, সাতাশ-আটাশ বছর হবে কি হবে না। সে বয়সে ওরকম একটা আদর্শবাদ শুধু সম্ভব নয়, কাম্য। খায়রুল কবীরের সে আদর্শবাদ যে সংবাদ সর্বদা রক্ষা করেছে, তা বলা চলে না। তবে চেষ্টা করেছে এটা জানি। মনে হয় নানা উত্থান-পতন নানা বাঁক-মোড় ঘুরে সংবাদ যেন আবার স্বস্থানে অর্থাৎ নিরপেক্ষতায় ফিরে আসছে। অন্ততঃ খবরের দিকটায়। অবশ্য বলা যায়, নিরপেক্ষতাও নিতান্ত আপেক্ষিক। অনেকে বলবেন, এটা একটা ছেঁদো কথা, যে নিরপেক্ষ সেও তো একটা পক্ষ। এসব চুলচেরা বিচারে না বসে, বলা যায় স্থূল পক্ষাবলম্বন সংবাদ অন্ততঃ সংবাদ পরিবেশনে করে না। আর একটা কাজ খায়রুল কবীর করেছিলেন এবং সে কাজে তিনি যে পটুত্ব এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। তাঁর অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা ছিল এবং হৃদয়বান নেতৃত্বদানে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইংরেজিতে যাকে বলে throwing the weight about-সেটা কদাপি তার মধ্যে দেখিনি। সেটা করতে গেলে তিনি ব্যর্থ হতেন।

সংবাদে তখন যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর মতো বাঘা বাঘা সাংবাদিক, যাঁরা শুধু জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠই ছিলেন না, ছিলেন অসম্ভব স্পর্শকাতর, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন। তার সমবয়সীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের কেউ গুণ-গরিমা, বিদ্যাবুদ্ধি কোনও দিক থেকেই খাটো ছিলেন না। কারও কারও তো দুর্মুখ এবং কটুভাষী হিসেবে যথেষ্ট বদনামই ছিল। এছাড়া ছিলেন মন্টু লোহানী এবং মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, ঘটু-নাটু বলে ইদরিস ভাই যাদের অভিহিত করতেন। এমন লাগসই দুটো নাম মীর মশাররফ হোসেন দুই গজনবী ভ্রাতাকে দিয়েছিলেন। গাজী মিয়ার বস্তানী থেকে ইদরিস ভাই এই নাম দুটো উদ্ধার করেন। অগত্যা-খ্যাত এই দুই বন্ধু তখন তরুণদের মধ্যে holy teror এঁদের দু'জনকে সামলানোই যে কোনও সম্পাদকের সারাক্ষণের চিন্তা হতে পারতো। কিন্তু খায়রুল কবীরকে এ নিয়ে বিশেষ ভাবনায় পড়তে দেখিনি। আত্মাভিমানী সাদেক খান, নম্র লাজুক সাবের, খরজিহ্বা তালেব। এদের ছাড়া তৎকালীন angry young man কে, জি মুস্তাফা ছিলেন, কারু মান রেখে কথা বলতে তিনি সর্বদাই অনিচ্ছুক। অন্ততঃ তখন তাই ছিলেন। সংবাদের নানা বিভাগে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের নানা অঙ্গনে শুধু বৈশিষ্ট্য নয়, রীতিমত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শিল্পী সুলভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরো বিসর্জন দিতে পারেননি। কাজেই এদের খায়রুল কবীর কিভাবে সামলাতেন, সেটা ভেবে আজও বিস্মিত হই। সামলানোই নয়, বয়োবৃদ্ধ ইদরিস ভাই থেকে

www.pathagar.com

সর্বকনিষ্ঠ মন্টু লোহানী পর্যন্ত সকলেই তাঁর সামনে গরম দুধে পাউরুটির মতো বিগলিত হতেন। এই একটা পরামাশ্চর্য গুণ খায়রুল কবীরের ছিল। এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে বিষয় অজানাই থেকে যাবে। যাঁরা সংবাদের ছিলেন, তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, যাঁরা সংবাদে কোনওদিন কাজ করেননি সে সব পোড় খাওয়া সাংবাদিকদেরও দেখি খায়রুল কবীরের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধায় কিংবা ভালোবাসায় কিংবা অন্য কোনও অনুদঘাটিত কারণে, রীতিমত আপ্লুত হয়ে যান। ক্লড রয় এলুয়ার সম্পর্কে একটা কথা বলেছিলেন, প্রতিভা অনেকেরই থাকতে পারে, বুদ্ধির চোখ ঝলসানো দীপ্তি অপরিমেয় জ্ঞানের ভাণ্ডারও অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু এলুয়ার যেখানে একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেটা হচ্ছে তিনি ভালো লোক। কথাটার অর্থ আমি খায়রুল কবীর-কে দেখে কিছুটা আঁচ করেছিলাম। অন্তত: সেকালে যে কথাটা সত্য ছিল, সে তো নিজের চোখেই দেখেছি।*

*১৯৮০ সালে দৈনিক 'সংবাদ'-এর উনত্রিশ বছর পূর্তি সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ

লেখক ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক

www.pathagar.com

আন্দোলন সংগ্রামে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সন্তোষ গুপ্ত

এ দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে ও সংগ্রামে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। তবে কখনও কখনও সরকারের ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে কোনও কোনও সাংবাদিককে নেতিবাচক ভূমিকাও পালন করতে দেখা গেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে তাদের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদা না হলেও প্রথম দিকে সরকারের সব নীতির সঙ্গে একাত্ম ছিল।

দেশের শিল্প বিকাশের উপর সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। প্রথমদিকে তাই দেখা যায়, কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশের কিছুদিন পর পরই বন্ধ হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ দেশ বিভাগের পর ইতিপূর্বে ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিক ইনসাফ ঠিক এক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে দৈনিক মিল্লাত এবং ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে দৈনিক ইত্তেহাদের প্রকাশনা বন্ধ হয়।

ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্র ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অবকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে। সরকারী পদমর্যাদা ও প্রকাশনাযন্ত্র থেকে তাদের বিদায়ের পর এদের মালিকানাধীন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুবা ক্রমাগত আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৈনিক জেহাদ।

জনাব এ.টি.এম মোস্তফা আইয়ুব আমলে মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালে তদীয় ভ্রাতা জনাব তাহার মালিকানাধীন প্রকাশিত দৈনিক জেহাদ প্রকাশের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। মোহন মিয়ার পত্রিকা মিল্লাতের বন্ধ হওয়ার মূলে ছিল পত্রিকাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে তাঁর অনাগ্রহ। এভাবে নূরুল আমীনের পত্রিকা দৈনিক সংবাদও মালিকানা পরিবর্তনের পর আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এ ছাড়া বামপন্থী পত্রিকা হিসেবে সংবাদ-এর উপর সরকারের বিরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। গভর্নর মোনায়েম খাঁর পত্রিকা দৈনিক পয়গাম তাঁর পতনের পর কোনওমতে প্রকাশনা চালু রেখেছিল।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় একবার পুলিশ ধর্মঘট হয়। জেল, গুলির মুখে এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হয়। এই সময়ে ঢাকার কোনও সংবাদপত্রে এই ধর্মঘটের খবর প্রকাশিত হয়নি। আজাদ ও মর্নিং নিউজ বিশ্বস্তভাবে সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকা সমর্থন

www.pathagar.com

করে। পাকিস্তান অবজারভারও এ ব্যাপারে সরকারী নীতির সমর্থক ছিল। কারণ এই পত্রিকার মালিকও তখন প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের ব্যাপকতার জন্যে তৎকালে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিক্রিয়াও গণমুখী হয়। আজাদ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই ভূমিকা এবং ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে আজাদ পত্রিকা সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় পাকিস্তানে সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। বস্তুত ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল সংগ্রামে সাংবাদিকগণ প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের ঘোষিত আদর্শের প্রতি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে গুলির মুখে স্তব্ধ করার জন্যে পাকিস্তান সরকারের প্রচেষ্টা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের আচ্ছন্ন আড়ষ্ট চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কৃষকদের আন্দোলন– যথা টংক নানকার প্রথার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী দমন নীতি, চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় কৃষকদের ভুখামিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলন দমনে সরকারের বর্বরতা ও নৃশংসতার খবর সে সময় ঢাকার কোনও কোনও সংবাদপত্রে সসংকোচে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই পাথরচাপা উৎসমুখটা খুলে দিয়েছিল। এরপর ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক সরকার কায়েম হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনের অস্তিত্ব ছিল না। ১৩ অক্টোবর নিরাপত্তা আইন পুনরায় এক অর্ডিন্যান্সবলে চালু করা হয়। এই দিন রাতেই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫ জন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ইতিপূর্বে শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

সামরিক সরকার কায়েমের পর পত্রিকার উপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সংবাদপত্র নামমাত্র যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করত, তা সামরিক শাসন জারির সঙ্গে মার্শাল ল রেগুলেশনের একটি ধারাবলে রহিত করা হয়। উপরে উল্লিখিত গ্রেফতারকৃত ৩৫ জনের মধ্যে ঢাকায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার ও আলী আকসাদ ছিলেন। পাবনার সংবাদ পত্রিকার মিত্রও একই সময়ে গ্রেফতার হন। কিন্তু কোনও গ্রেফতারের খবর সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়নি। সরকার থেকে জানানো হয় যে, এই গ্রেফতারের খবর ঘোষণার পূর্বে গ্রেফতার সংক্রান্ত কোনও খবর প্রকাশ করা যাবে না। গ্রেফতারের ৭/৮ দিন পর গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিকদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এরপর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ধরপাকড় চলতে থাকে, তার খবরও সরকারী প্রেসনোট অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এ ধরনের নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সম্মুখে কোনওরূপ প্রতিবাদের পথ ছিল না। ২৭ অক্টোবর দ্বিতীয় ক্যু মারফত আইয়ুব খান ক্ষমতায় এলেন।

www.pathagar.com

ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের ৩১ অক্টোবর আমাকে সংবাদ অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৯ সালের মে মাসে পাকিস্তান অবজারভারের রিপোর্টার ফয়েজ আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করেছে। তার পিছনে উপনিবেশবাদী দুরভিসন্ধি ছিল। এ ছাড়া আর কোনও যুক্তি ছিল না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণকে অনেকটা পিছিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক শোষণ সুদীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। সেই সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরকারী যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন, যদি ধর্মই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার একচেটিয়া অধিকারী হয় তাহলে উর্দু কেন, আরবি হোক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আরবি তো দু' অঞ্চলের মুসলমানের দৃষ্টিতে সমান পবিত্র। সরকার কিংবা পশ্চিমা ধনিকশ্রেণী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ ধরনের বক্তব্যে প্রীত হওয়ার চাইতে বেজার হয়েছিল বেশি। উর্দুকে ইসলামী ভাষা বলে বাংলাদেশের জনগণের উপর যদি চাপিয়ে দিতে চায়, তাহলে আরবির দাবি সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরবির প্রতি অনীহ। তার কারণ তাদেরকেও তাহলে বাংলাদেশের মতো গোড়া থেকে ভাষা শিক্ষা করতে হয়। তারা তাতে গররাজী। তাহলে যে বাংলাদেশের মানুষকে পিছিয়ে রাখার সমস্ত কূটকৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গড়তে নিঃসন্দেহে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অনন্য। সেদিন যদি সংবাদপত্রসমূহ এবং সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে আগরতলা মামলার প্রহসনের মীমাংসা হতো না। অকস্মাৎ সরকার পতনও হতো না। জনসাধারণ সরকার নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্ট পত্রিকার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান অফিস পুড়িয়ে দেয়। ট্রাস্ট বাতিলের দাবিতে জনমত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।

বিগত ১৯৭০ সালের ১২ নবেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের ১০ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানির পর দেশে বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, আর ইসলামাবাদের গদি ছেড়ে ইয়াহিয়া বাংলাদেশে তশরিফ আনেন। বিমানবন্দর সেদিন সাংবাদিকদের জন্যে এমনকি বিদেশী সাংবাদিকদের জন্যেও ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। বিমান বন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে বিবিসি'র সংবাদদাতা খবর পাঠালেন লণ্ডনে। ১৯৭১ সালে সংবাদপত্র অফিস জ্বালিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনীর স্বরূপ ধরা পড়ল সমগ্র বাঙালির কাছে। এত করেও জঙ্গী শাহী স্তব্ধ করতে পারেনি বাঙালির কণ্ঠ। কবির ভাষায় বলা চলে :

জিহ্বা তো দিয়েছি
শৃঙ্খলের প্রতিটি আংটায়'

১৯৭০ -এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, তা ছিল গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে অনেক ব্যাপক এবং জন অভ্যুত্থানকারী। দেশের সকল শ্রেণীর লোক

www.pathagar.com

এতে অংশগ্রহণ করে। সরকারী গুলিগোলার বিরুদ্ধে এই অসহযোগ আন্দোলন চলেছিল ২৫ মার্চ পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হামলায় ঢাকা শহরে এক রাতেই ৮ থেকে ১০ হাজার নর-নারী শিশু বৃদ্ধ যুবক মারা যায়। এই গণহত্যার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে শুরু হয় প্রতিরোধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৬ দফার ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন বাঙালীর মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হয়।

নির্বাচনোত্তরকালে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে (১ মার্চ-২৫ মার্চ ১৯৭১) সাংবাদিকগণ দ্বিধাহীন চিত্তে নির্ভীকভাবে সাড়া দিয়েছেন।

২৫ মার্চ রাতের আঁধারে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরস্ত্র বাংলার বুকে শুরু হয় হত্যা, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। বর্বর বাহিনী আগুন দেয় স্কুল ঘরে, বস্তিতে, প্রাসাদে আর কুটিরে। সেদিন তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতি নির্মূল করা। তাই ছাত্র আর শিক্ষকদের হত্যা করা হয় প্রথম রাতেই। পরদিন ২৬ মার্চ। মিছিলের নগরী, প্রতিবাদের নগরী, শত সংগ্রামের গর্বিত নগরী ঢাকা জ্বলেছে দাউ দাউ করে। বিকেল ৩টার দিকে গোলাবর্ষণ করে পাকসেনা ধ্বংস করে ইত্তেফাক অফিস। পঁচিশ তারিখ রাতে পুড়িয়ে দেয় ইংরেজি দৈনিক দি পিপল। শহীদ হন কয়েকজন সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের কর্মচারী। আজাদ পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার হেলালুর রহমান চিশতি ইকবাল হলে পাক বর্বর বাহিনীর গুলিতে রাত ১১টার দিকে শহীদ হন।

৩০ মার্চ দৈনিক সংবাদ পাক বাহিনীর গোলায় বিধ্বস্ত হয়। প্রাণ দিলেন শহীদ সাবের নামে একজন প্রবীণ সাংবাদিক। বহুদিন যাবত তিনি মানসিক রোগে ভুগছিলেন। এভাবে সংবাদপত্র জ্বালিয়ে দেওয়া, দৈনিক ইত্তেফাক, দি পিপল, সংবাদ পত্রিকা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনী অত্যাচার চালায়। "President Yahya khan looks gloomy, it seems that he has invaded his own country"- হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ইয়াহিয়ার সাংবাদিক সাক্ষাৎকার শেষে এই উক্তিটি করেন কোনও এক সাংবাদিক।

২৬ মার্চ (১৯৭১) সংবাদপত্রের উপর প্রি-সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। সংবাদপত্র সরকারী প্রেসনোটে পরিণত হয়। পাকিস্তান অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়ার বৈঠকের সময় ১৬ মার্চ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭১ গোপনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাদারি কর্তব্য পালন করেই অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্যে সংগ্রাম করেই সাংবাদিকদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আর তা যে শেষ হয়নি তার প্রমাণ– এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে একজন সৈনিকের মতই সাংবাদিকগণ নিজেদের স্থান বেছে নিয়েছেন। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পাশে তারা এসে দাঁড়িয়েছেন। দগ্ধ তাম্রদিগন্তের হাতছানি তাদের শঙ্কিত করেনি। ঘরছাড়া মানুষের কাফেলায় এসে তাঁরা অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করে নিয়েছেন। বিশ্বের বিবেকের কাছে

www.pathagar.com

সংগ্রামী বাংলার রক্তস্নাত বাংলার আশা আর আর্তনাদ তুলে ধরেছেন। জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বরতার কাহিনী প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন কর্তব্যের ডাকে- শুধুমাত্র পেশাগত দায়িত্ব পালনের চরিতার্থতা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে গণসংগ্রামে এই উপমহাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রগুলো যে ভূমিকা পালন করেছে, মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামী ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধেও অব্যাহত রেখেছেন। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ ব্যতীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থহীন, একথা সাংবাদিকরা লিখেছেন তাদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জন হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ সংবাদপত্র গণসংগ্রামে জনগণের পাশে ছিল। প্রমাণিত হয়েছে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বলিষ্ঠ ভূমিকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারে।*

**লিটল ম্যাগাজিন 'প্রাঙ্গণ' (শফিকুল বাশার সম্পাদিত) ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর '০৪) প্রকাশিত হয় এ লেখা। এই লেখাটিই প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত'র স্বহস্তে লিখিত শেষ প্রবন্ধ। প্রেস ক্লাব সুবর্ণ জয়ন্তি গ্রন্থের জন্যে তিনি লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মাত্র এক প্যারা লিখতে সক্ষম হন। ওই লেখা সম্পূর্ণ করার আগেই ৬ আগস্ট '০৪ তাঁর দেহাবসান ঘটে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। - সম্পাদক*

লেখক ছিলেন দৈনিক সংবাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক

www.pathagar.com

ফটো অ্যালবাম

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৭ ফেব্রুয়ারি '৭৯ জাতীয় প্রেস ক্লাব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

ছবি ঃ আফতাব আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৭ নবেম্বর '০৪ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিডিয়া কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

ছবি ঃ খালেদ হায়দার

www.pathagar.com

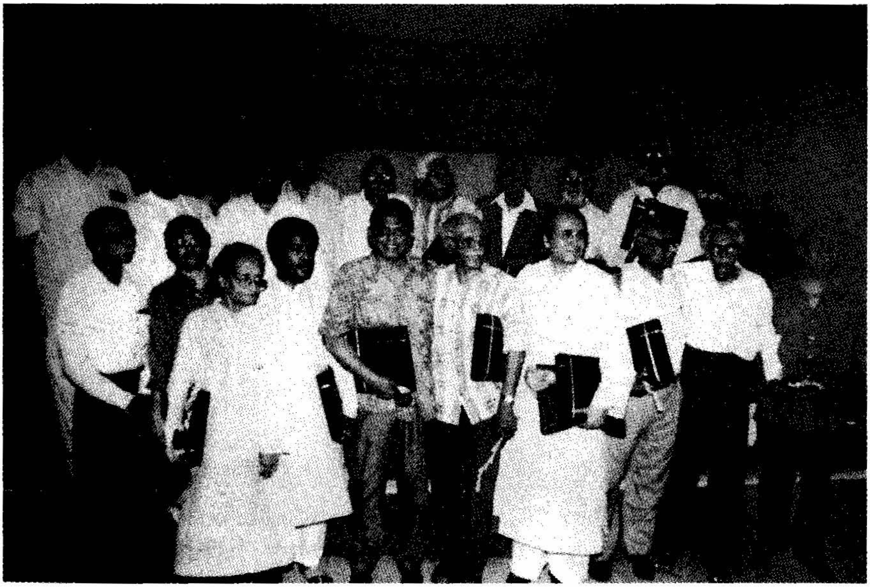

জাতীয় প্রেস ক্লাব সদস্য যাঁরা জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের এবং সদস্য লেখকদের সংবর্ধনা দেয়া হয় ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ

ছবি ঃ ওয়াসে আনসারী

উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জগতের মহানায়ক দিলীপকুমার ২২ জানুয়ারি '৯৫ ঢাকায় এলে জাতীয় প্রেস ক্লাব তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়

ছবি ঃ ওয়াসে আনসারী

www.pathagar.com

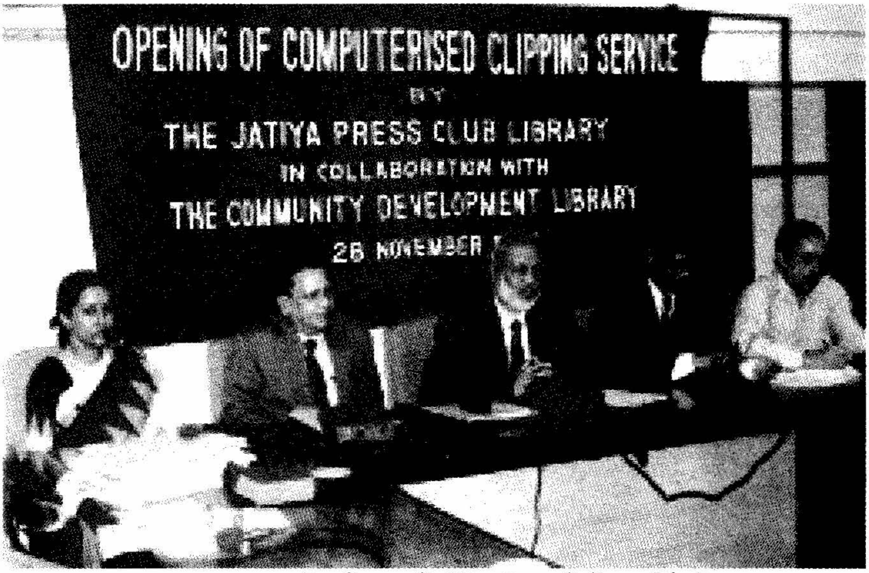

২৮ নবেম্বর ২০০২ প্রেস ক্লাব লাইব্রেরিতে কম্পিউটারাইজড ক্লিপিং সার্ভিস উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. মঈন খান

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা শাবানা আজমীকে দেয়া প্রেস ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে (১৯৯৪ সাল) সাধারণ সম্পাদক শওকত মাহমুদ (মাঝে) ও সাংস্কৃতিক উপ কমিটির আহ্বায়ক শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক

ছবি ঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

www.pathagar.com

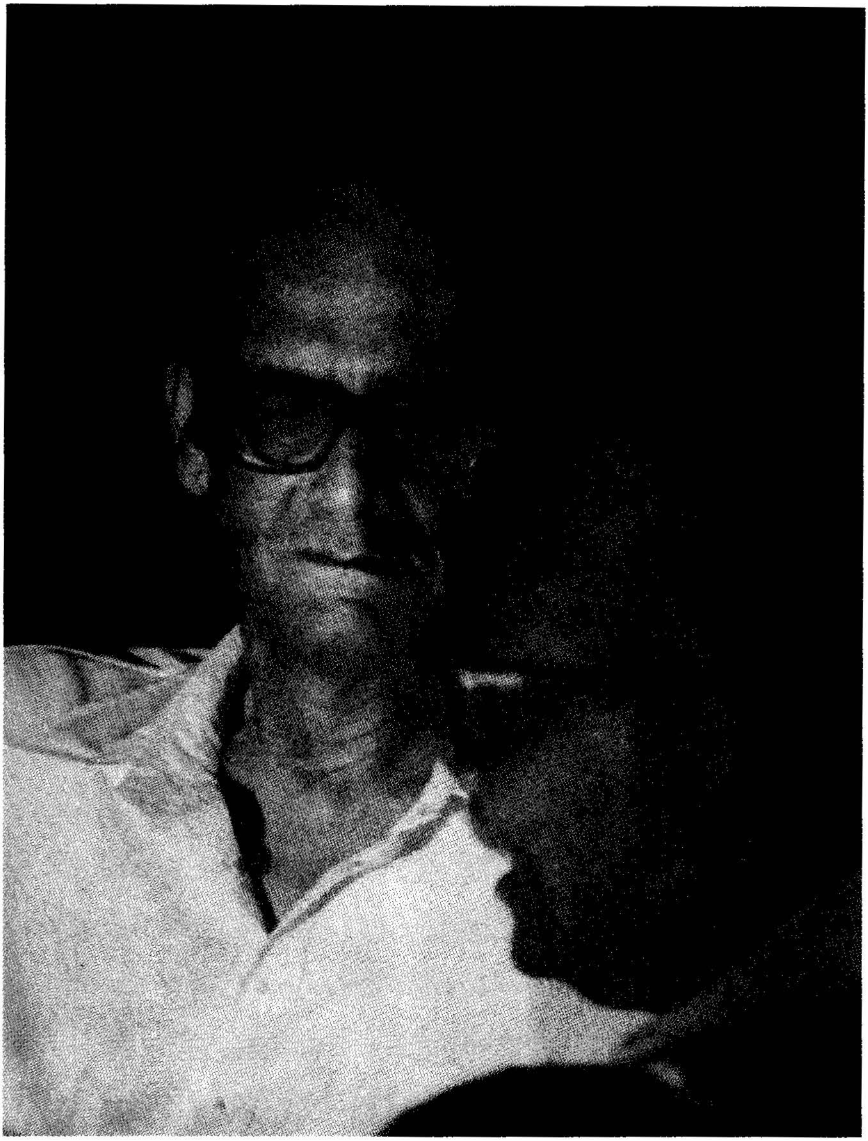

প্রখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সমর দাস। দু'জনেই আজ স্মৃতি

ছবি ঃ ওয়াসে আনসারী

www.pathagar.com

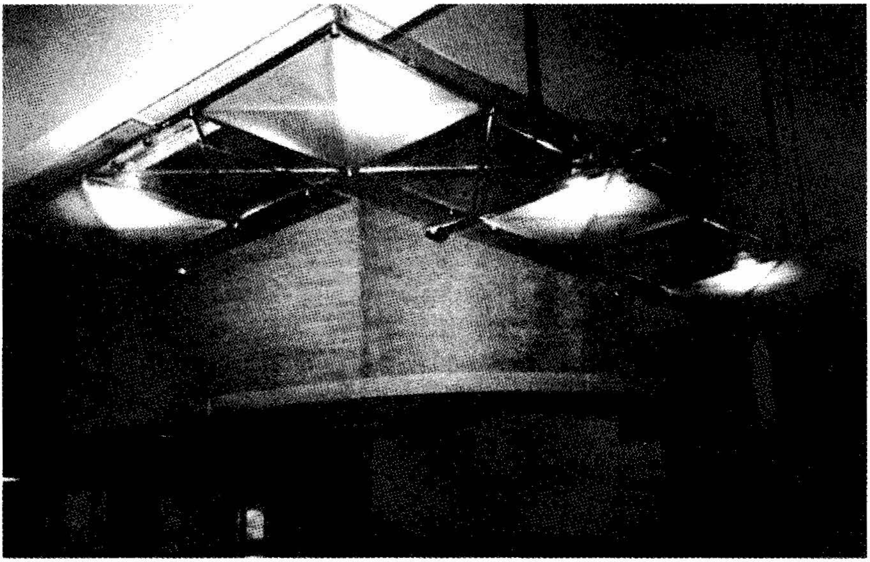

নবরূপে সজ্জিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের উপরের অংশ

জাতীয় প্রেস ক্লাব ভবনের প্রবেশ পথে নান্দনিক স্থাপত্যকর্ম

www.pathagar.com

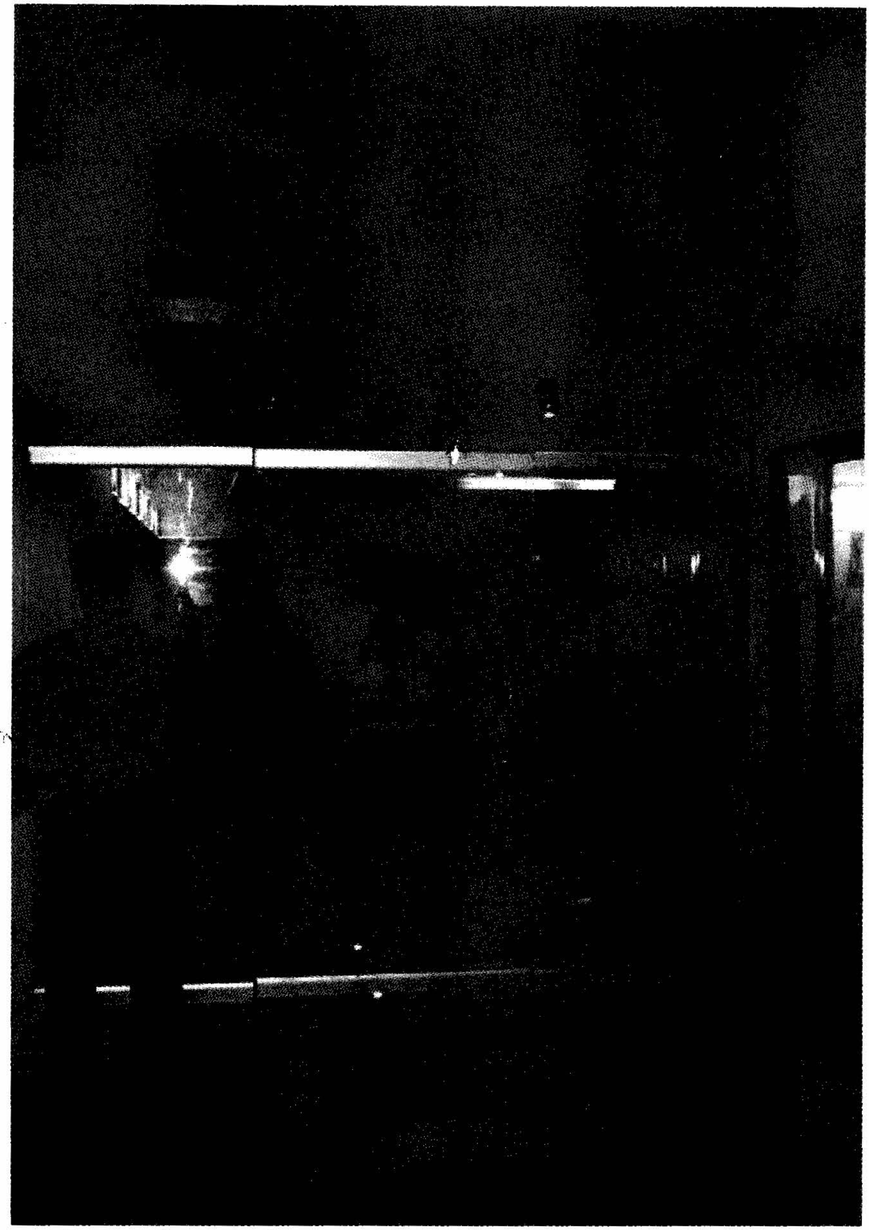

নতুন বিন্যাসে দৃষ্টিনন্দন জাতীয় প্রেস ক্লাবের মেম্বারস্ লাউঞ্জ

www.pathagar.com

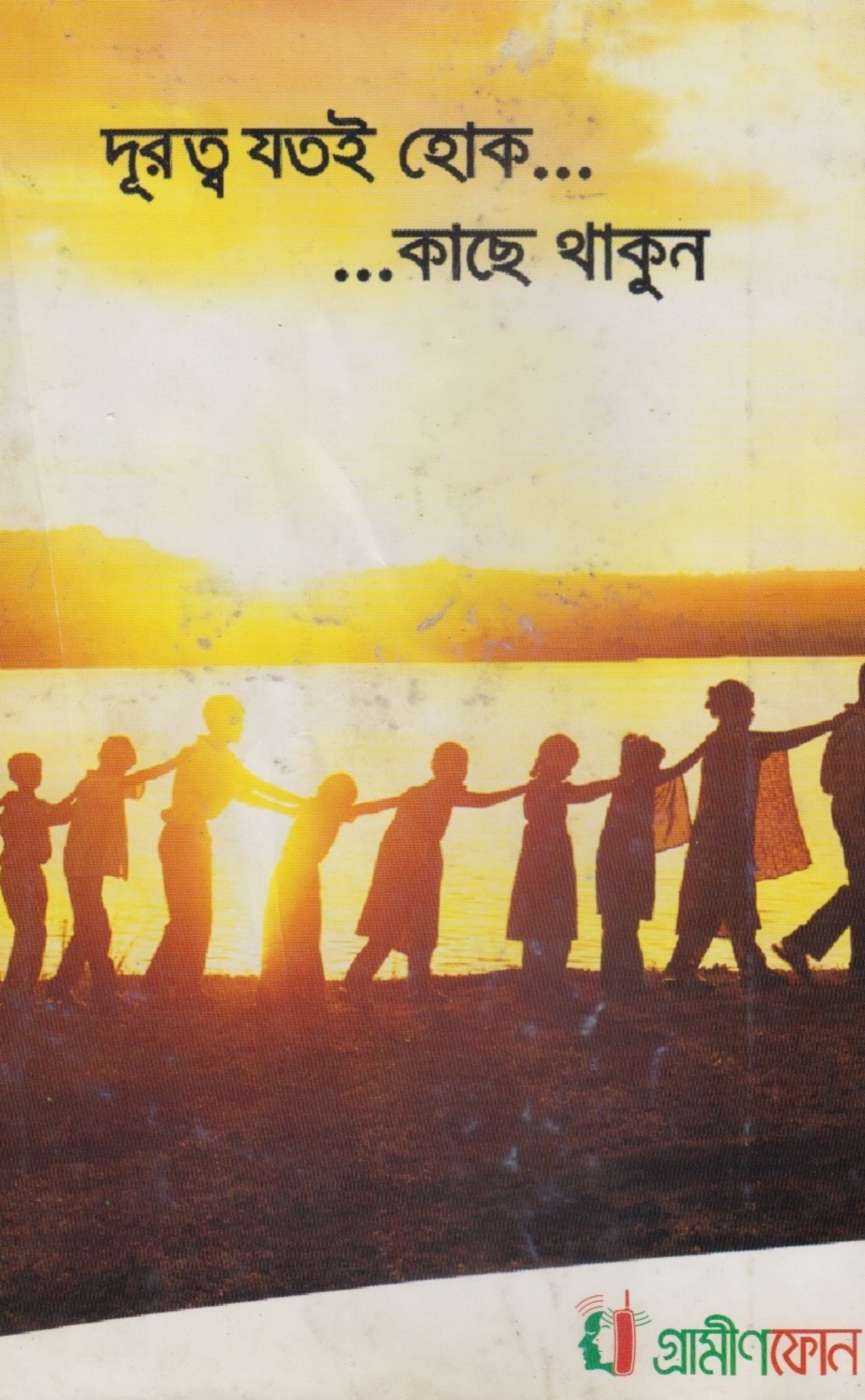
দূরত্ব যতই হোক...
...কাছে থাকুন
গ্রামীণফোন